সংগীত মনীষা

দ্বিতীয় খণ্ড

অমল দাশশর্মা

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ ১৯৮১

প্রকাশক : কনক বাগচী
কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০১২

মুদ্রক : এরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩, হায়াৎ খান লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

যাঁর অক্লান্ত ও অকৃত্রিম সেবা ও আত্মত্যাগ সর্বদা
আমার সামগ্রিক উন্নতি ও সার্থকতার জন্য নিয়োজিত
সেই

শ্রীমতী বেলা দেবীকে

এই

গ্রন্থ অর্পণ করা হোল।

নিবেদন

বিগত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা অনুসারে ভেবেছিলাম সংগীত সম্বন্ধে, শুধুমাত্র একখানা এমন গ্রন্থ রচনা করবো যে, শিক্ষার্থীকে আর কোথাও ছুটো-ছুটি করতে হবে না, তা সে যেকোন শ্রেণীরই হোক না কেন। যাবতীয় ঔপপত্তিক বিষয়ের ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা সমূহ সহযোগে এই গ্রন্থখানিকে তাই যথাসম্ভব প্রণালীবদ্ধ, প্রামাণ্য অথচ সংক্ষিপ্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত বিশাল হওয়ায় একখণ্ডে ছাপা সম্ভব হোল না। আজ তাই দ্বিতীয় খণ্ডের এই প্রস্তাবনা।

একক প্রচেষ্টায় এই বিশাল বিষয় সমূহ সংকলনে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটা বিচিত্র নয়। সহৃদয় সুধীজনের কাছে তাই বিনীত নিবেদন এই যে, ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন, সংযোজন, বর্জন প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ দিলে পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থখানিকে আরো গ্রহণ যোগ্য করার প্রয়াসী হবো।

বর্তমানে সংগীত পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সংগীতবিদ্‌দের সামনে এখন কঠিন দায়িত্ব। এখন শিক্ষাদানের সেই পুরোনো তথা সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে প্রণালীবদ্ধ তথা প্রামাণ্যরূপে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর সংগীত শাস্ত্রাদি হওয়া চাই যথাসম্ভব বিজ্ঞান ভিত্তিক, প্রণালী-বদ্ধ তথা প্রামানিক। তবেই নবীন শিক্ষার্থীরা সহজে ভ্রান্তিহীন শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে।

গ্রন্থখানি প্রকাশের বিস্তৃত পশ্চাতপটে যে কঠোর পরিশ্রম এবং আর্থিক, মানষিক, পারিবারিক ইত্যাদি বহুবিধ অবক্ষয় ঘটেছে, সংগীতের শিক্ষার্থী, শিক্ষক তথা রসিকজনের মনোরঞ্জনে সক্ষম হলে তা সার্থক হবে। ইতি

২৭শে জুন ১৯৭৯। অমল দাশশর্মা

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

সংগীতশাস্ত্র

সংগীত ঃ সংগীত বলতে সাধারণত কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীত বোঝায়। পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব বলেছেন : "গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে", অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটি স্বতন্ত্র কলার সমাবেশকে সংগীত বলে। প্রাচীনকালে এই তিনটি স্বতন্ত্র কলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একত্রেই অনুষ্ঠিত হোত, কারণ এরা একে অন্যের পরিপূরক ছিল। আবার স্বতন্ত্ররূপেও অনুষ্ঠিত হোত। অর্থাৎ এই কলাবিদ্যাগুলি প্রাচীনকাল থেকেই স্বতন্ত্ররূপে স্বীকৃত এবং প্রচলিত। তবে গীতের প্রাধান্য হেতু, সংগীত বলতে যে শুধু গীতও বোঝায়, শার্ঙ্গদেব সে কথারও উল্লেখ করেছেন :

নৃত্যং বাদ্যানুগং প্রোক্তং বাদ্য গীতানুবৃত্তি চ।
অতোগীত প্রধানত্বাদত্রাদাবভিধীয়তে ॥

অর্থাৎ বাদ্যের অধীন নৃত্য এবং গীতের অধীন বাদ্য, সুতরাং এই কলাত্রয়ের মধ্যে গীতই প্রধান।

গীত/গান ঃ গীত বা গানের পরিচয়ে শার্ঙ্গদেব বলেছেন :

রঞ্জকঃ স্বরসন্দর্ভো গীতমিত্যাভিধীয়তে।
গান্ধর্বগানমিত্যস্য ভেদদ্বয়মুদীরিতাম্ ॥

অর্থাৎ প্রাণীচিত্ত বিনোদনে সক্ষম এমন স্বর রচনাকে গীত বলে। গান্ধর্ব ও দেশী ভেদে গীত দুই প্রকার।

আসলে নানাবিধ গানের ব্যাপক নাম হোল গীত। কারণ যাবতীয় সংগীতে ব্যবহৃত পদ্যকেই গীত বা গান বলা হয়।

বাদ্য ঃ কোন বাদ্যযন্ত্রে সুর ও তাল সহযোগে মনের ভাব প্রকাশ তথা রস সৃষ্টি করাকে বাদ্য বলে। তত, সুষির, আনদ্ধ ও ঘন ভেদে চার

শ্রেণীর বাদ্য আছে। 'বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ' পরিচ্ছেদে, প্রচলিত বহু বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রাদির পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

নৃত্য ঃ বিবিধ ছন্দে এবং সুললিত অঙ্গভঙ্গি সহযোগে মনের ভাব প্রকাশ তথা রস সৃষ্টি করাকে নৃত্য বলে। প্রাচীন ভারতে নৃত্যের দুটি প্রধান ধারা প্রচলিত ছিল, যথা তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্য। এছাড়াও নানাবিধ মিশ্রিত লোক-নৃত্য প্রচলিত ছিল।

তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্য ঃ মহাদেবের অনুচর তণ্ডু কর্তৃক প্রচারিত উদ্ধত ও বীর রসোদ্দীপক নৃত্যকে তাণ্ডব এবং বাণদুহিতা কর্তৃক প্রচারিত সুকুমার ললিতভাবযুক্ত তথা শৃঙ্গার রসোদ্দীপক নৃত্যকে লাস্য বলে। কালক্রমে নৃত্যের বহু প্রকারভেদ প্রচলিত হয়েছে।

আধুনিক ভারতে নৃত্যের চারটি প্রধান ধারা প্রচলিত, যথা—(১) ভরতনাট্যম, (২) মণিপুরী, (৩) কথাকলি এবং (৪) কত্থক। এই চারটি নৃত্যধারা উচ্চাঙ্গ (ক্লাসিকাল) নৃত্যকলা হিসাবে স্বীকৃত। এছাড়া বিভিন্ন আঞ্চলিক নৃত্যকে দেশী বা লোকনৃত্য বলা হয়। যেমন, গাজন, গরবা, দেবদাসী, নাগা, সাঁওতালী, ভাঙ্গরা প্রভৃতি।

ভরতনাট্যম ঃ ভরতমুনি তণ্ডুর কাছে তাণ্ডবনৃত্য শিক্ষা করেছিলেন এইরূপ শাস্ত্রে কথিত আছে। এই ভরতনৃত্যের ক্রমবিবর্তিত রূপকেই ভরতনাট্যম বলা হয়। তাণ্ডবের বলিষ্ঠ ভাবাপন্ন এই নৃত্য মৃদঙ্গ বা মাদল সহযোগে এবং পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে পরিবেশিত হয়ে থাকে। দক্ষিণ ভারতেই এর প্রচলন বেশী। তবে বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এর অনুশীলন দেখা যায়।

মণিপুরী ঃ আসামের মণিপুর অঞ্চলে এর উৎপত্তি ও প্রচলন। ভক্তি-রসাত্মক ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক এই নৃত্যে লাস্যভাবই অধিক পরিস্ফুট। এতে মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল ও খঞ্জনী ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ভারতের অন্যান্য স্থানেও এর অনুশীলন দেখা যায়।

কথাকলি ঃ দক্ষিণ ভারতের কেরল অঞ্চলে কথাকলি নৃত্যের উৎপত্তি ও প্রচলন। তবে বর্তমানে অন্যান্য স্থানেও এর প্রচলন দেখা যায়। ভরত মুনি বর্ণিত নাট্যনৃত্যকেই সম্ভবতঃ বর্তমানে আঞ্চলিক লোকনৃত্যের পরিণতি

স্বরূপ কথাকলি নৃত্য বলা হয়। এই নৃত্যানুষ্ঠানে, পৌরাণিক দেব-দেবীর, চরিত্রগুলির বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ, নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি ও ভাবাভিনয়ের সাহায্যে প্রদর্শিত হয়। এতে মৃদঙ্গ বা মাদল ব্যবহৃত হয় এবং সংগীতোপযোগী বোল প্রভৃতি অন্তরালবর্তী সহযোগী শিল্পীরা উচ্চারণ করে থাকে।

কথক ঃ মধ্যযুগে, উত্তর ভারতীয় কথক বংশীয় শিল্পীরা ভরতনাট্যম, মণিপুরী এবং পারস্যের নৃত্যের সংমিশ্রণে এই নৃত্যধারার উদ্ভাবন এবং প্রচার করেন। বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্র প্রকাশই এই নৃত্যানুষ্ঠানের প্রধান বিষয়বস্তু। এতে পাখোয়াজ বা তবলার নানাবিধ বোলের ছন্দ অনুসারে নৃত্যের ছন্দ-সমন্বয় করা হয়। এছাড়া শিল্পী স্বয়ং বহু বিচিত্র বোল উচ্চারণ করে, তাকে আবার পায়ের ছন্দে প্রকাশ করে থাকেন এবং সেই সঙ্গে নানাবিধ তেহাই প্রয়োগ এই নৃত্যের একটি মহত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

ভাও ঃ ভাও হোল ভাব শব্দের হিন্দী রূপ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে বিবিধ ভাব প্রকাশকে বলা হয় 'ভাও-বাৎলানা'। ঠুংরি গায়িকারা, নৃত্য-শিল্পীবা এবং নট-নটীরা 'ভাও' প্রদর্শন কবে থাকেন।

ভাব ঃ রস-আস্বাদনে চিত্তের যে ভাবান্তর হয় তাকে ভাব বলে। শাস্ত্রে ভাবের চারটি বৈচিত্র্যের উল্লেখ আছে। যথা—(১) স্থায়ীভাব, (২) সঞ্চারী (সঞ্চরণশীল) বা ব্যভিচারী ভাব, (৩) বিভাব এবং (৪) অনুভাব।

স্থায়ীভাব ঃ রসের প্রধান ভাবকে স্থায়ীভাব বলে। কারণ একটি বিশেষ ভাব থেকে একটি বিশেষ রসের উৎপত্তি হয় এবং সেই ভাবের বিরতিতে সেই রস লোপ পায়। তাই মুখ্য ভাবটিকে স্থায়ীভাব বলে।

সঞ্চারী ভাব ঃ মুখ্য বা স্থায়ী ভাবের আনুষঙ্গিক যে সকল ভাব অপ্রধান হলেও তাকে পরিস্ফুট করে তাদের ওই মুখ্য ভাবের সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব বলা হয়।

বিভাব ঃ ভাবের বিবিধ উপকরণকে বিভাব বলে। যেমন, পুষ্পোদ্যান, সংগীত, বসন্তঋতু, যুদ্ধ, অগ্নি, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি।

অনুভাব ঃ ভাবকে ব্যক্ত করার ক্রিয়াকে অনুভাব বলে। যেমন, ভ্রূসংকুচন, নানাবিধ কটাক্ষ, আস্ফালন, স্মিতহাস্য প্রভৃতি।

নাদ ঃ

বিশ্বের সবকিছুর মূল কারণ হোল নাদ বা ধ্বনি, তাই শাস্ত্রে নাদকে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত করে 'নাদব্রহ্ম' বলা হয়েছে। আমাদের দর্শন-শাস্ত্রে আছে ঃ

ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরাঃ।
ন নাদেন বিনা নৃত্যং তস্মানাদাত্মকং জগৎ ॥
তন্মধ্যে সংস্থিত প্রাণঃ প্রাণাদবহ্নি সমুদ্ভব।
বহ্নিমারুত সংযোগান্নাদঃ সমুপজায়তে ॥

অর্থাৎ গীত, নৃত্য, স্বর প্রভৃতি কিছুই নাদ ছাড়া হয় না, কারণ নাদই জগতের আত্মা, প্রাণ থেকে বহ্নি এবং অগ্নি ও বায়ুর সংযোগে নাদের উৎপত্তি।

মহর্ষি পাণিনি নাদের পরিচয়ে বলেছেন ঃ

নকারং প্রাণনামানং দকারমনলং বিদুঃ।
জাতঃ প্রাণাগ্নি সংযোগাত্তেন নাদোভিধীয়তে ॥

অর্থাৎ—নকার অর্থে প্রাণ এবং দকার অর্থে অগ্নি, এই দুয়ের মিশ্রণে নাদের উৎপত্তি। পরবর্তী সকল শাস্ত্রীরা নাদ সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যাই স্বীকার করেছেন।

নাদ, ধ্বনি, শ্রুতি, স্বর, শব্দ, আওয়াজ প্রভৃতি শব্দগুলি নানাস্থানে ব্যবহৃত হলেও এগুলির মূলগত অর্থ অভিন্ন। সংগীতের উপযোগী এবং তদ্ব্যাতিরিক ভেদে নাদ দুই প্রকার। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করেছেন যে, একই প্রকার কম্পন-সংখ্যাযুক্ত ধ্বনিকে সংগীতোপযোগী (musical বা স্নিগ্ধ) ধ্বনি, এবং বহুপ্রকার কম্পন-সংখ্যাযুক্ত ধ্বনিকে সংগীতোনুপযোগী (Non-musical) বা কর্কশ বা কোলাহল বলে। সংগীতোপযোগী নাদই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

অনাহত নাদ ঃ আহত এবং অনাহত ভেদে নাদ দুই প্রকার। কোনরূপ ঘর্ষণ বা স্পর্শ ছাড়াই যার উৎপত্তি, অর্থাৎ যে নাদ-সৃষ্টির কারণ অজ্ঞাত, যা উপলব্ধি করা যায় কিন্তু শোনা যায় না। যেমন, দুই হাত দিয়ে কান চেপে ধরলে একটা অবিরাম সাঁ-সাঁ আওয়াজ উপলব্ধি করা যায়, তাকে বলা হয় অনাহত নাদ ; এই নাদ সংগীতে অনুপযোগী।

শোনা যায়, প্রাচীন মুনি-ঋষিরা নাকি এই মুক্তিদায়ক নাদের উপাসনা করতেন।

আহত নাদ: যে নাদ দুটি বস্তুর ঘর্ষণে বা স্পর্শে সৃষ্ট এবং যা কানে শোনা যায় তাকে আহত নাদ বলে। সংগীতোপযোগী এই নাদই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আহত নাদ সম্পর্কে তিনটি বিষয় মহত্বপূর্ণ। যেমন, নাদের জাতিভেদ, রূপভেদ এবং উচ্চ-নীচতা ভেদ।

নাদের জাতিভেদ: কোন ধ্বনি মনুষ্যকণ্ঠ কিংবা কোনপ্রকার বাদ্যযন্ত্র নিঃসৃত তা কানে শুনেই নির্ণয় করা সম্ভব। অর্থাৎ কোন জাতীয় নাদ তা নিরূপণ করাকে নাদের জাতিভেদ বলে।

নাদের রূপভেদ: কোন একটি স্বরকে আস্তে কিম্বা জোরে উচ্চারণ করে যে রূপান্তর ঘটানো সম্ভব তাকে নাদের রূপভেদ বলা হয়।

নাদের উচ্চ-নীচতা ভেদ: ষড়্জ থেকে ঋষভ উঁচু, আবার পঞ্চম থেকে মধ্যম নীচু, এই পার্থক্য কানে শুনেই নির্ণয় করা সম্ভব—যাকে নাদের উচ্চ-নীচতা ভেদ বলে। শিক্ষার্থী নির্বাচনে নাদের এই ভেদগুলির পরীক্ষা তার সাংগীতিক প্রতিভার পরিচায়ক হিসাবে মহত্বপূর্ণ।

মন্তব্য: শিক্ষার্থী নির্বাচনে নাদ-ভেদগুলির পরীক্ষা তার সাংগীতিক প্রতিভার পরিচায়ক হিসাবে মহত্বপূর্ণ।

শ্রুতি:

সংগীতোপযোগী তথা শ্রবণযোগ্য সূক্ষ্ম স্বরকে শ্রুতি বলে। শ্রুতি একটি বা অসংখ্য হতে পারে, তবে একটি সপ্তকে পরস্পর বিভেদযুক্ত ২২টি মাত্র ধ্বনিই নাকি কর্ণগোচর হয়, তাই শাস্ত্রে ২২টি শ্রুতি স্বীকৃত। অবশ্য এটা অনুমান মাত্র, শ্রবণশক্তি সকলের সমান নয়। একে একটি সংজ্ঞাবাচক সিদ্ধান্ত বলা যায় মাত্র। কারণ এক ফুটকে ১২ ইঞ্চিতে ভাগ করার যেমন কোন নির্দিষ্ট কারণ নেই, স্বরসপ্তককেও তেমনি ২২টি শ্রুতিতে ভাগ করার কোন অনিবার্য কারণ দেখা যায় না। তবে প্রাচীন সংগীতাচার্যেরা ২২টি শ্রুতিরই পক্ষপাতী ছিলেন এবং তা আজও স্বীকৃত। এই সিদ্ধান্তকে তাঁরা নানাভাবে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যেমন, নাট্যশাস্ত্রকার তাঁর উদ্ভাবিত 'সারণাচতুষ্টয়' প্রক্রিয়ার সাহায্যে একটি সপ্তকে মোট ২২টি শ্রুতি প্রমাণ

করেছেন। পরবর্তী কালে শার্ঙ্গদেবও উক্ত অভিমত স্বীকার করে, মানব দেহের সঙ্গেও এর যোগাযোগ স্থাপন করে বলেছেন যে, ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয় থেকে ২২টি সূক্ষ্ম নাড়ী ক্রমিক উচ্চতররূপে মানব দেহে অবস্থিত, যার সাহায্যে এই ২২টি শ্রুতি উপলব্ধি করা যায়। পরবর্তী রামামাত্য, সোমনাথ প্রমুখ শাস্ত্রীরাও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

শ্রুতির ব্যাখ্যায় অতি প্রাচীন সংগীতাচার্য বিশ্বাবসু বলেছেন: "শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাদ্ ধ্বনিরেব শ্রুতির্ভবেৎ" অর্থাৎ কানের পর্দা যে ধ্বনি গ্রহণে সক্ষম তাই শ্রুতি। পরবর্তী শাস্ত্রীরা এর আরো সহজ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন: "শ্রূয়তে ইতি শ্রুতি"। তাই বলে কোলাহলকে শ্রুতি আখ্যা দেওয়া যায় না। সুতরাং শুধুমাত্র সংগীতোপযোগী ধ্বনিব ক্ষেত্রেই এই শব্দটি প্রযোজ্য। সেদিক থেকে ভাতখণ্ডেজীর বর্ণনা ভারি সুন্দর ও স্পষ্ট।

যেমন, নিত্যং গীতোপযোগীত্বমভিজ্ঞেয়ত্বমপ্যূত।
লক্ষে প্রোক্তং সুপর্যাপ্তং সংগীতশ্রুতিলক্ষণম্॥

অর্থাৎ সংগীতোপযোগী যে ধ্বনি পরস্পর পার্থক্যযুক্ত তাকে শ্রুতি বলে। ধ্বনির এই ক্রমোচ্চতা শ্রবণেন্দ্রিয় ছাড়া অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভূত হয় না। নামকরণের দিক থেকে তাই শ্রুতি শব্দটি সার্থকতম।

শিক্ষাকার নারদ বিভিন্ন রসযুক্ত ৫টি মাত্র শ্রুতির নামোল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে সংগীতে রস-সৃষ্টির উৎস হোল শ্রুতি। এই অভিমতটি সর্বমান্য। উক্ত ৫টি শ্রুতি থেকে ভরত উদ্ভাবিত ২২টি শ্রুতি হোল এইরূপ—

দীপ্তা—তীব্রা, রৌদ্রী, বজ্রিকা ও উগ্রা।

আয়তা—কুমুদ্বতী, ক্রোধী, প্রসারিণী, সন্দিপনী ও রোহিণী।

করুণা—দয়াবতী, আলাপনী ও মদন্তী।

মৃদু—মন্দা, রতিকা, প্রীতি ও ক্ষিতি।

মধ্যা—ছন্দোবতী, রঞ্জনী, মার্জনী, রক্তা, রম্যা ও ক্ষোভিণী।

নারদ উল্লিখিত উক্ত পাঁচটি শ্রুতিকে নাট্যশাস্ত্রকারাদি পরবর্তী শাস্ত্রীরা শ্রুতির জাতি বলে উল্লেখ করেছেন। শার্ঙ্গদেবও অনুরূপ অভিমত স্বীকার করে স্বরসপ্তকের শ্রুতিবিভাজন সম্পর্কে পূর্বাচার্যদের মতো বলেছেন:

চতুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব ষড়্জমধ্যম পঞ্চমাঃ।
দ্বে দ্বে নিষাদগান্ধারৌ ত্রিস্ত্রী ঋষভ ধৈবতো।

অর্থাৎ ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চমের ৪টি করে, নিষাদ ও গান্ধারের ২টি করে এবং ঋষভ্ ও ধৈবতের ৩টি করে শ্রুতি।

এই শ্রুতিবিভাজন প্রাচীনকাল থেকে অপরিবর্তনীয়রূপেই প্রচলিত আছে, কিন্তু স্বর স্থাপনের ক্ষেত্রে আধুনিককালে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। শ্রুতি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার আগে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের দেশে হারমনিয়ম আমদানির পর থেকে শ্রুতির স্বাভাবিক বিকাশ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা বাড়ছে। তাই সাধনাসিদ্ধ কণ্ঠে, সচেতনতার জন্য শ্রুতির বিকাশ অপেক্ষাকৃত কম; বরং সাধারণ অশিক্ষিত কণ্ঠের কীর্তন, ভাটিয়ালী প্রভৃতি folk সংগীতে সেই তুলনায় সার্থক বিকাশ দেখা যায়।

আলোচনার সুবিধা তথা স্পষ্টিকরণের জন্য শ্রুতিনাম, স্বর স্থাপন, কম্পনসংখ্যা প্রভৃতি সহযোগে একটি তালিকা পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হোল।

পরবর্তী তালিকাটি পর্যালোচনা করলে কতগুলি অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। অতঃপর সেবিষয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রাচীন স্বর স্থাপন প্রণালী বর্জন করে, কে এবং কীজন্য এই পরিবর্তন করেছেন তার সঠিক তথ্য জানা যায় না। ভাতখণ্ডেজী তো এই পরিবর্তনকে নিয়মের আভিজাত্য দিয়ে বলেছেন: "এতে শুদ্ধ স্বরাঃ সপ্ত স্বস্বাদ্যশ্রুতি সংস্থিতা", অথচ প্রাচীন শাস্ত্রে আছে "এতে শুদ্ধ স্বরাঃ সপ্ত স্বস্বান্তশ্রুতি সংস্থিতা"। প্রাচীন শাস্ত্রীরা বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, স্বরগুলি নিজ নিজ অন্ত্যশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বপক্ষে পণ্ডিতজী কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কোনরূপ ব্যাখ্যাও করেন নি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণত পাশ্চাত্য মনীষিগণই অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থাদির মর্মোদ্ধার করে নানাবিধ গ্রন্থাদি রচনা করেন। সংগীত গ্রন্থাদির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বস্তুতঃ সেই সকল গ্রন্থাদি থেকেই আমরা প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের বিবরণ জানতে পারি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বৃহদন্তর আদি ব্যবধানগুলির সঠিক প্রয়োগ করতে পারেন নি। তাঁরা ষড়্জ ও ঋষভের মধ্যে বৃহদন্তর (৪টি শ্রুতি) স্থাপন করাতে সবগুলি শ্রুত্যান্তরই স্থানভ্রষ্ট হয়েছে। পাশ্চাত্য সংগীতের অপেক্ষাকৃত স্থূলত্বহেতু এই সূক্ষ্ম প্রভেদকে তাঁরা ভুল বলে বুঝতে পারেন নি। তাঁদের এই

শ্রুতি সংখ্যা	শ্রুতিনাম	প্রাচীন স্বরস্থান	বর্তমান স্বরস্থান	(১) কম্পন সংখ্যা	(২) বর্তমান ১২টি স্বরের কম্পন সংখ্যা	শ্রুতি সংখ্যা	শ্রুতি ব্যবধান	কম্পন সংখ্যার ব্যবধান
১	তীব্রা		সা	২১৬	২৪০	১		
২	কুমুদ্বতী			২২৫		২		
৩	মন্দা			২৩৭ ১/২৭		৩		
৪	ছন্দোবতী	সা	রে_	২৪০	২৫৪ ২/১৭	৪	৩টি	১৪ ২/১৭
৫	দয়াবতী		রে	২৫০	২৭০	৫	১টি	১৫ ১৫/১৭
৬	রঞ্জনী	রে		২৫৬		৬		
৭	রক্তিকা	রে	গ	২৬৬ ২/৩	২৮৮	৭	২টি	১৮
৮	রৌদ্রী	গ_	গ	২৭০	৩০১ ১৭/৪৩	৮	১টি	১৩ ১৭/৪৩
৯	ক্রোধী	গ		২৮৪ ৪/৯		৯		
১০	বজ্রিকা		ম	২৮৮	৩২০	১০	২টি	১৮ ২৬/৪৩
১১	প্রসারিণী		ম'	৩০০	৩৩৭ ১৪/১৭	১১	১টি	১৭ ১৪/১৭
১২	প্রীতি			৩১৬ ৪/৮১		১২		
১৩	মার্জনী	ম		৩২০		১৩		
১৪	ক্ষিতি	ম'	প	৩৩১ ১/৩	৩৬০	১৪	৩টি	২২ ৩/১৭
৫	রক্তা			৩৩৭ ১/২		১৫		
১৬	সন্দিপণী			৩৫৪ ৩/৫		১৬		
১৭	আলাপিনী	প	ধ_	৩৬০	৩৮১ ৩/১৭	১৭	৩টি	২১ ৩/১৭
১৮	মদন্তী		ধ	৩৭৫	৪০০	১৮	১টি	১৮ ১৪/১৭
১৯	রোহিণী	ধ_		৩৮৪		১৯		
২০	রম্যা	ধ	নি_	৪০০	৪৩২	২০	২টি	৩২
২১	উগ্রা	নি_	নি	৪০৫	৪৫২ ৪/৪৩	২১	১টি	২০ ৪/৪৩
২২	ক্ষোভিণী	নি		৪২৬ ২/৩		২২		
১	তীব্রা		সা	৪৩২	৪৮০	১	২টি	২৭ ৩৯/৪৩
২	কুমুদ্বতী			৪৫০		২		
৩	মন্দা			৪৭৪ ২/২৭		৩		
৪	ছন্দোবতী	সাঁ	রেঁ_	৪৮০	৫০৮ ৪/১৭	৪	৩টি	২৮ ৪/১৭

১ (ক) ই. ক্লিমেন্টস্ উল্লিখিত কম্পনসংখ্যা ; (খ) ১ম শ্রুতিতে ২১৬ কম্পনসংখ্যা ধরলে অন্যান্য শ্রুতির কম্পনসংখ্যা যথাক্রমে এইরূপ হবে।

২ . পণ্ডিত ভাতখণ্ডে রচিত ক্রমিক পুস্তক (৪র্থ খণ্ড) থেকে গৃহীত।

ভ্রান্তিই সম্ভবত ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রীদের বিভ্রান্ত করেছে। যদিও বর্তমানে প্রাপ্ত বহু প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদি তখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ছিল, কিন্তু ভাতখণ্ডেজীর গ্রন্থাদিতে ভরত, শার্ঙ্গদেব, লোচন, শ্রীনিবাস প্রমুখ সংগীতাচার্যদের প্রমাণবাক্যের উল্লেখ থেকে, তিনি যে এই সকল গ্রন্থ সম্পর্কে সজ্ঞান ছিলেন সেকথা প্রমাণিত হয়। তবু কেন যে তিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রচার করলেন তা বলা কঠিন। অথচ সমসাময়িক শাস্ত্রী ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় যে এই ভ্রান্তি উপলব্ধি করেছিলেন সেকথা তাঁর 'সংগীতসার' গ্রন্থ থেকে জানা যায়। তিনি বলেছেন: "…কিন্তু শাস্ত্রের সহিত বর্তমান সময়ে প্রচলিত বীণাদি যন্ত্রের পর্দা-বিন্যাসের ঐক্য নাই। যে যে স্বরের যে কয়টি করিয়া শ্রুতিসংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, সেই সেই স্বর তাহার অন্ত্যশ্রুতিতে সংস্থাপিত, ইহা শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন—। কিন্তু বীণাদি যন্ত্রের পর্দা দেখিলে তদ্বৈপরীত্যই প্রতীত হয়, অর্থাৎ নিষাদ ও ষড়্জের মধ্যে যে পরিমাণ স্থান আছে, ষড়্জ ও ঋষভের মধ্যে প্রায় তাহার দ্বিগুণ স্থান আছে। ইহাতে বোধহয়, আধুনিক বীণকারেরা অন্ত্যশ্রুতিতে স্বর স্থাপন না করিয়া প্রথম শ্রুতিতেই স্বরকে স্থাপন করিয়া থাকিবেন। উইলার্ড প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণও এই মতটি অবলম্বন করিয়া হিন্দু-সংগীত বিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়া গিয়াছেন এবং ইংরাজী সংগীত-গ্রন্থকর্তাদিগের মত এই মতের অনুগত। বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রকর্তারা চতুর্থ, সপ্তম ও নবম শ্রুতিতে ষড়্জাদি স্বরসমূহকে স্থাপন করিয়াও তৎপূর্ববর্তী শ্রুতি সকলের স্বরকারণত্ব স্বীকার করিয়াছেন (?); বোধকরি সেই কারণেই বীণকারেরা প্রথম, পঞ্চম ও অষ্টমাদি শ্রুতিতে ষড়্জাদি স্বরসমূহ স্থাপিত করাতে উক্ত বৈপরীত্য সংঘটিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু কি হেতু, কোন সময়ে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক ঐরূপ বৈপরীত্য সংঘটিত হইয়াছে, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, আমরা বীণকারদিগের (বর্তমান) মতের অনুবর্তী হইয়াই শ্রুতি বিভাগ করিলাম…।"

প্রসঙ্গতঃ এখানে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান স্বর স্থাপনানুসারে কোমল স্বরগুলি পূর্ববর্তী স্বরসমূহের শ্রুতিতে প্রবেশ করছে, প্রাচীন প্রণালীতে কিন্তু তেমন হয় না।

শার্ঙ্গদেবের সময় থেকে প্রায় সকল শাস্ত্রীরাই বিকৃত স্বরগুলিকে কোন

একটি নির্দিষ্ট শ্রুতিতে স্থাপন করেছেন—যাকে একটি পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত বলা যায়, কারণ শ্রুতি ও স্বরের রূপভেদ সম্পর্কে শাস্ত্রকারেরা বলেছেন যে, প্রতিটি শ্রুতিই স্বররূপ ধারণে সক্ষম। এই অভিমত সর্বমান্য। কারণ বিকৃত স্বরগুলিতো বটেই, এমনকি শুদ্ধ স্বরগুলিও রাগবিশেষে রূপ (শ্রুতি) পরিবর্তন করে থাকে—যেকথা সকল সংগীতজ্ঞেরাই জানেন। সুতরাং অন্ততপক্ষে বিকৃত স্বরগুলিকে কোন নির্দিষ্ট শ্রুতিতে স্থাপন করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়।

নাট্যশাস্ত্রকার কিন্তু স্বরসমূহের জন্য শুদ্ধ বা বিকৃত কোন সংজ্ঞা প্রয়োগ করেন নি। স্বরেও শুদ্ধ ও বিকৃত সংজ্ঞার প্রবর্তক হলেন শার্ঙ্গদেব, যা আজও প্রচলিত। নাট্যশাস্ত্রকার দুটি গ্রামের স্বপ্তস্বরের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামদ্বয়ের অন্তর কাকলি হিসাবে 'স্বরসাধারণ' বা স্বরবিশেষের উল্লেখ করেছেন। স্বরসাধারণের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন যে, স্বরসাধারণ দ্বৈগ্রামিক হওয়ায় দুই প্রকার—ষড্‌জগ্রামে ষড়্‌জসাধারণ, মধ্যমগ্রামে মধ্যমসাধারণ; প্রয়োগের সূক্ষ্মতার জন্য তিনি মধ্যমসাধারণকে কৈশিক (কেশাগ্রবৎ-সূক্ষ্ম) নামে অভিহিত করেছে।

সংগীতশাস্ত্রাদিতে শ্রুত্যন্তর 'সমান' এবং 'অসমান' এই দুটি মত প্রচলিত আছে। উভয় মতই আত্মপক্ষ সমর্থনে নানা যুক্তির অবতারণা করে থাকেন। মনে হয়, এই বিষয়ে গোড়াতেই গলদ হয়েছিল; সেই গলদ করেছিলেন শার্ঙ্গদেব, এবং প্রায় ছয়-শতাব্দী ধরে তা অনুসৃত হয়ে চলেছে। এই বিষয়ে অস্পষ্ট ধারণা নিয়েই অনেকে সংগীতগ্রন্থাদি রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গ আলোচনাকালে ভাতখণ্ডেজীও বলেছেন যে ভরত, শার্ঙ্গদেবাদি সমান শ্রুত্যন্তরের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু শ্রুত্যন্তর সমান এমন কথা ভরত কোথাও বলেন নি, বলেছিলেন শার্ঙ্গদেব।

ইতিহাসের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, শার্ঙ্গদেব ভরতের অনুবর্তী শাস্ত্রী ছিলেন এবং পরবর্তী রামামাত্য, পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল, সোমনাথ, ব্যাংকটমুখী, অহোবল, লোচন, হৃদয়নারায়ণ দেব, শ্রীনিবাস, ভাবভট্ট, তুলজাজী, নরহরি চক্রবর্তী প্রমুখ শাস্ত্রীরা শার্ঙ্গদেব তথা ভরতের অনুগামী ছিলেন। অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হওয়ায় এঁরা সম্ভবতঃ, রত্নাকর গ্রন্থেরই অধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কিন্তু শার্ঙ্গদেব ভরত বর্ণিত 'সারণাচতুষ্টয়'

প্রক্রিয়া তথা প্রমাণশ্রুতি বিষয়গুলির ভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা করায় এই জটিলতার উদ্ভব হয়েছে। কারণ ভরত উক্ত প্রক্রিয়ার সাহায্যে একটি সপ্তকে মোট ২২টি শ্রুতি নিরূপণ করেছেন মাত্র, সবগুলি শ্রুতি পরস্পর সমান এমন কথা বলেন নি (সারণাচতুষ্টয় এবং প্রমাণশ্রুতি দ্রষ্টব্য)। উক্ত প্রক্রিয়ায় ভরত যে মনীষার পরিচয় দিয়েছেন তা আজও বিশ্বকে বিস্মিত করে।

কিন্তু মধ্যযুগের ভাবভট্ট, শ্রীনিবাস প্রমুখ শাস্ত্রীরা বিষয়টির ত্রুটি উপলব্ধি করেছিলেন, এবং শার্ঙ্গদেবের বর্ণনা যে ত্রুটিপূর্ণ, তার সমর্থনে তাঁরা শ্রুত্যন্তর অসমান এইরূপ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন—যার চরম রূপায়ণ করেন পণ্ডিত ভাতখণ্ডে। কিন্তু আজও অনেকে এই বিষয়ে অভিন্ন মতাবলম্বী নন, তাই বিষয়টি প্রমাণ করা আবশ্যক।

মনে রাখতে হবে যে, ভরত, শার্ঙ্গদেবাদি শাস্ত্রীরা শুধুমাত্র শ্রবণশক্তির উপরে নির্ভর করেই শ্রুতি বিভাজন করেছিলেন, কম্পনসংখ্যা পরিমাপ করে নয়। (বস্তুতঃ এই বিষয়টি শ্রবণশক্তির বিশেষ জ্ঞানের উপরেই নির্ভরশীল)। সুতরাং সেই বিভাজন আপাতঃদৃষ্টিতে সমান মনে হলেও আসলে তা সমান ছিল না। সম্ভবতঃ সেই দিক দিয়ে চিন্তাও করা হয় নি। কারণ স্বরস্থাপন-প্রণালী সর্বত্রই সমান; অর্থাৎ 'ষড্‌জপঞ্চমভাব' অথবা The harmony of the fifth। সেদিক দিয়ে বিচার করলে আন্দোলন সংখ্যাগুলি প্রায় নির্ভুল এবং শ্রুত্যন্তরগুলি অসমান। যেমন ষড্‌জ থেকে পঞ্চমের এবং পঞ্চম থেকে তারষড়্‌জের আন্দোলন সংখ্যা সমান, অর্থাৎ ১২০, কিন্তু এদের মধ্যে শ্রুতির ব্যবধান হোল যথাক্রমে ১৩টি ও ৯টি। শ্রুত্যন্তর যে কোন মতেই নিয়মাবদ্ধ করা যায় না সেকথা পূর্বোক্ত তালিকার স্বর-শ্রুতি তথা কম্পন ব্যবধান প্রভৃতি পর্যালোচনা করলে আরো নানাভাবে প্রমাণিত করে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে ২ শ্রুতি, ৩ শ্রুতি বা ৪ শ্রুতিযুক্ত স্বর রচনার অর্থ কী? এবং কেনই বা তা আজও প্রচলিত। বিষয়টি গবেষণার দাবী রাখে; সুযোগ সুবিধার অভাবে নির্দিষ্ট সূত্রাদি সহযোগে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা গেল না। তবে মনে হয় প্রাচীন আচার্যেরা সপ্তকের বিভিন্ন স্বরগুলি যে, অসমান ব্যবধানে অবস্থিত সেই কথা প্রমাণ করায়

জন্যই শ্রুতি বিভাজন এবং শ্রুতিগুলিকে একক (Unit) হিসাবে প্রতিপন্ন করে স্বরসমূহের বিভিন্ন সংখ্যক শ্রুতি নিরূপণ করেছিলেন ; (যদিও বিজ্ঞান-ভিত্তিতে এখনও পর্যন্ত শ্রুতির কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত এককত্ব নির্ধারিত হয় নি)। কিন্তু ধ্বনি হিসাবে সেগুলি পরস্পর সমান ব্যবধানযুক্ত মনে হলেও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে (পরিমাপ যন্ত্রের সাহায্যে) তা শুদ্ধ নয়।

পরিশেষে, শ্রুতি প্রসঙ্গে কাল্পনিক হলেও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় সংগীতে রস ও ভাবই প্রধান যার প্রকাশক হোল শ্রুতি ; শ্রুতিগুলির নামকরণ তদনুরূপেই করা হয়েছে মনে করলে, সেই নাম-করণের আরো একটি তত্ত্বের অনুমান করা যায়। কারণ সপ্তকের ২২টি শ্রুতি নির্ধারণই যদি শুধুমাত্র উদ্দেশ্য হোত তাহলে তো ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যাই যথেষ্ট ছিল ; এমন সুন্দর তথা বিচিত্র নামকরণের সার্থকতা কী ? সুতরাং প্রাচীন আচার্যেরা যে নামগুলির সাহায্যে শ্রুতিবিশেষের নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট (রস ও রূপ) বোঝাতে চান নি সেকথা কে বলতে পারে ! এই বিষয়ে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত, সম্ভবতঃ, সংগীতের নবীনতম কোন দিগ্‌-দর্শন করতে পারে।

মোটকথা, শ্রুতি প্রসঙ্গে গবেষণার অবকাশ আছে, এই বিষয়ে শক্তিমান গুণীদের হস্তক্ষেপ কামনা করি।

স্বর ঃ

সংগীতোপযোগী সুমধুর ধ্বনিকে স্বর বলে। প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে স্বরের পরিচয়ে জাতি, কুল, বর্ণ, দেবতা প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে। শার্ঙ্গদেব বলেছেন, শ্রুতিগুলির অনন্তর অনুরসনাত্মক স্নিগ্ধ ধ্বনিকে স্বর বলে। গবেষকদের মতে একইপ্রকার কম্পনসংখ্যাযুক্ত (Vibration) ধ্বনিকে সংগীতোপযোগী (Musical) এবং নানাপ্রকার কম্পনসংখ্যাযুক্ত ধ্বনিকে সংগীত-অনুপযোগী (Non-musical) ধ্বনি বলা হয়। স্বরের ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা হোল, 'একটি ধ্বনি এবং তার দ্বিগুণ উচ্চ আর একটি ধ্বনির মধ্যবর্তী বিশেষ নিয়মানুযায়ী ক্রমোচ্চতর ব্যবধানে অবস্থিত ধ্বনিগুলিকে স্বর বলে।'

শ্রুতি ও স্বরের রূপভেদ ঃ পণ্ডিত ভাতখণ্ডে শ্রুতি ও স্বরের রূপভেদ প্রসঙ্গে অত্যন্ত সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

সর্বোচ্চ শ্রুতয়স্তত্ত্রাগেষু স্বরতাং গতাঃ।
রাগহেতুত্বং এতাসাং শ্রুতি সংজ্ঞৈব তংমতা ॥

অর্থাৎ বিশিষ্ট রাগে ব্যবহৃত শ্রুতিগুলিই স্বর এবং অবশিষ্টগুলি শ্রুতি। কারণ ভিন্ন ভিন্ন রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলি তার নিশ্চিত শ্রুতিসংখ্যা থেকে, রাগরূপ অনুসারে, স্থান পরিবর্তন করে থাকে—যার ফলে তীব্র, তীব্রতর, কোমল, অতিকোমল প্রভৃতি স্বরের উৎপত্তি হয়। এই বিশেষ স্বররূপগুলি রাগানুসারে, কণ্ঠেন্দ্রিয়ের সাহায্যে, সাধনালব্ধ উপায়ে আপনা থেকেই উৎপন্ন হয়। তাই তোড়ী ও মুলতানী রাগের কোমল গান্ধার ভিন্ন ভিন্ন রূপযুক্ত। অর্থাৎ রাগসংগীতে ব্যবহৃত স্বরের রূপ সর্বদা শ্রুতিসংখ্যানুসারে প্রয়োগ করা হয় না। পক্ষান্তরে সবগুলি শ্রুতিই স্বররূপ ধারণে সক্ষম। কারণ সাপ ও তার কুণ্ডলিতে যতটুকু প্রভেদ, শ্রুতি ও স্বরের মধ্যেও কেবলমাত্র ততটুকুই পার্থক্য। সুতরাং শ্রুতিবিভাজন ও স্বরস্থাপনের যে বিভ্রান্তিকর আলোচনা আগে করা হয়েছে তা একেবারে বর্জন করলেও রাগসংগীতের তেমন ক্ষতি নেই। এমনও অনুমান করা যায় যে, ভবিষ্যতে হয়তো কোন প্রতিভাবান সংগীতাচার্য এই থাট-রাগ-পদ্ধতি বর্জন করে শ্রুতি-রাগ-পদ্ধতির প্রবর্তন করবেন—যার সাহায্যে রাগরূপের আরো নির্ভুল পরিচয় দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

অচল ও সচল স্বর ঃ একটি সপ্তকে সাতটি শুদ্ধ এবং পাঁচটি বিকৃত, মোট বারটি স্বর আছে। সাতটি স্বরের লৌকিক নাম যথাক্রমে ষড্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই স্বরনামগুলি প্রচলিত। এগুলির সংক্ষিপ্ত নাম হোল ঃ সা, রে, গ, ম, প, ধ এবং নি। সপ্তস্বরের মধ্যে সা এবং প স্বরদ্বয়ের অন্য কোন রূপ স্বীকৃত নয়, তাই এ'দুটিকে 'অচল স্বর' বলে, (অবশ্য শার্ঙ্গদেব পঞ্চমের বিকৃতভাব স্বীকার করেছেন যা বর্তমানে প্রচলিত নয়)। অবশিষ্ট পাঁচটি স্বরের দুটি করে রূপ আছে তাই এগুলিকে সচল স্বর বলা হয়।

শুদ্ধ/তীব্র স্বর। কোমল/বিকৃত স্বর ঃ স্বর সপ্তকের শুদ্ধ রূপগুলিকে মধ্যম ছাড়া তীব্র স্বরও বলা হয়। সচল স্বরগুলির দ্বিতীয় রূপকে কোমল বা বিকৃত স্বর বলে।

শুদ্ধ/কোমল ও তীব্র/কড়ি মধ্যম ঃ এখানে মনে রাখতে হবে

যে, রে, গ, ধ এবং নি স্বরগুলির কোমল বা বিকৃত রূপটি কিঞ্চিৎ নীচে অবস্থিত, কিন্তু মধ্যমের বিকৃত রূপটি কিঞ্চিৎ উঁচুতে অবস্থিত। তাই মধ্যমের শুদ্ধ রূপটিকে কোমল এবং বিকৃত রূপটিকে তীব্র বা কড়ি মধ্যম বলা হয়।

বাদীস্বর (গ্রহ, অংশ বা জীবস্বর): শাস্ত্রে বাদীস্বরকেই গ্রহ, অংশ বা জীবস্বর বলা হয়েছে। মতঙ্গ এর পরিচয়ে বলেছেন: "বদনাদ্‌বাদী স্বামীবৎ"; শার্ঙ্গদেবও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন: "প্রয়োগে বহুলঃ স্বরঃ বাদী রাজত্রগীয়তে", অর্থাৎ রাগরূপী রাজ্যে বাদীস্বর রাজার সমান। রাগে ব্যবহৃত যাবতীয় স্বরের মধ্যে এটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। যেমন রাগ আরম্ভ করা, রাগ সমাপ্ত করা, বিভিন্ন স্বরসহযোগে একে উচ্চারণ করা, বিবিধ স্বর-বিন্যাসের পরে এতে এসে বিশ্রাম (ন্যাস) করা, ইত্যাদি নানাভাবে এর বহুত্ব প্রদর্শিত হয়। সাধারণতঃ গানের 'সম'টিও বাদী কিংবা সংবাদী স্বরের উপরে হয়ে থাকে।

সংবাদী/সমবাদী: মতঙ্গ বলেছেন—বাদী-স্বামীবৎ (রাজা), সংবাদী-অমাত্যবৎ (মন্ত্রী), অনুবাদী-পরিজনবৎ (আত্মীয়স্বজন) এবং বিবাদী-শত্রুবৎ (শত্রুতুল্য)। সুতরাং বাদী রাগ-জগতের রাজা হলে সংবাদী হোল মন্ত্রী। কারণ, রাগে ব্যবহৃত যাবতীয় স্বরের মধ্যে এটি বাদীর চেয়ে কম কিন্তু অন্যান্য স্বরের চেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। নামের সার্থকতা হোল বাদীর সাহায্যে রাগরূপ বিকাশকালে তাকে পরিপুষ্ট ও ব্যবহার উপযোগী করে তোলে যে স্বর তাই সংবাদী।

অনুবাদী: বাদী ও সংবাদী ছাড়া রাগে ব্যবহৃত অন্যান্য স্বরগুলিকে অনুবাদীস্বর বলা হয়।

বিবাদী: শার্ঙ্গদেব বলেছেন: "বিবাদী তু সদা ত্যাজ্যঃ ক্বচিত্তান-ক্রিয়াত্মকঃ", অর্থাৎ বিবাদী স্বর সর্বদাই ত্যাজ্য কিন্তু তান প্রয়োগকালে ক্বচিৎ কখনো সামান্যরূপে প্রয়োগ করা যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি অন্যত্র বলেছেন:

সুপ্রমাণ যুতরাগে বিবাদী রক্তবর্ধকঃ।
যথেষৎ কৃষ্ণবর্ণেন শুভ্রস্যাতিবিচিত্রতা॥

অর্থাৎ সাদার মধ্যে কালো যেমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে তেমনি প্রমাণ

মতো বিবাদী স্বরের প্রয়োগ হলে তা রাগের রঞ্জকতা বৃদ্ধি করে। এই প্রসঙ্গে পার্শ্বদেবও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

প্রচ্ছাদনীয়/মনাক্স্পর্শঃ "প্রচ্ছাদনীয়ো লোপ্যা বা", অর্থাৎ তাঁর মতেও বিবাদী স্বরকে প্রচ্ছাদনীয় বা মনাক্স্পর্শরূপে (সীমিতভাবে) প্রয়োগ করলে রাগের রঞ্জকতা বৃদ্ধি পায়। তবে এই প্রয়োগ খুব সহজ নয়। তাই শত্রুতুল্য হিসাবে কেহ কেহ একে একেবারে বর্জন করেন।

বাদী, সংবাদী প্রভৃতির শ্রুত্যন্তর, স্বরান্তর ও স্বররূপঃ শ্রুত্যন্তর অনুসারে বাদী, সংবাদী প্রভৃতির নির্ণয়প্রণালীর ব্যাখ্যা নাট্যশাস্ত্রকার ভরতই সর্বপ্রথম করেছেন। অবশ্য প্রাচীনকালের সংগীতে রাগবিশেষে ব্যবহৃত স্বরগুলির আরো সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে তা অনেক সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয়েছে।

সাধারণতঃ ষড্‌জ-পঞ্চমভাব অনুসারে বাদী-সংবাদী তথা ঔডব জাতির বর্জিত স্বরদ্বয় নিরূপিত হয়ে থাকে। এই স্বরদ্বয়ের শ্রুত্যন্তর নয়টি বা তেরটি এবং স্বরান্তর চারটি বা পাঁচটি। এই দুটির রূপও সাধারণতঃ অভিন্ন হয়ে থাকে। ক্বচিৎ ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন মারবা রাগের বাদী শুদ্ধ ধৈবত এবং সংবাদী কোমল ঋষভ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কড়ি-মধ্যম স্বরটি কোন রাগের বাদী বা সংবাদী হয় না। অনুবাদী বাদীস্বরের সহায়ক বা পরিপূরক হয়। এই প্রসঙ্গে ভরত ষড্‌জগ্রামের অনুবাদী সম্পর্কে বলেছেন যে, রে, গ, ধ ও নি ষড্‌জের, ম, প ও নি ঋষভের, ম, প ও ধ গান্ধারের, প, ধ ও নি মধ্যমের, ধ ও নি পঞ্চমের এবং রে, ম ও প ধৈবতের অনুবাদী হয়ে থাকে।

বাদী থেকে কুড়িটি শ্রুতির ব্যবধানে যে স্বর তাই বিবাদী। সেদিক থেকে ঋষভ-গান্ধার, ধৈবত-নিষাদ ইত্যাদি স্বরগুলি পরস্পর পরস্পরের বিবাদী স্বর।

স্পর্শ, ভূষিকা বা কণস্বর (Grace Note): কোন স্বরোচ্চারণ-কালে পার্শ্ববর্তী কোন স্বরকে সামান্য প্রয়োগ করা হলে, সেই স্বল্পোচ্চারিত স্বরকে স্পর্শ, ভূষিকা বা কণস্বর বলা হয়।

বক্রস্বরঃ আরোহণ বা অবরোহণকালে যে স্বর সরলভাবে ব্যবহৃত

হয় না তাকে বক্রস্বর বলে। যেমন, 'প ধ নি ধ র্সা' এবং 'ম গ রে গ সা' এখানে আরোহে নি এবং অবরোহে রে বক্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

শুভ স্বর সংবাদ, ষড়্জ পঞ্চম ভাব, ষড়্জ মধ্যম ভাব, ষড়্জ গান্ধার ভাব ঃ সুর-সংবাদ বিষয়টি অতি প্রাচীন। সা-প, সা-ম, সা-গ প্রভৃতি স্বরসংগতিকে স্বরসংবাদ বলে। এগুলির মধ্যে সা-প স্বরসংগতি সর্বাধিক মাধুর্যপূর্ণ হওয়ায় একে শুভ স্বরসংবাদ বলা হয়। পণ্ডিত অহোবল এর পরিচয়ে বলেছেন :

ষড়্জ পঞ্চম ভাবেন ষড়্জে জ্ঞেয়াঃ স্বরা বুধৈঃ।
গসা ভাবেন গন্ধারে মসা ভাবেন মধ্যমে॥

অর্থাৎ সা-প স্বরসংগতিকে যেমন ষড়্জপঞ্চম ভাব বলা হয়, তেমনি গ-সা'কে ষড়্জ গান্ধার এবং ম-সা'কে ষড়্জ মধ্যম ভাব বলা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গ-সা সংবাদটিকে বর্তমানে কেহ কেহ অস্বীকার করেন। তবে তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখি না।

অধ্বদর্শক স্বর ঃ অধ্বদর্শক অর্থ পথপ্রদর্শক। অধ্বদর্শক স্বর বলতে পথপ্রদর্শক স্বর বোঝায়। ভারতীয় রাগ সংগীতে মধ্যম স্বরটি অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। কারণ, এই স্বরটি যাবতীয় রাগের গায়ন সময় নির্দেশ বা নিরূপণে সহায়তা করে। মধ্যম স্বরটিকে তাই অধ্বদর্শক স্বর বলা হয়। শুধুমাত্র মধ্যমের রূপ পরিবর্তন করলেই সকালের রাগ সন্ধ্যায় অথবা দিনের রাগ রাত্রে গেয়রূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন বিলাবলের মধ্যম তীব্র করলে ইমন অথবা পূরবীর মধ্যম কোমল করলে ভৈরব প্রভৃতি রাগোৎপন্ন হয়ে থাকে। অন্য কোন স্বরের এইরূপ বৈশিষ্ট্য নেই।

সাধারণতঃ রাত্রি বারোটা থেকে দিবা বারোটা পর্যন্ত কোমল মধ্যম এবং তার বিপরীত সময়ে তীব্র মধ্যমের প্রাধান্য থাকে। (রাগচক্র দ্রষ্টব্য)

স্বর-সংগতি ঃ রাগ সংগীতের প্রায় সকল রাগেরই রূপ-বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য কয়েকটি বিশেষ স্বরের উপরে নির্ভরশীল। সেই বিশেষ স্বরগুলির সংযুক্ত উচ্চারণকে স্বর-সংগতি বলে। সাধারণতঃ বাদী-সমবাদী স্বরদ্বয় স্বর-সংগতিতে বিদ্যমান থাকে। অন্যান্য স্বর প্রয়োগকালেও সেই বিশেষ স্বর কয়টি প্রযুক্ত না হলে রাগ রূপ-বৈশিষ্ট্য পূর্ণ প্রকাশিত হয় না। অর্থাৎ রাগ-সংগীতে 'স্বর-সংগতি'র বিশেষ মহত্বপূর্ণ স্থান আছে। উদাহরণ স্বরূপ

কেদারের সা-ম, কামোদের রে-প, নট রাগের প-রে, শ্রীরাগের রে-প, মারবার রে-ধ প্রভৃতি স্বর-সংগতি উল্লেখযোগ্য।

স্থান/সপ্তক স্বরাষ্টক (OCTAVE) ত্রিসপ্তক, মন্দ্র/উদারা, মধ্য/মুদারা, তার/তারা: স্বর থেকে সপ্তকের বিকাশ। ষড়্জ থেকে নিষাদ পর্যন্ত নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে সাতটি স্বরকে একটি স্থান বা সপ্তক বলে। সা থেকে পরবর্তী সা পর্যন্ত আটটি স্বরকে স্বরাষ্টক (Octave) বলে। (উপরে বা নীচের অষ্টম স্বরকেও Octave বলা হয়)। উচ্চ-নীচতা ভেদে সপ্তক তিনটি। অবশ্য তিনটির বেশীও সপ্তক হতে পারে। তবে ভারতীয় সংগীতে ত্রিসপ্তকই স্বীকৃত, এবং এই তিনটি সপ্তকের স্বরোচ্চারণ যাদের কণ্ঠে হয়, তাঁরা উত্তম শ্রেণীর শিল্পী। মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিনটি স্থান বা সপ্তক। চলতি কথায় এদের যথাক্রমে উদারা, মুদারা ও তারা বলা হয়। হৃদয় (Larynx), কণ্ঠ (Throat) ও মস্তিষ্ক (Head) শরীরের এই তিনটি স্থান থেকে ত্রিসপ্তকের স্বরোৎপন্ন হয়। মন্দ্র থেকে মধ্য এবং মধ্য থেকে তার সপ্তকের স্বরগুলি যথাক্রমে দ্বিগুণ উচ্চতা বিশিষ্ট হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য সংগীতে এদের Voice Register বলা হয়। ভারতীয় সংগীতে শ্রুতি ধারার সাহায্যে স্বর পরিমিত হয় এবং শিল্পীর ব্যবহৃত সপ্তককেই মধ্য সপ্তক বলা হয়। তার বাঁ-দিকের নীচু বা খাদের সপ্তককে 'মন্দ্র' এবং ডানদিকের উঁচু বা চড়ার সপ্তককে তার সপ্তক বলা হয়। পাশ্চাত্য সংগীতে কম্পনসংখ্যার সাহায্যে সুর পরিমিত হয়, ফলে কোন স্বর বা স্থানকে নির্দিষ্টরূপে নির্দেশ করা যায়।

থাট/ঠাট/মেল: থাট বা ঠাটকে সংস্কৃত ভাষায় মেল বা মেলকর্তা বলে। সপ্তক থেকে থাটের বিকাশ।[১] পণ্ডিত ভাতখণ্ডে থাটের পরিচয়ে বলেছেন: "মেলঃ স্বরসমূহঃ স্যাদ্রাগব্যঞ্জন শক্তিমান," অর্থাৎ যে স্বর রচনা রাগ উৎপাদনে সক্ষম তাকে থাট বলে। পক্ষান্তরে যে স্বর সমষ্টির সাহায্যে একাধিক রাগকে কোন একটি শ্রেণীভুক্ত করা যায় সেই প্রক্রিয়াকে থাট বলে। বর্তমান সংগীত পদ্ধতিতে মোট দশটি থাট স্বীকৃত। অবশ্য থাট

১ সংগীতে সর্বপ্রথম থাটের প্রচলন করেন মাধব বিদ্যারণ্য (১৪শ শতাব্দী)। তিনি সর্বপ্রথম ১৫টি থাট স্বীকার করে তাদের অন্তর্গত নানাবিধ রাগের পরিচয় দেন।

সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ আছে, তবে সে বিষয়ে আপাততঃ কোন গুরুত্ব না দিলেও বিশেষ ক্ষতি নেই।

থাট সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ থাট সর্বদা ক্রমানুসারে সাতটি স্বর-যোগে রচিত হয়। কোন স্বরের দুটি রূপ কোন থাটে ব্যবহৃত হয় না। থাটে শুধুমাত্র আরোহণ থাকে। অবরোহণ, বাদী-সমবাদী, রঞ্জকতা বা কোনপ্রকার গতিপূর্ণ অভিব্যক্তির প্রয়োজন নেই। কারণ, থাট রাগ উৎপাদনের কাঠামো মাত্র। থাট রচনায় ব্যবহৃত স্বরক্রম সেই থাটোৎপন্ন আশ্রয় রাগে নাও থাকতে পারে। থাটগুলি চেনা এবং তাদের স্বররূপ প্রভৃতি মনে রাখার জন্য সেই থাট থেকে উৎপন্ন একটি প্রসিদ্ধ রাগের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে। থাট নামধারী রাগগুলিকে শুদ্ধরাগ, আশ্রয়রাগ, জনকরাগ প্রভৃতিও বলা হয়।

দশ থাটঃ হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতিতে স্বীকৃত দশটি থাটের নাম ও তাদের স্বররূপ হোল এইরূপ :—

সংখ্যা	থাট নাম	স্বররূপ	বিকৃত স্বর
১	বিলাবল	সা রে গ ম প ধ নি র্সা	—
২	ইমন/কল্যাণ	সা রে গ ম॑ প ধ নি র্সা	ম॑
৩	খমাজ	সা রে গ ম প ধ নি॒ র্সা	নি॒
৪	ভৈরব	সা রে॒ গ ম প ধ॒ নি র্সা	রে॒ ধ॒
৫	পূরবী	সা রে॒ গ ম॑ প ধ॒ নি র্সা	রে॒ ম॑ ধ॒
৬	মারবা	সা রে॒ গ ম॑ প ধ নি র্সা	রে॒ ম॑
৭	কাফী	সা রে গ॒ ম প ধ নি॒ র্সা	গ॒ নি॒
৮	আশাবরী	সা রে গ॒ ম প ধ॒ নি র্সা	গ॒ ধ॒ নি॒
৯	ভৈরবী	সা রে॒ গ॒ ম প ধ॒ নি॒ র্সা	রে॒ গ॒ ধ॒ নি॒
১০	তোড়ী	সা রে॒ গ॒ ম॑ প ধ॒ নি র্সা	রে॒ গ॒ ম॑ ধ॒

৩২ থাটঃ কর্ণাটক সংগীতে প্রচলিত ৭২ থাট রচনার প্রণালীতে এবং হিন্দুস্থানী সংগীতের থাট পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যানুসারে থাট রচনা করা হলে

সর্বাধিক ৩২টি থাট উৎপন্ন হতে পারে। যেমন, সপ্তকের শুদ্ধ ও বিকৃত মোট ১২টি স্বর থেকে কড়ি মধ্যমকে বাদ দিয়ে এবং তার ষড্‌জকে নিয়ে স্বরসংখ্যা পূর্ণ করে, তাকে পূর্ব ও উত্তর এই দুটি অঙ্গে ভাগ করলে এইরূপ হবে—

১। পূর্বাঙ্গ	২। উত্তরাঙ্গ
সা রে রে গ গ ম	প ধ ধ নি নি সাঁ

এখন এই দুটি অঙ্গ থেকে থাট রচনার নিয়মানুসারে চারটি করে স্বর নিয়ে সর্বাধিক চারটি করে অর্ধমেল উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, যেমন—

পূর্বাঙ্গ	উত্তরাঙ্গ
১। সা রে গ ম	১। প ধ নি সাঁ
২। সা রে গ ম	২। প ধ নি সাঁ
৩। সা রে গ ম	৩। প ধ নি সাঁ
৪। সা রে গ ম	৪। প ধ নি সাঁ

এখন এই অর্ধমেলগুলিকে ১+১, ১+২, ১+৩ প্রভৃতি বিভিন্নভাবে যোগ করে সর্বাধিক ৪×৪=১৬টি থাট উৎপন্ন হতে পারে। এ পর্যন্ত কড়ি মধ্যম স্বরটি ব্যবহার করা হয়নি, অতএব এখন শুদ্ধমধ্যম-স্থানে কড়িমধ্যম প্রয়োগ করে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় আরো ১৬টি থাট উৎপন্ন হতে পারে। এইরূপে ১৬+১৬=৩২টি থাট উৎপন্ন হয়।

হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতিতে ৩২টি থাট গ্রহণ করার কোনো বাধা নেই, বরং তা রাগ বর্গীকরণে আরো সহায়ক হতে পারে। কিন্তু পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মতে অল্পসংখ্যক মেল বা থাট দিয়ে জন্যরাগগুলির রূপ নির্ধারণ করাই সুসংগত। এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনার অবকাশ আছে বলেই আমাদের ধারণা।

প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখযোগ্য যে ৭২টি থাট স্রষ্টা পণ্ডিত ব্যাংকটমুখীও রাগ বর্গীকরণে মাত্র ১৯টি থাট ব্যবহার করেছেন। তবে মাত্র দশটি থাট সহযোগে হিন্দুস্থানী রাগসমূহের বর্গীকরণে অনেক ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা যায়—যে কারণে ভাতখণ্ডেজীকে কয়েকটি বিশেষ নিয়ম প্রয়োগ করতে হয়েছে। সেই সকল ক্ষেত্রে থাটসংখ্যা বৃদ্ধি, উপপত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুবিধাজনক ও সংগত।

থাট বর্গীকরণঃ স্বরসমূহের রূপবৈশিষ্ট্যানুসারে থাটগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন,

১ম বর্গের থাটঃ প্রথম বর্গের থাট হোল বিলাবল, কল্যাণ ও খমাজ। এগুলি শুদ্ধ রে, গ, ধ-যুক্ত রাগসমূহের জন্য।

২য় বর্গের থাটঃ দ্বিতীয় বর্গের থাট হোল ভৈরব, পূরবী ও মারবা। এগুলি কোমল রে এবং শুদ্ধ গ, নি-যুক্ত রাগসমূহের জন্য।

৩য় বর্গের থাটঃ তৃতীয় বর্গের থাট হোল কাফী, ভৈরবী, আশাবরী ও তোড়ী। এগুলি কোমল গ, নি-যুক্ত রাগসমূহের জন্য।

রাগঃ

রাগ সংগীত ভারতের নিজস্ব জিনিষ। পৃথিবীর আর কোথাও এর প্রচলন নেই। 'রাগ' শব্দের প্রয়োগ সর্বপ্রথম করেছেন নাট্যশাস্ত্রকার। পূর্ববর্তী শিক্ষাকার নারদ 'রক্তং' শব্দটি রাগের পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন। নারদ থেকে মতঙ্গ পর্যন্ত সকল শাস্ত্রীরাই রাগের জন্য পূর্ণ, প্রসন্নাদি দশটি গুণের উপযোগিতা স্বীকার করেছেন। এছাড়া রাগ-বিকাশের জন্য লাবণ্য-গুণ অবশ্যই থাকা চাই। সেকথাও সকলে উল্লেখ করেছেন। রাগের পরিচয়ে টীকাকার ভট্ট শোভাকর বলেছেন: "রঞ্জয়তি শ্রোতৃচিত্তং ইতি রাগঃ।" রামায়ণকার বাল্মীকি বৈদিক ও লৌকিক উভয় সংগীতেই কৃতবিদ্য ছিলেন। তিনি জাতি ও জাতিরাগগুলির পরিচয় প্রসঙ্গে রাগের ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, রাগ যাবতীয় গুণযুক্ত না হলে পরিপূর্ণ আবেগের সৃষ্টি করতে পারে না। রাগকে লীলায়িত করার উপাদানাদির পরিচয় তিনি কুশী-লবের মাধ্যমে দিয়েছেন। রাগের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের পরিচয়ে বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ বলেছেন:

যোঽসৌ ধ্বনি বিশেষস্তু স্বরবর্ণ বিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স চ রাগ উদাহৃতঃ॥

অর্থাৎ স্বর-বর্ণাদির যে বিশেষ ধ্বনিতরঙ্গ মানবচিত্ত বিনোদনে সক্ষম তাকে রাগ বলে। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন সংগীতশাস্ত্রীরা এইরূপে রাগের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তবু অধিকাংশ গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ, শ্রোতা বা সংগীতসাহিত্য পাঠকের এবিষয়ে কোন সঠিক ধারণা আছে কি না,

সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। সাধনালব্ধ দক্ষতায় যাঁরা সংগীত পরিবেশণ করেন তাঁরা ক্রিয়াসিদ্ধ অংশের মতো শাস্ত্রগত বিষয়ে কুশল না হলেও, এটি যে উপলব্ধির জিনিষ তা বোঝেন। কিন্তু মুস্কিল হোল, সংগীতসাহিত্য পাঠকেরা সব কিছুরই আক্ষরিক ব্যাখ্যা চান। একথা অনস্বীকার্য যে, রাগের সঠিক সংজ্ঞা (Definition) নিরূপণ করা কঠিন; কারণ এর ব্যাপ্তি এতদূর বিস্তৃত ও অন্তঃর্মুখী যে ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না; তাই মনে রাখতে হবে যে, গান শুনে চট্ করে রাগনাম বলতে পারার চেয়ে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়ার দাম বেশী। এই প্রসঙ্গে কবিগুরুর উপলব্ধি ও প্রকাশভঙ্গি অপূর্ব, অভিনব এবং প্রণিধানযোগ্য। 'সংগীত ও ভাব' নিবন্ধে তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন:

"...এই মনে করুন পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে আর ভৈঁরোতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে? পূরবীতেও কোমল সুরের বাহুল্য, আর ভৈঁরোতেও কোমল সুরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন? তাহা কি কেবলমাত্র প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়? তাহা নহে। তাহার গূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথমতঃ প্রভাতের রাগিণী ও সন্ধ্যার রাগিণী উভয়েতেই কোমল সুরের আবশ্যক। প্রভাত যেমন অতি ধীরে ধীরে, অতি ক্রমশঃ নয়ন উন্মীলিত করে, সন্ধ্যা তেমনি অতি ধীরে ধীরে, অতি ক্রমশঃ নয়ন নিমীলিত করে। অতএব কোমল সুরগুলির, অর্থাৎ যে সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, যে সুরগুলি অতি ধীরে ধীরে অতি অলক্ষিতভাবে পরস্পর পরস্পরের উপর মিলাইয়া যায়, সন্ধ্যা ও প্রভাতের রাগিণীতে সেই সুরের অধিক আবশ্যক। তবে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কী বিষয়ে প্রভেদ থাকা উচিত? না, একটাতে সুরের ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বিকাশ হওয়া আবশ্যক, আর একটাতে অতি ধীরে ধীরে সুরের ক্রমশঃ নিমীলন হইয়া আসা আবশ্যক। ভৈঁরোতে ও পূরবীতে সেই বিভিন্নতা রক্ষিত হইয়াছে, এইজন্য প্রভাত ও সন্ধ্যা উক্ত দুই রাগিণীতে মূর্তিমান।"

এই নিবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেছেন—"......উপসংহারে সংগীতবেত্তাদিগের প্রতি আমার এই নিবেদন যে, কী কী সুর কিরূপে বিন্যাস করিলে কী কী ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে,

তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন। মুলতান ইমন-কল্যাণ কেদারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসম্বাদী তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া, দুঃখ, সুখ, রোষ বা বিস্ময়ের রাগিণীতে কী কী সুর বাদী ও কী কী সুর বিসম্বাদী তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন। মুলতান কেদারা প্রভৃতি তো মানুষের রচিত কৃত্রিম রাগ-রাগিণী, কিন্তু আমাদের সুখ-দুঃখের রাগ-রাগিণী কৃত্রিম নহে। আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার মধ্যে সেই সকল রাগ-রাগিণী প্রচ্ছন্ন থাকে। কতগুলো অর্থশূন্য নাম পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন ভাবের নাম অনুসারে আমাদের রাগ-রাগিণীর বিভিন্ন নামকরণ করা হউক। আমাদের সংগীতবিদ্যালয়ে সুর-অভ্যাস রাগ-রাগিণী শিক্ষার শ্রেণী আছে, সেখানে রাগ-রাগিণীর ভাব-শিক্ষারও শ্রেণী স্থাপিত হউক। এখন যেমন সংগীত শুনিলেই সকলে বলেন 'বাঃ, ইহার সুর কী মধুর!' এমন দিন কি আসিবে না যেদিন সকলে বলিবেন 'বাঃ, কি সুন্দর ভাব!'

আমাদের সংগীত যখন জীবন্ত ছিল তখন ভাবের প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইত সেরূপ মনোযোগ আর কোন দেশের সংগীতে দেওয়া হয় কিনা সন্দেহ। আমাদের দেশে যখন বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন সময়ের ভাবের সহিত মিলাইয়া বিভিন্ন রাগ-রাগিণী রচনা করা হইত, যখন আমাদের রাগ-রাগিণীর বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক চিত্র পর্যন্ত ছিল, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে রাগ-রাগিণী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল। সে দিন গিয়াছে। কিন্তু আবার কি আসিবে না!

সুতরাং শুধু স্বর সমাবেশই রাগ নয়, তার মধ্যে ভাব থাকা চাই। সেই ভাব প্রকাশ পায় স্বরসমূহের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রয়োগ কৌশলে। রাগের ভিত্তি সুরের কাঠামো হলেও স্বরসমূহের প্রয়োগ কৌশল তাই অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। এইজন্য একই স্বর বিভিন্ন রাগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ তথা ভাব প্রকাশ করে। স্বরসমূহের এই বৈশিষ্ট্য পারিপার্শ্বিক স্বরের স্পর্শে সাধনালব্ধ কৌশলে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। অবশ্য এই বৈশিষ্ট্য না থাকলে মাত্র সাতটি স্বরের সাহায্যে এত রাগ-সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। এদিক থেকে বিচার করলে রাগের সংজ্ঞা এইরূপ হওয়া উচিত—"বিশেষ নিয়মাবদ্ধ পারম্পর্যপ্রধান যে স্বরবিন্যাস মানবচিত্ত অনুরক্ত তথা ভাবময় করতে সক্ষম তাকে রাগ বলে।"

স্বরসমূহের এই প্রয়োগ কৌশলকে ওস্তাদ মহলে 'স্বরের ওজন' বলা হয়। বিষয়টিকে রং-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। কারণ 'লাল' শব্দটি বাদ দিয়ে যেমন লাল রংটিকে বোঝান কঠিন, তেমনি স্বরবিশেষের প্রয়োগ কৌশলও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এটি কানে শুনে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করতে হয়—যার জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা এবং সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধান আবশ্যক। শাস্ত্রে তাই সংগীতকে 'গুরুমুখী বিদ্যা' বলা হয়েছে।

ভারতীয় সংগীতের প্রাণ হোল রাগ। সেই রাগের রূপ ও তাল ঠিক রেখে অনেকেই সংগীত পরিবেশন করতে পারেন, কিন্তু সকল আর্টেরই আসল কথা হোল রস সৃষ্টি, যা সত্যিকার শিল্পী ছাড়া কেউ পারে না। কণ্ঠসংগীতে সেই রস সৃজনে সবচেয়ে সাহায্যকারী হোল কণ্ঠমাধুর্য। কণ্ঠ সুমধুর হওয়া বা না হওয়াতে গায়কের কোন হাত নেই, কোন তরুণীর সৌন্দর্যে যেমন নেই তার নিজের কৃতিত্ব। সারাজীবন সাধনা করেও গায়ক মধুকণ্ঠী হতে পারে না। কণ্ঠমাধুর্য স্বভাবজাত বা ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা। সাধনার সাহায্যে তা মার্জিত হতে পারে মাত্র।

প্রাচীনকাল থেকে রাগ বিকাশের 'জাতি বা জাতিরাগ পদ্ধতি', 'গ্রামরাগ পদ্ধতি', 'অভিজাত দেশীরাগ পদ্ধতি' প্রভৃতি বিভিন্ন স্তর দেখা যায়। শেষোক্ত স্তর থেকেই বর্তমান থাট রাগ পদ্ধতির বিকাশ হয়েছে।

রাগ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ রাগ সর্বদা কোন একটি থাটের অন্তর্গত হয়। রাগে আরোহাবরোহণ, বাদী, সমবাদী, স্বর, বর্ণ, অলংকারাদি এবং রঞ্জকতা গুণ থাকা চাই। রাগে সর্বাধিক সাতটি এবং কমপক্ষে পাঁচটি স্বর থাকে। অবশ্য অনেকে চারটি স্বরযুক্ত 'মালশ্রী' রাগ স্বীকার করে নিয়মের একটি বিশেষ ব্যতিক্রম বলে থাকেন। সাধারণতঃ কোন স্বরের পাশাপাশি দুটি রূপ, কোন রাগে ব্যবহৃত হয় না। তবে এই নিয়মেরও কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন, কেদার, ললিত, জয়জয়ন্তী প্রভৃতি রাগ। কোন রাগে পাশাপাশি দুটি স্বর এবং ষড়্‌জ স্বরটি কখনও বর্জিত হয় না।

রাগের জাতিভেদঃ যথারীতি রাগ রচনায়, পাঁচ, ছয় ও সাতটি স্বরযুক্ত রাগকে যথাক্রমে ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ জাতির রাগ বলা হয়।

প্রধানতঃ তিন প্রকার জাতি হলেও আরোহাবরোহণ ভেদে রাগসমূহের জাতি (৩×৩=৯) মোট নয় প্রকার, যথা—

১।	আরোহে	৭টি এবং	অবরোহে	৭টি	স্বরযুক্ত রাগকে	সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	জাতির রাগ বলে।
২।	,,	৭টি	,,	৬টি	,,	সম্পূর্ণ-ষাড়ব	,,
৩।	,,	৭টি	,,	৫টি	,,	সম্পূর্ণ-ঔড়ব	,,
৪।	,,	৬টি	,,	৭টি	,,	ষাড়ব-সম্পূর্ণ	,,
৫।	,,	৬টি	,,	৬টি	,,	ষাড়ব-ষাড়ব	,,
৬।	,,	৬টি	,,	৫টি	,,	ষাড়ব-ঔড়ব	,,
৭।	,,	৫টি	,,	৭টি	,,	ঔড়ব-সম্পূর্ণ	,,
৮।	,,	৫টি	,,	৬টি	,,	ঔড়ব-ষাড়ব	,,
৯।	,,	৫টি	,,	৫টি	,,	ঔড়ব-ঔড়ব	,,

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই জাতিভেদগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ, ষাড়ব-ষাড়ব এবং ঔড়ব-ঔড়ব জাতির রাগগুলিকে যথাক্রমে সম্পূর্ণ, ষাড়ব এবং ঔড়ব বলেও সংক্ষিপ্তরূপে উল্লেখ করা হয়।

রাগের শ্রেণীভেদ ঃ উপরোক্ত জাতিভেদ ছাড়াও প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে রাগসমূহকে শুদ্ধ, ছায়ালগ এবং সংকীর্ণ এই তিন প্রকার বর্গীকরণ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে প্রতিটি বর্গের বৈশিষ্ট্য কী ও কেন ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হয়নি। বর্তমান সংগীতে এর পরিচয় নিম্নরূপ—

আশ্রয় রাগ বা শুদ্ধ শ্রেণীর রাগ ঃ যে সকল রাগে অন্য কোন রাগের ছায়া দেখা যায় না এবং শুদ্ধ ও স্বতন্ত্র নিয়মানুসারে গাওয়া হয়, অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির দশটি থাটবাচক রাগকে শুদ্ধ শ্রেণীর বা আশ্রয় রাগ বলে।

ছায়ালগ বা সালংক শ্রেণীর রাগ ঃ দশটি থাটবাচক রাগের ছায়া অবলম্বনে রচিত রাগসমূহকে ছায়ালগ বা সালংক শ্রেণীর রাগ বলে। এই রাগগুলি সর্বদা দুটিমাত্র রাগের মিশ্রণে রচিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, এই রাগগুলিতে দুটি রাগের আরোহাবরোহী থাকে এবং যে রাগের আরোহী থাকে তার প্রাধান্যই বেশী হয়। এই নিয়ম (সূত্র) অবশ্য অভ্রান্ত নয়, কারণ প্রতিটি ছায়ালগ রাগই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যানুসারে স্বতন্ত্র।

মিশ্র বা সংকীর্ণ শ্রেণীর রাগ ঃ যে সকল রাগ শুদ্ধ ও ছায়ালগ শ্রেণীর মিশ্রণে রচিত তাদের মিশ্র বা সংকীর্ণ শ্রেণীর রাগ বলে। অর্থাৎ এই শ্রেণীতে দুইটিরও অধিক রাগের মিশ্রণ থাকে।

জন্য ও জনক রাগ ঃ যেমন আমরা জানি ইমন রাগের সব স্বর তীব্র এবং এর আরোহাবরোহী তথা প্রকৃতি সরল ও সহজ, অতএব একে যেমন খুশি গাওয়া হোক সর্বদাই ইমন থাকবে। কিন্তু এর থেকে উৎপন্ন অন্যান্য 'জন্য' রাগগুলির জন্য বিশিষ্ট নিয়মবিধি রক্ষার প্রয়োজন আছে কেননা সেই বিশেষ নিয়মবিধির অমান্য করলেই তা ইমনের মতো মনে হবে। তাই ইমন থাটের নিয়মভ্রষ্ট রাগগুলির আশ্রয় বা জনক রাগ হোল ইমন।

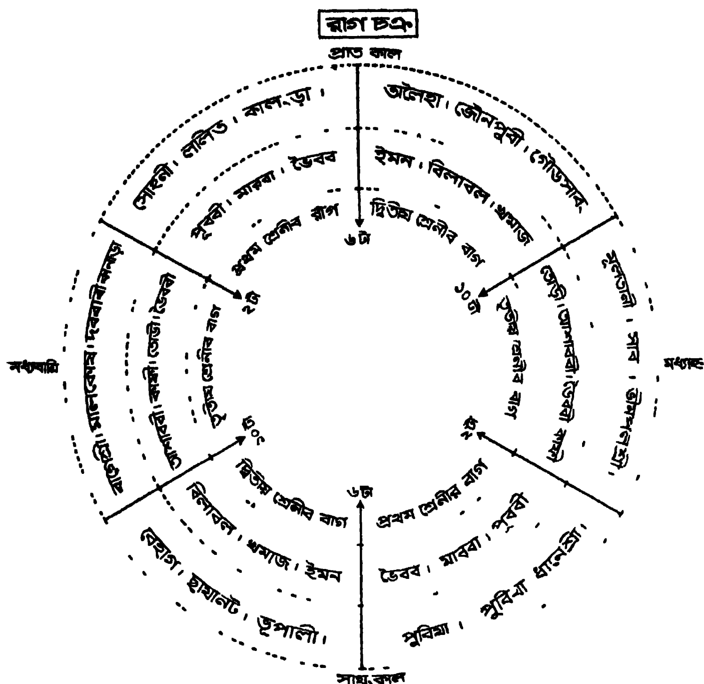
পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাঁর 'লক্ষ্যসংগীত' গ্রন্থে দশটি জনকরাগকে রাগনগরের রাজপথ এবং তার থেকে উৎপন্ন জন্যরাগগুলিকে ছোট ছোট পথ তথা অত্যন্ত সংকীর্ণ বা মিশ্র রাগগুলিকে ছোট ছোট গলিপথ বলে উল্লেখ করেছেন।

পরমেল প্রবেশক রাগ ঃ পরমেল প্রবেশক শব্দের অর্থই এর সংজ্ঞা সূচিত করছে। অর্থাৎ থাটান্তরের রাগ গাইবার আগে যে সকল রাগ গাওয়া হয় তাদের পরমেল প্রবেশক রাগ বলে। এই রাগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল, এতে সর্বদা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী রাগের স্বরবিন্যাসের কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকে। যেমন মারবা থাটের মারবা রাগে পরবর্তী ইমন থাটের ইমন রাগের স্বরবিন্যাসের সাদৃশ্য আছে। সুতরাং মাববা একটি পরমেল প্রবেশক রাগ। আবার শুদ্ধ রে, ধ-যুক্ত রাগের সময় উত্তীর্ণ হলে কোমল গ্‌, নি্‌-যুক্ত রাগ গাওয়ার সময় আসে। তখন জয়জয়ন্তী রাগটি পরমেল প্রবেশক রাগ রূপে গাওয়া হয়। কারণ এতে শুদ্ধ রে, ধ তথা দুই গ ও দুই নি ব্যবহৃত হয়। এটি খমাজ থেকে কাফী থাটে প্রবেশের সূচনা করে।

পরমেল প্রবেশক রাগের প্রধান উদ্দেশ্য হোল দুটি থাটের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। অর্থাৎ দুটি থাটের স্বরবিন্যাসে সাদৃশ্যযুক্ত এমন একটি রাগ গাইতে হবে যে, রাগ পরিবর্তিত হলেও যাতে রসিক শ্রোতাদের তেমন শ্রুতি-পীড়ার কারণ না ঘটে।

হিন্দুস্থানী সংগীতে তিনটি মাত্র পরমেল প্রবেশক রাগ দেখা যায়। যেমন, প্রথম শ্রেণীতে মারবা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে জয়জয়ন্তী এবং তৃতীয় শ্রেণীতে মূলতানী।

তিন শ্রেণীর রাগ ঃ আধুনিককালে রাগ সংগীতকে* এমনভাবে শ্রেণীভাগ করা হয়েছে যে, দিবা-রাত্রির ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১২ ঘন্টার ব্যবধানে একই থাটের পুনরাগমন ঘটে। অর্থাৎ সকাল বা সন্ধ্যায়, দ্বিপ্রহর বা



মধ্যরাত্রে একই স্বররূপযুক্ত রাগ গাওয়া হয়। এর প্রধান কারণ বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে সংগীতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

১ম শ্রেণীর রাগঃ প্রথম শ্রেণীর রাগে অন্যান্য স্বররূপ যেমনই হোক না কেন, ঋ, ধ স্বরদ্বয় সর্বদা কোমল হবে।

২য় শ্রেণীর রাগঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর রাগে অন্যান্য স্বররূপ যেমনই হোক না কেন, রে, ধ স্বরদ্বয় সর্বদা শুদ্ধ হবে।

৩য় শ্রেণীর রাগঃ তৃতীয় শ্রেণীর রাগে অন্যান্য স্বররূপ যেমনই হোক না কেন, গ, নি স্বরদ্বয় সর্বদা কোমল হবে।

দিবা ও রাত্রির, ১২ ঘন্টা করে সময়কে, তিন ভাগ করে, তিন শ্রেণীর থাট্ এবং রাগের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে। সময়কালের দৃষ্টিতে কতগুলি রাগ ও থাটগুলি নিয়ে রচিত উপরের রাগ চক্রটি আলোচনা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, তবে তা কদাচিৎ। কারণ, এইটিই বিজ্ঞানসম্মত রীতি।

সন্ধি প্রকাশ রাগ ঃ সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত এই দুটি সন্ধিক্ষণে যে সকল রাগ গাওয়া হয় তাদের সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলে। প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন ভেদে দুই প্রকার সন্ধিপ্রকাশ রাগ আছে। সন্ধিপ্রকাশ রাগ সর্বদা কোমল রে এবং শুদ্ধ গ, নি যুক্ত হয়। ভৈরব, ললিত, মারবা, পূরবী, শ্রী প্রভৃতি সন্ধিপ্রকাশ রাগ হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

মধ্যমকে অধ্বদর্শক স্বর হিসাবে যে মহত্বপূর্ণ বলা হয়েছে তা এই রাগে সুন্দর ভাবে প্রকাশ পায়। কারণ যেকোন প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগের মধ্যম স্বররূপটি পরিবর্তন করলে তা সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগরূপে পরিবর্তিত হয়।

পূর্ব, পূর্বাঙ্গ বা পূর্বাঙ্গবাদী রাগ ; উত্তর, উত্তরাঙ্গ বা উত্তরাঙ্গ-বাদী রাগ ঃ সপ্তকের দুটি অঙ্গ। সা থেকে প পর্যন্ত পূর্ব এবং ম থেকে তার সাঁ পর্যন্ত উত্তরাঙ্গ। দিবা ১২টা থেকে রাত্রি ১২টার মধ্যে যেসকল রাগ গাওয়া হয় তাদের পূর্ব, পূর্বাঙ্গ বা পূর্বাঙ্গবাদী রাগ বলে। সাধারণতঃ এগুলির বাদীস্বরটি পূর্বাঙ্গে থাকে। প্রকৃতি গম্ভীর হয় এবং স্বরবিস্তার মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে অধিক হয়ে থাকে। রাত্রি ১২টা থেকে দিবা ১২টার মধ্যে যে সকল রাগ গাওয়া হয় তাদের উত্তর, উত্তরাঙ্গ বা উত্তরাঙ্গবাদী রাগ বলে।

উভয়াঙ্গের স্বর ঃ এগুলির নিয়ম সাধারণতঃ পূর্বাঙ্গরাগের বিপরীত হয়ে থাকে। তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও কদাচিৎ দেখা যায়। কারণ মধ্যম, পঞ্চম ও ষড়্‌জ স্বরত্রয় উভয় অঙ্গেই বিদ্যমান, সুতরাং এর কোনোটি যদি বাদীস্বর হয়, তখন সেই রাগের প্রকৃতি যেকোন অঙ্গেরই হতে পারে। তেমন ক্ষেত্রে, সেই রাগের গায়ন সময়, অঙ্গ-প্রাধান্য প্রভৃতি তার নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী নিশ্চিত হয়ে থাকে।

দ্বিমধ্যম রাগ ঃ যে সকল রাগে দুটি মধ্যমই ব্যবহৃত হয় তাদের দ্বিমধ্যম রাগ বলে। এগুলির বৈশিষ্ট্য হোল এই যে এদের গ, নি স্বরদ্বয় সর্বদা শুদ্ধ হয়ে থাকে। যেমন, ললিত, কেদার, কামোদ, ছায়ানট, হম্বীর প্রভৃতি দ্বিমধ্যম রাগ হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

সমপ্রকৃতিক রাগ ঃ সাধারণতঃ একই থাট থেকে উৎপন্ন অনেক রাগের স্বররূপ, বাদী, সংবাদী, গায়ন সময়, স্বরবিন্যাস প্রভৃতির মধ্যে কিছু

কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। এগুলি একে অন্যের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত বলে এদের সমপ্রকৃতিক রাগ বলে। যেমন, কেদার, হমীর, ছায়ানট, কামোদ প্রভৃতি কিম্বা পুরিয়া, মারবা, সোহনী, ললিত প্রভৃতি।

বক্ররাগ : যে সকল রাগের আরোহণ বা অবরোহণে কিম্বা উভয়েরই চলন স্বাভাবিক ক্রমানুসারে হয় না, অর্থাৎ বক্ররূপে হয়, সেগুলিকে বক্ররাগ বলে। যেমন, গৌড়সারং, গৌড়মল্লার প্রভৃতি।

অন্তর্মার্গ : অন্তর্মার্গ বলতে মধ্যবর্তী পথ বোঝায়। 'বাদী ভেদে রাগ ভেদ' কথাটি রাগসংগীতে বহুল প্রচলিত, সেই ভেদ প্রকাশ পদ্ধতি হোল অন্তর্মার্গ। কারণ রাগ-বিশেষের স্বতন্ত্র চলন-বৈশিষ্ট্যকেই অন্তর্মার্গ বলে। প্রাচীনকালে ন্যাস অপন্যাস প্রভৃতি নিয়ে সংগীত ছিল কঠোর সাংস্কৃতিক নিয়মাবদ্ধ ; তবে বর্তমান সংগীতে তা কিছুটা শিথিল হয়েছে।

বাদীস্বরটি হোল সকল রাগের মুখ্য স্বর। স্বভাবতঃই, রাগের চলন-বৈশিষ্ট্য তার উপরে নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে অন্তর্মার্গও সেই অনুযায়ী নির্ভরশীল। রাগ-সংগীতে অন্তর্মার্গ তাই একটি মহত্বপূর্ণ বিষয়।

তুক/ধাতু : গানের অবয়বকে তূক বা ধাতু বলে। প্রকৃতপক্ষে বর্ণ, তূক বা ধাতুতে কোন পার্থক্য নেই। প্রাচীন সংগীতে আলাপ, বিস্তার প্রভৃতির জন্য বর্ণ, এবং গানের জন্য ধাতু শব্দের ব্যবহার করা হোত ; তবে বর্তমানে এইরূপ ভেদ স্বীকৃত নয়। এখন যাবতীয় সংগীতের জন্য ধাতু বা তূক শব্দের ব্যবহার করা হয়।

স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ বা ভনিতা ভেদে তূক বা ধাতু চার প্রকার।

স্থায়ী (মুখ/মুখড়া) : এই অংশের স্থায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। সেদিক থেকে একে সার্থক নামকরণ বলা যায়। সাধারণতঃ মন্দ্রসপ্তকের কয়েকটি স্বর এবং মধ্যসপ্তকের পূর্ব অঙ্গের মধ্যবর্তী স্বরগুলি নিয়ে স্থায়ী রচিত হয়। চলতি ভাষায় অনেকে এই অংশকে 'মুখ বা মুখড়া' বলে থাকেন।

অন্তরা : স্থায়ী থেকে দূরে (অন্তরে) বলেই এর নাম অন্তরা। সাধারণতঃ মধ্যসপ্তকের ম কিম্বা প থেকে তার সপ্তকের গঁ, মঁ, পঁ পর্যন্ত স্বর-সহযোগে অন্তরা রচিত হয়।

সঞ্চারী : সঞ্চরণ থেকে সঞ্চারী শব্দের উৎপত্তি। স্থায়ী ও অন্তরার

সংমিশ্রণে সঞ্চারী রচিত হয়। অর্থাৎ ত্রিসপ্তকের স্বরই এই অংশে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে সাধারণতঃ মন্দ্র ও মধ্যসপ্তকেই সঞ্চারী সীমিত থাকে।

আভোগ/ভনিতা ঃ সাধারণতঃ আভোগ বা ভনিতার অংশ অন্তরার মতোই রচিত হয়। তবে এই অংশের বৈশিষ্ট্য হোল, এতে শিল্পী আপন ক্ষমতানুসারে তার সপ্তকের উচ্চতম স্বর পর্যন্ত ব্যবহার করেন এবং এই অংশে রচয়িতা তাঁর নাম বা পরিচয়ও প্রকাশ করে থাকেন।

আলাপগান ঃ আলাপগানকে সংগীতের শ্রেষ্ঠ পর্যায়ভুক্ত বলা যায়। প্রাচীন শাস্ত্রে একে আলপ্তি বা অনিবদ্ধ গান বলা হয়েছে। রাগ বিশেষের রূপ স্বরবিস্তারের সাহায্যে পরিস্ফুট করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এর অন্তর্নিহিত ভাবটি হোল, যেমন, পূজার আগে আরাধ্য দেবতার মূর্তি কল্পনা বা নির্মাণ করে নেওয়া হয়, তেমনি রাগবিশেষের রূপকে আলাপরূপ আরাধনার সাহায্যে মূর্ত করে নেওয়া হয়। আলাপগানের মাধ্যমেই রাগের বাদী সমবাদী চলনবৈশিষ্ট্য প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়ে থাকে। তালবদ্ধ না হলেও এতে ছন্দ আছে এবং বিলম্বিত মধ্য ও দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়। ধ্রুপদ গানের মতো এতে স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী ও আভোগ এই চারটি অংশ বা তূক থাকে। সাধারণতঃ দুই প্রকারে আলাপগান গাওয়া হয়। নোমতোম রি রে না অথবা আকারের সাহাযো। নোমতোম সহযোগে আলাপ গাওয়াই শ্রেয় কারণ এতে বিভিন্ন স্থানে ছন্দ প্রদর্শনের সুবিধা থাকে। তাছাড়া দ্রুত আলাপকালে আকার অপেক্ষা ইহা বৈচিত্র্যদায়ক হয়ে থাকে। ধ্রুপদ গায়কেরাই উত্তম আলাপগান করেন, যাঁদের স্বর ও রাগজ্ঞান অতি উচ্চস্তরের হয়ে থাকে। তবে আধুনিককালে খেয়াল গায়কেরাও সুন্দর আলাপগান করে থাকেন।

স্বর বিস্তার সাধারণত বাদী বা সমবাদী স্বর থেকে আরম্ভ করা কর্তব্য। পূর্বাঙ্গ রাগে বাদীস্বর থেকে আলাপ আরম্ভ করাই শ্রেয়, কিন্তু বাদী স্বরটি যদি ষড়্জ থেকে দূরে অবস্থিত হয় তাহলে সমবাদী স্বরটিকে প্রাথমিক স্বর হিসাবে প্রযুক্ত করা উচিত। প্রারম্ভে ছোট ছোট স্বরবিন্যাস সহযোগে ষড়্জে এসে ন্যাস কবা এবং প্রথম অংশে বাদীস্বরের উপরে না যাওয়া কর্তব্য। প্রতিটি রাগে বাদী-সমবাদী ছাড়া কয়েকটি বিশ্রান্তি স্বর থাকে, যেগুলির উপযুক্ত প্রয়োগ রাগ বিস্তারে অতিশয় সহায়ক হয়ে থাকে।

এইরূপে ক্রমে মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকের স্বরবিন্যাস-ক্ষেত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং আলাপগান বৈচিত্র্য ও মাধুর্যপূর্ণ হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াতে রাগের শুদ্ধতা এবং প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যথোচিত সচেতন থাকা অবশ্য কর্তব্য।

কণ্ঠসংগীতে নিরর্থক শব্দ অথবা আকার সহযোগে আলাপ গাওয়া হয়। পূর্বে সম্ভবতঃ সংস্কৃত শ্লোকের সাহায্যে আলাপ গাওয়া হোত। খেয়াল গীতরীতি প্রচলনের সূচনায় আলাপগান ছিল সংক্ষিপ্ত ; মাত্র দুই প্রকার—প্রকৃত ও রূপক আলাপ; একটি প্রকৃতি হিসাবে এবং অপরটি বিস্তৃতি হিসাবে। তবে বর্তমানে আলাপের দ্বাদশ অঙ্গ স্বীকৃত। যথা—বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত, ঝালা, ঠোক, লড়ি, লড়গুথাও, লড়লপেট, পরণ, সাথ, ধুয়া ও মাঠা। এই অঙ্গগুলির সাহায্যে আলাপ বৈচিত্র্য ও মাধুর্যপূর্ণ করা হয়।

সাধারণতঃ আলাপের স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী ও আভোগ যথাক্রমে বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত ও দ্রুততর প্রভৃতি লয় সহযোগে গীত বা বাদিত হয়। 'ঝালা' অঙ্গ থেকে আলাপের ছন্দময় রূপটি পরিস্ফুট হতে থাকে। এই অঙ্গে স্বরগুলি বিলম্বিত লয়ে উচ্চারিত হলেও তানানানা বাণী অথবা চিকারি সহযোগে ঝালা প্রদর্শিত হয়। 'ঠোক' অঙ্গে আলাপের অংশগুলি অপেক্ষাকৃত দ্রুততর হয় এবং তখন যুক্তবাণী প্রযুক্ত হতে থাকে। যেমন, দ্রেতুম তানানানা আর যন্ত্রে ড্রেদার ডার ডা ডারা ইত্যাদি। 'লড়ি' অঙ্গ সাধারণতঃ যন্ত্রেই প্রদর্শিত হয়, কণ্ঠসংগীতে হয় না। লড়ি অর্থ মালা। এই অঙ্গে অযুক্ত বোলের কোন অংশ নিয়ে নানাভাবে বিস্তার (মালা গাঁথা) করা হয়। 'লড়গুথাও' অঙ্গে সরল স্থানে যুক্তবোল প্রযুক্ত হয়ে থাকে। যেমন, ক্রেধান, ক্রেধেতেটে ইত্যাদি। লড়ি ও লড়গুথাও অঙ্গের সঙ্গে যদি সুঁত, আশ বা ছুট/মীড় প্রযুক্ত হয় তাহলে সেই প্রক্রিয়াকে 'লড়লপেট' বলা হয়। 'পরণ' অঙ্গে যন্ত্রী চিকারিতে একটি ছন্দ আরম্ভ করেন এবং মুখ্য তারে পাখোয়াজের বোল বাজিয়ে সমে এসে আবার চিকারিতে ছন্দ প্রদর্শন করেন। সংগতকারী তখন অনুরূপ বোল সহযোগে জবাব সঙ্গত করেন। এই প্রক্রিয়াকে 'তারপরণ'ও বলা হয়। 'সাথ' অঙ্গ প্রায় পরণেরই মতো, তবে এতে যন্ত্রী ও সংগতকারী একই সঙ্গে পরণ বাজিয়ে সম প্রদর্শন করেন। প্রধান তারে সামান্য স্বরবিন্যাস সহযোগে চিকারির তারে লড়ি

বাজালে 'ধুয়া' অঙ্গ সম্পন্ন হয়। আর প্রধান তারে এবং চিকারির তারে পর্যায়ক্রমে লড়ি ও লড়গুথাও বাজানোর প্রক্রিয়াকে 'মাঠা' বলে।

আলাপগানের চারটি বিভাগ আছে। যথা, (১) আওচার আলাপ, (২) বন্ধন আলাপ, (৩) কয়েদ আলাপ এবং (৪) বিস্তার আলাপ।

(১) যে আলাপগানে রাগের পরিচয় মাত্র প্রদর্শিত হয় তাকে 'আওচার আলাপ' বলে। এতে আলাপের বিশালত্ব বা কোন নিয়মের কঠোরতা নেই। গানের প্রধান পদগুলির সাহায্যে রাগরূপ প্রকাশ করাই এর উদ্দেশ্য। ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি গানের গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে ইহা প্রযুক্ত হয়।

(২) বন্দেজীতান সহযোগে এই আলাপ আরম্ভ করার জন্যই এর নাম 'বন্ধন আলাপ'। কারণ বিভিন্ন ঘরাণার বৈশিষ্ট্যানুসারে কয়েকটি বন্দেজীতান আলাপের প্রথম অংশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে প্রথমে ছোট ছোট এবং ক্রমে বড় তান প্রযুক্ত হয়।

(৩) 'কয়েদ আলাপ' স্বরবিশেষকে কেন্দ্র (কয়েদ) করে করা হয়। প্রথমে ছোট এবং ক্রমে বড়ো বড়ো তানের সাহায্যে উক্ত স্বরটিকে অলংকৃত করা হয়। সাধারণতঃ বাদী স্বরকে কেন্দ্র করেই আলাপ গাওয়ার প্রথা, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ষড়্জকে কেন্দ্র করেও আলাপ গাওয়া হয়।

(৪) 'বিস্তার আলাপ' রাগপ্রকাশক স্বর সহযোগে আরম্ভ করা হয়। এর প্রকৃতি অনেকটা আওচার আলাপের মতো বটে কিন্তু ইহা তার থেকে অনেক গভীর ও ব্যাপক হয়ে থাকে।

স্থায়ীর আলাপ ঃ স্থায়ীর আলাপে শিল্পী প্রারম্ভে মন্দ্র সপ্তকের স্বরবিন্যাস সহযোগে ষড়্জ ও বাদীস্বর সংস্থাপন তথা বাদীস্বরের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে থাকেন। বাদী স্বরটি যদি পূর্বাঙ্গে অর্থাৎ ষড়্জের অদূরবর্তী না হয় তাহলে সমবাদী স্বর থেকে রাগ আরম্ভ করা কর্তব্য। প্রথমে ছোট ছোট তান সহযোগে বাদী, সমবাদী অথবা ষড়্জে ন্যাস করা উচিত। ক্রমে বিবিধ স্বরবিন্যাস সহযোগে একটি-দুটি করে স্বর-সংযোগে মধ্য সপ্তকের পঞ্চম, ধৈবত বা নিষাদ, এমনকি তার ষড়্জ পর্যন্ত স্পর্শ করে মধ্য ষড়্জে ফিরে এসে স্থায়ীর আলাপ সমাপ্ত করা হয়।

অন্তরার আলাপ ঃ এই অংশের আলাপ সাধারণতঃ মধ্য সপ্তকের গান্ধার, মধ্যম বা পঞ্চম থেকে আরম্ভ করা হয় এবং নানাবিধ স্বরবিন্যাস

সহযোগে তার ষড্‌জ অথবা আরো কিছু উঁচুতে গিয়ে মধ্য ষড্‌জে ফিরে এসে অন্তরার আলাপ শেষ করা হয়।

সঞ্চারীর আলাপ : স্থায়ী ও অন্তরার সংমিশ্রণে সঞ্চারীর আলাপ মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকের মধ্যেই সাধারণতঃ সীমিত থাকে।

আভোগের আলাপ : এই অংশের আলাপ অন্তরার মতোই হয়ে থাকে। তবে এর বৈশিষ্ট্য হোল এই যে, এতে ত্রিসপ্তকের স্বরবিন্যাস সহ-যোগে শিল্পী আপন সাধনা ও ক্ষমতানুসারে তার সপ্তকের উচ্চতম স্বরোচ্চারণ করে থাকেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই অংশগুলিতে লয়ের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা হয়।

আলাপের লয় : আলাপগানের বিভিন্ন অংশে যথাক্রমে বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত, দ্রুততর প্রভৃতি লয় প্রযুক্ত হয়ে থাকে। দ্রুতলয়ে আলাপ গাওয়ার সময়ে আকারের থেকে নোমতোম প্রভৃতি বাণী প্রযুক্ত হলেই আলাপগান অধিক মাধুর্যপূর্ণ হয়ে থাকে।

বিস্তার : প্রকৃতপক্ষে বিস্তার ও তান অভিন্ন অর্থবোধক। আবার আলাপ বলতেও বিস্তার বোঝায়। বাদ্য প্রসঙ্গে ব্যবহৃত প্রস্তার অর্থেও বিস্তার বোঝায়। তবে সংগীতের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এগুলির মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। যেমন, স্বরসমূহের অনিবদ্ধ বিস্তারকে আলাপ বলে, কিন্তু নিবদ্ধ বিস্তারকে তান বলা হয়। আর প্রস্তার শব্দটি বাদ্যযন্ত্রাদির বোল-বিস্তার প্রসঙ্গে প্রযুক্ত হয়।

বড়ত-ফিরত : ওস্তাদ মহলে এক-একটি স্বরসংযোগে আলাপ-বিস্তার প্রভৃতিকে বড়ত-ফিরত বলা হয়।

আবির্ভাব তিরোভাব : রাগ-গায়নকালে সমপ্রকৃতিক অন্য কোন রাগের স্বরবিন্যাস প্রয়োগ করে অল্প সময়ের জন্য মুখ্য রাগটির তিরোভাব ঘটানো হয়। পরে আবার উক্ত রাগের মুখ্য স্বরবিন্যাস প্রয়োগে মূল রাগের আবির্ভাব ঘটে। এইরূপে কুশল সংগীতজ্ঞেরা আবির্ভাব এবং তিরোভাব প্রদর্শন করে থাকেন।

ঘরাণা : সংগীত জগতে ঘরাণা বলতে রীতি, পদ্ধতি বা ষ্টাইল বোঝায়। এখানে ঘর অর্থ বংশ এবং ঘরাণা অর্থে বংশ তথা শিষ্য-পরম্পরাবৈশিষ্ট্য বলাই যুক্তিযুক্ত। বিভিন্ন ঘরাণার সংগীতশিল্পীদের সংগীতে

কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। যে বৈশিষ্ট্যগুলি উক্ত ঘরাণার কোন প্রতিভাবান শিল্পীর সৃজনীশক্তির প্রভাবে সৃষ্ট। সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই উক্ত ঘরাণার রস আস্বাদন-প্রতীকরূপে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ যখন কোন প্রতিভাবান শিল্পী তাঁর সৃজনীশক্তির প্রভাবে কোন নতুন প্রয়োগকৌশল অথবা অলংকার ধারা প্রবর্তন করেন এবং সেই পদ্ধতি বা অলংকারধারা তাঁর বংশ তথা শিষ্যপরম্পরায় অনুসৃত এবং প্রবাহিত হতে থাকে তখন তাকে একটি নবীন ঘরাণা বলে উল্লেখ করা হয়।

বর্তমানে ভারতবর্ষে অসংখ্য ঘরাণার প্রচলন হয়েছে। যার মধ্যে গোয়ালিয়র, কিরাণা, আগ্রা, দিল্লী, উদয়পুর, অত্রৌলি, বেনারস, জয়পুর, বিষ্ণুপুর, লক্ষ্ণৌ, পাঞ্জাব প্রভৃতি ঘরাণা উল্লেখযোগ্য*।

ঘরাণার মাধ্যমেই সংগীতজগতে বহু বিচিত্র উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে এবং সংগীতের ব্যাপকত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। একই রাগের ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি বিভিন্ন ঘরাণার গুণীদের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বর্তমানে সেনী ঘরাণা, অর্থাৎ তানসেনের বংশ তথা শিষ্য পরম্পরাই অধিকাংশ সংগীতগুণীদের মতে শ্রেষ্ঠ ঘবাণা। তবে এবিষয়ে মতভেদ আছে, কারণ কেহই আপন ঘবাণার থেকে অন্যের ঘরাণাকে শ্রেষ্ঠ বলে মানতে রাজি নন।

একথা অনস্বীকার্য যে, আধুনিককালের ব্যবহারিক সংগীতধারার ইতিহাস মধ্যযুগের ধারাতেই প্রবহমান। যেখানে তানসেনই সংগীতাকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। মুসলমান বাদশাহদের সংগীতপ্রীতি এবং পৃষ্ঠ-পোষকতায়, সেই দিনে অজস্র সংগীতগুণীরা রাজাশ্রয়লাভ করেছেন। যাঁদের মধ্যে তানসেন-বংশ তথা শিষ্যপরম্পরাই ছিল প্রধান। বাদশাহী আমল যখন শেষ হতে আরম্ভ হয় তখন ওই সকল সংগীতগুণীরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন এবং সেই সকল স্থানের অধিবাসী বলে পরিচিত হতে থাকেন। সেই সকল গুণীদের প্রভাবে তাঁদের বংশ ও শিষ্যপরম্পরায় যে সংগীত-বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়, পরবর্তীকালে উক্ত স্থানের গায়ন বৈশিষ্ট্য হিসাবে তা উল্লিখিত হতে থাকে। এইরূপে বিভিন্ন ঘরাণার উদ্ভব হয়।

* বিভিন্ন ঘরাণা'র সংগীত বৈশিষ্ট্যগুলি "সংগীত ঘবাণা (বংশ ও শিষ্যপবম্পরা পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে।

আদত ঃ ওস্তাদ-মহলে এমন অনেক শব্দ শোনা যায়, যার অর্থ বোধগম্য হয় না, অথচ সব সময়ে জেনে নেওয়াও সম্ভবপর হয় না, তেমনি কয়েকটি শব্দের পরিচয় এখানে দেওয়া হোল।

আদত একটি উর্দ্ শব্দ। এর অর্থ স্বভাব বা অভ্যাস। ওস্তাদেরা শিল্পীর গুণ অথবা দোষ প্রকাশে এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, শিল্পীর সাধনার নিয়মানুবর্তিতা অনুসারে অলংকারাদি প্রয়োগের বিচক্ষণতা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ নিয়মিত রেওয়াজের (সাধনা) সাহায্যে অর্জিত ক্ষমতায় যে শিল্পী নানাবিধ তান-অলংকারাদি প্রয়োগ করে সংগীত পরিবেশনে সক্ষম তাঁর সম্পর্কে ওস্তাদেরা 'ভাল আদত' বলে থাকেন।

আতাই ঃ অশিক্ষিত-পটুত্ব-সম্পন্ন সংগীতজ্ঞ সম্বন্ধে 'আতা'ই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ গুরু পরম্পরা ঘরাণার আভিজাত্য সম্পন্ন শিক্ষা যে পায়নি তেমন শিল্পীকে ওস্তাদেরা আতাই গায়ক বা আতাই বাদক বলে থাকেন।

জিগর ঃ জিগর একটি উর্দ্ শব্দ। এর অর্থ হৃদয়। শিল্পীব সাংগীতিক মেজাজ (Musical temperament) সম্পর্কে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ সংগীত পরিবেশনকালে শিল্পোচিত রুচি ও জ্ঞান অনুযায়ী বিবিধ তান অলংকারাদি যথোচিত প্রয়োগ করে সংগীতের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করার ক্ষমতাকে 'জিগর' বলা হয়।

হিসাব ঃ হিসাব শব্দটি উর্দ্ হলেও বাংলা ভাষাতেও অভিন্ন অর্থ-বাচক। সংগীতে তাল রক্ষা করার জ্ঞান ও ক্ষমতা সম্পর্কে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে, সংগীতের লয় রক্ষা করার ক্ষমতা বা অক্ষমতা সম্পর্কে এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

জমজমা ঃ জমজমা একটি উর্দ্ শব্দ, এর অর্থ ঝলমলে। এর সাংগীতিক অর্থ হোল স্বরসংযোজনা। সাধারণতঃ যন্ত্রসংগীতে ব্যবহৃত এক বিশেষ প্রকার তানকে জমজমা বলে। যেমন, সারেসরে গমগম পধপধ ইত্যাদি। অর্থাৎ পর পর দুটি স্বর পর্যায়ক্রমে একাধিকবার দ্রুতলয়ে বাজানোকে জমজমা বলা হয়।

পকড়ঃ পকড় একটি উর্দু শব্দ, এর অর্থ ধরা। এর সাংগীতিক সংজ্ঞা হোল : যে ন্যূনতম স্বর রচনার সাহায্যে কোন রাগরূপ প্রকাশ করা যায়, সেই স্বরবিন্যাসটিকে রাগ বিশেষের পকড বলা হয়।

পুকারঃ পুকার একটি উর্দু শব্দ এর অর্থ ডাকা। দুটি বা তিনটি সপ্তকের এক বা একাধিক স্বর একসঙ্গে উচ্চারণ করাকে পুকার বলে। যেমন, সরেসা-সঁরেঁসা গঁমঁরেঁসা-গমরেসা, স়রে়সা়-সরেসা-সঁরেঁসা ইত্যাদি।

জোড়ঃ জোড একটি উর্দু শব্দ, এর অর্থ যোগ কবা। বীণা, সেতার প্রভৃতি ততযন্ত্রে আলাপাদির সময়ে একটি দুটি স্বর যোগ করে যে রাগরূপ প্রকাশ করা হয়, সেই স্বর-যোগ প্রক্রিয়াকে জোড বলে।

মুখচালনঃ সংগীত পরিবেশনকালে রাগোচিত নানাবিধ তান-অলংকারাদি প্রয়োগ করাকে মুখচালন বলে।

লাগডাঁটঃ সংগীত পরিবেশনকালে শিল্পীর আত্মবিশ্বাস সহ নানাবিধ তান অলংকারাদি সহযোগে রাগরূপ প্রকাশ করা এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত অবিচ্ছেদ্দভাবে নিবিষ্ট রাখার ক্ষমতাকে লাগডাঁট বলা হয়। অর্থাৎ সংগীতক্রিয়ার যাবতীয় কায়দা (Art), যার সাহায্যে শ্রোতাদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করা হয়, তাই হোল লাগডাঁট। এর অভাব হলে আমরা 'জমল না' বলে থাকি। জমা শব্দটির সঙ্গে লাগ শব্দটির অর্থগত সাদৃশ্য আছে। পূর্ববর্তী শাস্ত্রকারগণ একে 'লগ্নদন্ত' বলে উল্লেখ করেছেন।

অলংকারঃ অলংকার অর্থ গহনা বা আভূষণ। সংগীতে সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য যে সকল তান অলংকারাদি প্রয়োগ করা হয় তাদের অলংকার বলে। তান, গমক, আস, মীড়, মূর্ছনা প্রভৃতি অলংকার শ্রেণীভুক্ত। শার্ঙ্গদেব এর পরিচয়ে বলেছেন : "বিশিষ্ট বর্ণসন্দর্ভমলংকারং প্রচক্ষতে" অর্থাৎ নিয়মিত কয়েকটি স্বরের বিশেষ রচনাকে অলংকার বলে। সংগীতে অলংকারের উপযোগিতা প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রকার বলেছেন :

শশিনা রহিতেব নিশা বিজলেব নদী লতা বিপুষ্পেব।
অবিভূষিতে কান্তা গীতিরলংকারহীনা স্যাৎ॥

অর্থাৎ চন্দ্রবিনা রজনী, জলহীনা নদী, ফুলহীনা লতা এবং ভূষণহীনা রমণীর মতো অলংকারহীন সংগীত অশোভনীয়। প্রাচীন শাস্ত্রে বহু বিচিত্র

অলংকারের উল্লেখ আছে। যার মধ্যে ৬৩ প্রকার অলংকার প্রসিদ্ধ। অবশ্য অলংকার অনন্ত হতে পারে। এখানে শাস্ত্রোক্ত অলংকারগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া হোল।

স্থায়ী বর্ণগত অলংকার।

১। প্রসন্নাদি—সসর্সা

২। প্রসন্নান্ত—র্সর্সসা

৩। প্রসন্নাদ্যন্ত—সর্সসা

৪। প্রসন্নমধ্য—র্সসর্সা

৫। ক্রমরেচিত—সরেসা, সাগমসা, সাপধনসা

৬। প্রস্তার—সরের্সা, সাগমর্সা সাপধনর্সা

৭। প্রসাদ—র্সরেসা, র্সাগমসা, র্সাপধনসা

আরোহী বর্ণগত অলংকার।

৮। বিস্তীর্ণ—সারেগমপধনি

৯। নিষ্কর্ষ—সসা রেরে গগ মম পপ ধধ নিনি, বা সসসা রেরেরে বা সসসমা, রেরেরেরে ইত্যাদি

১০। বিন্দু—সসসা রে গগগ ম পপপ ধ নিনিনি

১১। অভ্যুচ্চয়—সা গ প নি

১২। হসিত—সা রেরে গগগ মমমম পপপপপ ধধধধধধ নিনিনিনিনিনিনি

১৩। প্রেঙ্খিত—সরে রেগ গম মপ পধ ধনি

১৪। আক্ষিপ্ত—সাগ গপ পনি

১৫। সন্ধিপ্রচ্ছাদন—সরেগ গমপ পধনি

১৬। উদ্‌গীত—সসসা রেগ মমম পধ

১৭। উদ্বাহিত—সা রেরেরে গ ম পপপ ধ

১৮। ত্রিবর্ণ—সরে গগগ মপ ধধধ

১৯। বেণী—সসসা রেরেরে গগগ মমম পপপ ধধধ

২০ থেকে ৩১ পর্যন্ত অবরোহী বর্ণগত অলংকার। এগুলি আরোহী বর্ণের বিপরীত ক্রমে।

সঞ্চারী বর্ণগত অলংকার

৩২। মন্দ্রাদি—সাগরে রেমগ গপম মধপ পনিধ

৩৩। মন্দ্রমধ্য—গসরে মরেগ পগম ধমপ নিপধ

৩৪। মন্দ্রান্ত—রেগসা গমরে মপগ পধম ধনিপ

৩৫। প্রস্তার—সাগ রেম গপ মধ পনি

৩৬। প্রসাদ—সরেসা রেগরে গমগ মপম পধপ ধনিধ

৩৭। ব্যাবৃত্ত—সাগরেমসা রেমগপরে গপমধগ মধপনিম

৩৮। স্খলিত—মধপনি নিপধম

৩৯। পরিবর্ত—সাগম রেমপ গপধ মধনি

৪০। আক্ষেপ—সরেগ রেগম গমপ মপধ পধনি

৪১। বিন্দু—সসসরেসা রেরেরেগরে গগগমগ মমমপম পপপধপ ধধধনিধ

৪২। উদ্বাহিত—সরেগরে রেগমগ গমপম মপধপ পধনিধ

৪৩। ঊর্ম্মি—সামমমসম রেপপপরেপ গধধধগধ

৪৪। সম—সরেগম মগরেসা রেগমপ পমগরে গমপধ ধপমগ মপধনি নিধপম

৪৫। প্রেংখ—সরেরেসা রেগগরে গমমগ মপপম পধধপ ধনিনিধ

৪৬। নিষ্‌কুঞ্চিত—সরেসাগসা রেগরেমরে গমগপগ মপমধম পধপনিপ

৪৭। শ্যেন—সাপ রেধ গনি মসা

৪৮। ক্রম—সরে সরেগ সরেগম, রেগ রেগম রেগমপ, গম গমপ গমপধ, মপ মপধ মপধনি

৪৯। উদ্‌ঘাটিত—সরেপমগরে রেগধপমগ গমনিধপম

৫০। রঞ্জিত—সাগরেসাগরেসা রেমগরেমগরে মধপমধপম পনিধপনিধপ

৫১। সন্নিবৃত্তপ্রবৃত্ত—সাপমগরে রেধপমগ গনিধপম

৫২। বেণু—সসরেমগ, রেরেগপম, গগমধপ, মমপনিধ

৫৩। ললিত স্বর—সরেমরেসা, রেগপগরে, গমধমগ, মপনিপম

৫৪। হুংকার—সরেসা সরেগরেসা সরেগমগরেসা সরেগমপমগরেসা সরেগমপধপমগরেসা, সরেগমপধনিধপমগরেসা

৫৫। হ্লাদমান—সাগরেসা রেমগরে গপমগ মধপম পনিধপ

৫৬। অবলোকিত—সাগমমরেসা রেমপপগরে গপধধমগ মধনিনিপম

অতিরিক্ত সপ্তালংকার

৫৭। তারমন্দ্র প্রসন্ন—সারেগমপধনিসাঁসাঁ।

৫৮। মন্দ্রতার প্রসন্ন—সাসানধপমগরেসা।

৫৯। আবর্তক—সসা রেরে সসা রেসা, রেরে গগ রেরে গরে, গগ মম গগ মগ, মম পপ মম পম, পপ ধধ পপ ধপ, ধধ নিনি ধধ নিধ

৬০। সদান—সসা রেরে সসা, রেরে গগ রেরে, গগ মম গগ, মম পপ মম, পপ ধধ পপ, ধধ নিনি ধধ

৬১। বিধূত—সাগসাগ রেমরেম গপগপ মধমধ পনিপনি

৬২। উপলোল—সরেসরেগরেগরে, রেগরেগমগমগ, গমগমপমপম, মপমপধপধপ, পধপধনিধনিধ

৬৩। উল্লাসিত—সসাগসাগ, রেরেমরেম, গগপগপ, মমধমধ, পপনিপনি।

এছাড়াও সংগীতে ব্যাপকভাবে অলংকার শব্দটি প্রযোজ্য। মীড়, খাস, খটকা, গমক প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু অলংকারের পর্য্যায়ভুক্ত।

মীড়ঃ কণ্ঠসংগীতে কোন স্বর থেকে অন্য কোন স্বরে গড়িয়ে যাওয়াকে মীড় বলে। যেমন, সা ম, প রে ইত্যাদি।

গমকঃ নানাবিধ তান বা অলংকারই গমক পর্য্যায়ভুক্ত। মধ্যযুগীয় শাস্ত্রে বহু বিচিত্র গমকের উল্লেখ আছে। যেমন, সংগীত পারিজাত গ্রন্থে ২০ প্রকার, সংগীত রত্নাকর গ্রন্থে ১৫ প্রকার, সেনী ঘরাণায় প্রচলিত ২২ প্রকার ইত্যাদি। প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে শার্ঙ্গদেব বর্ণিত ১৫ প্রকার গমকের পরিচয় এখানে দেওয়া হোল—

১। তিরিপ—ছোট ডমরুর মতো সুন্দর স্বরকম্পন যা দ্রুতমাত্রার এক চতুর্থাংশ বেগে প্রয়োগ করা হয়। যেমন, সসসসা, রেরেরেরে, গগগগ ইত্যাদি।

২। স্ফুরিত—দ্রুতমাত্রার এক তৃতীয়াংশ বেগে প্রয়োগ করা হয়। যেমন, সসসা, রেরেরে, গগগ ইত্যাদি।

৩। কম্পিত—দ্রুতমাত্রার অর্ধাংশ বেগে প্রয়োগ করা হয়। যেমন, সসা, রেরে, গগ ইত্যাদি।

৪। লীন— দ্রুতমাত্রার সমান বেগে প্রয়োগ করা হয়। যেমন, সা, রে, গ ইত্যাদি।

৫। আন্দোলিত—লঘুমাত্রার বেগে কম্পিত হয়। যেমন, সা-, রে-, ইত্যাদি।

৬। বলি— বক্ররূপে এবং বেগে প্রয়োগ করা হয়। যেমন, সসসা, গগগ, পপ রেরে গগগ রেসা ইত্যাদি।

৭। ত্রিভিন্ন—যে কম্পন ত্রিসপ্তকেই অবিশ্রান্ত গতিসম্পন্ন। যেমন, পপপ, র্সর্সর্সা, নিনিনি ধধধ গগগ রেরেরে ধ়্ধ়্ধ়্ নি়্নি়্ সসা ইত্যাদি।

৮। কুরুল— এটি বলির মতো বক্র কিন্তু গ্রন্থিযুক্ত। যেমন, সসসা গগগ রেগরেগরে গগগ মমম ধপধপম গগগ রেগরেগরেসা ইত্যাদি।

৯। আহত—অগ্রগামী স্বরের ভিত্তিতে যে কম্পন প্রয়োগ করা হয়। যেমন, গরে মগ পম ধপ ইত্যাদি।

১০। উল্লাসিত—যে কম্পন ক্রমানুসারে প্রয়োগ করা হয়। যেমন, সা রে গ ম প ধ নি ইত্যাদি।

১১। প্লাবিত—প্লুতমাত্রার কম্পন। যেমন, সা- -, রে- -, গ- - ইত্যাদি।

১২। গুম্ফিত—যে কম্পন হুংকারযুক্ত ও গম্ভীর। যেমন, গসা পমগ। গ থেকে প পর্যন্ত দীর্ঘ ও গম্ভীর মীড়যুক্ত হয়।

১৩। মুদ্রিত—মুখ বন্ধ করে যে কম্পন প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ গুন্‌গুন্ শব্দে নিষ্পন্ন হয়।

১৪। নামিত—অবরোহক্রমে যে কম্পন উচ্চারিত হয়। যেমন সনি নিধ ধপ পম ইত্যাদি।

১৫। মিশ্রিত—কয়েক প্রকার গমকের মিশ্রণে রচিত হয়। যেমন, সসসা গগগ রেরে মম পপ রে রে নি ধ প ম গগ রেরে সসা ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে স্বরসমূহ গম্ভীর কম্পন সহযোগে উচ্চারণ করাকেই গমক বলে।

কৃন্তন কাটনা ঃ সেতারাদি ততযন্ত্রে আঙুলের কৌশলে দুই বা ততোধিক পরস্পর ভিন্নতাযুক্ত স্বরোৎপাদনের প্রক্রিয়াকে কৃন্তন বা কাটনা বলা হয়। তর্জনী ও মধ্যমা, তারের দুটি স্বরস্থানে (সারিকা) রেখে মিজরাবের আঘাতে যে স্বরোৎপাদন হয়, তার রেশ থাকাকালীন মধ্যমার সাহায্যে তারটিকে বাইরের দিকে টেনে চট্ করে ছেড়ে দিলে উক্ত দুই বা ততোধিক স্বরোৎপন্ন হয়।

আঁস/সূত ঃ ততযন্ত্রে একটি স্বর বাজিয়ে তার রেশ থাকাকালীন তারের উপরে আঙুল ঘসে অন্য স্বর বাজানোকে আঁস বা সুত বলা হয়। কণ্ঠসংগীতের মীড়কেই যন্ত্র সংগীতে আঁস বলে এবং পর্দাযুক্ত যন্ত্রে যাকে আঁস বলে পর্দাহীন যন্ত্রে তাকেই সূত বলে। আশ শব্দের নামান্তর হোল "ঘষিট"।

ঝালা ঃ চিকারী ও বোলতাব একসঙ্গে 'ডা রা রা রা' এইরূপ দ্রুত অবিশ্রান্তভাবে বাজানোকে ঝালা বলা হয়। ঝালা বাজানোর সময়ে রাগ বিশেষের মুখ্য কয়েকটি স্বর-যুক্ত বিস্তার পশ্চাতপটের মতো বিরাজিত থাকে। যাবতীয় যন্ত্রসংগীতে ঝালা একটি মহত্বপূর্ণ অঙ্গ। গতের শেষভাগে ঝালা বাজানো হয়। এই অংশে শিল্পী দ্রুততম গতিতে বাজিয়ে তাঁর সাধনা-লব্ধ দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকেন। যন্ত্রের মতো কণ্ঠসংগীতেও 'তা না না না' প্রভৃতি বাণীর সাহায্যে ঝালা গাওয়ার প্রচলন আছে।

ছুট্ ঃ কোন স্বর থেকে কয়েকটি স্বর লংঘন কবে কোন স্বরোচ্চারণ করাকে ছুট বলে। যেমন সা-গ, সা-প, সা-র্সা ইত্যাদি।

গিটকারী ঃ গিটকারী একপ্রকার অলংকার। সহজ ও সগমক এই দুই প্রকার গিটকারী প্রচলিত আছে। কয়েকটি স্বর একসঙ্গে দ্রুত উচ্চারণ করাকে গিটকাবী বলে।

পাল্টা ঃ কণ্ঠসাধনার জন্য যে সকল স্বরবিন্যাস রচিত, তাদের পাল্টা বলে।

মানৃঝা ঃ তত যন্ত্রাদিতে যে গৎ বাজানো হয় তার প্রথম আবর্তনকে স্থায়ী ধাতু এবং দ্বিতীয় আবর্তনকে মানৃঝা বলে। এরপরে অন্তরা বাজানো হয়। স্থায়ী ও অন্তরার মধ্যবর্তী বলেই সম্ভবত এই নামকরণ হয়েছে।

তান ঃ

'তন্' থেকে তান শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ প্রস্তার বা বিস্তার। রাগবাচক নিবদ্ধ স্বরসমূহের দ্রুত বা টানা উচ্চারণকে তান বলে।

শুদ্ধ ও কূটতান ঃ তান মূলত দুই প্রকার :—শুদ্ধতান এবং কূটতান। ক্রমানুসারে স্বরসমূহের উচ্চারণকে 'শুদ্ধ' এবং ক্রম-লংঘন করে উচ্চারণকে কূটতান বলে।

বোল ও স্বরতান ঃ আধুনিক রাগসংগীতে এগুলিকে আবার দুই-ভাবে প্রয়োগ করা হয়, যেমন বোলতান ও স্বরতান।

যন্ত্রের তান ঃ গীতের বাণীর আশ্রয়ে উচ্চারিত তানকে 'বোলতান' এবং স্বর বা আকারাদি বর্ণের সাহায্যে উচ্চারিত তানকে স্বরতান বলে। যন্ত্র সংগীতে সমস্ত তানই বোল বা বাণীর সাহায্যে উচ্চারিত বা প্রকাশিত হয়, যাকে স্বরতান বলে, কিন্তু যে সকল তানে বাণী বা বোলের বৈশিষ্ট্য প্রাধান্যলাভ করে তাকে বোলতান বলা হয়।

প্রাচীন তান ঃ শাস্ত্রে একটি থেকে সাতটি স্বরযুক্ত তানের উল্লেখ আছে। এগুলিকে যথাক্রমে আর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তর, ঔড়ব, ষড়ব ও সম্পূর্ণ তান বলা হোত।

খণ্ডমেরু মীড়খণ্ড ঃ 'খণ্ডমেরু' নামে তান প্রস্তারের একটি বিশেষ নিয়মের উল্লেখ শাস্ত্রে করা হয়েছে, ওস্তাদ মহলে অনেকে ভ্রমবশত একে 'মীরখণ্ড' বলে থাকেন। এই প্রক্রিয়ায় স্বর সপ্তকের প্রস্তার করলে ৫০৪০ প্রকার প্রস্তার পাওয়া যায়। এইরূপে ষাড়ব ক্রমকে প্রস্তার করলে ৭২০, ঔড়ব ক্রমে ১২০, স্বরান্তর ক্রমে ২৪, সামিক ক্রমে ৬, গাথিক ক্রমে ২ এবং আর্চিক ক্রমে ১টি প্রস্তার পাওয়া যায়। শাস্ত্রে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর সপ্তকের মূর্ছনাগুলি নিয়ে শুদ্ধ ও কূটতানের সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে। শুদ্ধ তানের সংখ্যা খুবই কম, কিন্তু শাস্ত্রে প্রস্তার সংখ্যা নিরূপণকালে শুদ্ধ ও কূটতানের সংখ্যা একই সঙ্গে নিশ্চিত করা হয়েছে। যেমন ষড্‌জ ও মধ্যম গ্রামের ষাড়ব ও ঔড়ব শুদ্ধতান সংখ্যা মাত্র ৮৪টি এবং সম্পূর্ণতান দুই গ্রামে দুটি করে মোট ৮৮টি কিন্তু এই দুটি গ্রামের কূটতানের সংখ্যা (৩, ১৭, ৯২৭) তিন লক্ষাধিক। যদিও প্রাচীন ব্যবস্থাগুলি সবই বর্তমানে

উপযোগী নয়, কিন্তু 'খণ্ডমেরু' পদ্ধতিটি সর্বকালের জন্যই মহত্বপূর্ণ। তাই এই পদ্ধতিটি বোঝানোর জন্য 'সা রে গ ম' এই স্বরান্তর ক্রমটির প্রস্তার ব্যাখ্যা করা হোল :

প্রস্তার পদ্ধতি :

১। সা রে গ ম	৭। সা রে ম গ	১৩। সা গ ম রে	১৯। রে গ ম সা
২। রে সা গ ম	৮। রে সা ম গ	১৪। গ সা ম রে	২০। গ রে ম সা
৩। সা গ রে ম	৯। সা ম রে গ	১৫। সা ম গ রে	২১। রে ম গ সা
৪। গ সা রে ম	১০। ম সা রে গ	১৬। ম সা গ রে	২২। ম রে গ সা
৫। রে গ সা ম	১১। রে ম সা গ	১৭। গ ম সা রে	২৩। গ ম রে সা
৬। গ রে সা ম	১২। ম রে সা গ	১৮। ম গ সা রে	২৪। ম গ রে সা

শুদ্ধ স্বররূপ সহযোগে স্বরান্তর ক্রমে এই ২৪টি ছাড়া আর কোন প্রস্তার হতে পারে না। তবে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বররূপ সহযোগে তান প্রস্তার অনন্ত হতে পারে।

তান পরিচয় : অতঃপর বর্তমান রাগ সংগীতে প্রচলিত কয়েক প্রকার তানের পরিচয় দেওয়া হোল।

১। অচরক—সসা রেরে গগ মম পপ ধধ নিনি।

২। উত্তরতি—সঁনিসাঁ ধপধ গরেগ সা।

৩। উলটি—গম রেগ সরে নি়সা ধ়নি় প়ধ় ম়ধ় প়।

৪। কদমা (ফুলঝুরি)—সাঁরেঁসঁনি ধনিসঁরেঁসঁনি ধনিসঁরেঁ গঁরেঁসঁনি ধনিধনি গঁরেঁসঁনি।

৫। কম্পিত—গঁগঁগঁগঁ রেঁরেঁরেঁরেঁ সঁসঁসঁসা নিনিনিনি (গমকসহ উচ্চারিত হয়)।

৬। কোয়েল—সাগ গপ পনি নিসাঁ।

৭। খটক—সরেগগরেসা মমরেগরেসা পধপমরেগরেসা।

৮। খটকা—সরে রেগ গম পধ ধনি নিসাঁ সঁনি নিধ ধপ পম মগ গরে রেসা।

৯। গমকী—গঁগঁরেঁ নিনিধ মমগরেসা।

১০। গিটকারি—সারে সারে রেগ রেগ গম গম মপ মপ।

১১। চক্কর—সাগরেসা রেমগরে গপমগ মধপম।

১২। চড়তি—সারেসা গরেগ পধপ র্সা

১৩। জবড়ে—জোয়াল ও জিহ্বার সাহায্যে উচ্চারিত হয়।

১৪। জোড়—সসারেরে সসগগ রেরেগগ রেরেসসা।

১৫। ঝটকা—গগগ গগগ গগরেসা নি়সা।

১৬। ঝপক—সারেগম ধপমগরেসা (দ্বিতীয়ার্ধ দ্রুততর হবে)।

১৭। ডোলনা—র্সর্সা ধধ নিনি পপ ধধ মম পপ গগ মগরেসা।

১৮। পালটি—সরেগম মগরেসা গমপধ ধপমগ।

১৯। ফন্দা—নিনিধপমগরেসা র্সর্সা নিনিধপমগরেসা র্গর্গর্রের্সা নিধপম-গরেসা।

২০। ফিকরাবন্দী—পমগপমগ রেগ রেম রেগমপ পমপ মপমগ (অপ্রত্যাশিতভাবে বিস্তার করা হয়)।

২১। ফিরকৎ—সরেগমগরে গমপমগরে গমপধনিধপমগরে।

২২। বকরা—চাপা গলায়, পাঁঠার ডাকের মত উচ্চারিত হয়।

২৩। বলসপাট—ধনির্সার্রের্গর্রে ধর্গর্রের্সনিধপমগরেসা।

২৪। বিডার—সারেগ ধনির্সা পমগ র্রের্সনি র্গর্রের্সা প়ধ়নি়সা।

২৫। মীড়খণ্ডী—ধনির্সার্রে ধর্রেনির্সা নিধ র্সর্রে ধনির্রের্সা ধর্রের্সনি র্রের্সনিধ।

২৬। মূড়কী—র্সনির্রের্সনির্সা পমধপমপ গরেমগরেগ র্সনির্রের্সনির্সা।

২৭। লপক—সাগ রেম গপ মধ পনি ধর্সা।

২৮। লপেট—সরেগমগরে গমপধপম ধনির্সর্রের্সনি ধনিধপ মপমগ রেগরেসা।

২৯। লড়ন্ত—সমান লয়ে আরম্ভ করে ক্রমে থাড়ি কুয়াড়ী প্রভৃতি লয়ে প্রয়োগ করা হয়।

৩০। লড়ি—গরেগমপমগরে গমপগমগপমগরে গমগরে পমগরেসা।

৩১। লড়ি ফিরত—গমগরে মগরে মগরে গমগরে ধপমগরেসা।

৩২। লড়ি সপাট—র্সর্রের্গর্সর্রের্গ র্সর্রের্গর্মর্পর্মর্গর্রের্সনিধ পমগরেসা।

৩৩। সরোক—সারেগম রেগমপ গমপধ মপধনি।

৩৪। হলক—জিহ্বা ও কণ্ঠের সাহায্যে উচ্চারিত হয়।

৩৫। হাল্কা—নিধপমগরেসা ধপমগরেসা পমগরেসা মগরেসা গরেসা রেসা।

এগুলি ছাড়াও নানাপ্রকার তানের প্রচলন আছে। তাছাড়া, বিভিন্ন ঘরাণার তানের নাম অথবা স্বর রচনায় যে পার্থক্য থাকতে পারে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

দশ থাট থেকে উৎপন্ন রাগসমূহ :

বিলাবল : অলৈহাবিলাবল। আশা। ইমনীবিলাবল। কমলরঞ্জনী। ককুভ। গুণকলি। চন্দ্রিকা। চক্রধর। জয়রাজ। জলধর কেদার। দীপক। দুর্গা। দেবগিরিবিলাবল। দেশকার। নট। নট বিলাবল। নট বিহাগ। পটবিহাগ। পহাড়ি। পটমঞ্জরী। বিলাবল। বিহাগ। বেহাগড়া। ভবানী। ভিন্নষড্‌জ। মলুহাকেদার। মাণ্ড। রসরঞ্জনী। রসচন্দ্র। লচ্ছাসাখ। লাজবন্তী। শুক্লবিলাবল। শংকরা। সরপর্দা বিলাবল। হেমকল্যাণ। হংসধ্বনি।

ইমন : ইমন/কল্যাণ। ইমনকল্যাণ। কামোদ। কেদার। চন্দ্রকান্ত। ছায়ানট। জৈতকল্যাণ। নন্দ। ভূপালী। মারুবেহাগ। মালশ্রী। মালারাণী। রাজকল্যাণ। লক্ষ্মীকল্যাণ। বৈজয়ন্তী। শ্যামকল্যাণ। শুদ্ধকল্যাণ। শুক্লকল্যাণ। শ্রীকল্যাণ। সাবনীকল্যাণ। সাঁঝ কা হিন্দোল। হমীর। হিন্দোল।

কাফী : আভোগী। আভোগীকানাড়া। কাফী। গৌড়মল্লার। গৌড়সারং। চন্দ্রকোস। দেশাখ। ধনাশ্রী। ধানি। নটমল্লার। নায়কী কানাড়া। নীলাম্বরী। পটমঞ্জরী। পটদীপ। পিলু। প্রদীপকী। বহার। বরবা। বড়হংসসারং। বাগেশ্রী। বৃন্দাবনীসারং। ভীমপলশ্রী। মধ্যমাদসারং। মল্লার। মালগুঞ্জী। মিয়াঁকি সারং। মিয়াঁকি মল্লার। মীরামল্লার। মেঘমল্লার। রাগেশ্বরী। রামদাসী মল্লার। রেবতীকানাড়া। রেবা। শাহানা। শাহানা কানাড়া[১]। শিবরঞ্জনী। শুদ্ধসারং[২]। শ্রীরঞ্জনী। সামন্তসারং। সুরমল্লার। সুহামল্লার। সুহাকানাড়া। সিন্ধুড়া। হুসেনীকানাড়া। হংসকংকনী। হংসমঞ্জরী। সুঘরাইকানাড়া।

মারবা : জৈত। পুরিয়া। পূর্বা। পূর্বাকল্যাণ। পঞ্চম। ভটিহার।

প্র. ১ রূপমঞ্জরী।
২ লংকাদহন সারং।

ভংখার। মারবা। মালিন। মালিগৌরী। ললিত। বরাটি। বিভাস। সাজগিরী। সোহনী।

খমাজ ঃ কলাবতী। খমাজ। খম্বাবতী। খোকর। গারা। গোরখ-কল্যাণ। চম্পক। চম্পাকলি। জয়জয়ন্তী। ঝিঁঝিট। তিলককামোদ। তিলং। দুর্গা। দেশ। নাগস্বরাবলী। নাটকুরঞ্জিকা। নারায়ণী। রাগেশ্রী। শ্যামকেদার। সরস্বতী। সাজন। সোরট। হংসশ্রী।

পূরবী ঃ গৌরী। চন্দ্রকল্যাণ। জৈতশ্রী। টংকী। ত্রিবেণী। দীপক। পরজ। পূরবী। পুরিয়াধনাশ্রী। বসন্ত। মনোহর। মালবী। ললিতা-গৌরী। রেবা। শ্রী। শ্রীটংকী।

ভৈরব ঃ অরজ। অহীর ভৈরব। আনন্দ ভৈরব। কালংড়া। কৌসী-ভৈরব। গুণকেলী। গৌরী। জোগিয়া। ঝিলক। দেবরঞ্জনী। প্রভাত। বঙ্গালভৈরব। বিভাস। ভৈরব। মেঘরঞ্জনী। রামকেলী। ললিতপঞ্চম। শিবমতভৈরব। সাবেরী। সৌরাষ্ট্রটংক। হিজাজ।

আশাবরী ঃ আড়াণা। আভেরী। আশাবরী। আনন্দভৈরবী। কোমলদেশী। কৌসীকানাড়া। খট। গান্ধারী। গোপীবসন্ত। জৌনপুরী। জংলা। ঝিলক। দরবারী কানাডা। দেবগান্ধার। দেশী। সিন্ধুভৈরবী।

ভৈরবী ঃ উত্তরীগুণকেলী। বসন্ত মুখারী। বিলাসখানীতোডী। ভূপালতোড়ী। ভৈরবী। মালকোস। মোটকী।

তোড়ী ঃ অঞ্জনী তোডী। আশাতোড়ী। আশাবরী তোড়ী। গুর্জরী-তোড়ী। গৌরী তোড়ী। ছায়া তোডী। তোড়ী। বাহাদুরী তোড়ী। মুলতানী। লাচারী তোড়ী। লক্ষ্মীতোড়ী।

হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির মুখ্য নিয়মাবলী ঃ

(১) রাগসংগীতে কমপক্ষে পাঁচটি এবং সর্বাধিক সাতটি স্বর ব্যবহৃত হয়। এর ব্যতিক্রম কচিৎ দেখা যায়, যেমন চারটি স্বরযুক্ত 'মালশ্রী'।

(২) পাঁচ, ছয় ও সাতটি স্বর অনুসারে রাগের তিন প্রকার জাতি আছে, এগুলির আরোহণ অবরোহণ ও অদল-বদল করে (৩×৩=৯) সর্বাধিক নয় প্রকার জাতি হিন্দুস্থানী সংগীতে প্রচলিত।

(৩) যাবতীয় রাগ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম শ্রেণীর রাগে সর্বদা

রে ও ধ কোমল হয়। এগুলি সাধারণতঃ সন্ধিপ্রকাশ রাগ হয়ে থাকে। কারণ এগুলি প্রায়ই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ে গাওয়া হয়। ২য় শ্রেণীর রাগে সর্বদা রে ও ধ শুদ্ধ হয় এবং ৩য় শ্রেণীর রাগে গ ও নি সর্বদা কোমল হয়।

(৪) সাধারণতঃ কোন স্বরের দুটি রূপ কোন একটি রাগে ব্যবহৃত হয় না। এই নিয়মের কচিৎ ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন, দুটি মধ্যমযুক্ত কেদার, ললিত প্রভৃতি।

(৫) প্রতিটি রাগে বাদী, সমবাদী প্রভৃতি এবং রঞ্জকতা অপরিহার্য। রাগরূপী রাজ্যে বাদীস্বরকে রাজা এবং সমবাদী স্বরকে মন্ত্রীর আসন দেওয়া হয়েছে, তাই অনুরূপ প্রাধান্য দেওয়া হয়।

(৬) রাগ-রঞ্জকতা বৃদ্ধির জন্য বিবাদী স্বরের কিঞ্চিৎ প্রয়োগ শাস্ত্রে অনুমোদিত, কিন্তু তার জন্য রাগজ্ঞান, স্বরজ্ঞান, আত্মসংযম ও কুশলতার প্রয়োজন। অর্ধান্তর স্বরগুলিই সর্বদা বিবাদী হয়ে থাকে।

(৭) কড়িমধ্যম স্বরটি কখনও বাদীস্বর হয় না। তাছাডা কড়িমধ্যমের সঙ্গে কোমল নিষাদ কোন রাগে ব্যবহৃত হয় না।

(৮) রাগসংগীতে মধ্যম স্বরটি অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। তাই একে 'অদ্ধদর্শক স্বর' বলা হয়। অদ্ধদর্শক অর্থ পথপ্রদর্শক। কেবলমাত্র মধ্যমের রূপ পরিবর্তন করলেই প্রাতঃকালীন রাগ সায়ংকালীন এবং সায়ংকালীন রাগ প্রাতঃকালীন রাগে পরিবর্তিত হয়।

৯। সা, ম এবং প স্বরত্রয় উভয় অঙ্গেই বিদ্যমান, সুতরাং এদের কোনটি বাদীস্বর হলে সেই রাগের গায়ন সময় তথা অঙ্গপ্রাধান্য রাগ প্রকৃতি অনুযায়ী হয়ে থাকে।

১০। কোন রাগে 'সা' বর্জিত হয় না। তাছাড়া কোন রাগে 'ম' ও 'প' স্বর দুটি একসঙ্গে বর্জিত হয় না। কারণ প্রথমতঃ কোন দুটি পাশাপাশি স্বর বর্জিত হবার রীতি নেই, দ্বিতীয়তঃ বাদী-সমবাদীর মতোই ঔড়বজাতির বর্জিত স্বরদ্বয় নিশ্চিত হয়ে থাকে। তাছাডা ম ও প স্বরদ্বয় সপ্তকের দুটি অঙ্গের সেতুবিশেষ। সেদিক থেকেও এদুটি একসঙ্গে বর্জিত হলে অঙ্গহানির সম্ভাবনা আছে।

১১। সময়ের পরিবর্তন অনুযায়ী রাগ বদলের আবশ্যক হয়। তখন

এক থাটের রাগ শেষ করে অন্য থাটের রাগ গাওয়া হয়। সেই সন্ধিক্ষণে যে সকল ঐক্যপূর্ণ স্বরবিন্যাসযুক্ত রাগ গাওয়া হয় তাদের পরমেলপ্রবেশক রাগ বলে।

১২। রাগ সংগীতে কণস্বরকে অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ মানা হয়, কারণ কণ-স্বরের সাহায্যেই সমপ্রকৃতিক রাগগুলির স্বতন্ত্রতা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়।

১৩। রাগ বিস্তার কালে আবির্ভাব-তিরোভাব প্রদর্শনের জন্য বাদীস্বর ছাড়া অন্যান্য স্বরকেও কিছুক্ষণের জন্য প্রাধান্য দেওয়া হয়।

১৪। 'সা' থেকে 'প' পূর্বাঙ্গ এবং 'ম' থেকে তারসা উত্তরাঙ্গ, সপ্তকের এই দুটি অঙ্গ স্বীকৃত। বাদীস্বরের অবস্থিতি অনুসারে রাগকে পূর্ব বা উত্তর অঙ্গের বলা হয়। এই অঙ্গ অনুসারে গায়ন সময় নিশ্চিত হয়। পূর্বাঙ্গ রাগগুলি আরোহণে এবং উত্তরাঙ্গ রাগগুলি অবরোহণে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এই দুটি অঙ্গের রাগগুলি পরস্পরের 'জবাব' বলে কথিত। অবশ্য এইসকল ব্যাপার মনস্তত্ত্বগত ভিত্তিতে নিশ্চিত হয়েছে।

১৫। সাধারণতঃ শুদ্ধ রে, ধ যুক্ত রাগগুলি ১ম শ্রেণীর রাগের পরে গীত হয় এবং কোমল গ্‌, নি্‌ যুক্ত রাগগুলি দিবা ও রাত্রি দ্বিপ্রহরে গীত হয়।

১৬। সাধারণতঃ দিবা এবং রাত্রি ১২টার পরে গেয় রাগগুলির সা ম ও প স্বরত্রয় প্রবল হয়।

১৭। সাধারণতঃ প্রাতঃকালীন রাগের কোমল রে্‌ ধ্‌ এবং সায়ংকালীন রাগের শুদ্ধ গ নি স্বরগুলি প্রবল হয়ে থাকে।

১৮। দুই মধ্যমযুক্ত রাগের আরোহে নি এবং অবরোহে গ বক্র হয়ে থাকে এবং অন্তরাতেও ঐক্য থাকে।

১৯। উত্তর ভারতীয় সংগীতে মিশ্রণ প্রচলিত কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে মিশ্রণ অপ্রচলিত।

২০। উত্তর ভারতীয় সংগীত মীড় প্রধান হয়, তাছাড়া তাল অপেক্ষা রাগকে প্রাধান্য দেওয়া হয় কিন্তু কর্ণাটক সংগীতে রাগ অপেক্ষা তালকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়।

মসীদ খানি বাজ : কথিত আছে, সেতারাদি যন্ত্রে যে সকল গৎ-তোড়া প্রভৃতি বাজানো হয় তার স্রষ্টা হোল তানসেনের পুত্র বংশীয় মসীদ খাঁ। তাই এর নাম মসীদখানি বাজ। একে পশ্চিমী বা পছাও-কা-

বাজও বলা হোত। আমীর খসরু সৃষ্ট বলে কথিত বাদন পদ্ধতির সংস্কার সাধন করে তিনি এই বাদন ধারার প্রবর্তন করেন এবং পুত্র বাহাদুর খাঁকে (সেন ?) শিক্ষা দেন। এর থেকেই পরবর্তীকালে জয়পুর ঘরাণার সৃষ্টি হয়েছে এইরূপ শোনা যায়।

এই বাদন পদ্ধতি বিলম্বিত খেয়ালের আদর্শে রচিত এবং সহজ ও সরল জোড, তোড়া, তান, বিস্তার প্রভৃতি নিয়ে খেয়ালের রীতিতেই অনুষ্ঠিত হোত। এর সঙ্গে তবলার সঙ্গত ছিল বাহুল্য বর্জিত। ইতিপূর্বের আমীর খসরু প্রবর্তিত বাদন পদ্ধতি ছিল আরো সহজ-সরল তথা একটি মাত্র তুকযুক্ত।

মসীদ খাঁই সম্ভবত সেতারে আরো তিনটি তার যুক্ত করেন। তবে তখন পর্যন্ত চিকারী বা তরফের তারটি সংযুক্ত হয় নি। ওটি আরো পরবর্তীকালে, 'সুরবাহার'[১] যন্ত্রটি সৃষ্টি হওয়ার পরে সংযুক্ত হয়েছিল।

রেজাখানি বাজ ঃ অনেকে মনে করেন যে মসীদ খাঁ'র শিষ্য গোলাম রেজা এই বাজের প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদও আছে, কারণ কারো মতে মসীদ খাঁ স্বয়ং তাঁর প্রিয় শিষ্যের জন্য এই বাদন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন।

রেজাখানি বাজ তরাণার অনুকণে সৃষ্ট। বিবিধ যুক্ত বোলের প্রাধান্যই এতে বেশী। মসীদ খানির মতো সহজ সরল নয়, তবে এই দুটি বাদন-ধারাকে এক অন্যের পরিপূরক বলা যায়। কারণ বিলম্বিতের পরে দ্রুত খেয়ালের মতো মসীদখানির পরে রেজাখানি গৎ বাজানোর রীতি ছিল। যা এখনও প্রচলিত আছে। গোলাম রেজার বংশধর ও শিষ্যগণ পরে দিল্লী থেকে পূর্বাঞ্চলে এসে বসবাস সুরু করেছিলেন বলে একে পূর্বী বাজও বলা হয়।

ইমদাদখানি বাজ ঃ সুপ্রসিদ্ধ ইমদাদ খাঁ খেয়াল ও ধ্রুপদের অথবা মসীদখানি ও রেজাখানির মিশ্রণে তথা বারোটি অঙ্গ সংযুক্ত করে পূর্ববর্তী বাজের আমূল সংস্কার সাধন করে ইমদাদখানি বাদন ধারার প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ যন্ত্র সংগীতে ইনি এক নবযুগের স্রষ্টা। ঝালার প্রাধান্য এঁরই

১ বাদ্যশাস্ত্র পরিচ্ছেদে সুরবাহার ও সেতার দ্রষ্টব্য।

অনবদ্য অবদান। এই সকল নবীনতা ইনি সুর বাহারেও প্রবর্তন করেছিলেন। বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে ইমদাদখানি বাজ প্রচলিত, যা বিগত অর্ধ শতাব্দীরও অধিক সময়কাল থেকে প্রবাহিত আছে।

সংগীত ও রসঃ মানব-হৃদয়ের বহু বিচিত্র চিন্তাধারার পরমোৎকর্ষ-সাধনেই রসের উৎপত্তি। কোন বিষয়কে সামান্য পরিবর্তিতরূপে কল্পনা করলে যেমন ভাবান্তর বা হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় তেমনি বিচিত্র নবীনতারও সৃষ্টি হয়, সেই পরিণতিকেই বলা হয় রস। পক্ষান্তরে কোন বাহ্যবস্তু বা গুণের আস্বাদনে, দেহ বা চিত্তের যে ভাবান্তব উৎপন্ন হয়, তাই রস।

নাট্যশাস্ত্রকার রসের সঙ্গে ভাবের জন্য-জনক বা কার্য-কারণ সম্বন্ধ বলে উল্লেখ করেছেন :

যথা বীজাদ্ভবেদ্বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং যথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতা॥

অর্থাৎ, বীজের সঙ্গে বৃক্ষ বা বৃক্ষের সঙ্গে ফুল তথা ফলের মতো, রসের সঙ্গে ভাবের সম্পর্ক। তিনি বলেছেন, রস আট প্রকাব : "চেত্যষ্টৌ নাট্যেবসাঃ", আদি আচার্য ব্রহ্মাও যে আট প্রকার রস স্বীকার করতেন সে কথারও তিনি উল্লেখ করেছেন : "এতে হ্যষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা দ্রুহিণেন মহাত্মনা"। রামায়ণকার মহর্ষি বাল্মীকিও আট প্রকার রসের উল্লেখ করেছেন :—

রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্য রৌদ্রভয়ানকৈঃ।
বীরাদিভিঃ রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্॥

অর্থাৎ, খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ট-৫ম শতকে ভারতীয় সমাজে মাত্র আটটি রসেরই প্রচলন ছিল। শান্ত রসকে নবম রস হিসাবে সম্ভবত খৃষ্টীয় ৫ম শতকের কিছু পূর্বে গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীকালে শান্ত রসকে চিত্তের স্বাভাবিক অবস্থা মনে করে কেহ কেহ আট প্রকাব রসই স্বীকার করেন। কেহ কেহ বাৎসল্য-ভাবকে রসের অঙ্গীভূত করে দশ প্রকার রস স্বীকার করেন। আবার কেহ কেহ ভক্তি, স্নেহ ও লৌল্য এই তিনটিকেও রসের অন্তর্ভুক্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

তবে রস নয়টি, এই অভিমতই অধিক সমর্থিত। ভরতের অনুগামী পরবর্তী শাস্ত্রী সংগীতরত্নাকর রচয়িতা পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব নবরসের ভাবগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন :

	রস	স্থায়ীভাব	সঞ্চারীভাব	অনুভাব	বিভাব
১	শৃঙ্গার বা আদিরস	রতি বা অনুরাগ	চিন্তা, শ্রম, ঔৎসুক্য, গ্লানি ইত্যাদি	কটাক্ষ, ওষ্ঠদংশন, ভ্রূজান্দোলন ইত্যাদি	মধুঋতু, পুষ্পোদ্যান, নৃত্যগীতি, চিত্রদর্শন ইত্যাদি
২	হাস্য	হাস	.	নেত্র, কপোল বা ওষ্ঠাধারের কম্পন, দৃষ্টি কুঞ্চন বা দৃষ্টি নিমীলন	অন্যের অনুকরণ, অরুচি, নির্লজ্জতা, কপটতা অসংগত-বাক্য ইত্যাদি
৩	করুণ	শোক	মোহ, ভয়, দীনতা, বিষাদ, স্বরভঙ্গ ইত্যাদি	অশ্রুপাত, পবিবেদনা, বিবর্ণতা, শ্বাস, উচ্ছ্বাস, মস্তকে বা বক্ষে করাঘাত ইত্যাদি	বিপদ, অনর্থ, দেশান্তবিত, আত্মীয়-বিয়োগ ইত্যাদি
৪	রৌদ্র	ক্রোধ	আবেগ, উৎসাহ, চপলতা, রোমাঞ্চ ইত্যাদি	ভ্রুকুটি, হস্তনিষ্পেষণ, দন্ত ও ওষ্ঠপীড়ন ইত্যাদি	হিংস্রভাব সম্পন্ন জীব, আচার ও বিদ্যার নিন্দা
৫	বীর	উৎসাহ	উগ্রতা	ত্যাগ	নীতি, বিনয়, কীর্তি, দুর্ধর্ষতা ইত্যাদি
৬	ভয়ানক	ভয়	দৈন্য, শংকা, মোহ, ত্রাস, মৃত্যু ইত্যাদি	দুশ্চিন্তা, নয়ন, হস্ত বা পদাদিব কম্পন ইত্যাদি	ভীষণাকৃতি ব্যক্তি বা জন্তু দর্শন, বিকৃত ধ্বনি শ্রবণ ইত্যাদি
৭	বীভৎস	ঘৃণা	ব্যাধি, মোহ ইত্যাদি	ওষ্ঠ, নাসাদি কুঞ্চন, বিশৃঙ্খল পদক্ষেপ ইত্যাদি	অপ্রিয় বা নিষিদ্ধবস্তু, আত্মতৃপ্তি হেতু অরুচিকর বস্তু ইত্যাদি
৮	অদ্ভুত	বিস্ময়	স্তম্ভ, স্বেদ, সম্ভ্রম, রোমাঞ্চ ইত্যাদি	নয়নবিস্তার, নির্নিমেশ-দৃষ্টি, আনন্দকোলাহল, হর্ষ ইত্যাদি	দুর্লভ বস্তুব প্রাপ্তি, আকাশচারী বা ইন্দ্রজাল প্রভৃতি দর্শন
৯	শান্ত	তত্ত্বজ্ঞান জনিত বৈরাগ্য	পরমানন্দোদ্ভূত মত্ততা, স্মৃতি, হর্ষ ইত্যাদি	তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক আলাপ, দৃষ্টিনাসাগ্রে স্থাপন, মোক্ষশাস্ত্রের অর্থচিন্তা ইত্যাদি	সংসারভীরুতা, বিষয়-দোষ দর্শন, তীর্থ-ভ্রমণ ইত্যাদি

রাগ সংগীত যে নানা রসের অভিব্যক্তিপূর্ণ এবং ষড়্জাদি স্বরগুলি যে রসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ভরতমুনি সেকথার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। লৌকিক স্বরগুলির নির্দিষ্ট পরিচয়ে তিনি বলেছেন :

হাস্যশৃঙ্গারয়োঃকার্যৌ স্বরৌ মধ্যমপঞ্চমৌ।
ষড় জর্ষভৌ চ কর্তব্যৌ বীররৌদ্রাদ্ভুতেষথ॥

গান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ কর্তব্যৌ করুণে রসে।
ধৈবতশ্চ প্রযোক্তব্যো বীভৎসে সভয়ানকে॥

অর্থাৎ, ম ও প হাস্য ও শৃঙ্গার, সা ও রে বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত, গ ও নি করুণ এবং ধ বীভৎস ও ভয়ানক রসোৎপাদক স্বর। তিনি শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস এই চারটিকে প্রধান রস হিসাবে গ্রহণ করে এগুলি থেকেই অন্য সকল রসের উৎপত্তি বলে উল্লেখ করেছেন।

যদিও প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে প্রত্যেক স্বরকেই কোন না কোন রসের অন্তর্গত বলা হয়েছে, কিন্তু কোন একটি মাত্র স্বর রসোৎপাদনে সক্ষম কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। যেমন ষড়্‌জকে বীর এবং পঞ্চমকে শৃঙ্গার রসোৎপাদক বলা হয়েছে, অধিকাংশ রাগই এই স্বরদ্বয়-যুক্ত, তবে কি সব রাগই এই দুটি রসের অন্তর্গত? সুতরাং স্বরগুলি বিভিন্ন রসেব প্রতীক মাত্র, কারণ সহযোগী স্বর ছাড়া কোন একক স্বর, কোন প্রকার রস সৃষ্টি করতে পারে না।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তিন শ্রেণীর রাগে নবরসেব বিভাজন এইরূপে করেছেন। যেমন,

১ম শ্রেণীর কোমল <u>রে</u> <u>ধ</u> যুক্ত রাগে শান্ত ও করুণ রস,

২য় শ্রেণীর শুদ্ধ রে ধ যুক্ত রাগে শৃঙ্গার রস এবং

৩য় শ্রেণীর কোমল <u>গ</u> <u>নি</u> যুক্ত রাগে বীর রস উৎপন্ন করে থাকে।

পণ্ডিতজী শৃঙ্গার, বীর, করুণ ও শান্ত এই চারিটি রসেব মধ্যেই নবরসের সমাবেশ করেছেন। বলা বাহুল্য, সংগীত এবং ললিতকলার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর রসজ্ঞান অপরিহার্য।

নৃত্য ও রস : তাণ্ডব ও লাস্য ভেদে নৃত্য দুই প্রকার। শাস্ত্রে মহাদেব প্রচারিত বীর রসোদ্দীপক উদ্ধত ও উগ্র তাণ্ডব নৃত্যকে পুরুষের মাধ্যমে এবং উমা প্রচারিত শৃঙ্গার রসোদ্দীপক সুকুমার ও কোমল লাস্য নৃত্যকে নারীব মাধ্যমে অনুশীলনের বিধান দেওয়া হয়েছে। কথিত আছে, ভরতমুনি ঋষি তণ্ডুর কাছে তাণ্ডব নৃত্য শিখেছিলেন যা বর্তমান ভারত-নাট্যম নৃত্যের মাধ্যমে প্রবাহিত। আর উমা দ্বারকার গোপীগণকে এবং গোপীগণ সৌরাষ্ট্রের নারীগণকে লাস্য নৃত্য শিখিয়েছিলেন যা কথাকলি ও মণিপুরী নৃত্যের মাধ্যমে প্রবাহিত।

ভরতমুনি তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যে এমন প্রভেদ স্বীকার করেন নি। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই তিনি উভয় নৃত্যের বিধান দিয়েছেন। তিনি বিষম, বিকট

ও লঘু ভেদে নৃত্যকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর অনুগামী শাস্ত্রী পণ্ডিত শার্ঙ্গদেবও নৃত্যের তিনটি শাখা স্বীকার করেছেন। শাস্ত্রে তাণ্ডব নৃত্যকে বীর ও রৌদ্র এবং লাস্য নৃত্যকে শৃঙ্গার, করুণ ও শান্ত রসোদ্দীপক বলা হয়েছে।

বাদ্য/তাল ও রস ঃ বিভিন্ন তাল এবং তার লয়ভেদ অনুসারে বিচিত্র রসের সৃষ্টি হয় সেকথা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন 'বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ' গ্রন্থে আছে ঃ

তথা লয়া হাস্যশৃঙ্গারয়ো মধ্যমাঃ
বীভৎসভয়ানকয়োর্বিলম্বিতঃ
বীর রৌদ্রাদ্ভূতেষু চ দ্রুত॥

অর্থাৎ, বিলম্বিত লয়ে বীভৎস ও ভয়ানক, মধ্যলয়ে হাস্য ও শৃঙ্গাব এবং দ্রুত লয়ে রৌদ্র ও অদ্ভুত রস উৎপন্ন কবে। এই অভিমত বর্তমানে সংগীতেও স্বীকৃত।

রাগ প্রকাশ ঃ কোন নিশ্চিত স্বরবিন্যাসকে কোন বিশেষ নিয়মানুসারে, অর্থাৎ বাদী, সমবাদী, অল্পত্ব, বহুত্ব, স্পর্শস্বর ইত্যাদির প্রতি উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে গায়ন বা বাদন তথা রসোৎপাদন করলে তবেই তা রাগ সংগীতের পদবাচ্য হতে পাবে। প্রচলিত সংগীত পদ্ধতির বিধি বিধানাদি সম্পর্কে শিল্পী যে সজ্ঞান হবে সেকথা বলাই বাহুল্য। এছাড়া রাগ প্রকাশে শিল্পীর প্রতিভা এবং উপলব্ধির বিকাশ থাকা অবশ্য কর্তব্য। তবেই তা সাধারণের চিত্তাকর্ষক হবে। সর্বোপরি চাই সুমধুর কণ্ঠস্বব অথবা বিশেষ বাদন-বৈশিষ্ট্য, যার সাহায্যে উক্ত গুণাবলী তথা রাগ প্রকাশ সুষ্ঠু ও সুন্দর হবে।

স্বর সাধনা ঃ ভারতীয় সংগীত হোল কণ্ঠগীত প্রধান, কারণ বাদ্য ও নৃত্যেরও মুল আধার হোল গান। আর গানের প্রধান অঙ্গ হোল কণ্ঠস্বর। একথা অনস্বীকার্য যে কণ্ঠস্বর সুমধুর হওয়া বা না হওয়াতে শিল্পীর কোন হাত নেই, যেমন কোন সুন্দরীর নেই তার সৌন্দর্যে কোন কৃতিত্ব। তবে একথা সত্য যে সাধনার সাহায্যে কণ্ঠস্বরের যথেষ্ট উন্নতি সাধন সম্ভব। কারণ সংগীতে একেবারে অনুপযোগী কণ্ঠস্বর খুবই কম হয়ে থাকে। কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট করার জন্য কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রেখে স্বর সাধনা করলে মোটামুটি সুফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়, যেমন—

১। স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর সহযোগে স্বরোচ্চারণ।

২। স্বরের স্থিরতা এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ।

৩। অযথা চড়া সুরে (চিৎকার করে) স্বর-অভ্যাস না করা।

অনেকে অন্যের অনুকরণ করতে গিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর বিকৃত করে থাকে যা অনুচিত। আবার অনেকে স্বরের স্থিরতার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই। স্বর অভ্যাসকালে অযথা তাড়াহুড়ো করে থাকে। অনেকের ধারণা খুব উঁচু স্থানে-স্বর-সাধনা করলে তাড়াতাড়ি স্বর সুমধুর হয়। এই ধারণা অভ্রান্ত নয়। বরং নিজস্ব কণ্ঠস্বরের উপযোগী আরম্ভিক স্বর (মধ্য ষড়্‌জ) নির্বাচন একটি মহত্বপূর্ণ বিষয়। উপযুক্ত নির্দেশাদির অভাবে কণ্ঠস্বর নষ্ট করার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

স্বরাভ্যাসকালে সর্বদা আ' কারের সাহায্যে স্বরোচ্চারণ করা উচিত এবং ক্রমে ই'কার, উ'কার, ও'কার প্রভৃতির অনুশীলন করা কর্তব্য। প্রারম্ভে খুব ধীর গতিতে এবং ক্রমে গতি পরিবর্তন করে স্বরাভ্যাস করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে গায়নকালে এই সকল প্রক্রিয়া হয়তো একেবারে অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে কিন্তু কণ্ঠস্বরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এর সার্থকতা অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে অধিক বলা বাহুল্য, কারণ কণ্ঠস্বরের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যানুসারে শিক্ষার্থী স্বয়ংই ক্রমে স্বরাভ্যাসের নানাবিধ নবীন পন্থার সন্ধান পেতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের দেশে কোন বিষয়েই প্রতিভা বিচার করে বিদ্যার্থী নির্বাচনের রীতি নেই। সংগীতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। অথচ কণ্ঠস্বর তথা অন্যান্য প্রতিভাদি বিচার করে তবেই তাকে উপযুক্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। কারণ সকলেই যেমন ধ্রুপদ, ধামার গাইতে পারে না, তেমনি খেয়াল, ঠুংরী গাওয়াও যথেষ্ট সাধনা সাপেক্ষ বিষয়। আবার টপ্পা গান তো আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সুতরাং এইসকল বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সচেতন থাকা কর্তব্য।

গায়কের গুণ ও দোষঃ পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী সুগায়কের পরিচয়ে 'লক্ষসংগীত' গ্রন্থে বলেছেন ঃ

সংগীতং মোহিনীরূপমিত্যাহুঃ সত্যমেব তত্।
যোগ্যরস ভাবভাষারাগ প্রভৃতিসাধনৈঃ॥
গায়কঃ শ্রোতৃমনসি নিয়তং জনয়েৎ ফলম্॥

অর্থাৎ, যোগ্য ভাব ভাষা রস প্রভৃতির উত্তম সাধনাসিদ্ধ গায়কের গানই মোহিনীরূপে শ্রোতাদের প্রভাবিত করতে পারে। গায়কের দোষ সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

ভাষাব্যক্তা হাবভাবাঃ প্রতীয়ন্তে বিসংগতা।
ব্যস্তাশ্চেষ্টাস্তথাক্রোশাঃ কেবলম্ কর্কশা মতাঃ॥
এতাদৃগ্‌গায়নান্নস্যাৎ পরিণামো হ্যভীপ্সিতঃ।
ততো হাস্যরসস্যৈব কেবলম্ স্যাৎ সমুদ্‌ভবঃ॥

অর্থাৎ, প্রথম থেকেই যদি হাত-পা ছোঁড়া, মুখ বাঁকানো, দাঁত বেরকরা ইত্যাদি কুঅভ্যাস রপ্ত হয়ে যায়, তাহলে সেগুলি ত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে, ফলে সংগীতসভায় হাস্যরস উৎপন্ন হয়।

পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সংগীতরত্নাকর' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন, যা শিক্ষার্থীর গোড়া থেকেই জেনে রাখা কর্তব্য। যেমন ঃ

গায়কের গুণ ঃ হৃদ্যশব্দঃ সুশারীরো গ্রহমোক্ষ বিচক্ষণঃ।
রাগ রাগাঙ্গ ভাষাঙ্গ ক্রিয়াঙ্গোপাঙ্গ কোবিদঃ॥
প্রবন্ধ গাননিষ্ণাতো বিবিধালপ্তিতত্ত্ববিৎ।
সর্বস্থানোচ্চগমকেষ্বনায়াসলসদ্ গতিঃ॥
আয়ত্তকণ্ঠস্তালজ্ঞঃ সাবধানোজিতশ্রমঃ।
শুদ্ধচ্ছায়ালগাভিজ্ঞঃ সর্বকাকুবিশেষবিৎ॥
অপারস্থায় সঞ্চারঃ সর্বদোষবিবর্জিতঃ।
ক্রিয়াপরোজস্রলয়ঃ সুঘটো ধারণান্বিতঃ॥
স্ফূর্জান্নির্জবনোহারিরহঃ কৃদভজনোদ্ধুরঃ।
সুসম্প্রদায়ো গীতজ্ঞৈর্গীয়তে গায়নাগ্রনীঃ॥

ভাবার্থ ঃ

হৃদ্যশব্দঃ=মধুর সুরেলা কণ্ঠস্বরযুক্ত গায়ক।
সুশারীরো=যে কণ্ঠস্বর অনায়াসে রাগরূপ ব্যক্ত করতে সক্ষম।
গ্রহমোক্ষবিচক্ষণঃ=গ্রহ, অংশাদি স্বর সম্বন্ধে যিনি বিচক্ষণ।
রাগরাগাঙ্গ···কোবিদঃ=রাগ, রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গাদি সম্বন্ধে যিনি জ্ঞানী।
প্রবন্ধগাননিষ্ণাতো=প্রবন্ধাদি গীতরীতি সম্বন্ধে যিনি সজ্ঞান।
বিবিধালপ্তিতত্ত্ববিৎ=যিনি বিবিধ আলপ্তি সম্বন্ধে বিচক্ষণ।
সর্বস্থানোচ্চ···গতিঃ=মন্দ্র, মধ্য, তার প্রভৃতি সর্বস্থানের গমক যিনি অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারেন।
আয়ত্তকণ্ঠস্তালজ্ঞঃ=যিনি আয়ত্বাধীন কণ্ঠস্বর তথা তালজ্ঞানের অধিকারী।

সাবধানো জিতশ্রমঃ=যিনি একাগ্রচিত্তে অক্লান্ত গাইতে পারেন।
শুদ্ধছায়ালগাভিজ্ঞঃ=যিনি শুদ্ধ, ছায়ালগ, সংকীর্ণাদি রাগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।
সর্বকাকুবিশেষবিৎ=যিনি সর্বপ্রকার কাকু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ।
অপারস্থায়সঞ্চারঃ=যিনি অসংখ্য স্বরবিন্যাস রচনায় শক্তিমান।
সর্বদোষবিবর্জিতঃ=যিনি নির্দোষ সংগীত পরিবেশনে সক্ষম।
ক্রিয়াপরোজস্ত্রলয়ঃ=যিনি যথালয়ে সংগীত ক্রিয়ায় সাধনা সিদ্ধ।
সুঘটোধারণান্বিত=যিনি কান্তিবান ও শিল্পোচিত জ্ঞানসম্পন্ন।
স্ফুর্জন্নির্জবনো=যিনি জলদ্‌গম্ভীর স্বরোচ্চারণে সক্ষম।
হারিরহঃক্লদভজনোদ্ধুরঃ=যিনি সহজেই শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে পারেন।
সুসম্প্রদায়ঃ=যিনি উচ্চশ্রেণীর গুরুপরম্পরায় শিক্ষালাভ করেছেন।
গীতজ্ঞৈর্গীয়তে গায়নাগ্রনীঃ=উক্ত গীতজ্ঞানী গায়কই সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃত।

গায়কের দোষ ঃ সংদষ্টোদ্‌ধৃষ্টসূৎকারিভীতশংকিতকম্পিতাঃ।
করালী বিকলঃ কাকী বিতালকরভোদ্বড়াঃ॥
ঝোম্বকস্তুম্বকী বক্রী প্রসারী বিনিমীলকঃ।
বিরসাপস্বরাব্যক্তস্থানভ্রষ্টাব্যবস্থিতাঃ॥
মিশ্রকোনবধানশ্চ তথান্যঃ সানুনাসিকঃ।
পঞ্চবিংশতিরিত্যেতে গায়কা নিন্দিতা মতাঃ॥

ভাবার্থ ঃ

সংদষ্টোদ্‌ধৃষ্টসূৎকারী=দাঁত চেপে নিরস চিৎকার করে গাওয়া।
ভীতশংকিতকম্পিতাঃ=ভীত শংকিত ও কম্পিতভাবে গাওয়া।
করালীবিকলঃকাকী=কাকের মতো কর্কশ কণ্ঠে হাঁ করে গাওয়া।
বিতালকরভোদ্বড়াঃ=তালভ্রষ্ট হওয়া এবং গলা উঁচু করে ভেড়ার মতো মুখ করে গাওয়া।
ঝোম্বকস্তুম্বকীবক্রী=গলার শিরা ও গাল ফুলিয়ে মুখ বাঁকিয়ে গাওয়া।
প্রসারীবিনিমীলকঃ=হাত-পা ছুঁড়ে বা চোখ বুঁজে গাওয়া।
বিরসাপস্বরাব্যক্ত=নীরস, রাগভ্রষ্ট তথা অশুদ্ধ উচ্চারণ সহযোগে গাওয়া।
স্থানভ্রষ্টাব্যবস্থিতাঃ=স্বরস্থানভ্রষ্ট তথা অব্যবস্থিতরূপে গাওয়া।
মিশ্রকোনবধানশ্চ=অন্যমনস্কভাবে রাগের শুদ্ধতা রক্ষা না করে গাওয়া।
তথান্যঃ সানুনাসিকঃ=তথা নাকি সুরে গাওয়া।

পঞ্চবিংশতি···মতাঃ=এই পঁচিশ প্রকার দোষ যাদের আছে তারা সংগীত-সমাজে নিন্দিত হয়ে থাকে।

উপরোক্ত গুণ ও দোষগুলি সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রথম থেকেই সচেতন থাকা কর্তব্য।

কাকু ঃ মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশের জন্য কণ্ঠের স্বরের যে বিচিত্রতা প্রকাশ পায় তাকে কাকু বলে। কাকুর আভিধানিক অর্থ হোল বিকৃত কণ্ঠ-ধ্বনি। নাট্যশাস্ত্রকার কাকুর প্রকার ভেদেব বর্ণনায় বলেছেন ঃ সাকাঙ্খা ও নিরাকাঙ্খা ভেদে কাকু দুই প্রকার। অনিযুক্ত বাক্য সাকাঙ্খ এবং নিযুক্ত বাক্য নিরাকাঙ্খ। লয়েব গতিভেদে এব রস সৃষ্টিব বর্ণনায় ভরত বলেছেন ঃ

হাস্যশৃঙ্গারকরুণোধিষ্টা কাকুর্বিলম্বিতা।
বীররৌদ্রাদ্ভুতেষুচ্চা দীপ্তা চাপি প্রশস্যতে॥
ভয়ানকে সবীভৎসে দ্রুতা নীচা চ কীর্তিতা।
এবং ভাবরসোপেতা কাকুর্যোজ্যা অযোক্তৃভিঃ॥ ৮

অর্থাৎ বিলম্বিত-কাকুতে হাস্য, শৃঙ্গার ও করুণ বস, উচ্চ ও দীপ্তা-কাকুতে বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রস এবং নীচু ও দ্রুত কাকুতে ভয়ানক ও বীভৎস রসাদির প্রকাশ পায়। এর উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে বলেছেন ঃ "উরসঃ শিবসঃ কণ্ঠাৎ স্বরঃ কাকুঃ প্রবর্ততে"। অর্থাৎ উরঃ, শির ও কণ্ঠ এই তিনস্থান থেকেই কাকুস্বর নির্গত হয়।

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কাকুব ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ "ভিন্নকণ্ঠধ্বনির্ধীরে কাকুরিত্যভিধীয়তে"। অর্থাৎ কণ্ঠ তথা উচ্চারণ ভেদে ধ্বনিব যে ভেদ বা ভিন্নতা হয় তার নাম কাকু।

এ সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেবের বিবৃতি ক্ষুদ্র অথচ স্পষ্ট, তিনি বলেছেন ঃ "কাকুধ্বনের্বিকারঃ"। তিনি আবার ছয়প্রকার কাকুর বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

ছায়াকাকু ষটপ্রকারা স্বররাগান্যরাগজা।
স্যাদ্দেশক্ষেত্রয়ন্ত্রানাং তল্লক্ষণমথোচ্চতে॥ ১

অর্থাৎ স্ববকাকু, রাগকাকু, অন্যরাগকাকু, যন্ত্রকাকু, দেশকাকু ও ক্ষেত্রকাকু, এই ছয়প্রকার কাকু।

স্বরকাকু॥ শ্রুতির সামান্য কমবেশী করে অন্যান্য স্বরের ছায়া প্রদর্শন করাকে স্বরকাকু বলে।

রাগকাকু ॥ রাগ-বিশেষের মুখ্য ছায়াকে রাগকাকু বলে।

অন্যরাগকাকু ॥ অন্য কোন রাগের ছায়া প্রদর্শন করাকে অন্যরাগকাকু বলে।

যন্ত্রকাকু ॥ বিভিন্ন যন্ত্রের নিজস্ব ধ্বনিই সেই যন্ত্রের কাকু। কারণ এর সাহায্যেই আমরা কানে শুনেই ধ্বনিটি কোন যন্ত্র নিঃসৃত বুঝতে পারি।

দেশকাকু ॥ রাগের প্রকৃতি বা দেশ ছাড়া অন্য কোন রাগের সাহায্য না নিয়ে সংগীত প্রদর্শন করাকে দেশকাকু বলে। বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বর রচনা বিশেষকেও দেশকাকু বলা যায়।

ক্ষেত্রকাকু ॥ রাগের অবয়বকে (ধাতু) ক্ষেত্র বলে। গাইবার সময়ে ক্ষেত্রবিশেষের যে বিভিন্ন রূপ লক্ষিত হয় তাকে ক্ষেত্রকাকু বলে। এখানে বিভিন্ন পরিবেশ বা অবস্থার সুরবিশেষও হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে কাকু থেকেই সংগীতের উৎপত্তি বলা যায়। সংগীতশিল্পী ও অভিনেত্রীবর্গের সফলতা কাকুর পরেই নির্ভরশীল। কারণ আমাদের হৃদয়াবেগের প্রকাশ কণ্ঠস্বরে অদ্ভুতভাবে প্রতিফলিত হয়। এমনকি পশুপক্ষীর ধ্বনিতেও কাকুর প্রকাশ লক্ষিত হয়। যেমন রাত্রে তস্করাদি দেখে যখন কোন কুকুর ডাকে তখন তার ধ্বনিতে যে কঠোরতা এবং ভয়ংকরতা থাকে অন্যসময়ে তেমন থাকে না। বরং সেই কুকুরই যখন তার প্রভুর সঙ্গে বেড়াতে যেতে চায় তখন তার ধ্বনিতে আবেদনপূর্ণ বিনয় এবং বিবশতা প্রকাশ পায়।

অতএব সংগীতে কাকু অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। কাকুর সাহায্যেই সংগীতে মাধুর্য ও স্নিগ্ধতা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন রস সৃষ্টি সম্ভবপর হয়।

সারণাচতুষ্টয় : সারণা অর্থ চালনা। স্বরের সর্বাধিক শ্রুতিসংখ্যা ৪টি হওয়ায় ৪ বারের বেশী সারণা নিষিদ্ধ। নামকরণের এটাই সম্ভবতঃ অন্যতম কারণ। সারণাচতুষ্টয় প্রক্রিয়ার উদ্ভাবক মহর্ষি ভরত এর সাহায্যে নির্ণয় ও প্রমাণ করেছেন যে, একটি সপ্তকে মোট ২২টি শ্রুতি আছে।

তিনি ষড়্‌জগ্রামের সুরে বাঁধা দুটি সমান আকারের বীণা এই কার্যে ব্যবহার করেছেন। এই বীণাদ্বয়ের একটি ধ্রুব বা অচলবীণা এবং অন্যটি অধ্রুব বা সচলবীণা। এর একটিকে ষড়্‌জগ্রামের সুরে অচল রেখে অপরটির সুর পরিবর্তন করে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, ধ্রুববীণাকে অপরিবর্তিত রেখে চলবীণার তার শিথিল করে শ্রুতি কমাতে থাকলে চারবারে মন্দ্রনিষাদ

ধ্বনিত হবে। তবে এই একশ্রুতি করে কমানো খুব সহজ কাজ নয়। কারণ শ্রুতির পরিমাপ সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেন নি। সম্ভবতঃ এবিষয়ে তিনি তাঁর শিষ্য বা অনুগামীদের সজ্ঞান বলে ধরে নিয়েছেন। অবশ্য পক্ষান্তরে তিনি এক শ্রুতি নির্ণয়প্রণালীর ব্যাখ্যায় প্রমাণশ্রুতির উল্লেখ করেছেন। তবে এই প্রমাণশ্রুতি কিন্তু নিয়ামক পরিমাপ নয়। অর্থাৎ প্রতিটি শ্রুতি যে প্রমাণশ্রুতির সমান-মূল্য-যুক্ত, এমন কথা তিনি বলেন নি। পরবর্তী শার্ঙ্গদেব প্রমুখ বহু শাস্ত্রী প্রমাণশ্রুতির ঐরূপ ব্যাখ্যা করায় বিষয়টি জটিলতাপূর্ণ হয়ে পড়েছিল, (শ্রুতি দ্রষ্টব্য)।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভরত ও শার্ঙ্গদেবের উক্ত প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যাতে পার্থক্য শুধু এই যে ভরত বীণাদ্বয়ে সাতটি করে তার ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু শার্ঙ্গদেব বাইশটি।

প্রথমেই ভরত বলেছেন যে, ষড়্জগ্রামের পঞ্চমকে একশ্রুতি অপকর্ষ (নীচু) করলে মধ্যমগ্রাম উৎপন্ন হয়।

প্রমাণশ্রুতি ঃ এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ

মধ্যমগ্রামে শ্রুত্যপকৃষ্টঃ পঞ্চমঃ কার্যঃ।
পঞ্চমস্য শ্রুত্যৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং যদন্তরং
মার্দবাদায়তত্বাদাতাবৎ প্রমাণশ্রুতি॥

অর্থাৎ, মধ্যমগ্রামে পঞ্চমকে তিনশ্রুতি সম্পন্ন করতে হবে। এই একশ্রুতি নামানো থেকে মধ্যমগ্রামের পঞ্চমকে এবং একশ্রুতি ওঠানো থেকে ষড়্জগ্রামের পঞ্চমকে পাওয়া যাবে, এবং এটাই একশ্রুতি নির্ধারণের পক্ষে পরিমাপ-বিশেষ বা প্রমাণশ্রুতি।

এখানে বিশেষ করে লক্ষণীয় যে, এত স্বরের মধ্যে প্রথমেই তিনি পঞ্চমকে একশ্রুতি কমাতে বললেন কেন? আর কেনই বা সেই একশ্রুতিকে প্রমাণশ্রুতি বলে উল্লেখ করলেন? সারণাচতুষ্টয় প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি হোল এইখানে। আমরা জানি যে, চার শ্রুতিযুক্ত সা, ম, প স্বরত্রয় বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ, যা অতি প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত। কিন্তু এর থেকে নাট্যশাস্ত্রকার পঞ্চমকেই কেন সারণার প্রথম ক্রিয়াতে নির্বাচন করলেন? এর একটি বিশেষ কারণ আছে। যা পর্যালোচনা করলে এই প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিকতার প্রতি নিশ্চিত আস্থা স্থাপন করা যায়।

মনে রাখতে হবে যে, সেই যুগে স্বর-পরিমাপের কোন যন্ত্রাদি ছিল না। তাছাড়া শ্রুতিরও কোন নির্দিষ্ট পরিমাপ বা আধার ছিল না। সুতরাং এই প্রক্রিয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছিল অসম্ভব। ভারতীয় সংগীতে স্বর-সংবাদ তত্ত্বের একটি মহত্বপূর্ণ স্থান আছে। এই সংবাদ-তত্ত্বের প্রধান হোল ষড়্জপঞ্চমভাব-সংবাদ, যার ভিত্তিতে ষড়্জগ্রাম রচিত। এর আর একটি হোল ষড়্জমধ্যম-ভাব-সংবাদ, যার ভিত্তিতে মধ্যমগ্রাম রচিত। সারণা প্রক্রিয়ায় এই দুটি সংবাদ-তত্ত্বের ভিত্তি অপরিহার্য। এবিষয়ে মোটামুটি ধারণা জন্মালে সারণা-প্রক্রিয়া সহজবোধ্য হবে। এই প্রক্রিয়ার আর একটি অপরিহার্য বিষয় হোল 'গ্রাম'। তাই ভরত গ্রামের মাধ্যমে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন।

সাবণা প্রক্রিয়ার প্রারম্ভে যখন শ্রুতিব কোন নিশ্চিত পরিমাপ জানা নেই, তখন স্বর সপ্তকের মধ্যে পঞ্চমই একমাত্র স্বর যাকে সংবাদ তত্ত্বানুসারে একশ্রুতি অপকর্ষ করা সম্ভব। এই এক শ্রুতির পরিমাপ কি? আর কেমন করেই বা তা নির্ণয় করা সম্ভব? এর উত্তর হোল এই যে, পঞ্চমকে ততটুকুই নীচু করতে হবে যাতে সে ধ্রুববীণার ঋষভের সঙ্গে ষড়্জমধ্যমভাবের সংবাদ করবে। এইরূপে প্রথম সারণার পরে, ষড়্জের সঙ্গে মধ্যমের যে দূরত্ব, ধ্রুববীণার ঋষভের সঙ্গে চলবীণার পঞ্চমের সেই দূরত্ব স্থাপিত হবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সারণার পথ ঐ একশ্রুতির সাহায্যে সুগম হয়ে পড়বে। এই অপকর্ষ একশ্রুতিকে ভরত প্রমাণশ্রুতি বলেছেন। এখন এই অপকৃষ্ট পঞ্চমের সাহায্যে (ভিত্তিতে) প্রতিটি স্বরের একশ্রুতি উৎকর্ষ বা অপকর্ষ কবা সম্ভব হবে। সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে এই একশ্রুতির মান নির্ণয়ে পঞ্চমই একমাত্র আধার স্বর। সপ্তকের অন্য কোন স্বরের সাহায্যে এই প্রক্রিয়া সম্ভব নয়। অতঃপর সারণা-চতুষ্টয়ের চারটি সারণাতে শ্রুতি (স্বর) গুলি কিভাবে স্থান পরিবর্তন করছে, নিম্নোক্ত তালিকায় তা দেখানো হোল।

শ্রুতি সংখ্যা	শ্রুতিনাম	ধ্রুববীণায় ষড়্‌জগ্রাম প্রাচীন স্বরস্থান	চলবীণায় সারণা-ক্রিয়ার পরিণাম				বর্তমান স্বরস্থান
			১ম সারণা	২য় সারণা	৩য় সারণা	৪র্থ সারণা	
২২	ক্ষোভিনী	নিষাদ				সা	
১	তীব্রা				সা		ষড়্‌জ
২	কুমুদ্বতী			সা			
৩	মন্দা		সা			রে	
৪	ছন্দোবতী	ষড়্‌জ			রে		
৫	দয়াবতী			রে		গ	ঋষভ
৬	রঞ্জনী		রে		গ		
৭	রক্তিকা	ঋষভ		গ			
৮	রৌদ্রী		গ				গান্ধার
৯	ক্রোধা	গান্ধার				ম	
১০	বজ্রিকা				ম		মধ্যম
১১	প্রসারিণী			ম			
১২	প্রীতি		ম			প	
১৩	মার্জনী	মধ্যম					
১৪	ক্ষিতি				প		পঞ্চম
১৫	রক্তা			প			
১৬	সন্দীপনী		প			ধ	
১৭	আলাপনী	পঞ্চম			ধ		
১৮	মদন্তী			ধ		নি	ধৈবত
১৯	রোহিনী		ধ				
২০	রম্যা	ধৈবত		নি			
২১	উগ্রা		নি				নিষাদ
২২	ক্ষোভিনী	নিষাদ					

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাগসমূহের পরিচয় এবং তুলনামূলক আলোচনা

রাগ পরিচায়ক বিষয়সমূহ ঃ কোন রাগ গায়ন, বাদন অথবা রাগ বিশেষেব পরিচয় প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা কর্তব্য। যেমন,

১। রাগ নাম। ২। থাট নাম। ৩। জাতি (ঔড়ব, ষাড়ব প্রভৃতি)।

৪। গায়ন সময়। ৫। স্বররূপ (বর্জিত, দুর্বল তথা বক্রস্বর প্রভৃতি)।

৬। আবোহাবরোহী। ৭। বাগরূপ বৈশিষ্ট্য (প্রকৃতি, মিশ্রণ প্রভৃতি)।

৮। বাদী, সামবাদী এবং বিশ্রান্তি স্থান।

৯। শ্রেণী (শুদ্ধ, ছায়ালগ, সংকীর্ণ প্রভৃতি)।

১০। অঙ্গ প্রাধান্য। ১১। স্থায়ী, অন্তবাদির প্রারম্ভিক বৈশিষ্ট্য

১২। মুখ্য অঙ্গ (পকড় প্রভৃতি)।

১৩। সমানতা (সেই থাট থেকে উৎপন্ন অন্যান্য বাগেব সঙ্গে এব সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য প্রভৃতি)।

১৪। ঐতিহাসিক পরিচয়।

বিলাবল ঃ বিলাবল থাটের আশ্রয় রাগ। অর্থাৎ শুদ্ধ শ্রেণীর রাগ। জাতি সম্পূর্ণ। সব শুদ্ধ স্বর। বাদী ধ, সামবাদী গ। গায়ন সময় দিবা ১ম প্রহর। প্রকৃতি বক্র, উত্তবাঙ্গ প্রধান। ভক্তি ও বীর রসাত্মক রাগ। ইমন রাগের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য থাকায় কেহ কেহ একে 'প্রাতঃকল্যাণ' বলে থাকেন।

আরোহাবরোহী— { সা রেগ মপধ নি র্সা
র্সা নিধ পমগ রে সা }

পকড়— গপ নি র্সা নিধপ মগ রে সা

অলৈহাবিলাবল ঃ আট প্রকার বিলাবলের মধ্যে অলৈহা-ই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। বস্তুতঃ বিলাবল রাগ হিসাবে অধিকাংশ শিল্পী অলৈহা-বিলাবলই গেয়ে থাকেন।

'অলৈহা' বিলাবল থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। এর গ, নি বক্র, আরোহে মধ্যম বর্জিত তথা অবরোহে কিঞ্চিত কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয়। অতএব এর জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। এ ছাড়া বিলাবলের সঙ্গে এর আর কোন পার্থক্য নেই।

আরোহাবরোহী—{ সা রে গরে গপ ধ নিধ র্সা
সাঁনিধপ ধন্ৃধপ মগ মরে সা।

পকড়— গ রে গপ ধ নির্সা।

ইমন বা কল্যাণ ঃ ইমন বা কল্যাণ থাটের আশ্রয় রাগ। অর্থাৎ শুদ্ধ শ্রেণীর রাগ। জাতি সম্পূর্ণ। কড়ি মধ্যম তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী গ, সমবাদী নি। গায়ন সময় রাত্রি ১ম প্রহর। এই রাগ যখন শুদ্ধমধ্যমকে বিবাদীরূপে প্রয়োগ করে গাওয়া হয় তখন কেহ কেহ তাকে 'ইমনকল্যাণ' রাগ বলে থাকেন। বস্তুতঃ ইমন এবং ইমনকল্যাণ রাগের মধ্যে এইটুকুই শুধু পার্থক্য। এটি পূর্বাঙ্গ প্রধান তথা ভক্তি ও শৃঙ্গার রসাত্মক একটি অত্যন্ত সুমধুর রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সা রেগ ম॑প ধনি র্সা
র্সা নিধপ ম॑গ রে সা।

পকড়— নি় রেগ রেসা পম॑গ রেসা।

খমাজ ঃ খমাজ থাটের আশ্রয় রাগ। অর্থাৎ শুদ্ধশ্রেণীর রাগ। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। দুই নি এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। সাধারণতঃ আরোহে শুদ্ধ এবং অবরোহে কোমল নি ব্যবহৃত হয়। আরোহে ঋষভ বর্জিত এবং পঞ্চম দুর্বল। কেহ কেহ পঞ্চমকে একেবারে বর্জন করে 'সা গ ম ধ নি র্সা' এইরূপ আরোহণ করে থাকেন। বাদী গ সমবাদী নি। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। পূর্বাঙ্গে বাদী হলেও এটি উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ, যা একটি ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এতে ভজন, ঠুংরী, গজল প্রভৃতি বেশী হয়ে থাকে। এটি ভক্তি ও শৃঙ্গার রসাত্মক একটি চঞ্চল প্রকৃতির রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সা গ মপ ধ নির্সা
র্সা ন্ধিপ মগ রেসা।

পকড়— ন্ধি মপধ গমগ।

ভৈরব ঃ ভৈরব থাটের আশ্রয় রাগ। অর্থাৎ শুদ্ধ শ্রেণীর রাগ। জাতি

সম্পূর্ণ। ঋ্রে, ধ্ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। ঋ্রে, ধ্ স্বরদ্বয় আন্দোলনযুক্ত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ তথা রাগরূপ প্রকাশক। আরোহে ঋষভ দুর্বল কিন্তু অবরোহে মধ্যম থেকে ঋষভের মীড় অত্যন্ত মনোরম হয়। বাদী ধ্, সমবাদী ঋ্রে। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। সন্ধিপ্রকাশ রাগ। উত্তরাঙ্গে বাদী হলেও এটি পূর্বাঙ্গে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং গম্ভীর প্রকৃতির। ভক্তি ও শৃঙ্গার রস প্রধান।

আরোহাবরোহী—{ সা ঋ্রে গ ম প ধ্ নি র্সা
র্সা নি ধ্ প ম গ ঋ্রে সা।

পকড়— সা গমপ ধ্ প।

পূরবী ঃ পূরবী থাটের আশ্রয় রাগ। অর্থাৎ শুদ্ধ শ্রেণীর রাগ। জাতি সম্পূর্ণ। দুই মধ্যম, ঋ্রে, ধ্ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী গ, সমবাদী নি। গায়ন সময় দিবা অন্তিম প্রহর। সন্ধিপ্রকাশ রাগ। উত্তর ভারতে কেহ কেহ এতে শুদ্ধ ধৈবত ব্যবহার করেন আবার কেহ কেহ দুটি ধৈবতই ব্যবহার করে থাকেন। পূর্বাঙ্গ প্রধান এবং প্রকৃতি করুণ ও অচঞ্চল।

আরোহাবরোহী—{ সা ঋ্রেগ ম্প ধ্নি র্সা
সা নিধ্প ম্গ ঋ্রে সা।

পকড়— নি্ সাঋ্রেগ মগ ম্গ ঋ্রেগ ঋ্রেসা।

মারবা ঃ মারবা থাটের আশ্রয় রাগ। অর্থাৎ শুদ্ধ শ্রেণীর রাগ। জাতি ষাড়ব। পঞ্চম বর্জিত। ঋ্রে কোমল, কড়ি মধ্যম এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। আরোহে নি এবং অবরোহে ঋ্রে বক্র। ঋ্রে, গ, ধ স্বরত্রয় মহত্বপূর্ণ তথা বৈচিত্র্যদায়ক। বাদী ঋ্রে, সমবাদী ধ। সাধারণতঃ বাদী ও সমবাদীর স্বররূপ একই হয়ে থাকে। সেই হিসাবে একে একটি ব্যতিক্রম বলা যায়। গায়ন সময় দিবা অন্তিম প্রহর। সন্ধিপ্রকাশ রাগ। পরবর্তী কল্যাণ থাটের রাগে প্রবেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয় বলে একে পরমেল প্রবেশক রাগও বলা হয়। এর প্রকৃতি গম্ভীর এবং পূর্বাঙ্গ প্রধান। কেহ কেহ একে বীভৎস রসের অন্তর্গত বলে থাকেন।

আরোহাবরোহণ—{ সা ঋ্রে গম্ ধ নিধ র্সা
র্সা নিধ ম্গ ঋ্রে সা।

- পকড়— ধ ম্গঋ্রে গম্গ ঋ্রে সা।

কাফী ঃ কাফী থাটের আশ্রয় রাগ। অর্থাৎ শুদ্ধ শ্রেণীর রাগ। জাতি সম্পূর্ণ। গ্, নি্ কোমল তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী প, সমবাদী সা।

মতান্তরে গ, নি বাদী-সংবাদী। গায়ন সময় মধ্যরাত্রি। মতান্তরে সায়ংকাল। আরোহণে কচিৎ তীব্র গান্ধার ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ কোমল ধৈবতকেও সামান্য প্রয়োগ করে থাকেন। তবে এইরূপ প্রয়োগ কুশলতা এবং সাধনা সাপেক্ষ। সা, গ, প নি স্বরগুলি মহত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যদায়ক। এটি একটি পূর্বাঙ্গ প্রধান, চঞ্চল প্রকৃতির এবং করুণ ভক্তি তথা শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ।

আরোহাবরোহী— { সা রেগ মপ ধ নি র্সা
র্সা নিধ প মগ রে সা।

পকড়— সসা রেরে গগ মম প।

আশাবরী ঃ আশাবরী থাটের আশ্রয় রাগ। অর্থাৎ শুদ্ধ শ্রেণীর রাগ। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। গ, ধ, নি কোমল ও অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। আরোহণে গ, নি বর্জিত। বাদী ধ, সমবাদী গ। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর। জৌনপুরী, গান্ধারী, দরবারী প্রভৃতি রাগের সাথে এর স্বররূপের সাদৃশ্য থাকায়, এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য সাবধানতার প্রয়োজন। কেহ কেহ আশাবরীতে কোমল ঋষভের ব্যবহার করেন, তখন একে 'কোমল আশাবরী' বলা হয়। গ প ধ স্বর তিনটি বৈচিত্র্যদায়ক। উত্তরাঙ্গ প্রধান এবং ভক্তি রসাত্মক রাগ।

আরোহাবরোহী— { সা ^ম^রে মপ ধ র্সা
র্সা নিধ প মগ রে সা।

পকড়— ^ম^রে ম প নিধ প।

ভৈরবী ঃ ভৈরবী থাটের আশ্রয় রাগ। জাতি সম্পূর্ণ। রে, গ, ধ, নি কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। মতান্তরে বারোটি স্বরই ব্যবহার করা হয়। বাদী ম, সমবাদী সা। মতান্তরে ধ, গ। দুটি মতই প্রচলিত। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। মতান্তরে সর্বকালীক। এই রাগে খেয়াল কম হয়। এতে ভজন, ঠুংরী, টপ্পা, গজল প্রভৃতিই অধিক হয়ে থাকে। এটি পূর্বাঙ্গ প্রধান একটি শৃঙ্গার ও ভক্তি রসাত্মক অতি সুমধুর রাগ।

আরোহাবরোহণ— { সা রেগ ম প ধ নি র্সা
র্সা নিধপ ম গরে সা।

পকড়— মগ সরেসা ধনি সা।

তোড়ী ঃ তোড়ী থাটের আশ্রয় রাগ। অর্থাৎ শুদ্ধ শ্রেণীর রাগ। জাতি

সম্পূর্ণ। কড়ি মাধ্যম, রে, গ, ধ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ধ, সমবাদী গ। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর। রে, গ, ধ স্বর তিনটি বৈচিত্র্যদায়ক। উত্তরাঙ্গ প্রধান তথা করুণ ও শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ।

আরোহাবরোহী— { সা রেগ মপ ধ নির্সা
{ র্সা নিধপ মগ রেসা।

পকড়— ধনিসা রেগরে সা মগ রেগ রেসা।

ভূপালী ঃ কল্যাণ থাটোৎপন্ন একটি ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি ঔড়ব। ম, নি স্বরদ্বয় বর্জিত। সব শুদ্ধ স্বর। বাদী গ, সমবাদী ধ। গায়ন সময় রাত্রি ১ম প্রহর। শুদ্ধ কল্যাণ, জৈতকল্যাণ, দেশকার প্রভৃতির সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে, তবে নিজস্ব স্বতন্ত্রতায় ভূপালী আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। এটি একটি সহজ সরল ও গম্ভীর প্রকৃতির পূর্বাঙ্গ প্রধান তথা শৃঙ্গার ও ভক্তি রসাত্মক রাগ।

আরোহাবরোহী— { সা রে গ প ধ র্সা
{ র্সা ধ প গ রে সা।

পকড়— গ রেসা ধ সা রেগ পগ ধপগ রেসা।

হমীর ঃ কল্যাণ থাটোৎপন্ন একটি ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি সম্পূর্ণ। দুই মধ্যম ও অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ধ, সমবাদী গ। মতান্তরে বাদী পঞ্চম। গায়ন সময় রাত্রি ১ম প্রহর হওয়াতে, পূর্বাঙ্গবাদী রাগ হিসাবে পঞ্চমের বাদীত্ব অধিক যুক্তিযুক্ত, কিন্তু ধৈবতের বাদীত্ব অধিক সমর্থিত। তাই এর উত্তরাঙ্গ অপেক্ষাকৃত প্রবল এবং প্রকৃতি চঞ্চল।

আরোহাবরোহী— { সা রেসা গমধ নিধ র্সা
{ র্সা নিধপ মপধপ গমরেসা।

পকড়— সা রেসা গমধ।

কেদার ঃ কল্যাণ থাটোৎপন্ন একটি ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি ঔড়ব-ষাড়ব। দুই মধ্যম ও অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। আরোহণে রে, গ ও অবরোহণে গ দুর্বল। কেদারের গান্ধারকে তাই 'গুপ্ত গান্ধার' বলা হয়। কড়ি মধ্যমযুক্ত রাগের স্থূল নিয়ম হিসাবে আরোহে নি ও অবরোহে গ বক্র এবং কোমল নিষাদ বিবাদীরূপে কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত হয়। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় রাত্রি

১ম প্রহর (বর্ষা ঋতুতে সর্বকালীক)। শুদ্ধ, চাঁদনী, জলধর ও মলুহা এই চার প্রকার কেদার প্রসিদ্ধ। এটি পূর্বাঙ্গ প্রধান, গম্ভীর প্রকৃতির তথা শৃঙ্গার রসাত্মক একটি সুমধুর রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সা ম মপ ধপ নিধ র্সা
সা নিধপ ম্পধপ মগ মরে সা।

পকড়— সা ম ম্পধপ ম পম রেসা।

বেহাগ ঃ বিলাবল থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহণে রে ধ বর্জিত। সব শুদ্ধ স্বর। বিবাদীরূপে ক্বচিৎ কড়ি মধ্যম ব্যবহৃত হয়। রে ও ধ স্বরদ্বয় দুর্বল। কেহ কেহ এদুটিকে একেবারে বর্জন করেন। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। বাদী গ, সমবাদী নি। পূর্বাঙ্গ প্রধান, চঞ্চল প্রকৃতি ও শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ।

আরোহাবরোহী—{ নি় সা গ মপ নির্সা
র্সা নি ধপ মগ রেসা।

পকড়— নি়সা গমপ গমগ রেসা।

দেশ ঃ খমাজ থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি সম্পূর্ণ। দুই নি তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। আরোহে শুদ্ধ এবং অবরোহে কোমল নি ব্যবহৃত হয়। আরোহে গ, ধ এবং অবরোহে রে বক্র। কেহ কেহ গ ও ধ স্বরদ্বয়কে আরোহে একেবারে বর্জন করেন। বাদী রে, সমবাদী প। মতান্তরে প-রে বাদী-সংবাদী। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। সোরঠ রাগের সঙ্গে এর সাদৃশ্য অত্যন্ত প্রবল। তবে সোরঠ রাগের গান্ধার স্বরটি অত্যন্ত দুর্বল। এটি বক্র প্রকৃতির উত্তরাঙ্গ প্রধান তথা ভক্তি ও শৃঙ্গার রসাত্মক একটি সুমধুর রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সা রেগ সা রে মপ ধ মপ নির্সা
র্সা নি্ধপ মগ রেগ সা।

পকড়— রে মপ নি্ধপ পধপম গরেগ সা।

কালংড়া ঃ ভৈরব থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি সম্পূর্ণ। রে্, ধ্ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ধ্, সমবাদী গ। মতান্তরে প-সা বাদী-সংবাদী। গায়ন সময় রাত্রি অন্তিম প্রহর। উত্তরাঙ্গে পরজ, বসন্ত প্রভৃতি রাগের ছায়া প্রদর্শন করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়। ক্ষুদ্র ও চঞ্চল প্রকৃতির এই রাগ উত্তরাঙ্গ প্রধান তথা ভক্তি ও শৃঙ্গার রসাত্মক হয়।

আরোহাবরোহী—{ সা রে গমপ ধ নিসা
সা নিধ প মগ রে সা।

পকড়— ধপ সানিধপ গমগ নিসারেগ মগ।

তিলককামোদ ঃ খমাজ থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি ষাঁড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে ধ বর্জিত। দেশ ও সোরঠ রাগের সঙ্গে এর কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকায় এতে কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয় না, অতএব সব শুদ্ধ স্বর। বাদী রে, সমবাদী প। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। মহারাষ্ট্রে এই রাগে দুটি নিষাদ ব্যবহৃত হয়। এটি একটি ক্ষুদ্র প্রকৃতির বক্র এবং পূর্বাঙ্গ প্রধান তথা শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ।

আরোহাবরোহণ—{ সা রেগসা রেমপধ মপ সা
সা পধম গ সারেগ সানি।

পকড়— প নি সা রেগসা রেপমগ সা নি।

শ্রী ঃ পূরবী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। আরোহে গ, ধ বর্জিত, অতএব জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। কড়ি মধ্যম রে ধ কোমল ও অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী রে, সমবাদী প। গায়ন সময় সূর্যাস্তকাল। সন্ধিপ্রকাশ রাগ। প্রকৃতি গম্ভীর। এটি ভক্তি ও শৃঙ্গার রসাত্মক পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ। যাবতীয় সায়ং-কালীন রাগের মধ্যে শ্রী রাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সা রে, রে সা এবং প রে সা স্বর সংগতি বৈচিত্র্যময় ও মহত্বপূর্ণ।

আরোহাবরোহণ—{ সা রে রে সা রে মপ নি সা
সা নিধ প মগরে গ রে রে সা।

পকড়— সা রে রে সা পমগরে গরে রে সা।

সোহনী ঃ মারবা থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। পঞ্চম বর্জিত। জাতি ষাড়ব। কড়ি মধ্যম, কোমল রে ও অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ধ, সমবাদী গ। শুদ্ধ মধ্যমের কচিৎ ব্যবহার আছে। মারবা ও পুরিয়া রাগের সাথে এর স্বররূপের সাদৃশ্য আছে। তবে সোহনী উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ। কেহ কেহ একে 'সুবহ কি পুরিয়া' বলে থাকেন। গায়ন সময় রাত্রি অন্তিম প্রহর।

আরোহাবরোহী—{ সা রেসা গমধ নিসা
সা রেসা নিধ গমধ মগ রেসা।

পকড়— সা নিধ নিধ গ ম ধ নিসা।

বাগেশ্রী ঃ কাফী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। এই রাগের জাতি সম্বন্ধে কিঞ্চিত মতভেদ আছে। কারণ পঞ্চম স্বরটিকে কেহ আরোহে বর্জন করেন, কেহ করেন না, আবার কেহ একেবারে বর্জন করেন। সেই হিসাবে এর তিন প্রকার জাতি হতে পারে। তবে অধিকাংশ গায়ক আরোহণে রে, প বর্জন করেন। সুতরাং এর জাতি 'ঔড়ব-সম্পূর্ণ' হওয়াই যুক্তিযুক্ত। গ্, নি্ কোমল ও অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। গ্ নি্ কোমল হলে আরোহনে শুদ্ধ নিষাদ প্রয়োগের রীতি আছে, তবে তার জন্য কুশলতার প্রয়োজন। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় রাত্রি ৩য় প্রহর। 'ম ধ নি্' স্বর সংগতি বৈচিত্র্যদায়ক। উত্তরাঙ্গ প্রধান এবং করুণ ও চঞ্চল প্রকৃতির রাগ।

আরোহাবরোহণ— { সা নি়ধ় নি্সা মগ্ মধ নি্সা
{ র্সা নি্ধ মপধ মগ্ রেসা।

পকড়— সা নি়ধ় সা মধনিধ মগ্ রেসা।

বৃন্দাবনী সারং ঃ কাফী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি ঔড়ব। গ, ধ বর্জিত। তবে আরোহণে ক্বচিৎ ধৈবতের ব্যবহার দেখা যায়। দুই নিষাদ যুক্ত এবং অন্যান্য স্বব শুদ্ধ। বাদী রে, সমবাদী প। গায়ন সময় মধ্যাহ্ন। আরোহণে শুদ্ধ এবং অবরোহণে কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয়। মধ্যমাদি বা মধুমাদ সারং রাগের সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুব প্রকট। সুতরাং রাগ বিস্তারকালে সাবধানতার প্রয়োজন। পূর্বাঙ্গ প্রধান ও চঞ্চল প্রকৃতির রাগ।

আরোহাবরোহী— { নি় সা রে ম প নি র্সা
{ র্সা নি্ প ম রে সা।

পকড়— নি় সারে মরে পমরে।

ভীমপলশ্রী ঃ কাফী থাটোৎপন্ন ছায়াগল শ্রেণীর রাগ। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আবোহে রে, ধ বর্জিত। গ্, নি্ কোমল তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় দিবা ৩য় প্রহর। পূর্বাঙ্গ প্রধান, চঞ্চল প্রকৃতি তথা শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ। আরোহে সা, ম, প প্রবল। 'ধনাশ্রী' নামক রাগের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে, যীর বাদীস্বর পঞ্চম। ভীমপলশ্রী'র পঞ্চমও প্রবল। সম্ভবতঃ এই কারণেই ধনাশ্রী রাগ ক্রমে অপ্রচলিত হয়ে পড়ছে।

আরোহাবরোহী— { ন়িসা গ় ম প নি সা
সাঁ নি ধপ ম গ রেসা।

পকড়— ন়িসা ম গম পমগ মগ রেসা।

পীলু ঃ কাফী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর রাগ। কেহ কেহ একে ধুন বলে থাকেন। ভৈরবী, ভীমপলশ্রী ও গৌরী রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। জাতি মিশ্র সম্পূর্ণ। সপ্তকের সবগুলি স্বরই ব্যবহৃত হয়। গায়ন সময় দিবা ৩য় প্রহর। মতান্তরে সর্বকালীক। বাদী কোমল গান্ধাব, সমবাদী শুদ্ধ নিষাদ। পূর্বাঙ্গ প্রধান, চঞ্চল ও ক্ষুদ্র প্রকৃতি তথা ভক্তি ও শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ। ভজন, ঠুংরী প্রভৃতিতে এর অধিক প্রয়োগ হয়।

আরোহাবরোহী— { ন়িসা গরেগ মপ, ধপ নিধপ সাঁ
সাঁ নিধপ মগ ন়িসা।

পকড়— ন়িসাগ ন়িসা প় ধ় ন়িস।।

জৌনপুরী ঃ আশাববী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে গ বর্জিত। গ, ধ, ন কোমল তথা অন্যান্য স্বব শুদ্ধ। ক্কচিৎ দুই নিষাদ ব্যবহৃত হয়। বাদী ধ, সমবাদী গ। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর। গান্ধারী, আশাবরী ও দরবারী কানাড়াব সঙ্গে এর স্বররূপের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু গান্ধারীতে দুই ঋষভ, আশাববীতে আরোহে নি বর্জিত এবং দরবারী পূর্বাঙ্গ প্রধান হওয়াতে রাগ ভেদ বজায় রাখা সম্ভবপর হয়। জৌনপুবী উত্তরাঙ্গ প্রধান তথা ভক্তি রসাত্মক রাগ।

আরোহাবরোহী— { সা রেমপ ধ নি সাঁ
সাঁ নি ধপ মগ রে সা।

পকড়— মপ নিধপ ধ মপগ রেমপ।

মালকোষ ঃ ভৈরবী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি ঔড়ব। রে, প বর্জিত। গ, ধ, নি কোমল, অর্থাৎ সব কোমল স্বর। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় রাত্রি ৩য় প্রহর। কেহ কেহ একে আশাবরী থাটের অন্তর্গত মনে করেন, কিন্তু কোমল ঋষভ বিবাদী-রূপে কিঞ্চিত ব্যবহৃত হওয়ায় ভৈরবী থাটের যৌক্তিকতাই সমর্থনযোগ্য। মালকোষ একটি সরল, স্বতন্ত্র, গম্ভীর, সুমধুর ও উত্তরাঙ্গ প্রধান তথা ভক্তি ও শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ।

আরোহাবরোহী—{ ধ̣নি̣ সা গ্ম ম ধ্ নি̣ সাঁ
সাঁ নি̣ধ̣ম গ্ম ম, গ্ম সা।

পকড়—মগ্ মধ্ নি̣ধ্ মগ্ সা।

শুদ্ধকল্যাণ ঃ কল্যাণ থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। কড়ি মধ্যম তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। জাতি ওঁড়ব সম্পূর্ণ। আরোহে ম্ং, নি বর্জিত। বাদী গ, সমবাদী ধ। গায়ন সময় রাত্রি ১ম প্রহর। পূর্বাঙ্গ প্রধান তথা ভক্তি রসাত্মক রাগ। ম্ং, নি স্বরদ্বয় অবরোহেও দুর্বল হওয়ায় ভূপালীর সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। কেহ কেহ আবার ম্ং নি স্বরদ্বয় একেবারে বর্জন করে থাকেন। তবে প‿গ ও সাঁ‿ধ মীড়যোগে কড়ি মধ্যম ও শুদ্ধ নিষাদ প্রয়োগ তথা প‿রে সংগতি একে ভূপালী থেকে ভিন্ন রাখে। তাছাড়া ভূপালীর থেকে এর ধৈবত দুর্বল হয়। কেহ কেহ আবার ম্ং, নি স্বরদ্বয়কে আরোহণেও কিঞ্চিৎ ব্যবহার করে থাকেন। এতেও তেমন অসংগতি হবে না, কারণ প্রচ্ছাদনীয় বা তানক্রিয়াত্মক ইত্যাদির ভিত্তিতে সজ্ঞানে বিবাদী স্বরপ্রয়োগের রীতি শাস্ত্রে অনুমোদিত।

আরোহাবরোহী—{ সা রেগ প ধ সাঁ
সাঁ নিধপ ম্ংগ রেসা।

পকড়— গরেসা নি̣ধ̣প̣ সা গরে পরে সা।

কামোদ ঃ কল্যাণ থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। দুই মধ্যম ও অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। কড়ি মধ্যম শুধু আরোহণে ব্যবহৃত হয়। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী প, সমবাদী রে। গায়ন সময় রাত্রি ১ম প্রহর। রে প সংগতি রাগরূপ প্রকাশক এবং গ নি স্বরদ্বয় দুর্বল হয়। কেদার, হম্বীর, ছায়ানট প্রভৃতি রাগের সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, এগুলি সমপ্রকৃতিক রাগ। এগুলিতে গ নি বক্র এবং কোমল নিষাদ বিবাদীরূপে কিঞ্চিত ব্যবহৃত হয়। উত্তরাঙ্গ প্রধান ও চঞ্চল প্রকৃতির রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সা রেপ ম্ংপ ধপ নিধ সাঁ
সাঁ নিধপ, ম্ংপধপ গমপ গমরেসা।

পকড়— রে প ম্ংপধপ গমপ গমরে সা।

ছায়ানট ঃ কল্যাণ থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। দুই মধ্যম ও

অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। কড়ি মধ্যম শুধু আরোহণে ব্যবহৃত হয়। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী প সমবাদী রে। গায়ন সময় রাত্রি ১ম প্রহর। প রে সংগতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যদায়ক। কামোদ, হমীর, কেদারাদি রাগের মতো এর গ নি বক্র এবং কোমল নিষাদের বিবাদীরূপে কিঞ্চিৎ ব্যবহার আছে। এগুলি সমপ্রকৃতিক রাগ। উত্তরাঙ্গ প্রধান চঞ্চল প্রকৃতির রাগ।

আরোহাবরোহী— { সা রেগ ম প নিধ সাঁ
সাঁ নিধপ মঁপধপ গমরেসা।

পকড়— প রেগমপ মগ মরেসা।

গৌড়সারং ঃ কল্যাণ থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। দুই মধ্যম এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। দুই মধ্যমযুক্ত হমীর, কেদারাদির মতো এর গ, নি বক্র এবং কোমল নিষাদ বিবাদীরূপে ব্যবহৃত হয়। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী গ, সমবাদী ধ। গায়ন সময় দিবা দ্বিতীয় প্রহর। কোমল নিষাদ এবং কড়ি মধ্যম শুধু আরোহে ব্যবহৃত হয়। এটি পূর্বাঙ্গ প্রধান, বক্র এবং চঞ্চল প্রকৃতির রাগ।

আরোহাবরোহী— { সা গরে মগ পমঁ ধপ নিধ সাঁ
সাঁধ নিপ ধ মঁপ গমরে পরে সা।

পকড়— সা গরে মগ পরে সা।

হিন্দোল ঃ কল্যাণ থাটাৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি ঔড়ব। রে, প বর্জিত। কড়ি মধ্যম এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। মালকোষের স্বরগুলি তীব্র করলেই হিন্দোল রাগ হয়। বাদী ধ, সমবাদী গ। গায়ন সময় দিবা ১ম প্রহর। নিষাদ অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং আরোহে বক্র হয়। এর কারণ নিষাদ বেশী ব্যবহৃত হলে সোহনী রাগের ছায়া এসে যেতে পারে। সেইজন্য সাঁ ধ মীড় সহযোগে নিষাদ প্রয়োগ করা হয়। শুদ্ধ রে ও ম স্বরদ্বয় কেহ কেহ "অবরোহে দ্রুত গীতো ন রক্তিহর" এই নিয়মানুসারে ক্বচিৎ প্রয়োগ করে থাকেন। এই রাগে গমকের প্রয়োগ অধিক হয়। উত্তরাঙ্গ প্রধান এবং চঞ্চল প্রকৃতির রাগ।

আরোহাবরোহী— { সা গ মঁধ নিধ সাঁ
সাঁ নিধ মঁগ সা।

পকড়— সা গ মঁধ নিধ মঁগ সা।

শংকরা ঃ বিলাবল থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। শংকরা দুই প্রকার শোনা যায়, একপ্রকার রে ম বর্জিত এবং দ্বিতীয় প্রকার শুধু মধ্যম বর্জিত।

এই দুটি মতই প্রচলিত সুতরাং এর জাতি ঔড়র বা বাড়ব। সব শুদ্ধ স্বর। বাদী গ, সমবাদী নি। মতান্তরে সা-প। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। মতান্তরে মধ্যরাত্রি। আরোহে সামান্য ঋষভের ব্যবহার হয়। তিরোভাবকালে রে ধ স্বরদ্বয় প্রয়োগ করে কল্যাণের ছায়া দেখান হয়। তবে 'প নিধ, র্সা নি' স্বর সংগতি এবং মধ্যমের অনুপস্থিতি রাগরূপ প্রকাশ করে। শংকরার রূপ কিছুটা বেহাগের সঙ্গে মেলে কিন্তু বেহাগে মধ্যম প্রবল হওয়াতে রাগভেদ স্পষ্ট থাকে। শংকরা উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ, এর প্রকৃতি চঞ্চল এবং শৃঙ্গার রসাত্মক হয়।

আরোহাবরোহী—{ সা গ প নিধ র্সা
র্সা নিধ প নিধ র্সা নিপ গপ গসা।

পকড়— র্সা নিপ নিধ র্সা নিপ গপ গসা।

দেশকার ঃ বিলাবল থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। সব শুদ্ধ স্বর। জাতি ঔড়ব। ম নি বর্জ্জিত। এর সংগে ভূপালীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ভূপালী পূর্বাঙ্গ এবং বাদীস্বর ভিন্ন হওয়ায় রাগভেদ স্পষ্ট থাকে। তাছাড়া দেশকার রাগ ধৈবতকে যেকোন উচিতস্থান থেকে উচ্চাবণ করা রাগ-বৈশিষ্ট্য প্রকাশক। অবরোহে ক্বচিৎ নিষাদের ব্যবহার দেখা যায়। বাদী ধ, সমবাদী গ। গায়ন সময় দিবা ১ম প্রহর। এর প্রকৃতি গম্ভীর এবং ভক্তি রসাত্মক হয়।

আরোহাবরোহী—{ সা রেগ পধ র্সা
র্সা ধ প গ পধপ গ রে সা।

পকড়— ধপ গপ গ রেসা।

জয়-জয়ন্তী ঃ খমাজ থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর রাগ। জাতি সম্পূর্ণ। দুই গান্ধার ও দুই নিষাদ এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। আরোহণে তীব্র এবং অবরোহণে কোমল গ-নি ব্যবহৃত হয়। এর উৎপত্তি গৌড়, বিলাবল ও সোরঠ রাগেব মিশ্রণে হয়েছে। মন্দ্র পঞ্চম ও মধ্য ঋষভের সংগতি অত্যন্ত সুন্দর এবং রাগরূপ প্রকাশক হয়। বাদী রে, সমবাদী প। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহরের শেষভাগ। এটি একটি পরমেল-প্রবেশক রাগ। এর পরে কাফী মেলের কোমল গান্ধারযুক্ত বাগ গাওয়া হয়। এটি পূর্বাঙ্গ প্রধান, শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সা রেরে রেগ্‌রেসা ন্ধিপ্ রে গমপ নির্সা
র্সা ন্ধিপ ধম রেগ্‌ রেসা।

পকড়— রেগ্‌ রেসা ন্ধিপ্ রে।

রামকেলী : ভৈরব থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর রাগ। এর সাধারণ রূপ ভৈরবের মত, কিন্তু এর বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখা যায়। এক মতে ম, নি স্বরদ্বয় আরোহণে বর্জন করা হয়, যার শাস্ত্রাধারও আছে কিন্তু বর্তমানে অপ্রচলিত। দ্বিতীয় মতে আরোহাবরোহণ সম্পূর্ণ, কিন্তু তাতে ভৈরবের সাথে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। তৃতীয় মতে তুই গান্ধারযুক্ত রামকেলীর সন্ধান পাওয়া যায় যা বর্তমানে অপ্রচলিত। বর্তমানে প্রচলিত মত হোল—তুই মধ্যম ও তুই নিষাদ এবং কোমল রে, ধ যুক্ত। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী ধ, সমবাদী রে। মতান্তরে বাদী পঞ্চম। উভয় ম ও নি যুক্ত রাগে পঞ্চমের বাদীত্ব অযৌক্তিক নয়। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। উত্তরাঙ্গ প্রধান, চঞ্চল প্রকৃতির রাগ।

আরোহাবরোহী— { সা গ মপধ নির্সা
{ র্সা নিধপ র্মপধনিধপ মরেসা।

পকড়— ধপ র্মপ ধনিধপ গমরেসা।

পুরিয়াধানেশ্রী : পূরবী থাটোৎপন্ন ছায়াগল শ্রেণীর রাগ। জাতি সম্পূর্ণ। কড়ি মধ্যম, রে, ধ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। পূরবীর সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, তবে পূরবীতে তুই মধ্যম তথা বাদীস্বর ভিন্ন হওয়ায় রাগভেদ স্পষ্ট থাকে। প বাদী এবং রে সমবাদী। 'র্ম রেগ' এবং 'র্র নিধপ' স্বর-সংগতি রাগবাচক তথা বৈচিত্র্যদায়ক। গায়ন সময় সায়ংকাল। উত্তরাঙ্গ প্রধান, চঞ্চল প্রকৃতি তথা শৃঙ্গার ও ভক্তি রসাত্মক রাগ।

আরোহাবরোহী— { নি রে গর্মপ ধপ নি র্সা
{ র্রেনিধপ র্মগ র্মরেগ রে সা।

পকড়— নিরেগ র্মপ ধপ র্মগ র্মরেগ ধর্মগ রেসা।

বসন্ত : তুই প্রকার বসন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। একপ্রকার হোল তুই মধ্যম ও তীব্র ধৈবতযুক্ত তথা পঞ্চম বর্জিত এবং দ্বিতীয় প্রকার হোল সম্পূর্ণ। কোমল গান্ধারযুক্ত আরো একপ্রকার বসন্ত রাগের সন্ধান পাওয়া যায়।

তবে বর্তমানে পূর্বী থাটের বসন্ত-ই প্রচলিত এবং অধিক লোকপ্রিয়। অর্থাৎ এটি পূরবী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। তুই মধ্যম যুক্ত এবং রে ধ কোমল তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ আরোহে প বর্জিত। বাদী তার র্সা, সমবাদী ম। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে এর গায়ন সময় রাত্রি অন্তিম প্রহর। তবে বসন্ত ঋতুতে সর্বকালীক। কারণ এটি মৌসুমী রাগ; এর

গানগুলি অনুরূপ বর্ণনামূলক হয়ে থাকে। পরজের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় এতে পঞ্চমের অল্প প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবে পরজ অপেক্ষাকৃত চঞ্চল রাগ।

এর মুখ্য অঙ্গ হোল 'ম॑ধ্‌ রে্ঁ সঁনিধ্‌প' ; এছাড়া ম॑গ ম॑গ তথা সঁা নিধ্‌ নিধ্‌ প্রভৃতি স্বর বিন্যাসও বার বার উচ্চারিত হয়ে থাকে। এটি উত্তরাঙ্গ প্রধান, গম্ভীর প্রকৃতি তথা শৃঙ্গার রসাত্মক একটি সুমধুর রাগ।

আরোহাবরোহী— সা গ ম॑ধ্‌ রে্ঁ সঁা
সঁরে্ঁ নিধ্‌ প ম॑গ ম॑গ ম॑ধ্‌ ম॑গ রে্সা।

পকড়— ম॑ধ্‌ রে্ঁসঁা রে্ঁনিধ্‌প ম॑গ ম॑গ।

পরজ ঃ পূরবী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। জাতি সম্পূর্ণ। দুটি মধ্যম ও রে্, ধ্‌ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী সঁা, সমবাদী প। গায়ন সময় রাত্রির অন্তিম প্রহর। সন্ধিপ্রকাশ রাগ। উত্তরাঙ্গ প্রধান ও চঞ্চল প্রকৃতির রাগ। মধ্য নিষাদে ন্যাস করে রাগ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হয়। যেমন 'সঁা রে্ঁ সঁা রে্ঁ নি ধ্‌ নি'।

আরোহাবরোহী— ণি সাগ ম॑ধ্‌ নি সঁা
সঁা নিধ্‌প মপধ্‌প গমগ মগরে্সা।

পকড়— সঁা নিধ্‌প ম॑পধ্‌প গমগ।

পুরিয়া ঃ মারবা থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। মারবা ও পুরিয়ার স্বর রচনা একই, তাছাড়া সোহনীর স্বর রচনাও অভিন্ন। তবে সোহনী উত্তরাঙ্গ প্রধান এবং পুরিয়া পূর্বাঙ্গ প্রধান হওয়ায় রাগভেদ স্পষ্ট থাকে। মারবা থেকে পুরিয়ার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট কুশলতার আবশ্যক। অবশ্য এ'দুটির বাদীস্বরের ভিন্নতা রাগভেদ স্পষ্ট রাখার জন্য যথেষ্ট সহায়ক। জাতি ষাড়ব। পঞ্চম বর্জিত। কোমল রে্ ও কড়ি মধ্যম এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। সন্ধিপ্রকাশ রাগ। নি ম॑ সংগতি বৈচিত্র্যদায়ক।

আরোহাবরোহী— ণি রে্ সা গ ম॑ধ নিরে্ঁ সঁা
সঁা নিধ ম॑গ রে্সা।

পকড়— গ ণিরে্সা ণিধ্‌ ণি ম॑ধ্‌ রে্ সা।

ললিত ঃ মারবা থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। দুই মধ্যম ও কোমল রে্ এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। ধম॑ ধম॑ এবং ণিরে্গম ম॑ম স্বর সংগতি রাগ প্রকাশক এবং বৈচিত্র্যদায়ক। জাতি ষাড়ব। পঞ্চম বর্জিত। বাদী ম,

সমবাদী সা। গায়ন সময় রাত্রি অন্তিম প্রহর। পরমেল প্রবেশক রাগ। প্রাতঃকালীন রাগের মধ্যে এর রূপ স্বতন্ত্র। কোমল ধৈবত যুক্ত একপ্রকার ললিত রাগের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু তোড়ীর থেকে পার্থক্য কম হওয়ায় তীব্র ধৈবতযুক্ত ললিতই যুক্তিযুক্ত। তবে কোমল ধৈবতযুক্ত ললিতই অধিক জনপ্রিয়।

আরোহাবরোহী—{ ন়িরে্ গম ম্মগ ম্ধ র্সা
রে্ নিধ ম্ধ ম্মগ রে্সা।

পকড়— ন়িরে্গ ম ধম্ ধম্ম গ।

গৌড়মল্লার ঃ কাফী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। মতান্তরে খমাজ থাট। দুই নিষাদের ব্যবহার সর্বমান্য, তবে গান্ধার সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কারণ খেয়াল গায়কেরা তীব্র এবং ধ্রুপদ গায়কেরা কোমল গান্ধার ব্যবহার করেন। কখনও দুই গান্ধারযুক্ত ধ্রুপদের সন্ধানও পাওয়া যায়। তবে মিয়াঁ-মল্লার, মেঘমল্লারাদি থেকে রাগভেদ রক্ষার জন্য তীব্র গান্ধারই যুক্তিযুক্ত। আরোহে নিষাদ দুর্বল। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী ম, সমবাদী সা। মৌসুমী রাগ হওয়ায় বর্ষা ঋতুতে গেয়। গানগুলিও অনুরূপ বর্ণনাত্মক হয়ে থাকে। পূর্বাঙ্গ প্রধান, গম্ভীর প্রকৃতি, বক্র চলন তথা শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সা রেম পধ র্সা
র্সা ন়িপ মপ গ়ম রেসা } কোমল গান্ধার যুক্ত

অথবা—{ সা রেগ রেম গরে সা রেপ মপ ধর্সা
র্সা ধ ন়িপ মগ মরে সা। } শুদ্ধ গান্ধার যুক্ত

পকড়— রেগ রেম গরে সা পম পধ র্সা ধপম।

মিয়াঁ মল্লার ঃ কাফী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। কোমল গ়, দুই নি তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। অবরোহে ধ বর্জিত, অতএব জাতি সম্পূর্ণ-ষাড়ব। বাদী ম, সমবাদী সা। মতান্তরে সা-প বাদী-সংবাদী। গায়ন সময় মধ্যরাত্রি, তবে মৌসুমী রাগ হওয়ায় বর্ষা ঋতুতে সর্বকালীক। এই রাগের বিস্তার বিলম্বিত লয়ে তথা মন্দ্রস্থানে অধিক মনোরঞ্জক হয়। সুপ্রসিদ্ধ তানসেন এই রাগের স্রষ্টা বলে কথিত আছে। কানাড়া ও মল্লার রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। কুশল গায়কেরা পাশাপাশি দুটি নিষাদ প্রয়োগ করেও রাগহানি হতে দেন না। তবে ওইরূপ প্রয়োগ অনিবার্য এমন কথা মনে করা অনুচিত। কারণ ওটি

মেঘমল্লার রাগের বৈশিষ্ট্য। এই রাগ উভয়াঙ্গ প্রধান, প্রকৃতি গম্ভীর তথা বক্র এবং শৃঙ্গার রসাত্মক হয়।

আরোহাবরোহী—{ রেমরেসা মরে প নি়ধ নিসা
সা নিপ মপ গ়ম রেসা।

পকড়— রেমরেসা নি়প়ম়প় নি়ধ় নি়সা প গ়মরেসা।

মেঘমল্লার: কাফী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। ধ, গ বর্জিত, অতএব জাতি ঔড়ব। দুই নি এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। আন্দোলিত ঋষভ 'মরে মরে মরে এবং 'মরেপ' স্বর সংগতি রাগবাচক। বাদী স, সমবাদী প। মতান্তরে মধ্যম সংবাদী। গায়ন সময় মধ্যরাত্রি। তবে মৌসুমী রাগ হওয়ায় বর্ষা ঋতুতে সর্বকালীক। গানগুলিও অনুরূপ বর্ণনাত্মক হয়ে থাকে। এর বিস্তার মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে অধিক মনোরঞ্জক হয়। তবে এটি উভয়াঙ্গ প্রধান, গম্ভীর প্রকৃতির শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সা রে মরে মপ নি় নিসা
সা নি়প মরে ম নি়সা।

পকড়— রেমরেসা, নি়প়নি়সা, রেম, রেপ মরে সা।

বহার: কাফী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। কোমল গান্ধার, দুই নিষাদ ও অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। আরোহে রে এবং অবরোহে ধ বর্জিত। অতএব জাতি ষাড়ব- ষাড়ব। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় মধ্যরাত্রি। তবে মৌসুমী রাগ হওয়া বসন্ত ঋতুতে সর্বকালীক। দ্রুত তান প্রয়োগকালে বর্জিত স্বরদ্বয় সর্বদা বর্জন করা হয় না। কেহ কেহ দুটি গান্ধার প্রয়োগ করেও রাগরূপ বজায় রাখেন। তবে এই কার্যে কুশলতা ও সাধনা সাপেক্ষ। মধ সংগতি অত্যন্ত মনোরঞ্জক হয়। এটি উত্তরাঙ্গ প্রধান, চঞ্চল প্রকৃতির শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ। এর মিশ্রণে 'বসন্তবহার', 'হিন্দোলবহার', 'ভৈরববহার', 'মালকোষবহার' প্রভৃতি রাগের উৎপত্তি।

আরোহাবরোহী—{ নি় সা গ়মপ গ়ম ধ নিসা
সা নি়প মপ গ়ম রেসা।

পকড়— মপ গ়ম নি়ধ নিসা।

দরবারী কানাড়া: আশাবরী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। কথিত আছে, এর স্রষ্টা বিখ্যাত তানসেন। গ় ধ় নি় কোমল ও অন্যান্য স্বর

শুদ্ধ। নি্ প সংগতি এবং আন্দোলিত গান্ধার রাগ প্রকাশক ও বৈচিত্র্যদায়ক। আশাবরী, আড়ানা, জৌনপুরী প্রভৃতি রাগের সঙ্গে এর স্বররূপের সাদৃশ্য আছে। সুতরাং রাগ বিস্তারের জন্য কুশলতার আবশ্যক। জাতি সম্পূর্ণ-ষাড়ব। আরোহণে গু দুর্বল, দ্রুততান প্রয়োগকালে একেবারে বর্জন করা হয়। বাদী রে, সমবাদী প। গায়ন সময় মধ্যরাত্রি। পূর্বাঙ্গ প্রধান, গম্ভীর প্রকৃতি, শৃঙ্গার রসাত্মক ও বক্র রাগ।

আরোহাবরোহী— { নি্ সা রে গু রেসা মপ ধু নি্ র্সা
র্সা ধু নি্প মপ গুম রেসা।

পকড়— গু রেরে সা ধু নি্ সা রে সা।

আড়ানা ঃ আশাবরী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর রাগ। কেহ কেহ তীব্র ধৈবত ব্যবহার করে একে কাফী থাটের অন্তর্গত বলে থাকেন। তবে কোমল ধৈবতযুক্ত আড়ানার প্রচলনই অধিক জনপ্রিয়। কানাড়া ও মেঘ রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। গু, ধু কোমল, দুই নি ও অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। আরোহে গ বক্র এবং অবরোহে ধ বর্জিত। তবে সাধারণতঃ গান্ধারকে আরোহে বর্জন করা হয়, তাই এর জাতি ষাড়ব-ষাড়ব। আড়ানা কানাড়ার একটি প্রকার ভেদ, এর সঙ্গে দরবারীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, কিন্তু আড়ানা উত্তরাঙ্গ প্রধান হওয়ায় রাগভেদ স্পষ্ট। বাদী তার র্সা, সমবাদী প। গায়ন সময় রাত্রি ৩য় প্রহর। প্রকৃতি চঞ্চল ও শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ।

আরোহাবরোহী— { সা রে ম প ধু নি্ র্সা
র্সা ধু নি্ প মপ গুম রেসা।

পকড়— র্সা ধু নির্সা ধু নি্প মপ গুম রেসা।

মুলতানী ঃ তোড়ী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। রে্, গু, ধু, কোমল, কড়ি মধ্যম ও অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। এর সঙ্গে তোড়ী রাগের সাদৃশ্য থাকায় রে্, গু, ধু স্বরত্রয় কুশলতার সঙ্গে উচ্চারণ করা আবশ্যক। সা, প, নি ন্যাস স্বর। কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে তীব্র গান্ধারযুক্ত মুলতানীর উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু হিন্দুস্থানী সংগীতে কোমল গান্ধারযুক্ত মুলতানীই স্বীকৃত। আরোহণে রে্, ধু বর্জিত, অতএব জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। বাদী প, সমবাদী সা। গায়ন সময় দিবা ৪র্থ প্রহর। উত্তরাঙ্গ প্রধান, পরমেল প্রবেশক ও শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ।

আরোহাবরোহী— { নি় সা গ্ম় প নি র্সা
সা নি ধ্ প ম়গ্ রে্সা।

পকড়— নি়সা ম়গ্ পগ্ রে্ সা।

ঝিঁঝিটি : খমাজ থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। কোমল নি্ ও অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী গ, সমবাদী নি্। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। এর আরোহনে ঋষভের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার খমাজ থেকে রাগ ভেদ বজায় রাখে। 'ধ্ সা রে মগ' রাগবাচক স্বর। পূর্বাঙ্গ প্রধান এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল, ক্ষুদ্র ও শৃঙ্গার রসাত্মক হয়।

আরোহাবরোহী— { সা রে গম পধ নি র্সা
র্সা নি্ ধ প ম গ রে সা।

পকড়— ধ্ সা রেমগ পমগরে সনি্ ধ্প্।

তিলং : খমাজ থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। দুই নি ও অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। রে, ধ স্বরদ্বয় বর্জিত হওয়ায় খমাজ অঙ্গের রাগ হলেও রাগভেদ স্পষ্ট থাকে। জাতি ঔড়ব। বাদী গ, সমবাদী নি। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। নি্ প সংগতি রাগবাচক। উভয়াঙ্গ প্রধান এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল ও ক্ষুদ্র হয়। এই রাগে ভজন, গজল, ঠুংরী প্রভৃতি অধিক হয়।

আরোহাবরোহী— { সা গ মপ নির্সা
র্সা নি প মগ সা।

পকড়— নি্প গমগ সা।

দূর্গা : বিলাবল থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। সব শুদ্ধ স্বর। গ, নি বর্জিত। জাতি ঔড়ব। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। 'ধম, রেপ, রেধ' স্বর সংগতি রাগবাচক। এই রাগে কিছুটা মল্লার ও সোরট রাগের ছায়া দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতীয় সাবেরী রাগের সঙ্গেও এর সাদৃশ্য আছে। পূর্বাঙ্গ প্রধান এই রাগ চঞ্চল প্রকৃতি ও শৃঙ্গার রসাত্মক হয়। এর কয়েকটি প্রকারভেদ আছে।

আরোহাবরোহী— { সা রেম পধ মরে প র্সাধ র্সা
র্সারে় পধ মরে সা।

পকড়— সা রেমপধ ধমরে সাধ্সা।

দূর্গা (২য় প্রকার) : খমাজ থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। দুই

নি ও অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। রে, প বর্জিত। জাতি ঔড়ব। বাদী গ, সমবাদী নি। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। এর উত্তরাঙ্গে কিঞ্চিত বাগেশ্রীর ছায়া দেখা যায়। চঞ্চল প্রকৃতির ক্ষুদ্র রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সা গ ম ধ নি র্সা
{ র্সা নি ধ ম গ সা।

পকড়— সা নিধ্ সা মগ মধনিধ্ মগ মসা।

অহীর ভৈরব ঃ ভৈরব থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর রাগ। ভৈরব বাগেশ্রী ও কাফীর মিশ্রণে এর উৎপত্তি বলা যায়। রে, নি কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। আরোহে ক্বচিৎ শুদ্ধ ঋষভের ব্যবহার দেখা যায়। 'নি সা ধ্ নি রে' স্বর সংগতি রাগবাচক। উভয়াঙ্গ প্রধান, করুণ ও শৃঙ্গার রসাত্মক ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সা রে গ ম প ধ নি র্সা
{ র্স নিধ প ম গ রে সা।

পকড়— নিসা ধ্ নিরে সা নিধ পম গরে সা।

চন্দ্রকৌস ঃ কাফী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর রাগ। বস্তুতঃ মালকোষের নিষাদ শুদ্ধ করলেই চন্দ্রকৌস হয়, সেদিক দিয়ে বিচার করলে এর থাট সম্বন্ধে মতভেদ আছে। প্রকৃতপক্ষে অহীর ভৈরব, চন্দ্রকৌস প্রভৃতি বহু রাগকে কোন একটি থাটের অন্তর্গত করা কঠিন। সুতরাং শাস্ত্রোল্লিখিত থাটগুলি শুধু গতানুগতিক নিয়ম মাত্র।

জাতি ঔড়ব, রে প বর্জিত। গ ধ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ম, সমবাদী সা। নিষাদ অত্যন্ত প্রবল। তার ঋষভের অল্প পরিমাণে প্রয়োগের রীতি আছে। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। এই রাগের চলন হুবহু মালকোষের মতো। উত্তরাঙ্গ প্রধান, চঞ্চল প্রকৃতির ক্ষুদ্র রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সা গ মধ নির্সা
{ র্সা নিধ মগমগসা।

পকড়— ধ্ নিসা গমধ নির্সা।

জোগিয়া ঃ ভৈরব থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। রে, ধ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। কচিৎ কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয়। গান্ধার বর্জিত।

এবং আরোহণে নিষাদ বর্জিত অতএব ঔড়ব-ষাড়ব। বাদী ম, সমবাদী সা, মতান্তরে সা-ম। 'রে-ম' এবং ধ-ম স্বর সংগতি রাগবাচক। পূর্বাঙ্গ প্রধান, করুণ ও শৃঙ্গার রসাত্মক এবং ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সা রে ম প ধ র্সা
র্সা নি ধ প ধম রে সা।

পকড়— . সা রেরে ম রে মম প ধ ম রে সা।

বিভাষ ঃ ভৈরব থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। রে, ধ কোমল। অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। ম নি বর্জিত। জাতি ঔড়ব। বাদী ধ, সমবাদী গ। মতান্তরে ধ, রে। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। পূরবী থাট থেকে উৎপন্ন রেবা রাগের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। তবে সেটি পূর্বাঙ্গ প্রধান হওয়ায় রাগভেদ স্পষ্ট। এ-দুটি যেন একে অন্যের জবাব। উত্তরাঙ্গ প্রধান বিভাষ রাগের প্রকৃতি শান্ত ও গম্ভীর এবং শৃঙ্গার রসাত্মক হয়। পূরবী ও মারবা থাট থেকে উৎপন্ন আরো দুই প্রকার বিভাষ রাগেব সন্ধান পাওয়া যায়। সে দুটির পরিচয়ও ক্রমে দেওয়া হোল।

আরোহাববোহী—{ সা রে গ প ধ র্সা
র্সা ধ প গ রে সা।

পকড়— ধপ গপ গরেসা গপ ধপ র্সধ প।

বিভাষ (২য় প্রকার) ঃ পূরবী থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। রে, ধ কোমল কড়ি মধ্যম ও অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী ধ, সমবাদী রে। আরোহণে ম, নি দুর্বল, কেহ কেহ একেবারে বর্জন করেন। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। এটি উত্তরাঙ্গ প্রধান চঞ্চল প্রকৃতির রাগ অপ্রচলিত ।

আরোহাবরোহী—{ সা রে গ মপ ধ নির্সা
র্সা নিধ পমগ রে সা।

পকড় — ধ প ম গ রে সা।

বিভাষ (৩য় প্রকার) ঃ মারবা থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। দেশকার ও গৌরী রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। কোমল রে ও কড়ি মধ্যম এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী ধ, সমবাদী গ। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। গ প, মধ স্বর সংগতি রাগবাচক। পঞ্চমে ন্যাস করে রাগের গাম্ভীর্য প্রকাশ করা হয়। উত্তরাঙ্গ প্রধান গম্ভীর প্রকৃতির ক্ষুদ্র রাগ।

আরোহাবরোহী—{ নি্ ঋে্ গ ম্গ গপ ম্ধ র্সা
সাঁ ঋে্ নিধ ম্গ পগ ঋেসা।

পকড়— নি্ ঋেগ ম্গ ঋেসা গপ গপধ ম্গ পগ ঋেসা।

কলাবতী ঃ খমাজ থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। নি্ কোমল অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। জাতি ঔড়ব। রে, ম বর্জিত। বাদী প, সমবাদী সা। উত্তরাঙ্গ প্রধান, চঞ্চল প্রকৃতির শৃঙ্গার রসাত্মক ক্ষুদ্র রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সাগ পধ নি্ধপ ধর্সা
সাঁনি্ধপ গপ ধপ গসা।

পকড়— সা গ পধ নি্ধপ গসা।

নট ঃ বিলাবল থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীব বাগ। জাতি সম্পূর্ণ-ঔড়ব। অবরোহে ধ-গ বর্জিত বা বক্র। সব শুদ্ধ স্বব। কচিৎ কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয়। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। নট রাগের মিশ্রণে নট-বেহাগ, নট-বিলাবল, কেদারনট প্রভৃতি নানাবিধ রাগের উৎপত্তি।

আরোহাবরোহী—{ সা রে গম প ধ নির্সা
সাঁ নিপ মরে সা।

পকড়— সা গমপ গম রেগমপ মরে সা।

পহাড়ী ঃ বিলাবল থাটোৎপন্ন মিশ্র রাগ। সব শুদ্ধ স্বর। ম, নি স্বরদ্বয় অত্যন্ত দুর্বল। কেহ কেহ একেবারে বর্জন করেন। কিন্তু তাহলে ভূপালীর ছায়া এসে পড়ে তাই অবরোহণে কিঞ্চিৎ মধ্যমের প্রয়োগ করা হয়। জাতি ঔড়ব। বাদী সা, সমবাদী প। গায়ন সময় সর্বকালিক। মন্দ্র ও মধ্যসপ্তকের বিস্তার আকর্ষণীয়। এটি একটি পূর্বাঙ্গ প্রধান ক্ষুদ্র প্রকৃতির শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সা রে গ প ধ র্সা
সাঁ ধপ গরে গপধপ মগরেসা।

পকড়— গ রেসা ধ্ প্ ধ্সা গপধপ গরেসা ধ্।

গুণকেলী ঃ ভৈরব থাটোৎপন্ন ছায়ালগ শ্রেণীর রাগ। ঋে্, ধ্ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। জাতি ঔড়ব গ, নি বর্জিত। বাদী ধ্, সমবাদী ঋে্। জোগিয়া রাগের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। তবে জোগিয়াতে নিষাদের ব্যবহার

এবং মধ্যম বাদী থাকায় রাগভেদ স্পষ্ট। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। কেহ কেহ একে গুণক্রি বলে থাকেন। এটি উত্তরাঙ্গ প্রধান, শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির ক্ষুদ্র রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সা ৃরে মপ ধৃ র্সা
র্সা ধৃ প ম ৃরে সা।

পকড়— সা ৃরেসা ধৃসা ৃরে সা ধৃ প।

গুণকেলী (২য় প্রকার): বিলাবল থাটোৎপন্ন এক প্রকার গুণকেলী শোনা যায়। সব শুদ্ধ স্বর। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী সা, সমবাদী প। গায়ন সময় দিবা প্রথম প্রহর। কেহ কেহ একে কল্যাণ থাটের অন্তর্গত এবং বাদী গান্ধার বলেন। পূর্বাঙ্গ প্রধান ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সা রে গম পধ নির্সা
র্সা নি ধ প মগরেসা।

পকড়— সা গরেসনি় ধ় নি়ধ়প় সা।

মাণ্ড: বিলাবল থাটোৎপন্ন মিশ্র ও ক্ষুদ্র রাগ। রাজপুতানার মাড়বার অঞ্চলে এর উৎপত্তি ও প্রচলন। সব শুদ্ধ স্বর। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী সা, সমবাদী প। গায়ন সময় সর্বকালীক। সা, ম, প স্বরত্রয় মহত্বপূর্ণ। রে, ধ দুর্বল এবং নিষাদ আন্দোলিত। 'র্সা, নিধ, মপগ ম সা,' স্বর সংগতি মাণ্ড সূচিত করে। পূর্বাঙ্গ প্রধান, চঞ্চল প্রকৃতির বক্র রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সাগরে মগপম ধপনিধ র্সা
র্সাধনিপ ধ মপগ মসা।

পকড়— সা রেগ সা র্সা নিধ মপগ মসা।

ভটিহার: মারবা থাটোৎপন্ন মিশ্র ও ক্ষুদ্র রাগ। কোমল ৃরে ও দুই মধ্যম এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। খমাজ থাটের অন্তর্গত এক প্রকার ভাটিহারের প্রচলন ছিল যা বর্তমানে অপ্রচলিত। এটি একটি প্রাচীন রাগ, তবে বর্তমানে প্রচলিত রূপটি স্বতন্ত্র। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী শুদ্ধ মধ্যম, সমবাদী সা। গায়ন সময় রাত্রি অন্তিম প্রহর। আরোহে নিষাদ দুর্বল এবং অবরোহে বক্র। পূর্বাঙ্গ প্রধান।

আরোহাবরোহী—{ সা ধ প ধমপগ ম॑ধ র্সা
ৃরেঁনি ধপম পগ ৃরেসা।

পকড়— সা ধপ ম॑ধর্সা ৃরেঁনিধ পগ ৃরেসা।

সিন্ধুরা (সৈন্ধবী) : কাফী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর এক ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ। গ্, নি্ কোমল তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে গ, নি বর্জিত। কেহ কেহ আরোহে কিঞ্চিত নিষাদ ব্যবহার করে থাকেন। বাদী সা, সমবাদী প। গায়ন সময় সায়ংকাল। মতান্তরে সর্বকালীক। এই রাগটি কাফী অঙ্গের এক মিশ্রিত রূপ। উত্তরাঙ্গ প্রধান তথা ভক্তি রসাত্মক রাগ। প্রাচীন সংগীত পারিজাত ও হৃদয়প্রকাশ গ্রন্থে একে 'সিন্ধোড়া' নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরোহাবরোহী—{ সা রেমপ ধ র্সা
সা নি্ধপ মগ্ রেসা।

মুখ্য অঙ্গ— মপ নি্র্সারেঁগ্রেঁর্সা নি্ধ মপ মগ্রেসা।

পটদীপ : কাফী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর উত্তরাঙ্গ প্রধান একটি ক্ষুদ্র রাগ। গ্ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে, ধ বর্জিত। তবে আরোহে কচিৎ শুদ্ধ ধৈবতের ব্যবহার আছে। আরোহে ঋষভ দুর্বল তথা রে ধ স্বরদ্বয় কিছুটা নীচু শ্রুতিতে অবস্থিত। গায়ন সময় রাত্রি ১ম বা ২য় প্রহর। বাদী নি, সমবাদী ম। চঞ্চল প্রকৃতি তথা শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ।

নিষাদের শুদ্ধরূপ ছাড়া ভীমপলশ্রীর সঙ্গে এর আর বিশেষ প্রভেদ নেই, তাই এর নিষাদ স্বরটি অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। হংসকিংকিনী নামক রাগের সঙ্গেও এর সাদৃশ্য আছে তবে তার বাদী পঞ্চম তথা দুই গন্ধার ও দুই নিষাদ।

পরদীপ, প্রদীপকী, পটদীপকী প্রভৃতি রাগ সম্বন্ধে নানারকম অভিমত প্রচলিত আছে। এগুলি অভিন্ন রাগ কিনা সেকথা বলা শক্ত। এই সকল কৃত্রিম রাগকে ধুন বলাই শ্রেয়।

আরোহাবরোহী—{ নি় সা গ্ম প নির্সা
র্সা নি ধপ মগ্ রে সা।

মুখ্য অঙ্গ— র্সা নি ধপম পগ্ম পনি।

মিয়াঁকি সারং : কাফী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর, ক্ষুদ্র ও গম্ভীর প্রকৃতির পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ। জাতি ষাড়ব। গ বর্জিত। দুই নিষাদ তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী রে, সমবাদী প। গায়ন সময় দিবা ৩য় প্রহর। রেপ, রেম প্রভৃতি স্বর-সংগতি রাগবাচক। বিখ্যাত তানসেন এই রাগের স্রষ্টা বলে

কথিত আছে। মিয়া মল্লার রাগের গন্ধার বর্জন অথবা বৃন্দাবনী সারং রাগে ধৈবতযুক্ত করলে মিয়াঁকি সারং রাগ হয়।

আরোহাবরোহী—{ ধ়নি়সা রেমরে প নি়ধ নির্সা
সাঁ রেঁসাঁ ধনি়প মরে মরে নি়ধ় সা।

মুখ্য অঙ্গ— সা নি়সা ধ়নি় প়ধ়নি়সা রে পমরে সা।

বিলাসখানি তোড়ীঃ ভৈরবী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর ক্ষুদ্র প্রকৃতির উত্তরাঙ্গ প্রধান করুণ ও শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ। সব কোমল স্বর। জাতি সম্পূর্ণ। অবশ্য আরোহে ম, নি় দুর্বল। বাদী ধ়, সমবাদী গ়। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। তোড়ী ও আশাবরীর মিশ্রণে রচিত এই রাগ অত্যন্ত সুমধুর ও প্রসিদ্ধ। তানসেন-পুত্র বিলাস খাঁ এই রাগ সৃষ্টি করেছেন, এইরূপ কথিত আছে।

আরোহাবরোহী—{ সা রে়নি় সা রে়গ় মপ ধ়নি় সাঁরে়ঁগঁ রে়সাঁ
সাঁ রে়নি় ধ়ম ধ়প মগ় রে়সা।

মুখ্য অঙ্গ— সা রে়নি় সা রে়গ় মগ় রে়সা।

মালশ্রীঃ কল্যাণ থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র রাগ। জাতি ঔড়ব? রে, ধ বর্জিত। কড়ি মধ্যম তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী প, সমবাদী সা। গায়ন সময় সায়ংকাল। কেহ কেহ বলেন যে, সা, গ, প এই তিনটি মাত্র স্বর নিয়েই এই রাগ গঠিত। কিন্তু হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির নিয়মানুসারে কমপক্ষে পাঁচটি স্বর প্রয়োজন। এই জন্যই সম্ভবতঃ এই রাগে পাঁচটি স্বরের সমাবেশ করা হয়েছে। কারণ এর ম ও নি স্বরদ্বয় নিতান্তই গৌণ। এই স্বরদ্বয়ের ব্যবহার খুব কম হয় গ প এবং প সাঁ স্বরসংগতি রাগবাচক তথা বৈচিত্র্যপূর্ণ। রাগ নিয়মানুসারে একে একটি ব্যতিক্রম বলা যায়।

আরোহাবরোহী—{ সা গ প নিসাঁ
সাঁ নিসাঁ প মগ সা।

মুখ্য অঙ্গ— সা গ প গপগ সা পমপ প গ সা।

মালবীঃ পূরবী থাট। জাতি মিশ্র সম্পূর্ণ। আরোহে নি তথা অবরোহে ধ় দুর্বল। রে়, ধ় কোমল, কড়ি মধ্যম এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী রে, সমবাদী

প। গায়ন সময় সায়ংকাল। শ্রী অঙ্গের রাগ। মিশ্র শ্রেণী, বক্র প্রকৃতি তথা উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ। গ প এবং নি প স্বর-সংগতি রাগ বাচক তথা মহত্বপূর্ণ। মালবী রাগের উল্লেখ প্রাচীন শাস্ত্রে আছে কিন্তু বর্তমান প্রচলিত রূপ বহুলাংশে পরিবর্তিত।

আরোহাবরোহী— { সা রে্ গমঁপ মঁধ্ সাঁ / সাঁ নিপ মঁ গরে্ সা

মুখ্য অঙ্গ— সাঁ পগ পগ রে্সা সাগ মঁধ্ রে্ সাঁ।

ইমনীবিলাবল: বিলাবল থাট। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে ম বর্জিত। দুই নি, দুই ম তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী সা, সমবাদী প। গায়ন সময় দিবা ১ম প্রহর। অলৈহা ও কল্যাণ রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। মিশ্র শ্রেণী। এর রূপ প্রায় বিলাবলের মতো। তবে প্রতি-আলাপ-সমাপ্তিতে কড়ি মধ্যম প্রয়োগ করে রাগ-বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হয়। যেমন 'ধনি্ ধপ, মঁগ, মগরে' ইত্যাদি। কোমল নিষাদ প্রয়োগ না করেও কেহ কেহ এই রাগ গেয়ে থাকেন।

আরোহাবরোহী— { সা রেগপ ধনিসাঁ / সাঁনিধপ ধনি্ধপ মঁগ মগরে গরেসা।

মুখ্য অঙ্গ— ধনি্ধপ মঁগ মগরে।

ককুভবিলাবল: বিলাবল থাট। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে ম বর্জিত। দুই নি তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী স, সমবাদী প। গায়ন সময় দিবা ১ম প্রহর। বিলাবল ও জয়জয়ন্তী রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। পূর্বাঙ্গে 'রেগম, রেসরে, সা, ধ়্নি্প়' এই সরবিন্যাস জয়জয়ন্তী প্রকাশ করে তবে উত্তরাঙ্গে প্রায় 'সাঁ রেঁগঁ মঁরেঁসাঁ' এই স্বরবিন্যাস সহযোগে রাগ-বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হয়।

আরোহাবরোহী— { সা, রেগপ ^নি^ধ নি সাঁ / সাঁ নিধ নি্ধপ মগ ^ম^রে সারেসা।

মুখ্য অঙ্গ— গ রেগপ মগমরে সরে সা।

সরপর্দাবিলাবল: বিলাবল থাট। জাতি সম্পূর্ণ। প্রকৃতি বক্র। দুই নি তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী সা, সমবাদী প। গায়ন সময় দিবা

১ম প্রহর। পূর্বাঙ্গে গৌড়মল্লার ও উত্তরাঙ্গে অলৈহা এই দুটির মিশ্রণে এর উৎপত্তি। গৌড়মল্লার রাগের ছায়াই এতে অধিক প্রকটিত, তাই রাগ-বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য যথেষ্ট সাবধানতার প্রয়োজন।

আরোহাবরোহী— { সা ^{গ}রেগ গরেগম, প $^{নি}$ধ নিসা
{ সা নিধপ ধনিধপ ম পমগরে গ ^{ম}রে সা।

মুখ্য অঙ্গ— ধনিধপ মগরে রেগরে সা।

দেবগিরীবিলাবল: বিলাবল থাট। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে ম বর্জিত। সব শুদ্ধ স্বর। বাদী সা, সমবাদী প। গায়ন সময় দিবা প্রথম প্রহর। বিলাবল ও কল্যাণ রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। প্রকৃতি কিঞ্চিৎ বক্র। মিশ্র শ্রেণী। এর চলন বৈশিষ্ট্যানুসারে তীব্রমধ্যমকে বর্জন করা কঠিন, তাই বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন।

আরোহাবরোহী— { সা ^{গ}রে ^{প}গ প $^{নি}$ধ নি সা
{ সা নিধপ মগরে $^{রে}$নি রেগমগ $^{রে}$গ রে সা।

মুখ্য অঙ্গ—গ মগ রে নি রে নি রেগমগ $^{রে}$গ রে সা।

শুক্লবিলাবল: বিলাবল থাট। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে বর্জিত। দুই নি তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। প্রকৃতি কিঞ্চিৎ বক্র। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। বাদী ম, সমবাদী সা। বিলাবল ও কেদার রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। তবে উত্তরাঙ্গ প্রধান হওয়ায় এতে খমাজ রাগের ছায়া বেশী দেখা যায়। তাই রাগ-বাচক রে-প সংগতি তথা অবরোহে ধৈবতের সঙ্গে কিঞ্চিৎ কোমল নিষাদ প্রয়োগ করে রাগ-বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হয়। অবরোহে নি-গ এবং ধ-ম স্বর-সংগতিও রাগ-প্রকাশে মহত্বপর্ণ। এছাড়া উত্তরাঙ্গে সর্বদা তারঋষভ প্রয়োগ করাও রাগ-প্রকাশে সহায়ক হয়।

আরোহাবরোহী— { সা গ ম পধ নি সা
{ সা নি ধ প ধম মগ রেনিসা।

মুখ্য অঙ্গ— মপধনি ধম গম মপম গমরেসা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে শুক্লবিলাবল, নটবিলাবল, শুদ্ধনাট প্রভৃতি রাগের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এগুলি প্রাচীন বৃহন্নট বা নটনারায়ণ রাগের

স্থান অধিকার করেছে। কথিত আছে, বিখ্যাত তানসেন শুক্লবিলাবল রাগ রচনা করেছেন। মধ্যযুগে তানসেন তথা অন্যান্য গুণীরা বহু রাগ (নাম) সৃষ্টি করেছেন। এইরূপে নটবিহাগ, পটবিহাগ, মিয়াকিমল্লার, মিয়াকিতোড়ী, মিয়াকিসারং, বিলাসখানি-তোড়ী, দরবারী প্রভৃতিব উদ্ভব হয়। কিন্তু তৎকালীন গুণীরা যদি প্রাচীন শাস্ত্রীয় রাগসমূহ সম্পর্কে সজ্ঞান থাকতেন এবং রাগ-রচনার মূল তত্ত্ব অনুশীলন করতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে এইসকল নতুন নামকরণের কোন প্রয়োজন ছিল না। পরবর্তীকালে এব জন্য নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

হংসধ্বনি ঃ বিলাবল থাট। জাতি ঔড়ব। ম, ধ বর্জিত। সব শুদ্ধ স্বর। বাদী সা, সমবাদী প। মতান্তরে গ বাদী। ছায়ালগ শ্রেণী, প্রকৃতি বক্র। গায়ন সমর রাত্রি ১ম প্রহর। এটি দক্ষিণ ভারতীয় রাগ, উত্তর ভারতে তেমন প্রচলিত নয়। উত্তরাঙ্গ ভাবাপন্ন রাগ।

আরোহাবরোহী— { সা রে গপগরে গ প নি র্সা
র্সা নিপ গরে গরে সা।

মুখ্য অঙ্গ— গপগরে সা রেগসা গপ নি।

হেমকল্যাণ ঃ বিলাবল থাট। জাতি ষাড়ব-ঔড়ব। নি বর্জিত এবং অবরোহে ধ দুর্বল। যদিও নাম কল্যাণ কিন্তু কড়ি মধ্যমের প্রয়োগ হয় না, বরং সব শুদ্ধ স্বর। বাদী সা, সমবাদী প। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। এর বিস্তার মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকেই অধিক হয়। মিশ্র শ্রেণী তথা বক্র প্রকৃতির রাগ। কামোদ, শুদ্ধকল্যাণ ও কেদার রাগেব মিশ্রণে এর উৎপত্তি। এই সকল রাগের প্রভাব মুক্ত করে রাগ-বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে যথেষ্ট সাবধানতা তথা কুশলতার প্রয়োজন।

আরোহাবরোহী— { সা প্ধ্প্ সা রেসা সাম গপ পধপ র্সা
র্সা পধপ গমপ ^পগ ^পরে সা।

মুখ্য অঙ্গ— সা প্ধ্প্ সা রেসা ম গপ গম রেসা।

দীপক ঃ দীপক বহু প্রাচীন রাগ। এর প্রকৃত রূপ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত এবং এই রাগ সম্পর্কে বিবিধ কাহিনী প্রচলিত। এই রাগের যে সকল গান পাওয়া গেছে তাতে বিলাবল, পূরবী ও কল্যাণ থাটোৎপন্ন রূপ লক্ষিত হয়।

(১) বিলাবল থাটের রাগ হোল যাড়ব-সম্পূর্ণ জাতির। আরোহে রে বর্জিত তথা অবরোহে ধ বক্র। দুই নি তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী গ, সমবাদী নি। গায়ন সময় রাত্রিকাল। বেহাগ ও ঝিঁঝিঁট রাগের মিশ্রণে নাকি এর উৎপত্তি। মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকেই এর বিস্তার অধিক হয়।

আরোহাবরোহী— { সা গমপ ধপ নি র্সা
র্সা নিধপ নিপ মগ রেসা।

চলন—প্‌ মপধ্‌ পনি্‌ সা সাগ গরেসা গমপ ধপ নিধপ গম রেসা নিধ্‌ পধ্‌ সা।

(২) পূরবী থাটোৎপন্ন রাগটি সায়ংকালীন এবং উত্তরাঙ্গ প্রধান। এর আরোহে ঋে তথা অবরোহে নি বর্জিত। বাদী সা, সমবাদী প। মতান্তরে বাদী প, সমবাদী সা।

চলন— { র্সা প গপগঋেসা সাগপ মঁধপ গমঁধপ র্সা নির্সা ঋের্সা
প গপগঋেসা।

(৩) কল্যাণ থাটোৎপন্ন রাগটি রাত্রিকালীন এবং নি বর্জিত হয়।

জলধর কেদার ঃ বিলাবল থাট। জাতি ঔড়ব। গ, নি বর্জিত। সব শুদ্ধ স্বর। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। মিশ্র শ্রেণী তথা উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ। কেদার, মল্লার ও দুর্গা রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। এর স্বরক্রম দুর্গার মতো হলেও কেদারের স্বরবিন্যাস সহযোগে বিস্তার করে মাঝে মাঝে রে প এবং ম রে স্বর-সংগতি তথা মধ্যমের উপরে ন্যাস করলে রাগ-বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে রক্ষিত হয়।

আরোহাবরোহী— { সা রেসা ম মপধ র্সা
র্সা ধপ মরে সা।

মুখ্য অঙ্গ— ধপ মরে সা।

জৈতকল্যাণ ঃ কল্যাণ থাট। জাতি ঔড়ব। ম, নি বর্জিত। বাদী প, সমবাদী সা (মতান্তরে রে)। সব শুদ্ধ স্বর। গায়ন সময় রাত্রি ১ম প্রহর। আরোহে ^পগ প এবং অবরোহে ধ গ স্বর-সংগতি রাগবাচক। উত্তরাঙ্গে 'র্সরের্সা, পধপ, ^ধগ প' স্বরবিন্যাস রাগ-বাচক ও বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ। কারণ এর সমপ্রকৃতিক দেশকার, ভূপালী, শুদ্ধকল্যাণ প্রভৃতি বহু রাগ আছে। তবে পঞ্চমের বাদীত্ব একে ভূপালী আদি রাগ থেকে রক্ষা করে। ছায়াগল শ্রেণী তথা বক্র প্রকৃতির একটি। উত্তরাঙ্গ ভাবাপন্ন রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সা ^প^গ প পধপ র্সা
রেঁর্সা প ^ধ^গ প ^প^রে সা।

মুখ্য অঙ্গ— সা গপ ধপ গ ^প^রে সা প্ সা।

শ্যামকল্যাণ ঃ কল্যাণ থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর বক্র প্রকৃতির রাগ। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে গ ধ বর্জিত। দুই মধ্যম তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। আরোহণে তীব্র এবং অবরোহণে কোমল মধ্যম ব্যবহৃত হয়। বাদী প, সমবাদী সা। গায়ন সময় রাত্রি ১ম প্রহর। কামোদ ও কল্যাণ রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। যার থেকে বাঁচানোর জন্য তীব্র মধ্যম ও শুদ্ধ নিষাদের বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ প্রয়োগ তথা গান্ধারকে বক্র প্রয়োগে অল্পত্ব দেওয়া হয়। যেমন 'ধপ র্মপ ^প^গ ম রে'। এছাড়া সারং রাগ থেকেও বিশেষ কুশলতার সঙ্গে একে রক্ষা করতে হয়।

আরোহাবরোহী—{ নি়সা রে র্মপ নি ^ধ^নি র্সা
র্সা নিধ ^র্ম^প মরে ^প^গ ^ম^রে ^গ^নি় সা।

মুখ্য অঙ্গ— গমরে ^গ^নি় সা রেসা রের্মপ।

মলুহা কেদার ঃ কল্যাণ থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর বক্র প্রকৃতির রাগ। জাতি মিশ্র সম্পূর্ণ। আরোহে রে, ধ তথা অবরোহে প গ দুর্বল ও বক্র। দুই নি, দুই মধ্যম তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। পূর্বাঙ্গ প্রধান। কেদার, কামোদ ও শ্যামকল্যাণ রাগের মিশ্রণে এর উত্তপত্তি। এর আলাপ প্রায়ই নিষাদ থেকে সুরু হয়। তীব্র মধ্যম সাধারণতঃ 'ধর্মপ' বা 'পধর্মপ' এইরূপে প্রয়োগ করা হয়।

আরোহাবরোহী—{ ^রে^নি়সা মরেসা মগপ র্ম ধর্ম প র্সা
র্সা নিধ র্ম প ^প^গ ^ম^প গমরেসা নিধ়প়র্মপ় সা।

মুখ্য অঙ্গ— মরেসা সা ধ়প়ম় প়প় নি়সা।

গান্ধারী ঃ আশাবরী থাট। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে গ বর্জিত। দুই রে, দুই নি, কোমল গ্, ধ্ তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ধ্, সমবাদী রে্। মতান্তরে গ সমবাদী। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর। আশাবরীতে শুদ্ধ রে এবং আরোহে গ্ নি্ বর্জিত। এছাড়া আশাবরী, জৌনপুরী প্রভৃতির সঙ্গে এর

বিশেষ পার্থক্য নেই। অনেকে দুই গান্ধারযুক্ত দেবগান্ধার রাগকে গান্ধারী বলে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এর পাশাপাশি অনেক রাগ থাকায় এর স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে গাওয়া কষ্টসাধ্য, সম্ভবতঃ এই কারণেই রাগটি অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে।

আরোহাবরোহী— { সা রে মপ ধ্ ম পধ্ নির্সা
সাঁ নিধ্ মপ ^{প}গ ^{গ}রে ^{গ}রে ^{গ}নিসা।

মুখ্য অঙ্গ— রেমপ, নিধ্ প মপ ^{ম}গ রেসা।

জোগ: কাফী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর ভক্তি ও শৃঙ্গার রসাত্মক একটি পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ। দুই গান্ধার, দুই নিষাদ তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। রে, ধ স্বরদ্বয় বর্জিত, জাতি ঔড়ব। বাদী সা সমবাদী প। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। যদিও এটি মালকোষ অঙ্গের একটি শ্রুতিমধুর রাগ, কিন্তু এর চলন তিলংয়ের মতো। শুধু আলাপাদির শেষে 'গমপ গমগ সাগ্সা' স্বরবিন্যাস বারবার প্রয়োগ করে রাগের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করা হয়।

আরোহাবরোহী— { নিসা পনি সা গমপ নিপ নির্সা
সাঁ পনিপ গমগ সাগ্সা।

মুখ্য অঙ্গ— নিসা পনিসা গমপ নিপ গমগ সাগ্সা।

নন্দ: কল্যাণ থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর একটি বক্র প্রকৃতির রাগ। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে বর্জিত। দুই মধ্যম এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী সা, সমবাদী প। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। হমীর, কামোদ, ছায়ানট ও বেহাগ রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। এদের প্রভাব এড়িয়ে নন্দ রাগ গাওয়া খুব কঠিন। এর মধ্যম স্বরটি অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ এবং রাগ প্রকাশক। যেমন, 'সাগম, ধপ, রেসাগম'।

আরোহাবরোহী— { সা গম পধ $^{নি}$প সাঁ
সাঁ $^{নি}$ধ ^{ম}প গম ধপ ^{ম}রে সাগম।

মুখ্য অঙ্গ— গমধপ রে সাগম।

খম্বাবতী: খমাজ থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর রাগ। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে গ, নি বর্জিত। দুই নি তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী গ, সমবাদী

ধ। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। মাণ্ড, সিন্ধুড়া, সোরট, খমাজ, বাগেশ্রী প্রভৃতি রাগের ছায়া পাওয়া যায়। আসলে খমাজ রাগের অল্প পরিবর্তন করে এর উৎপত্তি। এর প্রকৃতি ক্ষুদ্র কিন্তু অত্যন্ত মধুর রাগ। এই ধরণের রাগকে ধুন বলাই সঙ্গত।

আরোহাবরোহী— { সা রেগসা রেম পধ র্সা
র্সা নি় ধ পধ ম ^পগ ^মসা।

মুখ্য অঙ্গ— নি়ধপ ধমগ ^মসা।

রাগেশ্রী ঃ খমাজ থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর একটি উভয়াঙ্গ প্রধান রাগ। জাতি ঔড়ব-ষাড়ব। প বর্জিত তথা আরোহে রে দুর্বল। দুই নি ও অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী গ, সমবাদী নি। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। এর উত্তরাঙ্গে বাগেশ্রীর ছায়া প্রবল, তবে শুদ্ধ গান্ধার ও নিষাদ প্রয়োগ করে রাগ-বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হয়। এটি শৃঙ্গার ও ভক্তি রসাত্মক একটি অত্যন্ত সুমধুর রাগ।

আরোহাবরোহী— { সা গ ম ধ নি র্সা
র্সা নি় ধম গম ^রগ ^মসা।

মুখ্য অঙ্গ— ধনি়সা মগ মধ মগ ম সা।

মালগুঞ্জ ঃ কাফী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর একটি পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে প বর্জিত এবং রে দুর্বল। দুই গ, দুই নি তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় রাত্রি ৩য় প্রহর। বাগেশ্রী, রাগেশ্রী, জয়জয়ন্তী, গারা প্রভৃতি রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। এই সকল রাগের প্রভাব এড়ানোর জন্য এর প্রকৃতি কিঞ্চিৎ বক্র। কেহ কেহ পঞ্চমের স্থানে আরোহে গান্ধার বর্জন করে থাকেন। এটি শৃঙ্গার রসাত্মক একটি সুমধুর রাগ।

আরোহাবরোহী— { সারেসা গম মধনির্সা
র্সা নি়ধপম গম গ়রে সা।

মুখ্য অঙ্গ— গমগ় রেসা নি়সা ধনি়সা।

শাহানা ঃ কাফী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর একটি পূর্বাঙ্গ প্রধান, বক্র প্রকৃতির রাগ। গ় নি় কোমল তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী প, সমবাদী সা।

গায়ন সময় রাত্রি ৩য় প্রহর। আরোহে কচিৎ শুদ্ধ নিষাদ ব্যবহৃত হয়। নায়কী ও সুঘরাই কানাড়ার মিশ্রণে এর উৎপত্তি। এটি শৃঙ্গার ও ভক্তি রসাত্মক একটি সুমধুর রাগ।

আরোহাবরোহী— নি্সা গ্মপ নি্ধপ র্সা
র্সানি্ ধনি্প মপ গ্ম রেসা।

মুখ্য অঙ্গ— সা নি্ধ্ নি্প্ সা প মপ গ্ রেসা।

কানাড়ার প্রকারভেদ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে মধ্যযুগের অনেক গুণী রাগ রচনার মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। সামান্য পরিবর্তন সহযোগেই তাঁরা নতুন রাগ সৃষ্টি করেছেন। ফলে আড়াণা, নায়কী, সুহা, সুঘরাই, হুসেনী, আভোগী, শাহানা প্রভৃতি প্রায় অভিন্ন রূপযুক্ত রাগের সৃষ্টি হয়েছে। তাই এগুলির প্রচলন কম। যদি কেহ উক্ত কোন রাগ পরিবেশন করেন, নাম না শোনা পর্যন্ত তা সঠিকরূপে নির্ণয় করা কঠিন।

বাগেশ্রীবহার ঃ কাফী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর একটি বক্র প্রকৃতির উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে, প বর্জিত। গ্ কোমল, দুই নি তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। বাগেশ্রী ও বাহার রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। ম এবং প স্বরদ্বয় বদল করে এই রাগদ্বয়ের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটানো হয়। যেমন 'ম নি্ধম প পমগ্ম মনি্ধ র্সানি্ধম' এবং 'মনি্ধ নির্সা নি্প, সা র্সানি্প র্রের্সা নি্ধনি্প' ইত্যাদি। এটি একটি শৃঙ্গার রসাত্মক সুমধুর রাগ।

আরোহাবরোহী— সা গ্ ম ধ নি্ধ র্সা
র্সা নি্ধ মপ ^প^গ্ মরেসা।

মুখ্য অঙ্গ— ধনি্ ধম পমগ্ মরেসা।

হিন্দোলবহার ঃ মিশ্র থাট। মিশ্র শ্রেণী। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে বর্জিত। দুই ম, দুই নি, দুই গ এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ধ, সমবাদী গ। গায়ন সময় রাত্রি অন্তিম প্রহর। হিন্দোল ও বহার রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। পূর্বাঙ্গে হিন্দোল এবং উত্তরাঙ্গে বহার রাগ প্রকটিত থাকে। সাধারণতঃ 'সাগ মগ মনি্ধ ধনি্র্সা নি্প মগম গসা' (পূর্বাঙ্গে) এবং মনি্র্সা র্রেগ্ র্রের্সা নির্সর্রের্সা নি্ধ (উত্তরাঙ্গে) এইরূপ স্বর বিস্তার করা হয়। উত্তরাঙ্গ

প্রধান ও বক্র প্রকৃতির রাগ। কেহ কেহ পঞ্চম বর্জন করেও এই রাগ গেয়ে থাকেন। তবে সেই মত অধিক সমর্থিত নয়।

আরোহাবরোহী— { সা গ ৃগ মপগ্ম নি্ধ র্সা
সা নি্প মপগ্ম নিধ ৃগ ৃগ সা

মুখ্য অঙ্গ— মনি্ধ ধনি্র্সা নি্প ৃগ ৃগ সা

বসন্তবহারঃ মিশ্র থাট। মিশ্র শ্রেণী। বক্র প্রকৃতি। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে বর্জিত। সপ্তকের সবগুলি স্বরই এই রাগে ব্যবহৃত হয়। বাদী র্সা (তার ষড়্জ), সমবাদী প। গায়ন সময় রাত্রি ৩য় প্রহর। উত্তরাঙ্গ প্রধান। বসন্ত ও বহার রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। উভয় রাগই আরোহাবরোহণে প্রদর্শিত হয়। তবে সাধারণতঃ আরোহে বহার এবং অবরোহে বসন্ত রাগ প্রদর্শিত হয়ে থাকে। বহার প্রদর্শনকালে 'সা, ম, পগ্, ম নি্ ধ, নির্সা' এবং বসন্ত প্রদর্শনকালে 'সা, ম, গর্মধ্ নির্সা' ইত্যাদি স্বরবিন্যাস প্রয়োগ করা হয়। অবরোহে দুটি ঋষভই ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ আরোহে ঋষভ প্রয়োগ করেও গেয়ে থাকেন।

আরোহাবরোহী- সা মপ গ্ম নি্ধ নির্সা
র্রের্সা নিধ্প ৃগর্ম গর্রে সা।

মুখ্য অঙ্গ— র্সা নিধ্প ৃগ ৃগ র্রেসা মমপ গ্ম নি্ধ নির্সা নি্ধপ ৃগ ৃগ।

ভৈরববহারঃ মিশ্র থাট। মিশ্র শ্রেণী। বক্র তথা গম্ভীর প্রকৃতির উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ। জাতি সম্পূর্ণ। দুই রে, দুই গ, দুই নি তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। ভৈরব ও বহার রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। আলাপাদির সমাপ্তিতে সাধারণতঃ 'রেগ র্রেসা, নি্র্রে সা' এইরূপ স্বরবিন্যাস করা হয়। এই রাগে শুদ্ধ ও কোমল স্বর-প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যেমন শুদ্ধ গান্ধারের পরে শুদ্ধ ঋষভ, শুদ্ধ ঋষভের পরে কোমল গান্ধার এবং কোমল গান্ধারের পরে কোমল ঋষভ ব্যবহৃত হয়। তবে কোমল ধৈবত যেন কোনমতে প্রয়োগ না করা হয়। কারণ শুদ্ধ ধৈবতই, এর স্বতন্ত্রতা রক্ষা করার প্রধান স্বর। এছাড়া অহীর ভৈরব থেকে বাঁচানোর জন্য কোমল নিষাদ থেকে কোমল ঋষভে কখনো যাওয়া উচিত নয়। বহার রাগের সংমিশ্রণে বহু রাগের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে এই রাগই সবচেয়ে মধুর ও জনপ্রিয়।

আরোহাবরোহী— { সা রেগ মপম মধনির্সা নির্রে্সা
সা নিধপ মগ রেগ রেসা নিরেসা নিধসা।

মুখ্য অঙ্গ— ধনি ধপ মগরে গরেসা।

আনন্দ ভৈরব ঃ মিশ্র থাট। মিশ্র শ্রেণী তথা ভক্তিরসাত্মক গম্ভীর প্রকৃতির বক্র রাগ। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে ধ বর্জিত। রে কোমল, তুই নি তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। ভৈরব ও বিলাবল রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। পূর্বাঙ্গে ভৈরব এবং উত্তরাঙ্গে বিলাবল। ভৈরবের মতোই এর কোমল ঋষভ আন্দোলিত। উত্তরাঙ্গে বিলাবল থেকে বাঁচানোর জন্য 'প সা ধ নি প এইরূপ স্বরবিন্যাস প্রয়োগ করা হয়। ভাটিহার রাগের সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুব বেশী। বর্তমানে ভাটিহার রাগের বহুল প্রচারে এর প্রচার কমে গেছে। আনন্দ ভৈরবী নামে আর একটি রাগ আছে যার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

আরোহাবরোহী— { সা রেগম পম পর্সা
সা ধনিপ মগ ম রেসা।

মুখ্য অঙ্গ— মগরে গরে সা রেগম মপ সা ধনিপ মগ মরে সা।

শিবমত ভৈরব ঃ মিশ্র থাট। মিশ্র শ্রেণী তথা ভক্তিরসাত্মক বক্র রাগ। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে নি তুর্বল। রে, ধ কোমল, তুই গ, তুই নি তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী প, সমবাদী সা। মতান্তরে ধ-রে বাদী-সমবাদী। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। প্রাচীন শাস্ত্রে একে শিব ভৈরব বা শুদ্ধ ভৈরব বলা হয়েছে। তবে এই রাগ তারই বিবর্তিত রূপ কিনা সেকথা বলা কঠিন। কারণ এই রাগে ভৈরব, ভৈরবী, আশাবরী, তোড়ী প্রভৃতি রাগের আভাস পাওয়া যায়। তবে একে ভৈরব ও আশাবরীর মিশ্রণ বলে মনে হয়। বর্তমানে এর প্রচলন খুব কম।

আরোহাবরোহী— { সা রেসা গমপ নিধ নিধ সা
সা নিধপ মগমপ মগম মরে গরে সা।

মুখ্য অঙ্গ— গমপ ধধ সা রেনিধপ ধনিধপ ম রেগরে সা।

বঙ্গালভৈরব ঃ ভৈরব থাট। জাতি ষাড়ব। নি বর্জিত। রে, ধ

কোমল। বাদী ধ, সমবাদী রে। গায়ন সময় দিবা ১ম প্রহর। অবরোহে গ বক্র। ছায়ালগ শ্রেণী। রে, ধ ভৈরবের মতোই আন্দোলিত এবং সা ধ ও সাঁ ধ স্বর-সংগতি রাগ বাচক। আসলে ভৈরব রাগের নি বর্জন করে গাইলেই এই রাগ হয়। উত্তরাঙ্গে বিভাস তথা গান্ধারী রাগের প্রভাব এড়ানোর জন্য মধ্যমে ন্যাস করা হয়। বঙালী নামে একটি রাগ আছে যার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

আরোহাবরোহী—{ সা রেগম পধ সাঁ
সাঁ ধ পম পগম রে সা।

মুখ্য অঙ্গ— সা ধধ প গম প গমরে সারেসা ধসা ধপ গমরেসা।

প্রভাত ভৈরব ঃ ভৈরব থাট। জাতি সম্পূর্ণ। রে, ধ কোমল দুই মধ্যম তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় দিবা ১ম প্রহর। ভৈবব ও ললিত রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। মিশ্র শ্রেণী, বক্র প্রকৃতি এবং শৃঙ্গার ও ভক্তি রসাত্মক রাগ। আসলে ভৈরবের সঙ্গে কড়ি মধ্যম যুক্ত করলেই এর উৎপত্তি হয় কিন্তু রামকলিতেও ঐরকম স্বরবিন্যাস থাকায় এর বেশী প্রচলন হয় নি।

এই রাগে ভৈরবের প্রাধান্যই বেশী। মধ্যমের উপবে ন্যাস করে, 'ম্ধম্মগ' স্বরবিন্যাস-যোগে ললিতের ছায়া প্রদর্শন করে শেষে ভৈরব অঙ্গ প্রদর্শিত হয়।

আরোহাবরোহী—{ নিরে গমম্গ গমপ ধ নিসাঁ
সাঁ নিধপ ম মধ ম্মগ রেগ ম্গ রে সা।

মুখ্য অঙ্গ— গম $^{নি}$ধ $^{নি}$ধ প মগরে গম ম্মগ গমগ রেসা।

গোপিকাবসন্ত ঃ আশাবরী থাট। জাতি ষাড়ব। রে বর্জিত। গ, ধ, নি কোমল তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী সা, সমবাদী ম। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। মিশ্র শ্রেণী, বক্র প্রকৃতি তথা গম্ভীর ভক্তিরসাত্মক রাগ। আশাবরী ও মালকোষ রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। আলাপাদির শেষে রাগ-রূপ-বৈশিষ্ট্য হিসাবে 'ধ ম প মগ মসা' এই স্বরবিন্যাস করা হয়। এর পূর্বাঙ্গে মালকোষ এবং উত্তরাঙ্গে আশাবরীর প্রকাশ থাকে। এটি একটি দক্ষিণ ভারতীয় রাগ উত্তর ভারতে এর প্রচলন কম। একে গোপিবসন্তও বলা হয়।

আরোহাবরোহী—{ সা গুম প নি ধ নি সাঁ
সাঁ নিধনি ধম পমগ সা।

মুখ্য অঙ্গ— নিসা গম পধ নি ধ ধনি ধম সা।

সিন্ধু ভৈরবীঃ আশাবরী থাট। জাতি সম্পূর্ণ। দুই রে, গ ধ নি কোমল তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ম, সমবাদী সা। মতান্তরে বাদী ধ সমবাদী রে,। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর। মিশ্র শ্রেণী, চঞ্চল প্রকৃতি তথা ভক্তি রসাত্মক রাগ। মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকেই আলাপাদি বেশী হয়। সুতরাং পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ।

আবোহাবরোহী—{ সা রেগম পধ নি সাঁ
সাঁ নিধপ মগ রেসা।

মুখ্য অঙ্গ— পগরে সারে নিসা ধপধ সা ধনিসা।

কৌসীকানাড়া (মালকোষ অঙ্গ)ঃ আশাবরী থাট। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে, প বর্জিত। গ, ধ, নি কোমল তথা অন্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় মধ্যরাত্রি। মালকোষ ও কানাড়ার মিশ্রণে এর উৎপত্তি। মিশ্র শ্রেণী, গম্ভীর প্রকৃতি তথা পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ। এই রাগ মালকোষ এবং বাগেশ্রী এই দুটি অঙ্গে গাওয়া হয়। মালকোষ অঙ্গেরটিই অধিক প্রসিদ্ধ। এর রূপ প্রায় মালকোষের মতো। শুধু আলাপাদির শেষে 'প গ ম রে সা' এই স্বরবিন্যাস-যোগে রাগরূপ প্রদর্শিত তথা স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হয়।

আরোহাবরোহী—{ নি সা গ ম ধ নি সাঁ
সাঁ নিধ ম প ম গ ম রে সা।

মুখ্য অঙ্গ— নিসা গম ধনিধম পগ মগ রেসা।

কৌসীকানাড়া (বাগেশ্রী অঙ্গ) কাফী থাট। জাতি মিশ্র। মিশ্র শ্রেণী, বক্র প্রকৃতি তথা উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ। গ, নি কোমল তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। আরোহে রে, প এবং অবরোহে ধ, গ দুর্বল তথা বক্র। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় মধ্যরাত্রি। কানাড়া ও বাগেশ্রী রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। 'নি প গ ম রে' স্বরবিন্যাস যোগে কানাড়া তথা 'গম ধ নি রেঁসা' স্বরবিন্যাস যোগে বাগেশ্রী অঙ্গ প্রদর্শিত হয়। এই রাগের সঙ্গে খম্বাবতী এবং বাগেশ্রী

কানাড়া প্রভৃতিরও সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই এর কোনটিই বিশেষ জনপ্রিয় হতে পারে নি।

আরোহাবরোহী— { সা রেনুসা গুমধ নিরেঁ সাঁ
 { সাঁ ধনিপ মপধ গুমরে সা।

মুখ্য অঙ্গ— সা নিসা পমপ গুমধ নিপ মধনিরেঁসাঁ নিপ গুমরেসা।

ললিত পঞ্চমঃ ভৈরব থাট। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে প বর্জিত। রে, ধ কোমল, দুই মধ্যম তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় রাত্রি অন্তিম প্রহর। ললিত ও পরজ বা বসন্ত রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চম ও কোমল ধৈবত যুক্ত ললিতের নাম ললিত পঞ্চম। মিশ্র শ্রেণী, বক্র তথা গম্ভীর প্রকৃতি এবং উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ।

আরোহাবরোহী— { সা রেসা গম মগ মধ নিসাঁ
 { সাঁ নিধপ ধমম পগ মরে সা।

মুখ্য অঙ্গ— গমগ রেসা নিসাগম মগ পম রেনি ধপ ধমম পগ রেসা।

মধুবন্তী (অম্বিকা)ঃ তোড়ী থাট। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে, ধ বর্জিত। কোমল গু, কড়ি মধ্যম তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী প, সমবাদী সা। গায়ন সময় দিবা ৩য় প্রহর। মুলতানী ও ভীমপলশ্রী রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। মিশ্র শ্রেণী তথা শৃঙ্গার ও করুণ রসাত্মক রাগ।

আরোহাবরোহী— { নিসা মগু মপ নিসাঁ
 { সাঁ নিধপ মগু মগু রেসা।

মুখ্য অঙ্গ— ধপ মগু মগু রেসা।

পুরিয়াকল্যাণ (পূর্বা কল্যাণ)ঃ মারবা থাট। জাতি সম্পূর্ণ। পঞ্চম দুর্বল। কোমল রে কড়ি মধ্যম তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী কোমল রে, সমবাদী শুদ্ধ ধৈবত। বাদী-সমবাদী ছাড়াও এর গ, নি স্বরদ্বয় মহত্বপূর্ণ। গায়ন সময় রাত্রি ১ম প্রহর। পূর্বাঙ্গে পুরিয়া এবং উত্তরাঙ্গে কল্যাণ রাগের আভাস পাওয়া যায়। এই দুটি রাগের মিশ্রণেই এর উৎপত্তি। তাছাড়া শ্রী অঙ্গের 'পরেগ' স্বরবিন্যাসও এতে ব্যবহৃত হয়। মিশ্র শ্রেণী, পূর্বাঙ্গ প্রধান তথা গম্ভীর ও করুণ রসাত্মক রাগ। এই রাগটি আধুনিক হলেও এর নিজস্ব একটি স্বতন্ত্রতা আছে।

আরোহাবরোহী—{ সা রেগ ম পধ নিসা
সা নিধ পমগ রেসা।

মুখ্য অঙ্গ— নিধ পমগ মরে সা।

গুর্জরী তোড়ী ঃ তোড়ী থাট। জাতি ষাড়ব। প বর্জিত। রে, গ, ধ কোমল কড়ি মধ্যম তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ধ, সমবাদী রে। মতান্তরে গ সমবাদী। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর। এর রূপ তোড়ীর মতোই, শুধু পঞ্চম বর্জন করে গাওয়া হয়। ছায়ালগ শ্রেণী, পূর্বাঙ্গ প্রধান তথা ভক্তি রসাত্মক রাগ।

আরোহাবরোহী—{ নিরে গম ধ নিসা
সা নিধ ম গরে গরে সা।

মুখ্য অঙ্গ— মধ নিধ মগ রেগ রেসা।

বাহাদুরী তোড়ী ঃ তোড়ী থাট। তোড়ী অঙ্গের হলেও এব ভৈরবী থাট হওয়া উচিত। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আবোহে নি বর্জিত। দুই রে, গ ধ কোমল ও অন্য স্বর শুদ্ধ। বাদী সা, সমবাদী প। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর। আশাবরী ও ভৈরবীব মিশ্রণে এর উৎপত্তি। কেহ কেহ এতে দেশী রাগের মিশ্রণও কবে থাকেন। এর পাশাপাশি অনেক রাগ থাকায় এর স্বতন্ত্র রূপ বজায় রাখা কঠিন। সম্ভবত এই কারণেই এর প্রচলন কম। মিশ্র শ্রেণী তথা বক্র প্রকৃতির রাগ।

আরোহাবরোহী—{ রেনি সারেগ $^{\text{সা}}$রেগ মপ $^{\text{নি}}$ধ সা
সা রেনিধ মগ রেগ $^{\text{সা}}$রে গরেসা।

মুখ্য অঙ্গ— রেনিসা রেগ পরেগ সরে নিসা।

সোরঠ ঃ খমাজ থাট। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে গ ধ বর্জিত। দুই নি তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী রে, সমবাদী ধ। মতান্তরে বাদী প, সমবাদী রে। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। মিশ্র শ্রেণী তথা উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ। দেশ রাগের সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকায় গান্ধারকে যথাসম্ভব কম প্রয়োগ করা হয়। তাই অবরোহেও গ অত্যন্ত দুর্বল, ম রে মীড় যোগে শুধু সামান্য প্রয়োগ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, খমাজ থাটোৎপন্ন রাগগুলিকে

দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যেমন, ১। গান্ধার প্রবল এবং ২। ঋষভ প্রবল রাগসমূহ। এই হিসাবে সোরঠ দ্বিতীয় শ্রেণীর রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সা রে মপ নিসাঁ
{ সাঁ রেঁসাঁ নিধ মপধ মরে নিসা।

মুখ্য অঙ্গ— রে প মপধ মরে নিধ মরে সা।

আভোগী ঃ কাফী থাট। জাতি ঔড়ব। প, নি বর্জিত। কোমল গ্‌ তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী সা, সমবাদী ম। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। এর সঙ্গে বাগেশ্রী রাগের সাদৃশ্য প্রবল। তাছাড়া এর মধ্যমকে ষড়্‌জ স্থির করে গাইলে কলাবতী নামক রাগ উৎপন্ন হয়। এটি মিশ্র শ্রেণীর পূর্বাঙ্গ প্রধান তথা শৃঙ্গার ও ভক্তিরসাত্মক একটি সুমধুর রাগ।

আরোহাবরোহী—{ সা রেগ্‌ ম ধ সাঁ
{ সাঁ ধম গ্‌রে সা।

মুখ্য অঙ্গ—মগ্‌রেসা ধ্‌ধ্‌ সা মম ধগ্‌ মগ্‌মধ সাঁ ধম গ্‌সা।

হংসকিংকিনী ঃ কাফী থাটোৎপন্ন মিশ্র শ্রেণীর উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে, ধ বর্জিত। দুই গ, দুই নি তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী প। সমবাদী সা। গায়ন সময় দিবা ৩য় প্রহর। সাধারণতঃ আরোহে শুদ্ধ এবং অবরোহে কোমল গান্ধার ও নিষাদ ব্যবহৃত হয়। তবে এর প্রকৃতি বক্র, তাই 'সাঁ নি ধ প' এইরূপে কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হলেও কোমল গান্ধার 'মগ্‌ রেসা' এইরূপে প্রয়োগ হয় না। উভয় গন্ধারই বৈচিত্র্য-পূর্ণ এবং প গ্‌ সংগতি রাগবাচক। ভক্তি ও শৃঙ্গার রসাত্মক এই রাগ কিঞ্চিত কঠিন হলেও অত্যন্ত শ্রুতিমধুর।

এই রাগে খমাজ, পিলু, ভীমপলশ্রী, পটদীপ, কাফী, ধনাশ্রী প্রভৃতি অনেক রাগের আভাস পাওয়া যায়, স্বভাবতঃই এই রাগ গাওয়া কঠিন ও সাধনাসাপেক্ষ। তাই এর তেমন প্রচলন নেই। ভীমপলশ্রী ও পটদীপ বা ভূপালী ও দেশকার প্রভৃতি রাগে যেমন বাদী ভেদে রাগ ভেদ হয়ে থাকে, প্রদীপকী নামক রাগের সঙ্গে এর ঠিক তেমনি সম্বন্ধ।

আরোহাবরোহী—{ নি় সা গ ম প প নি সাঁ
{ সাঁ নিধপ মপগ্‌ মগ্‌রে সা।

মুখ্য অঙ্গ— সাগ মপ গ্‌রেসা নিসা গমপ ম পগ।

হংসনারায়ণী ঃ পূরবী থাটোৎপন্ন একটি দক্ষিণী রাগ। কেহ কেহ একে মারবা থাটের অন্তর্গত বলে থাকেন। তবে ধৈবত বর্জিত এবং পঞ্চমের বহুত্ব থাকায় পূরবী থাটই অধিক যুক্তিযুক্ত। বর্তমানে এই রাগ উত্তর ভারতে জনপ্রিয় হয়েছে এবং ছোট ও বড়ো উভয় খেয়ালই শোনা যায়। পূরবী ও পুরিয়া ধানেশ্রীর মিশ্রণে এর উৎপত্তি। এর স্বরপ্রয়োগ বৈশিষ্ট্যই এর স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে।

জাতি ঔড়ব-ষাড়ব। আরোহে ধ, নি এবং অবরোহে ধ বর্জিত। বাদী প, সমবাদী সা। গায়ন সময় সায়ংকাল। কোমল ঋে, কড়ি মধ্যম এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

আরোহাবরোহী—{ সা ঋে গম॑প র্সা
সাঁ নিপ ম॑গ ঋেসা।

মুখ্য অঙ্গ— সাঋে গম॑প নিপ ম॑গ ম॑প ম॑গ ঋেসা।

ললিতাগৌরী ঃ পূরবী থাট। জাতি সম্পূর্ণ। ঋে কোমল, দুই ধৈবত, দুই মধ্যম তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় সায়ংকাল। মিশ্র শ্রেণী। কিঞ্চিত বক্র প্রকৃতি তথা ভক্তিরসাত্মক রাগ। ললিত ও গৌরী রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। এর পূর্বাঙ্গে ললিত এবং উত্তরাঙ্গে গৌরী বিরাজিত। কেহ কেহ একে ভৈরব অঙ্গের গৌরী রাগের একটি প্রকার-ভেদ বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত এতে অনেক রাগের আভাস পাওয়া যায়। কালংড়া রাগের 'পধ্‌পধ্‌ মপ মগ ঋেগ ঋেসা' এই সরবিন্যাসের সঙ্গে গৌরী রাগের ঋেনি়সা ধ়নি়' যোগ করলে ললিতাগৌরীর রূপ পরিস্ফুট হয়। পঞ্চম প্রয়োগে ললিত তথা শুদ্ধ মধ্যমের অধিক প্রয়োগে পূরবী থেকে একে বাঁচানো হয়। ম, প ও নি এর বিশ্রান্তি স্বর। এর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, প্রাতঃকালীন দুটি রাগের মিশ্রণে রচিত হলেও সায়ংকালে গাওয়া হয়। অবশ্য সন্ধিপ্রকাশ রাগমাত্রই সামান্য অদল-বদল করে প্রাতঃকালীন বা সায়ংকালীন হওয়া সম্ভব।

একে কেহ ভৈরব, কেহ পূরবী আবার কেহ মারবা থাটের অন্তর্গত বলে উল্লেখ করেছেন। মারবা থাট-মতাবলম্বীরা শুদ্ধ ধৈবতের এবং ভৈরব ও পূরবী থাট-মতাবলম্বীরা কোমল ধৈবতের বেশী প্রয়োগের কথা বলেছেন। তবে এর

প্রকৃতি অনুসারে দুটি ধৈবতের মধ্যে কোমল ধৈবতের অধিক প্রয়োগই সূচিত করে। কিন্তু এই রাগের খুব কম গান প্রাপ্ত হওয়ায় এর নিশ্চিত রূপ নিরূপণ করা কঠিন।

আরোহাবরোহী— { সা রেগম মমগ পনু নিসাঁ
সাঁ নিধুপ ধমপ মধু মমগ মগরেসা।

মুখ্য অঙ্গ— নিরেগ ম মমগ ধুমমগ রেগ মপ গরেসা রেনিসা ধুনি।

খট ঃ আশাবরী (মতান্তরে ভৈরব) থাটোৎপন্ন একটি প্রাচীন রাগ। খট নাকি ষড়্ বা ষট শব্দের অপভ্রংশ শব্দ এবং ছয়টি রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। তবে রাগ সঙ্গীতে তেমন মিশ্রণ অস্বাভাবিক। বস্তুতঃ এতে আশাবরী, জৌনপুরী ভৈরব প্রভৃতি রাগের ছায়া দেখা যায় মাত্র। কারো মতে এতে কড়ি মধ্যম ছাড়া সবগুলি স্বরই ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতি চঞ্চল। গমক প্রধান হওয়ায় ধামার, ধ্রুপদ প্রভৃতি অধিক গাওয়া হয়।

বর্তমানে এর জাতি সম্পূর্ণ। গু, ধু, নি কোমল। বাদী ধু, সমবাদী গু। মতান্ত প/সা। ধু, গু স্বরদ্বয় আন্দোলিত। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর।

আরোহাবরোহী— { সা রে গু ম প ধু নি সাঁ
সাঁ নিধু প ম গু রে সা

মুখ্য অঙ্গ— মপধুমপ গুরেসা নিসারগুমপ গুরেসা।

দেবগান্ধার ঃ আশাবরী থাটোৎপন্ন একটি প্রাচীন রাগ। 'দ্বিগান্ধার' থেকেই নাকি এই নামকরণ হয়েছে। রে, প বর্জিত প্রাচীন 'সম্পূর্ণ ভৈরব' রাগের সঙ্গে নাকি এর ঐক্য ছিল। তবে বর্তমানে এর রূপ অনেকটা জৌনপুরী/জৌনপুরী তোড়ীর মতো। এর দুটি প্রকারভেদ আছে।

একটির জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে, ধ বর্জিত। পুর্বাঙ্গে ধনাশ্রী এবং উত্তরাঙ্গে জৌনপুরী। বাদী ধু, সমবাদী গু। গায়ন সময় প্রাতঃকাল।

অপরটির জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে নি বর্জিত। দুটি গান্ধার, কোমল ধু, নি এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। আরোহে শুদ্ধ গান্ধার সারেগম এইরূপে এবং অবরোহে কোমল গান্ধার ব্যবহৃত হয়। গান্ধারীর দুই রে'র মতে এর দুই গ প্রযুক্ত হয়। বাকি রূপ জৌনপুরীর মতো। গ, প ন্যাস স্বর। বাদী ধু, সমবাদী কোমল গু। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর।

আরোহাবরোহী— { সারেগ ম গ্‌রে মপ ধ র্সা
সা, নি্ধ্ পম গ্‌ রেসা।

মুখ্য অঙ্গ— মপধ্ মপ গ্‌রেসা নি্সারেগ ম প গ্‌রেসা।

ভূপালতোড়ী ঃ ভৈরবী থাটোৎপন্ন একটি প্রাচীন, সমধুর তথা ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ। বিলাসখানি তোড়ীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। তবে এর চলন তোড়ীর মতো। জাতি ঔড়ব। ম নি বর্জিত। বাদী ধ্, সমবাদী গ্। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। মতান্তরে দিবা ২য় প্রহর। রে্, গ্, ধ্ কোমল। ভক্তি তথা শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ।

আরোহাবরোহী— { সা রে্ গ্‌ প ধ্ র্সা
রে্র্সা ধ্প গ্‌ পগ্‌রে্সা।

মুখ্য অঙ্গ— সা রে্গ্‌ রে্গ্‌প ধ্পগ্‌ রে্গ্‌রে্সা।

যোগকোস ঃ ভৈরবী থাটোৎপন্ন মালকোস অঙ্গের একটি সুমধুর নবীন রাগ। জোগ এবং চন্দ্রকোসের মিশ্রণে এর সৃষ্টি। কোমল ধ্, দুই গ, দুই নি ও অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। কোমল নিষাদ "মধ্নি্ধ্পমগম" এইরূপে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া আরোহাবরোহীতে শুদ্ধ নিষাদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোমল ধৈবত জোগ এবং শুদ্ধ গান্ধার চন্দ্রকোস থেকে এর স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে। জাতি ঔড়ব-ষাড়ব। আরোহে রে, প এবং অবরোহে রে বর্জিত। বাদী সা, সমবাদী ম। গায়ন সময় রাত্রি ৩য় প্রহর।

আরোহাবরোহী— { সা ধ্ নি্ সা ^ম^গ্‌ ^ম^গ্‌ সা গ ম ধ্ নি র্সা
র্সা নি ধ্ প ম, পধ্নিধ্পম গম গ্‌সা।

মুখ্য অঙ্গ— মনি্ধ্পম গম গ্‌সা।

সুহা ঃ কাফী থাটোৎপন্ন একটি কানাড়া অঙ্গের প্রাচীন রাগ। সারং অঙ্গের প্রাবল্য থাকায় অন্যান্য কানাড়ার চেয়ে গ দুর্বল তথা অতি কোমল হয়ে থাকে। সারং ও কানাড়ার মিশ্রণে এর সৃষ্টি। এর সঙ্গে নায়কী, শাহানা, সুঘরাই, দেবসাখ প্রভৃতি রাগের সাদৃশ্য আছে। কোমল ধৈবত যুক্ত করে কেহ কেহ একে আশাবরী থাট বলে থাকেন, তবে তা বর্তমানে অপ্রচলিত। জাতি ষাড়ব। ধ বর্জিত। গ্‌ নি্ কোমল তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। কদাচিৎ শুদ্ধ নি প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। আরোহে রে দুর্বল এবং অবরোহে গ বক্র। বাদী

ম, সমবাদী সা। ম ন্যাস স্বর। ম-সা, প-সা এবং নি-প, নি-ম, গুমরে প্রভৃতি স্বর সংগতি রাগ বাচক। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর।

আরোহাবরোহী—{ নিসা মগু মপ পনি ম প সাঁ
সাঁ পনিপ মপ মগু ম রে সা।

মুখ্য অঙ্গ— নিসা মগু মগু মপ পনি মপ সাঁ মগু মরে সাঁ
পনিপ মপ গুমরে সা।

মালীগৌরা ঃ মারবা থাটোৎপন্ন পূর্বাঙ্গ প্রধান একটি প্রাচীন রাগ। এতে তান কম প্রযুক্ত হয়। প্রকৃতি গম্ভীর তথা আলাপ প্রধান রাগ। চার-পাঁচ প্রকাব মত পাওয়া যায়, তবে অধিক প্রচলিত মতটি এখানে দেওয়া হল। শ্রী ও পুরিয়ার মিশ্রণে এব উৎপত্তি। পুরিয়াতে পঞ্চম যুক্ত করেই এর উৎপত্তি, অনেকে এইরূপ মনে করেন।

জাতি সম্পূর্ণ। বাদী রে সমবাদী প। মতান্তরে গ-ধ। কোমল রে, কড়ি মধ্যম, দুই ধৈবত তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। আবোহে পঞ্চম দুর্বল। শুদ্ধ ধৈবত প্রবল, কোমল ধৈবত অবরোহে অল্প পবিমাণে প্রযুক্ত হয়। রাগ রূপ স্পষ্ট রাখার জন্য 'ধনিসরে নিধপ মগ মধসা' এই স্বরবিন্যাস অধিক প্রয়োগ করা কর্তব্য। গায়ন সময় সায়ংকাল।

আরোহাবরোহী—{ সা রে গা মপ ধনিধ সাঁ নিরেসাঁ
সাঁ নিধপ মনিধ মগ রেসা।

মুখ্য অঙ্গ— নিরেসা সা প মধমগ মগরে রেপ মধপ মনিধমগ গরেসা।

ভংখার ঃ মারবা থাটোৎপন্ন একটি উত্তরাঙ্গ প্রধান নবীন রাগ। বেহাগের সাধারণ রূপ বজায় রেখে যদি কোমল রে এবং কড়ি মধ্যম অধিক প্রয়োগ করা হয় তাহলে ভংখার উৎপন্ন হয়।

জাতি সম্পূর্ণ। বাদী প, সমবাদী সা। কোমল রে, দুই মধ্যম এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। পগ এবং মধ সংগতি রাগ প্রকাশক। গায়ন সময় রাত্রি অন্তিম প্রহর।

আরোহাবরোহী—{ সা রে সা গমপম পগ মধসাঁ
সাঁ রে নিধপ মগ পগ রেসা।

মুখ্য অঙ্গ—নিসা গমপ ম পগ মধ মগ পগ রেসা।

জৈত ঃ মারবা থাটোৎপন্ন একটি ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ। তিন প্রকার জৈত শোনা যায়। প্রথম প্রকারে ম নি বর্জিত; দ্বিতীয় প্রকার কড়ি মধ্যমযুক্ত যেমন, সা রে্ গ প গ র্ম ধ র্ম গ রে্ সা। আর তৃতীয় প্রকারে ঋষভ ও ধৈবত স্বরদ্বয়ের উভয় রূপই ব্যবহৃত হয়। তবে প্রথম প্রকারই অধিক জনপ্রিয়।

জাতি ঔড়ব। ম নি বর্জিত। বাদী প, সমবাদী সা। গায়ন সময় দিবা অন্তিম প্রহর। গ প সংগতি রাগ বাচক তথা বিশ্রান্তি স্বর। তবে পঞ্চম অবরোহে বক্র। পূর্বাঙ্গে ভৈরব থাটের বিভাসের ছায়া দেখা যায়। শুদ্ধ ধৈবত ও কোমল ঋষভের প্রয়োগ কৌশল এর স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে। উত্তরাঙ্গে কোমল ঋষভের ব্যবহার একে দেশকার, শুদ্ধ কল্যাণ প্রভৃতি থেকে স্বতন্ত্র রাখে।

আরোহাবরোহী— { সা রে্ গপ ধপ র্সা
র্সা প ধপ গ রে্সা।

মুখ্য অঙ্গ— সা রে্সা রে্ গপ ধগপ রে্গপ গরে্সা।

রেবা ঃ পূরবী থাটোৎপন্ন একটি ক্ষুদ্র প্রকৃতিব নবীন রাগ। এই রাগ পূরবী এবং শ্রী অঙ্গে গাওয়া হয়। পূরবী অঙ্গে গান্ধার এবং শ্রী অঙ্গে ঋষভ প্রবল হয়ে থাকে। এই রাগের সঙ্গে বিভাস, ত্রিবেণী, শ্রীটকং প্রভৃতির রূপ ও রসগত পার্থক্য এত অল্প যে সবগুলিই প্রায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। তবে দেশকার ও ভূপালীর মতো রেবা ও বিভাসের যুক্ত সাদৃশ্য উল্লেখনীয়। দেশকার ও বিভাস যেমন প্রাতঃগেয় রেবা এবং ভূপালী তেমনি সায়ংগেয় রাগ।

জাতি ঔড়ব। ম নি বর্জিত। বাদী সা, সমবাদী প। মতান্তরে গ-ধ। রে্ ধ্ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

আরোহাবরোহী— { সা রে্সা গরে্গ পধ্প র্সা
র্সা পধ্প গরে্গ রে্সা।

মুখ্য অঙ্গ— সা গরে্গ রে্সা পগ ধ্প গরে্গ রে্সা।

গারা ঃ খামাজ থাটোৎপন্ন একটি ক্ষুদ্র তথা মিশ্র রাগ। এতে ঠুংরী অধিক হয়ে থাকে। অনেকে একে কল্যাণ ও ঝিঁঝোটির মিশ্রণে উৎপন্ন বলেন। তবে এর সঙ্গে অধিক সাদৃশ্য জয়জয়ন্তী রাগের। পূর্বাঙ্গের প্রাধান্য অত্যাধিক্য হওয়ায় গায়কেরা মধ্যমকে সুর করে গেয়ে থাকেন।

জাতি সম্পূর্ণ। বাদী গ, সমবাদী নি। মতান্তরে সা/প। গায়ন সময়

রাত্রি ২য় প্রহর। গ, নি স্বরদ্বয়ের উভয়রূপ তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। তবে কোমল গান্ধার সীমিত ও সাবধানে ব্যবহার করা কর্তব্য। ধ্‌ নি় গ স্বর সঙ্গতি রাগবাচক এবং জয়জয়ন্তী ও ঝিঁঝোটি থেকে এর স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে।

আরোহাবরোহী—{ সা ধ্‌নি়গ, রেগরে গমপধনির্সা
{ র্সা নি় ধনি়প মগ রেগ্‌ রেসা।

মুখ্য অঙ্গ— সা রেনি়সা ধ্‌নি়গ মপ গম রেগ্‌রেসা নি়ধ্‌নি়সা।

পঞ্চম ঃ এটি প্রাচীন ছয় রাগের অন্তর্গত একটি রাগ। সংগীত পারিজাত থেকে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে পর্যন্ত এর অনেক রূপ বিবর্তন হয়েছে। তবে বর্তমানে এটি মারবা থাটের অন্তর্গত ষাড়ব জাতির রাগ হিসাবে প্রচলিত। পঞ্চম বর্জিত। দুই মধ্যম তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী শুদ্ধ মধ্যম, সমবাদী ষড়জ। গায়ন সময় রাত্রি অন্তিম প্রহর। আরোহে রে নি দুর্বল হওয়ায় হিন্দোলের ছায়া কিঞ্চিৎ দেখা গেলেও ললিত ও সোহনী থেকে স্বতন্ত্র থাকে। আর শুদ্ধ মধ্যম একে হিন্দোল থেকে স্বতন্ত্র করে। শুদ্ধ পঞ্চম নামে একটি স্বতন্ত্র রাগও প্রচলিত আছে।

আরোহাবরোহী—{ সা নি়ধ্‌নি়সা মর্মম গর্মধনি র্মধর্সা
{ র্সা নিধ র্মমগ র্মগ রে্সা।

মুখ্য অঙ্গ— সা ম গর্মধ র্মমগ, র্মধনি র্মধর্সা নিধর্মগ রে্সা।

মারু বেহাগ ঃ কল্যাণ থাটোৎপন্ন একটি আধুনিক তথা মধুর রাগ। কল্যাণ ও বেহাগ রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। পূর্বাঙ্গ প্রধান। 'মারু' নামে একটি স্বতন্ত্র রাগও আছে।

এর জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে ধ বর্জিত। বাদী গ, সমবাদী নি। মতান্তরে প/সা। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। দুই মধ্যম তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। শুদ্ধ মধ্যম বিশ্রান্তি-স্বর হওয়ায় কল্যাণ ও বেহাগের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে।

আরোহাবরোহী—{ নি় সা গ মপ নির্সা
{ র্সা নি ধপ র্মগ র্মগরেসা।

মুখ্য অঙ্গ— সা রেনি়সা মমগ গর্মপর্মপ গর্মপনিধপ ধর্মপ, র্মগরেসা।

বিহাগড়া ঃ বিলাবল (মতান্তরে খমাজ) থাটোৎপন্ন বেহাগ অঙ্গের

রাগ। একে পট বিহাগও বলা হয়। তবে এ'দুটিতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। পট বিহাগে কোমল নিষাদ অলৈহা'র মতো বক্র কিন্তু বিহাগড়াতে সরল। যথা—র্সা ন্ধিপ। এছাড়া বিহাগড়াতে কড়িমধ্য কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়ে থাকে কিন্তু পট বিহাগে তা একেবারে বর্জিত। তবে উভয় রাগই বেহাগের খুব কাছাকাছি। তাই মধ্যমে ন্যাস এবং কোমল নিষাদ ব্যবহার করে এর স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হয়।

বিহাগড়ার দুটি রূপ প্রচলিত। কেহ কড়ি মধ্যম প্রয়োগ এবং কোমল নিষাদ বর্জন করেন। আবার কেহ কোমল নিষাদ প্রয়োগ এবং কড়ি মধ্যম বর্জন করেন। দ্বিতীয় মতটি অধিক লোকপ্রিয়। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে ধ বর্জিত। বাদী গ, সমবাদী নি। দুই নি এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর।

আরোহাবরোহী— { ন়িসা গ মপনি র্সা
র্সনিধপ ন্ধিপ মগরেসা।

মুখ্য অঙ্গ— সা গম গম পন্ধিপ ধ গম গরেসা।

নট বিহাগ ঃ বিলাবল থাটোৎপন্ন বেহাগ অঙ্গের একটি নবীন রাগ। এর সঙ্গে পটবিহাগ, বিহাগড়া প্রভৃতির সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। পূর্বাঙ্গে নট এবং উত্তরাঙ্গে বেহাগ প্রকাশ পায়। দুই নি এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। কোমল নিষাদের ব্যবহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যথা ম ন্ি ধপ অথবা র্সা নিধপ ন্ধিপ ইত্যাদি।

জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে ধ বর্জিত। বাদী প, সমবাদী সা। মতান্তরে সা/প। গায়ন সময় রাত্রি ১ম প্রহর।

আরোহাবরোহী— { সা রেগ মপ প নি ন্র্সা
র্সা নিধপ গম ন্ধিপ মগ পমগ রেসা।

মুখ্য অঙ্গ— গমন্ধিপ পমগ রেগমপ মগরেসা।

নট বিলাবল ঃ বিলাবল থাটোৎপন্ন একটি নবীন রাগ। সাধারণতঃ বিলাবলের মধম বাদী করে গাইলে নট বিলাবল হয়। এর পূর্বাঙ্গে নট এবং উত্তরাঙ্গে বিলাবল প্রকাশিত হয়ে থাকে। বস্তুত প্রাচীন নটনারায়ণ এবং নট বিলাবল বা শুক্লবিলাবল প্রভৃতি রাগে বিশেষ পার্থক্য নেই।

জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে বর্জিত। দুই নি এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ম, সমবাদী সা। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর।

আরোহাবরোহী— { সাগম প ধনি্প নিধনিসা ; সানি ধনি্ধপ পধনি্প মগমরেসা।

মুখ্য অঙ্গ— সা গম পম গম রে গমপ মগ মরে সা।

নারায়ণীঃ খমাজ থাটোৎপন্ন এই প্রাচীন রাগ দক্ষিণ ভারতীয় গ্রন্থে বর্ণিত এবং উত্তর ভারতীয় গুণীদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। সারং ও দুর্গা রাগের সঙ্গে এর সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। কোমল নি তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

জাতি ঔড়ব-ষাড়ব। আরোহে গ নি এবং অবরোহে গ বর্জিত। বাদী রে, সমবাদী প। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহব।

আরোহাবরোহী— { সারে মপ ধসা ; সা নি্ধপ মরে সা।

মুখ্য অঙ্গ— সারেসা ধ্সা মরে নি্ধপ মপধপ সানি্ধপ মরে সা রে ধ্ধ্সা।

গোরখ কল্যাণঃ খমাজ থাটোৎপন্ন একটি নবীন রাগ। এর নামের সঙ্গে কল্যাণ শব্দটি যুক্ত থাকলেও কল্যাণ রাগের সঙ্গে এর বিশেষ যোগ নেই। তাই কেহ কেহ একে শুধু 'গোরখ' বলে থাকেন। এর সঙ্গে দুর্গা ও বাগেশ্রী রাগের সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। অবরোহে কোমল নিষাদ ছাড়া এর সব স্বর শুদ্ধ। রে নি্ ধ্ সা স্বরসংগতি রাগবাচক। উত্তরাঙ্গে বাগেশ্রী প্রকাশ পায় তবে গান্ধার বর্জিত হওয়ায় রাগভেদ রক্ষিত হয়। এটি গম্ভীর প্রকৃতির গমক ও মীড় প্রধান রাগ। এর জাতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে তবে ঔড়ব-ষাড়ব-ই অধিক সমর্থিত। আরোহে গ প এবং অবরোহে গ বর্জিত। বাদী ম, সমবাদী সা। মতান্তরে সা/ম। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর।

আরোহাবরোহী— { সা রে ম ধ নিধ সা ; সা নি্ধপ মরে সা নি্ ধ্ সা।

মুখ্য অঙ্গ— সা রেম রে নি্ধ্ সা রেমধ নি্ধ ম ধনি্ধম রেনি্ ধ্ সা।

সাজগিরীঃ মারবা থাটোৎপন্ন একটি আধুনিক রাগ। পূরবী ও পুরিয়া রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। শুদ্ধ মধ্যমে বিশ্রান্তি এব স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে।

মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে এর বিস্তার অধিক ও শোভন হয়ে থাকে। দুই মধ্যম, দুই ধৈবত, কোমল রে তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। নি-ম সংগতি রাগবাচক। এর জাতি সম্পূর্ণ। বাদী গ, সমবাদী নি। গায়ন সময় সাংকাল।

আরোহাবরোহী— { নিরেগ গম নিম্ধগ ম্পধপ র্সা
{ র্রেনিধপ ধগ ম্ধম্গ রেসা।

মুখ্য অঙ্গ— নিরেগ রেম্গম গমনি ম্ধ গপ ধর্সা র্রেনিধ গধ ম্গ নিম্গ গরে সা।

ধনাশ্রী ঃ কাফী এবং ভৈরবী থাটোৎপন্ন দুই প্রকার ধনাশ্রী প্রচলিত। তবে ভৈরবী থাটের ধনাশ্রী বিরল বলা যায়। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে একে ধনাসী, ধন্যাসী প্রভৃতি নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একটি মিশ্র শ্রেণীর ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ।

জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে, ধ বর্জিত। গ, নি কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী প, সমবাদী সা। গায়ন সময় দিবা ৩য় প্রহর। প-গ সংগতি রাগবাচক। প বিশ্রান্তি স্বর। ভীমপলশ্রীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য থাকায় মধ্যমের অল্পত্ব দেওয়া কর্তব্য।

আরোহাবরোহী— { সা গমপ নি র্সা
{ র্সা নিধপ মগ পগ রেসা।

মুখ্য অঙ্গ— নিসা গমপ ধপ নিধপ গ পগ রেসা।

জৈতশ্রী ঃ পূরবী থাটোৎপন্ন একটি মিশ্র প্রকৃতির ক্ষুদ্র রাগ। জৈত এবং শ্রীরাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে একে জয়শ্রী, জেতাশ্রী প্রভৃতি নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে, ধ বর্জিত। বাদী গ, সমবাদী প। রে, ধ কোমল, কড়িমধ্যম এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। গায়ন সময় সায়ংকাল। মধ্য ও তার সপ্তকে বিস্তার অধিক হয়ে থাকে। এর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত পূরবী, শ্রী, পূরিয়াধানেশ্রী, বসন্ত প্রভৃতি রাগ থেকে স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য কুশলতার প্রয়োজন।

আরোহাবরোহী— { নিসা গ ম্প ম্ধপ নির্সা
{ র্সা নিধপ ম্ধ ম্গ রেসা।

মুখ্য অঙ্গ— সা নিসা গপ মধপর্সা র্রেনিধপ ম্গ পগ রেসা।

সুঘরাই ঃ কাফী থাটোৎপন্ন একটি কানাড়া অঙ্গের রাগ। আড়ানা ও বৃন্দাবনী সারং এর মিশ্রণে সৃষ্ট। শাহানা, সুহা, দেবসাখ প্রভৃতি এর সমপ্রকৃতিক রাগ। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে ধ বর্জিত। এতে গান্ধার বক্র তথা আন্দোলিত। কোমল গ্‌, দুই নি তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। কেহ কেহ কোমল ধৈবত ব্যবহার করে থাকেন। তবে তা বর্তমানে অপ্রচলিত। বাদী প, সমবাদী সা। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর।

আরোহাবরোহী— নি্‌ সা রে [ম]গুম প নি্‌প র্সা
র্সা ধনি্‌প মপ [ম]গু ম রেসা

মুখ্য অঙ্গ— নি্‌সা সা রে [ম]গুম [প]নি্‌প র্সা রেঁসাপ নি্‌প মপ [প]গুমরেসা।

নায়কী কানাড়া ঃ কাফী থাটোৎপন্ন একটি প্রাচীন তথা গম্ভীর প্রকৃতির রাগ। সুহা এবং সারং মিশ্রণে এর সৃষ্টি। আলাউদ্দীন খিলজির দরবারে নায়ক গোপাল এই রাগের সৃষ্টি করেছিলেন এইরূপ কথিত আছে।

জাতি ষাড়ব। ধ বর্জিত। বাদী ম, সমবাদী সা। মতান্তরে প/সা। গায়ন সময় মধ্যরাত্রি। রে-প সঙ্গতি রাগবাচক।

আরোহাবরোহী— সা রেপ মপনি্‌প র্সা
র্সা [প]নি্‌প নি্‌মপ [ম]গুমরেসা।

মুখ্য অঙ্গ— নি্‌প মপ র্সা নি্‌প মপ গু মপ গুম রেসা।

কাফী কানাড়া ঃ কাফী থাটোৎপন্ন একটি ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ। পূর্বাঙ্গে কানাড়া এবং উত্তরাঙ্গে কাফী প্রকাশিত এবং এদের মিশ্রণে সৃষ্ট। গ্‌ নি্‌ কোমল। জাতি বক্র সম্পূর্ণ। গান্ধার বক্র তথা আন্দোলিত। বাদী প, সমবাদী সা। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। পাশাপাশি বহু রাগ থাকায় 'রেগু সরে নি্‌ধপ ; রেনু্‌রেগু রেসরেসা ; নি্‌সনি্‌সারে' প্রভৃতি স্বরবিন্যাস বারবার করা কর্তব্য।

আরোহাবরোহী— নি্‌সারে গুমপ ধ নি্‌র্সা
র্সরেঁ নি্‌ধপ মপ [ম]গুমরেসা।

মুখ্য অঙ্গ— নি্‌সারেরে [ম]গুমরেসা রে নি্‌ধপ [ম]গুমরেসা।

ধানী : কাফী থাটোৎপন্ন একটি প্রাচীন, চঞ্চল তথা ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ। জাতি ঔড়ব-ঔড়ব। রে ধ বর্জিত। কেহ কেহ অবরোহে কিঞ্চিৎ ঋষভ ব্যবহার করে ঔড়ব-ষাড়ব জাতি বলে থাকেন। উভয় মতই প্রচলিত। গ্, নি্ কোমল। বাদী গ্, সমবাদী নি্। গায়ন সময় দিবা ৩য় প্রহর। মতান্তরে সর্বকালিক। গ, নি ন্যাস স্বর। এতে বিলম্বিত খেয়াল পাওয়া যায় না। ঠুংরীই অধিক হয়ে থাকে।

আরোহাবরোহী— { সা গ্ ম প নি্ র্সা
{ র্সা নি্ প ম গ্ সা/র্সা নি্পম গ্ম, গ্রেসা।

মুখ্য অঙ্গ— { নি্প্ নি্সা গ্মপনি্পগ্ গ্মগ্ সা—অথবা—
{ গ্মপনি্পগ্ সারে নি্ সা গ্।

প্রদীপকী/পটদীপকী : কাফী থাটোৎপন্ন একটি প্রাচীন তথা ক্ষুদ্র প্রকৃতির পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ। এটি দুই প্রকাব মতে প্রচলিত। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে, ধ বর্জিত। কোমল নি্, দুই গ তথা অন্যান্য স্বব শুদ্ধ। আরোহে তীব্র গান্ধাব। অববোহে বে দুর্বল। বাদী ম, সমবাদী সা। মতান্তবে সা/ম। মধ্যম ন্যাস স্বব। ভীমপলশ্রী অঙ্গ প্রবল। ক্বচিৎ শুদ্ধ নিষাদ বিবাদীরূপে প্রয়োগ করা হয়। ধানী, ধনাশ্রী, হংসকিংকিনী প্রভৃতি সমপ্রকৃতিক রাগ। গায়ন সময় দিবা ৩য় প্রহর। আর এক মতে দুই গ; ধ্, নি্ কোমল তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। তবে এর প্রচার কম।

আরোহাবরোহী— { নি্সা গ্ম প নি্র্সা
{ র্সানি্ ধপম গ্ গ্ মরে সা।

মুখ্য অঙ্গ— নিসাগ্মপ গ্ম নি্ধপ মপ ম গ্ম গ্রেসা।

ভীম : কাফী থাটোৎপন্ন একটি অপ্রসিদ্ধ নবীন রাগ। এর কোন শাস্ত্রীয় আধার বা পরম্পরাগত পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে এটি একটি উত্তরাঙ্গ প্রধান সুমধুর রাগ। ভীমপলশ্রী ও খম্বাবতীর মিশ্রণে সৃষ্ট। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে বে, ধ বর্জিত। দুই গ এবং কোমল নি্। কোমল গ্ শুধু তার সপ্তকে ব্যবহৃত হয়। বাদী সা, সমবাদী প। গায়ন সময় দিবা তৃতীয় প্রহর।

আরোহাবরোহী— { নি̣সা গ মপ নি̣র্সা
সাঁরে̣ সা নি̣ধ পধমপ পগ রেসা।

মুখ্য অঙ্গ— পনি̣র্সা রে̣সা গ̣ রে̣র্সা নি̣ধ মধপ মপ গমরেসা।

পটমঞ্জরী ঃ কাফী থাটোৎপন্ন একটি সুন্দর নবীন রাগ। সারং ও ভীমপলশ্রীর মিশ্রণে সৃষ্ট। জাতি সম্পূর্ণ। আরোহে গ̣ ধ দুর্বল। গ̣ নি̣ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী সা, সমবাদী প। গায়ন সময় দিবা তৃতীয় প্রহর। আর এক প্রকাব বিলাবল থাটোৎপন্ন পটমঞ্জরী প্রচলিত আছে, যার সব স্বর শুদ্ধ। যার পাশাপাশি অনেক রাগ থাকায় স্বরূপ বজায় রাখা কঠিন তাই অপ্রচলিত।

আরোহাবরোহী— { নি̣সা রেমপ ধপ মপ নির্সা
র্সা নি̣ধপ ধম পগ̣ রেগ̣মগ̣ রেসা।

মুখ্য অঙ্গ— সারেসা ধ̣প̣ রেমপ র্সা পনি̣ধপ মপ গ̣রেগ̣ মগ̣রেসা।

জয়ন্ত মল্লার ঃ কাফী থাটোৎপন্ন একটি নবীন রাগ। মল্লার অঙ্গে এমন সুমধুর রাগ বিরল। জয়জয়ন্তী ও মল্লার রাগের মিশ্রণে এর সৃষ্টি। পূর্বাঙ্গে জয়জয়ন্তী এবং উত্তরাঙ্গে মিঞা মল্লার ও রামদাসী মল্লার প্রভৃতির সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তবে সর্বক্ষেত্রেই স্বব প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য সহযোগে এর স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হয়। দুই গান্ধার, দুই নিষাদ এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। জাতি বক্র-সম্পূর্ণ। বাদী প, সমবাদী সা। মতান্তরে রে/প। গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর। তবে মৌসুমী রাগ হওয়ায় বর্ষাঋতুতে সর্বকালিক।

আরোহাবরোহী— { সা মরে প নিধ নির্সা
র্সা ধনি̣মপ ধপমগ রেগ̣ রেসা।

মুখ্য অঙ্গ— সানি̣ধনি̣সা ধ̣নি̣রে রেগমপ গ̣মরেসা ধ̣নি̣রে।

সুর মল্লার ঃ কাফী থাটোৎপন্ন একটি নবীন রাগ। পরমভক্ত সুরদাস এই রাগের স্রষ্টা এইরূপ কথিত আছে। সারং ও মল্লার রাগের মিশ্রণে এর সৃষ্টি। আরোহে সারং এবং অবরোহে দেশ প্রকাশিত। তবে বর্জিত গান্ধার রাগ ভেদ স্পষ্ট করে। দুই নি এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

জাতি ঔড়ব-ষাড়ব। আরোহে গ ধ এবং অবরোহে গ বর্জিত। বাদী

ম, সমবাদী সা। মতান্তরে সা/প। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর। তবে মৌসুমী রাগ হওয়ায় বর্ষা ঋতুতে সর্বকালিক।

আরোহাবরোহী— { সা ^মরে ম প নি র্সা
সা নি়ধ মপ নি়ধপ মরে নি়সা।

মুখ্য অঙ্গ— নি়সারেম পম মপনি়ধপ ম রেম রে সা ^মরে নি়সা।

রামদাসী মল্লার ঃ কাফী থাটোৎপন্ন একটি বক্র তথা অপ্রসিদ্ধ রাগ। সুপ্রসিদ্ধ গায়ক রামদাস এই রাগের স্রষ্টা এইরূপ কথিত আছে। শাহানা, গৌড় ও মল্লার রাগের মিশ্রণে এর সৃষ্টি। এতে দুই গান্ধার, দুই নিষাদ এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়। তবে কেহ কেহ শুধু কোমল গান্ধার ব্যবহার করে থাকেন। আরোহে শুদ্ধ এবং অবরোহে কোমল গান্ধার ব্যবহৃত হওয়ায় মল্লার অঙ্গের সকল রাগ থেকে এর স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হয়।

জাতি সম্পূর্ণ। বাদী ম, সমবাদী সা। মতান্তরে ধ/গ। মৌসুমী রাগ হওয়ায় বর্ষা ঋতুতে গেয়।

আরোহাবরোহী— { সারেপ মগম পনিধ নির্সা
র্সানি়ধনি়প ধপম প গমপ গ়্ মরেসা।

মুখ্য অঙ্গ— সারেগম প ধপ মগ ম প গ়্মরেসা।

নট মল্লার ঃ কাফী থাটোৎপন্ন মল্লার অঙ্গের একটি নবীন রাগ। নট ও মল্লার যোগে এর সৃষ্টি। পূর্বাঙ্গে নট এবং উত্তরাঙ্গে মল্লার প্রকাশিত। 'ম রে' এবং 'রে প' স্বরসংগতি রাগ রাচক এবং আনন্দদায়ক। কেহ কেহ এতে তীব্র গান্ধার প্রয়োগ করে বিলাবল থাটের অন্তর্গত বলে থাকেন। পঞ্চম ন্যাস স্বর।

জাতি বক্র সম্পূর্ণ। দুই গান্ধার, দুই নিষাদ তথা অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ম, সমবাদী সা। মৌসুমী রাগ, তাই বর্ষা ঋতুতে গেয়।

আরোহাবরোহী— { সা রে রেগম ^মরেম রেপ নি়ধনির্সা
র্সা ধ নি়প মপম রেসা।

মুখ্য অঙ্গ—সা ^গরে গ ^গরেগম মরেপ ধনি়প মপ ^মরে মরে সা।

শুদ্ধসারং ঃ এটি কাফী (মতান্তরে কল্যাণ) থাটোৎপন্ন একটি প্রাচীন

রাগ। বর্ত্তমানে এর প্রচলন কম। সারং অঙ্গের রাগে সাধারণত গ ধ দুর্বল হয়ে থাকে, তবে এতে একেবারে বর্জন করা হয়েছে। জাতি ঔড়ব। কোমল নিষাদ এবং অন্য স্বর শুদ্ধ। বাদী রে, সমবাদী প। পূর্বাঙ্গে 'প রে' এবং উত্তরাঙ্গে 'নি প' সংগতি রাগবাচক। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর। সারং অঙ্গের অন্যান্য রাগের মতো এতে শুদ্ধ নিষাদ ব্যবহৃত হয় না। বৃন্দাবনীসারং, সামন্তসারং, মেঘমল্লার প্রভৃতি রাগের সঙ্গে এর সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য।

আরোহাবরোহী— { সা রে মপ নিসা
সা নিপ মরে সা।

মুখ্য অঙ্গ— নিসা রে মরে রেপ মরে নিপ মরে পরে সা।

বরবা ঃ বরবা কাফী থাটোৎপন্ন একটি ক্ষুদ্র প্রকৃতির আধুনিক রাগ। অনেকে এতে গ ধ নি স্বরত্রয়ের উভয়রূপ ব্যবহার করেন। ধুন প্রধান হওয়ায় স্বরবিশেষের ব্যবহার-রীতি প্রচলিত। তবে আরোহে গান্ধার বর্জিত, কেহ একেবারে বর্জন করেন। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। বাদী রে, সমবাদী প। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর। পূর্বাঙ্গে দেশী এবং উত্তরাঙ্গে সিন্ধুড়ার আভাস পাওয়া যায়।

আরোহাবরোহী— { নিসা গ রে নিসা রেমপ ধনিসা
সা নিধপ মপ গ রেগ সা।

মুখ্য অঙ্গ— সা রেগ সা রেমপধ মপ ধমপসা নিধপ গরেগ সা।

গৌরী ঃ গৌরী একটি প্রাচীন তথা সুমধুর প্রসিদ্ধ রাগ। প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে এর রূপ ছিল ভৈরবের মতো। বর্তমানে পূরবী এবং ভৈরব থাটোৎপন্ন দুই প্রকার গৌরী পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই দুটিতে পার্থক্য খুবই সামান্য। উভয়েরই জাতি ঔডব-সম্পূর্ণ। আরোহে গ, ধ বর্জিত। বাদী রে, সমবাদী প। রে ধ কোমল। গায়ন সময় সায়ংকাল। পূরবী থাটের গৌরীতে দুই মধ্যম ব্যবহৃত হয় এবং কিঞ্চিত শ্রী রাগের আভাস পাওয়া যায়। আর ভৈরব থাটের গৌরীতে শুদ্ধ মধ্যম ব্যবহৃত হয় এবং কিঞ্চিত কালংড়ার আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য কড়িমধ্যমও সামান্য প্রযুক্ত হয়ে থাকে। তাই বর্ত্তমানে গৌরী পূরবী থাটোৎপন্ন রূপেই অধিক সমর্থিত। এটি পূর্বাঙ্গ প্রধান একটি করুণ ভক্তি রসাত্মক রাগ।

আরোহাবরোহী— { সা ব্রে পমপ নিসা
সানি ধনি ধপ মগ রে সা।

মুখ্য অঙ্গ— নিসারে নিধনি রে মপ মগ রে সানিধ নি রেসা।

দেশী : দেশী একটি আশাবরী থাটোৎপন্ন প্রাচীন রাগ। সারং ও আশাবরী'র মিশ্রণে এর উৎপত্তি। কোমল গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদের উভয় রূপ এবং অন্ত স্বর শুদ্ধ। তবে দেশী বিভিন্ন প্রকারে গাওয়া হয়। কেহ দুটি ধৈবত ব্যবহার করেন, কেহ শুদ্ধ আবার কেহ শুধু কোমল ধৈবত ব্যবহার করে থাকেন। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে গ ধ বর্জিত। নিষাদ অপেক্ষাকৃত দুর্বল। বাদী প সমবাদী রে। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর।

আরোহাবরোহী— { সা রে মপ নিসা
সা নিধপ মগ রেসা।

মুখ্য অঙ্গ— সানিসা রেপ গ রে নিসা রেমপ নিধপ মপগ রে নিসা।

শিবরঞ্জনী : শিবরঞ্জনী কাফী থাটোৎপন্ন একটি প্রাচীন ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ। বর্তমানে এর প্রচলন কম। তবে এটি একটি সুমধুর তথা উত্তরাঙ্গ প্রধান শৃঙ্গার ও ভক্তি রসাত্মক রাগ। জাতি ঔড়ব। ম নি বর্জিত। কোমল গান্ধার এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী প সমবাদী সা। গায়ন সময় মধ্যরাত্রি।

আরোহাবরোহী— { সা রেগ প ধ সা
সা ধপ গ রে সা।

মুখ্য অঙ্গ— সারেধসা সারেগপ পধসারেগ রেসা ধপগ রেসা ধসা।

জংলা/জংগুলা : ভৈরব ও আশাবরী থাটোৎপন্ন দুই প্রকার জংলা শোনা যায়। সাদৃশ্যযুক্ত অন্যান্য জনপ্রিয় রাগ থাকায় এটি অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। যেমন, ভৈরব থাটের জংলার সঙ্গে 'আনন্দ ভৈরব', 'অহীর ভৈরব' প্রভৃতি সাদৃশ্যযুক্ত। আশাবরী থাটের জংলাতে দুটি ধৈবত ব্যবহৃত হওয়ায় একে ধুন বলাই শ্রেয়ঃ। তাই এর ব্যবহার ঠুংরী, টপ্পা, গজলাদিতে অধিক হয়ে থাকে।

জাতি সম্পূর্ণ। বাদী সা, সমবাদী প। এতে গ ধ নি স্বরত্রয়ের উভয় রূপ ব্যবহৃত হয়। গায়ন সময় রাত্রি ৩য় প্রহর।

আরোহাবরোহী— { সা রে গমপ ধনি সাঁ
সাঁ নিধ পধ পমগ রেসা।

চলন— গ রেগ সা রেম প ধনিধপ ধ মপ রেগ রেসা।

ঝালক ঃ এই রাগের প্রচার প্রসিদ্ধ আমীর খসরু করেছেন এইরূপ কথিত আছে। তবে বর্তমানে ভৈরব এবং আশাবরী থাটোৎপন্ন দুইপ্রকার ঝীলফ শোনা যায়। এটি একটি ক্ষুদ্র যাবনিক রাগ।

ভৈরব থাটের ঝীলফ—জাতি ঔড়ব। রে নি বর্জিত। ধ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী ধ, সমবাদী গ। গায়ন সময় প্রাতঃকাল।

আরোহাবরোহী— { সা গম প ধ সাঁ
সাঁ ধ প মগম গ সা।

চলন— সা গমপ পধ ধসাঁ পপমপ মগম গসা।

আশাবরী থাটের ঝীলফ—জাতি সম্পূর্ণ। গ ধ নি কোমল। বাদী ধ, সমবাদী গ। গায়ন সময় প্রাতঃকাল। জৌনপুরী ও খট রাগের মিশ্রণে সৃষ্ট।

আরোহাবরোহী— { সা রেগম পধ নিসাঁ
রেঁসানিধ প গপমগ রেসা।

চলন— নিসা গমপ পম পধনিসাঁ রেঁনিসাঁ ধপ গগ পমগরে সা।

কতিপয় রাগের তুলনামূলক আলোচনা

কেদার—হমীর

সাদৃশ্য ঃ—

১। উভয় রাগই কল্যান থাট থেকে উৎপন্ন।

২। উভয় রাগই দুই মধ্যমযুক্ত এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

৩। উভয় রাগই রাত্রি ১ম প্রহরে গেয়।

৪। উভয় রাগে কোমল নিষাদ বিবাদীরূপে ব্যবহৃত হয়।

৫। উভয় রাগে গ বক্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

বৈসাদৃশ্য :—

কেদার	হম্বীর
১। বাদী ম, সমবাদী সা।	১। বাদী ধ, সমবাদী গ।
২। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ।	২। জাতি সম্পূর্ণ।
৩। মধ্যম দুটি পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়।	৩। কড়িমধ্যম অপেক্ষাকৃত দুর্বল।
৪। পূর্বাঙ্গ প্রবল এবং গম্ভীর প্রকৃতি।	৪। উত্তরাঙ্গ প্রবল এবং চঞ্চল প্রকৃতি।
৫। গ বক্র এবং দুর্বল।	৫। গ, প ও নি বক্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

কেদার—কামোদ

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগই কল্যান থাট থেকে উৎপন্ন।
২। উভয় রাগই দুই মধ্যমযুক্ত এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।
৩। উভয় রাগের গায়ন সময় রাত্রি ১ম প্রহর।
৪। উভয় রাগে কোমল নিষাদ বিবাদীরূপে ব্যবহৃত হয়।
৫। উভয় রাগে গ বক্ররূপে ব্যবহৃত হয়।
৬। উভয় রাগই পূর্বাঙ্গ প্রধান।

বৈসাদৃশ্য :—

কেদার	কামোদ
১। জাতি ঔডব-সম্পূর্ণ।	১। জাতি সম্পূর্ণ।
২। বাদী ম, সমবাদী সা।	২। বাদী প, সমবাদী রে।
৩। মধ্যম দুটি পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়।	৩। রে, প সংগতি রাগরূপ প্রকাশক, মধ্যম অপেক্ষাকৃত দুর্বল।
৪। গম্ভীর প্রকৃতি।	৪। চঞ্চল প্রকৃতি।

কেদার—ছায়ানট

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগই কল্যাণ থাট থেকে উৎপন্ন।

২। উভয় রাগই দুই মধ্যমযুক্ত এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

৩। উভয় রাগেই কোমল নিষাদ বিবাদীরূপে ব্যবহৃত হয়।

৪। উভয় রাগের অবরোহে গ বক্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

৫। উভয় রাগই গম্ভীর প্রকৃতির এবং রাত্রি ১ম প্রহরে গেয়।

বৈসাদৃশ্য :—

কেদার	ছায়ানট
১। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ।	১। জাতি সম্পূর্ণ।
২। বাদী ম, সমবাদী সা।	২। বাদী প, সববাদী রে।
৩। মধ্যম দুটি পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়।	৩। কড়িমধ্যম অপেক্ষাকৃত দুবল।
৪। গ বক্র এবং দুর্বল।	৪। গ, নি বক্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

ভীমপলশ্রী—বাগেশ্রী

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগই কাফী থাট থেকে উৎপন্ন।

২। উভয় রাগের বাদী ম এবং সমবাদী সা।

৩। উভয় রাগের জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ।

৪। উভয় রাগের গ্‌ নি্‌ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

বৈসাদৃশ্য :—

ভীমপলশ্রী	বাগেশ্রী
১। পঞ্চম মহত্বপূর্ণ স্বর।	১। ধৈবত মহত্বপূর্ণ স্বর।
২। আরোহে রে প বর্জিত।	২। আরোহে রে ধ বর্জিত।
৩। গায়ন সময় দিবা ৩য় প্রহর।	৩। গায়ন সময় মধ্যরাত্রি।
৪। পূর্বাঙ্গ প্রবল।	৪। উত্তরাঙ্গ প্রবল।

ভীমপলশ্রী—পটদীপ

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগই কাফী থাট থেকে উৎপন্ন।

২। উভয় রাগের জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ।

৩। উভয় রাগের আরোহে রে ধ বর্জিত।

৪। উভয় রাগে সমবাদী সা এবং কোমল গ্ ব্যবহৃত হয়।

বৈসাদৃশ্য :—

ভীমপলশ্রী	পটদীপ
১। বাদী মধ্যম।	১। বাদী পঞ্চম।
২। গ্ নি্ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।	২। গ্ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।
৩। পঞ্চম মহত্বপূর্ণ স্বর।	৩। নিষাদ মহত্বপূর্ণ স্বর।
৪। পূর্বাঙ্গ প্রবল।	৪। উত্তরাঙ্গ প্রবল।
৫। দিবা ৩য় প্রহরে গেয়।	৫। রাত্রি ২য় প্রহরে গেয়।

মারবা—সোহনী

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগই মারবা থাট থেকে উৎপন্ন।

২। উভয় রাগে রে্ কোমল, কড়িমধ্যম এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

৩। উভয় রাগের পঞ্চম বর্জিত এবং জাতি ষাড়ব।

৪। উভয়ই সন্ধিপ্রকাশ এবং চঞ্চল প্রকৃতির রাগ।

বৈসাদৃশ্য :—

মারবা	সোহনী
১। বাদী রে্, সমবাদী ধ।	১। বাদী ধ, সমবাদী গ।
২। সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ।	২। প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ।
৩। ঋষভ মহত্বপূর্ণ স্বর।	৩। ধৈবত মহত্বপূর্ণ স্বর।
৪। পূর্বাঙ্গ প্রবল।	৪। উত্তরাঙ্গ প্রবল।

মারবা—পুরিয়া

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগই মারবা থাট থেকে উৎপন্ন।

২। উভয় রাগেই কোমল রে কড়িমধ্যম এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

৩। উভয় রাগের পঞ্চম বর্জিত এবং জাতি ষাড়ব।

৪। উভয়ই সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ।

৫। উভয়ই পূর্বাঙ্গ প্রধান তথা করুণ রসাত্মক রাগ।

বৈসাদৃশ্য :—

মারবা	পুরিয়া
১। বাদী রে, সমবাদী ধ।	১। বাদী গ, সমবাদী নি।
২। রে মহত্বপূর্ণ স্বর।	২। নি মহত্বপূর্ণ স্বর।
৩। চঞ্চল প্রকৃতি।	৩। গম্ভীর প্রকৃতি।

পূরবী—শ্রী

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগই পূরবী থাট থেকে উৎপন্ন।

২। উভয় রাগেই রে, ধ কোমল, কড়িমধ্যম এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

৩। উভয়ই সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ।

৪। উভয়েরই অবরোহণ সম্পূর্ণ।

৫। উভয়ই করুণ ও ভক্তি রসাত্মক রাগ।

বৈসাদৃশ্য :—

পূরবী	শ্রী
১। জাতি সম্পূর্ণ।	১। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ।
২। বাদী গ, সমবাদী নি।	২। বাদী রে, সমবাদী প।
৩। দুই মধ্যম যুক্ত।	৩। কেবলমাত্র কড়িমধ্যম প্রযুক্ত হয়।
৪। চলন সহজ ও সরল।	৪। চলন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

বসন্ত—পরজ

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগই পূরবী থাট থেকে উৎপন্ন।

২। উভয় রাগেই ঋ, ধ্ কোমল, দুই মধ্যম এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

৩। উভয় রাগের আরোহে রে, প বর্জিত।

৪। উভয় রাগের বাদীস্বর তারষড়্জ।

৫। উভয় রাগের গায়ন সময় রাত্রি অন্তিম প্রহর।

৬। উভয় রাগই উত্তরাঙ্গ প্রধান এবং আনন্দের উদ্বোধক।

বৈসাদৃশ্য :—

বসন্ত	পরজ
১। মৌসমী রাগ এবং প্রকৃতি গম্ভীর।	১। অপেক্ষাকৃত চঞ্চল প্রকৃতির রাগ।
২। ম্ঁ ধ্ ঋঁ সংগতি অধিক হয়।	২। নি ধ্ নি সংগতি অধিক হয়।
৩। সমবাদী মধ্যম।	৩। সমবাদী পঞ্চম।
৪। শুদ্ধ মধ্যম বিবাদীরূপে প্রয়োগ করা হয়, যেমন—সা ম, মর্মমগ, ম্ঁধ্ ঋঁ, র্সা।	৪। দুটি মধ্যমই অনুবাদীরূপে ব্যবহৃত হয়, যেমন—র্মপধপ, গমগ, ম্ঁধ্ র্সা, নিধ্নি, ধ্প র্মপ, গমগ, র্মধ্ র্সা।
৫। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ।	৫। জাতি সম্পূর্ণ।

গৌড়সারং—গৌড়মল্লার

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগের জাতি সম্পূর্ণ।

২। উভয় রাগই পূর্বাঙ্গ প্রধান এবং বক্র প্রকৃতির।

বৈসাদৃশ্য :—

গৌড়সারং

১। কল্যান থাট।

২। বাদী গ, সমবাদী ধ।

৩। দুই মধ্যম ও অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

৪। কোমল নি বিবাদীরূপে ব্যবহৃত হয়।

৫। গায়ন সময় মধ্যাহ্ন।

৬। প্রকৃতি চঞ্চল।

গৌড়মল্লার

১। কাফী থাট, মতান্তরে খম্বাজ থাট।

২। বাদী ম, সমবাদী সা।

৩। দুই নি এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

৪। ক্বচিৎ কোমল গ ব্যবহৃত হয়।

৫। মধ্যরাত্রি এবং বর্ষা ঋতুতে গেয়।

৬। প্রকৃতি গম্ভীর।

মিঁয়ামল্লার—বহার

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগই কাফী থাট থেকে উৎপন্ন।

২। উভয় রাগের বাদী ম এবং সমবাদী সা।

৩। উভয় রাগই মৌসমী, এবং মধ্যরাত্রিতে গেয়।

৪। উভয় রাগের অবরোহে ধৈবত বর্জিত।

৫। উভয় রাগে কোমল গ এবং দুটি নি ব্যবহৃত হয়।

বৈসাদৃশ্য :—

মিঁয়ামল্লার

১। জাতি সম্পূর্ণ-ষাড়ব।

২। মন্দ্রসপ্তকের বিস্তার আকর্ষণীয়।

৩। প্রকৃতি গম্ভীর।

৪। পূর্বাঙ্গ প্রবল।

বহার

১। জাতি ষাড়ব।

২। মধ্যসপ্তকের বিস্তার আকর্ষণীয়।

৩। প্রকৃতি চঞ্চল।

৪। উত্তরাঙ্গ প্রবল।

মালগুঞ্জ—জয়জয়ন্তী

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগেই দুই গ, দুই নি এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

২। উভয় রাগেই কোমল গ অবরোহণে ব্যবহৃত হয়।

৩। উভয় রাগের অবরোহণ সম্পূর্ণ।

৪। উভয়ই মিশ্র এবং মধ্যরাত্রে গেয় রাগ।

বৈসাদৃশ্য :—

মালগুঞ্জ	জয়জয়ন্তী
১। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ।	১। জাতি সম্পূর্ণ।
২। কাফী থাট।	২। খম্বাজ থাট।
৩। বাদী ম, সমবাদী সা।	৩। বাদী রে, সমবাদী প।
৪। ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ।	৪। পরমেল প্রবেশক রাগ।
৫। শৃঙ্গার রসাত্মক রাগ।	৫ ভক্তি রসাত্মক রাগ।

দেশকার—শুদ্ধকল্যাণ

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগের আরোহে ম, নি বর্জিত।

২। উভয় রাগেই গ ধ স্বরদ্বয় প্রবল।

বৈসাদৃশ্য :—

দেশকার	শুদ্ধকল্যাণ
১। বিলাবল থাট।	১। কল্যাণ থাট।
২। জাতি ঔড়ব।	২। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ।
৩। বাদী ধ, সমবাদী গ।	৩। বাদী গ, সমবাদী ধ।
৪। উত্তরাঙ্গ প্রধান ও চঞ্চল প্রকৃতি।	৪। পূর্বাঙ্গ প্রধান ও গম্ভীর প্রকৃতি।
৫। দিবা ১ম প্রহরে গেয়।	৫। রাত্রি ১ম প্রহরে গেয়।

দেশকার—ভূপালী

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগের জাতি ঔড়ব।

২। উভয় রাগই শুদ্ধ স্বর যুক্ত।

৩। উভয়েরই গ ধ স্বরদ্বয় প্রবল।

বৈসাদৃশ্য :—

দেশকার	ভূপালী
১। বিলাবল থাট।	১। কল্যাণ থাট।
২। বাদী ধ, সমবাদী গ।	২। বাদী গ, সমবাদী ধ।
৩। দিবা ১ম প্রহরে গেয়।	৩। রাত্রি ১ম প্রহরে গেয়।
৪। উত্তরাঙ্গ প্রধান ও চঞ্চল প্রকৃতি।	৪। পূর্বাঙ্গ প্রধান ও গম্ভীর প্রকৃতি।
৫। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধৈবত।	৫। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পঞ্চম।

দেশকার—বিভাষ

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগের জাতি ঔড়ব।

২। উভয় রাগই উত্তরাঙ্গ প্রধান।

৩। উভয়েরই গ ধ স্বরদ্বয় প্রবল।

৪। উভয় রাগের বাদী ধ্ এবং সমবাদী গ।

বৈসাদৃশ্য :—

দেশকার	বিভাষ
১। বিলাবল থাট।	১। ভৈরব থাট।
২। দিবা ১ম প্রহরে গেয়।	২। প্রাতঃকালে গেয়।
৩। চঞ্চল প্রকৃতি।	৩। শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতি।
৪। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শুদ্ধ ধৈবত।	৪। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোমল ধৈবত।

বেহাগ—শংকরা

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগই বিলাবল থাট থেকে উৎপন্ন।

২। উভয় রাগের বাদী গ এবং সমবাদী নি।

৩। উভয় রাগেই রে আরোহে বর্জিত এবং অবরোহে দুর্বল

৪। উভয় রাগই রাত্রি ২য় প্রহরে গেয়।

বৈসাদৃশ্য :—

শংকরা	বেহাগ
১। জাতি ঔডব-ষাড়ব।	১। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ।
২। উত্তরাঙ্গ প্রধান এবং বীর রসাত্মক।	২। পূর্বাঙ্গ প্রধান এবং করুণ রসাত্মক।
৩। অবরোহে ধ বর্জিত।	৩। আরোহে ধ বর্জিত।
৪। সব শুদ্ধ স্বর।	৪। কড়িমধ্যম বিবাদীরূপে ব্যবহৃত হয়।

দেশ—সারং

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগের বাদী রে এবং সমবাদী প।

২। উভয় রাগের আরোহে গ ধ বর্জিত।

৩। উভয় রাগের আরোহে শুদ্ধ এবং অবরোহে কোমল ন্নি ব্যবহৃত হয়।

৪। উভয় রাগেই দুই নি এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

বৈসাদৃশ্য :—

দেশ	সারং
১। খমাজ থাট।	১। কাফী থাট।
২। জাতি ওড়ব-সম্পূর্ণ।	২। জাতি ঔড়ব।
৩। রাত্রি ২য় প্রহরে গেয়।	৩। গায়ন সময় মধ্যাহ্ন।
৪। উত্তরাঙ্গ প্রবল।	৪। পূর্বাঙ্গ প্রবল।

খমাজ—তিলং

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগই খমাজ থাট থেকে উৎপন্ন।

২। উভয় রাগের বাদী গ এবং সমবাদী নি।

৩। উভয় রাগেই দুই নি এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

৪। উভয় রাগের গায়ন সময় রাত্রি ২য় প্রহর।

৫। উভয় রাগের আরোহে রে বর্জিত।

৬। উভয়েরই প্রকৃতি চঞ্চল

বৈসাদৃশ্য :—

খম্বাজ	তিলং
১। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ	১। জাতি ঔড়ব।
২। উত্তরাঙ্গ প্রবল।	২। পূর্বাঙ্গ প্রবল।

আশাবরী—জৌনপুরী

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগই আশাবরী থাট থেকে উৎপন্ন।

২। উভয় রাগের গ, ধ, নি কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

৩। উভয়েরই আরোহে গ বর্জিত।

৪। উভয়েরই বাদী ধ এবং সমবাদী গ।

বৈসাদৃশ্য :—

আশাবরী	জৌনপুরী
১। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ।	১। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ
২। আরোহে গ, নি বর্জিত।	২। আরোহে গ বর্জিত
৩। পঞ্চম দুর্বল।	৩। পঞ্চম মহত্বপূর্ণ।

দরবারীকানাড়া—আড়াণা

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগই আশাবরী থাট থেকে উৎপন্ন।

২। উভয়েরই সমবাদী পঞ্চম।

৩। উভয় রাগের গ, ধ, নি কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

৪। উভয়েরই ধ বক্র।

৫। উভয় রাগই মধ্যরাত্রে গেয়।

বৈসাদৃশ্য :—

দরবারীকানাড়া	আড়াণা
১। জাতি সম্পূর্ণ-ষাড়ব।	১। জাতি ষাড়ব।
২। বাদী রে।	২। বাদী তারষড়্‌জ।
৩। প্রকৃতি গম্ভীর।	৩। প্রকৃতি চঞ্চল।
৪। পূর্বাঙ্গ প্রবল।	৪। উত্তরাঙ্গ প্রবল।
৫। কোমল নিষাদযুক্ত।	৫। দুই নিষাদযুক্ত।

মুলতানী—তোড়ী

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগই তোডী থাট থেকে উৎপন্ন।

২। উভয় রাগেই রে, গ, ধ, কোমল ও তীব্রমধ্যম ব্যবহৃত হয়।

৩। উভয়েরই অবরোহন সম্পূর্ণ।

বৈসাদৃশ্য :—

মূলতানী

১। বাদী প, সমবাদী সা।

২। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ।

৩। গায়ন সময় দিবা ৪র্থ প্রহর।

৪। সা, প নি প্রবল স্বর।

৫। পূর্বাঙ্গ প্রধান এবং গম্ভীর প্রকৃতি।

তোড়ী

১। বাদী ধ, সমবাদী গ

২। জাতি সম্পূর্ণ।

৩। গায়ন সময় দিবা ২য় প্রহর।

৪। রে, গ, ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং পঞ্চম দুর্বল।

৫। উত্তরাঙ্গ প্রধান এবং চঞ্চল প্রকৃতি।

ভৈরবী—মালকোষ

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগই ভৈরবী থাট থেকে উৎপন্ন।

২। উভয়েরই বাদী ম এবং সমবাদী সা।

৩। উভয় রাগেই গ, ধ, নি কোমল।

বৈসাদৃশ্য :—

ভৈরবী

১। জাতি সম্পূর্ণ।

২। ১২টি স্বরই ব্যবহৃত হয়।

৩। গায়ন সময় প্রাতঃকাল, মতান্তরে সর্বকালীক।

৪। চঞ্চল প্রকৃতির রাগ।

৫। মতান্তরে ধ গ বাদী-সংবাদী।

মালকোষ

১। জাতি ঔড়ব।

২। মাত্র ৫টি স্বর ব্যবহৃত হয়।

৩। রাত্রি ৩য় প্রহরে গেয়।

৪। শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির রাগ।

পরজ—কালংড়া

সাদৃশ্য :—

১। উভয় রাগেরই জাতি সম্পূর্ণ।

২। উভয়েরই সা প স্বরদ্বয় প্রবল।

৩। উভয়েরই ঋ, ধ কোমল।

৪। উভয়েরই গায়ন সময় রাত্রির অন্তিম প্রহর।

৫। উভয়েরই প্রকৃতি চঞ্চল এবং উত্তরাঙ্গ প্রধান

বৈসাদৃশ্য :—

পরজ	কালংড়া
১। পূরবী থাট।	১। ভৈরব থাট।
২। বাদী সা, সমবাদী প।	২। বাদী প, সমবাদী সা
৩। দুই মধ্যমযুক্ত।	৩। শুদ্ধ মধ্যমযুক্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বরশাস্ত্র

আরম্ভিক স্বর ঃ সাংগীতিক স্বর সমূহ পশুপক্ষীর ধ্বনি থেকে গৃহীত, প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে এইরূপ কথিত আছে। কিন্তু সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোনরূপ ব্যাখ্যা করা হয় নি। প্রকৃতপক্ষে পশুপক্ষীর ধ্বনির সঙ্গে ষড়্জাদি স্বর সমূহের কোন সাদৃশ্য নেই বলেই মনে হয়। তাই ভারতীয় সংগীতে, কোন সপ্তকের, আরম্ভিক স্বর সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট রূপ (ওজন) পাওয়া যায় না। যে কোন স্বরই ষড়্জ হিসাবে গ্রহণযোগ্য। অবশ্য প্রাচীন সংগীত প্রগতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা ছিল না, এমন কথা ভাবা যায় না। হয়তো অন্যান্য বহু বিষয়ের মতো এ বিষয়ের মর্মোদ্ধারও আমরা করতে পারি নি। ভরত আদি সংগীতাচার্যেরা বীণার তারে যে স্বর-স্থাপন ব্যবস্থা করেছেন তার থেকে মধ্যষড়্জ স্বরটির অবস্থান সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা করা যায় মাত্র। তবে মধ্যযুগের শ্রীনিবাস আদি শাস্ত্রীরা এ বিষয়ে অনেকটা সুষ্ঠ ব্যবস্থার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বীণার ৩৬ ইঞ্চি তারের উপরে স্বর-স্থাপন প্রণালী ব্যাখ্যা করেছেন। যার সাহায্যে আমরা মধ্যষড়্জের একটা মোটামুটি স্বর-স্থান স্থির করতে পারি।

তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাঁদের আবিস্কৃত কম্পনসংখ্যা পরিমাপের যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিটি স্বরেরই নির্দিষ্ট কম্পনসংখ্যা নিশ্চিত করেছেন। তাঁদের মতে কম্পনসংখ্যার সাহায্যে স্বরের স্থান বা রূপ নিরূপণ করা যায়। তাঁদের শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে মধ্যষড়্জের প্রতি সেকেণ্ডের (অধিক সমর্থিত) কম্পনসংখ্যা হোল ২৪০। অবশ্য আরম্ভিক স্বর সম্পর্কে সেখানেও বিভিন্ন মত প্রচলিত। যেমন,

বৈজ্ঞানিক মহল,	সা=২৫৬[১]
ইংলণ্ড ইত্যাদি,	সা=২৫৮·৬৫

১ বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী রচিত 'ভারতীয় সংগীতকোষ' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

ফিজ হারমনিক,	সা=২৬১'২৫
নবফিল হারমনিক,	সা=২৬৪
রাশিয়া,	সা=২৬৭'৫
সামরিক,	সা=২৭০

আন্দোলন/কম্পন (Vibration) : বীণা অথবা অনুরূপ কোন যন্ত্রের তারে আঘাত করলে তাতে যে ঝংকার উৎপন্ন হয়, সেই ঝংকার হাওয়াতে কম্পন (Vibration) বা আন্দোলনের সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ সেই আন্দোলন পরিমাপের যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যার সাহায্যে উচ্চ-নীচতা অনুসারে যে কোন ধ্বনির প্রতি সেকেণ্ডের কম্পনসংখ্যা গণনা করা যায়।

স্বরান্তর/গুণান্তর (Ratio) : দুটি স্বর-স্থানের কম্পনসংখ্যা বা দৈর্ঘ্যের ভাগফলকে স্বরান্তর (Ratio) বা গুণান্তর বলে।

অনুপাত এবং আনুপাতিক সম্বন্ধ : স্বরান্তর বা গুণান্তরকেই অনুপাত বলে। **যে কোন স্বরস্থানের দৈর্ঘ্য এবং কম্পনসংখ্যার অনুপাত সর্বদা সমান হয়, কিন্তু সম্বন্ধ হয় সম্পূর্ণ বিপরীত।** কারণ ধ্বনির উচ্চতা বেশী হলে কম্পনসংখ্যা বাড়ে কিন্তু দৈর্ঘ্য কমতে থাকে।

স্বরস্থান নির্ণয় : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংগীত জগতে দুটি মাত্র উপায়ে স্বরস্থান নির্ণয় করা হয়। যেমন,

১। বীণার তারের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যে স্বরস্থান নির্ণয় করা।

২। প্রতিটি স্বরের প্রতি সেকেণ্ডের কম্পনসংখ্যা নির্ণয় করা।

এই দুটি প্রণালীর মূলগত ঐক্য বিশেষভাবে লক্ষনীয়, যার থেকে এদের যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

বীণার তারের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যে স্বরস্থান-নির্ণয়ের পদ্ধতি সর্বপ্রথম নাট্যশাস্ত্রকার আবিষ্কার তথা ব্যাখ্যা করেছেন। এই পদ্ধতির মূল সূত্র হোল, ষড়্জপঞ্চমভাব অনুসারে স্বর স্থাপন করা। যাকে সংবাদতত্ত্ব বলে, এই সংবাদ-তত্ত্বের অর্থ হোল, প্রতিটি স্বর থেকে তার পঞ্চম স্বর দেড়গুণ এবং অষ্টম স্বর দুগুণ কম দৈর্ঘ্যযুক্ত হবে। ভরত বর্ণিত প্রণালীকে সহজতর করে পরবর্তী শাস্ত্রীরা বীণার ৩৬ ইঞ্চি তারের উপরে স্বর সমূহের স্থান-নির্ণয় পদ্ধতির ব্যাখ্যা করেছেন।

পাশ্চাত্য সংগীতবিদ্বানেরা কম্পনসংখ্যা পরিমাপের যন্ত্রের সাহায্যে মধ্য ষড়্জের (C) কম্পনসংখ্যা ২৪০ স্থির করে, যাবতীয় স্বর সমূহের কম্পনসংখ্যা নিরূপণ করেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁরাও গ্রীক সংগীতবিজ্ঞান পিথাগোরাস (Pythagoras) (যিনি ভারতবর্ষ থেকেই সংগীত দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেছিলেন বলে ঐতিহাসিক ভিত্তিতে জানা যায়) বর্ণিত প্রণালী The Harmony of the fifth (ষড্জপঞ্চমভাব) সূত্র অনুসারেই কম্পন-সংখ্যাগুলি নিরূপণ করেছেন।

কোন স্বরস্থানের দৈর্ঘ্য বা কম্পনসংখ্যা নির্ণয় করতে হলে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি জানতে হবে। যেমন,

১। যে স্বরের দৈর্ঘ্য বা কম্পনসংখ্যা জানতে হবে সেই স্বরস্থানের দৈর্ঘ্য বা কম্পনসংখ্যা।

২। ষড্জের (Base Note) দৈর্ঘ্য বা আন্দোলনসংখ্যা।

৩। যে স্বরের দৈর্ঘ্য বা কম্পনসংখ্যা জানতে হবে সেই স্বরের সঙ্গে ষড্জের স্বরান্তর বা অনুপাত।

যেমন ষড্জের দৈর্ঘ্য ৩৬ ইঞ্চি এবং পঞ্চমের ২৪ ইঞ্চি। এ'দুটির স্বরান্তর বা অনুপাত হোল :— $\frac{৩৬}{২৪} = \frac{৩}{২}$ অথবা ১$\frac{১}{২}$। অর্থাৎ পঞ্চমের দৈর্ঘ্য ষড্জের থেকে দেড়গুণ কম।

কিন্তু ষড়্জের কম্পনসংখ্যা ২৪০ এবং পঞ্চমের ৩৬০। এ'দুটির স্বরান্তর বা অনুপাত হোল :— $\frac{২৪০}{৩৬০} = \frac{২}{৩}$। অর্থাৎ পঞ্চমের কম্পনসংখ্যা ষড্জের থেকে দেড়গুণ বেশী।

স্বরস্থান-নির্ণয় সূত্র : স্বরস্থান নির্ণয়ের সূত্র হোল দুটি। যেমন,

১। ষড্জ—কোন স্বরের 'অনুপাত'=সেই স্বরের দৈর্ঘ্য।

২। ষড়্জ × কোন স্বরের 'অনুপাত'=সেই স্বরের কম্পনসংখ্যা।

স্বরস্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে প্রাচীন তথা মধ্যযুগের প্রতিনিধি শাস্ত্রী হিসাবে পণ্ডিত শ্রীনিবাস বর্ণিত শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরস্থাপন প্রণালীর পরিচয়, অতঃপর বিস্তারিত-রূপে দেওয়া হোল।

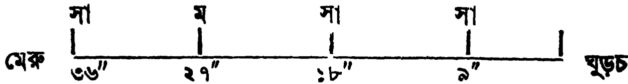
শ্রীনিবাস বর্ণিত শুদ্ধ স্বরসপ্তক : একথা মনে রাখা কর্তব্য যে, শ্রীনিবাস বর্ণিত শুদ্ধ স্বরসপ্তক ছিল বর্তমানে প্রচলিত কাফী থাটের মতো।

অর্থাৎ তাঁর স্বরসপ্তকের গান্ধার ও নিষাদ স্বরদ্বয় ছিল কোমল বা বিকৃত। অতএব তাঁর শুদ্ধ স্বরসপ্তক হোল, 'সা রে গ্ম ম প ধ ন্নি সা' এবং কোমল বা বিকৃত স্বরগুলি হোল, 'রে গ ম ধ নি'।

মধ্য তার এবং অতি তারষড়্জ:

পূর্বাংত্যযোশ্চমেরোশ্চ মধ্যে তারকসঃ স্থিতঃ।
তদর্ধে ত্বতিতারস্থ সস্বরস্থ স্থিতির্ভবেৎ॥

অর্থাৎ মেরু ও ঘুড়চের (৩৬ ইঞ্চি) মধ্যস্থানে তারষড়্জ এবং তার সা ও ঘুড়চের মধ্যস্থানে অতিতারষড়্জ অবস্থিত। অতএব, ৩৬—২=১৮, সা=১৮" এবং ১৮—২=৯, র্স=৯"। যেমন,



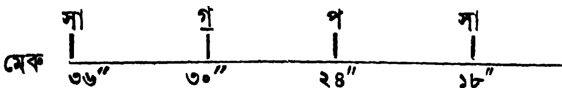
মধ্যম: মধ্যস্থানাদিমষড়্জমারভ্যাতারষড়্জগম্।
সূত্রং কুর্যাত্তদর্ধে তু স্বরং মধ্যমাচরেৎ॥

অর্থাৎ, মধ্য ও তারষড়্জের মধ্যস্থানে মধ্যম অবস্থিত।

অতএব, $\frac{৩৬ - ১৮}{২}$+১৮=২৭, ম=২৭ ইঞ্চি।

পঞ্চম: ভাগত্রয়সমাযুক্তং তৎসূত্রংকারিতম ভবেৎ।
পূর্বভাগদ্বযাদগ্রে স্থাপনীযোহথ পঞ্চমঃ॥

অর্থাৎ, মেরু ও তারষড়্জের মধ্যবর্তী স্থানকে তিনভাগ করে, দুইভাগ ছেড়ে উত্তর ভাগে পঞ্চম স্থাপন করতে হবে। অতএব, $\frac{৩৬—১৮}{৩}$+১৮=২৪, প=২৪ ইঞ্চি। যেমন,



গান্ধার: ষড়্জপঞ্চম মধ্যে তু গান্ধারস্থানমাচরেৎ।

অর্থাৎ, ষড়্জ ও পঞ্চমের মধ্যস্থানে গান্ধার অবস্থিত।

অতএব, $\frac{৩৬ - ২৪}{২}$+২৪=৩০, গ্=৩০ ইঞ্চি।

ঋষভ : ষড়্‌জপঞ্চমগং স্থত্রমংশত্রয়সমন্বিতম্।
তত্রাংশদ্বয়সংত্যাগাৎ পূর্বভাগে তু রির্ভবেৎ॥

অর্থাৎ; ষড়্‌জ ও পঞ্চমের মধ্যবর্তী স্থানকে তিনভাগ করে, দুইভাগ ছেড়ে পূর্ব ভাগে ঋষভ অবস্থিত। অতএব, ৩৬—$\frac{৩৬—২৪}{৩}$=৩২ ; রে=৩২" ইঞ্চি।

যেমন,



ধৈবত : পঞ্চমোত্তরষড়্‌জাখ্য মধ্যে ধৈবতমাচরেৎ।

অর্থাৎ, পঞ্চম ও তারষড়্‌জের মধ্যে (মধ্যস্থানে ?) ধৈবত অবস্থিত। কিন্তু এই হিসাবে ধৈবত স্থাপন করলে স্বরটি কিছুটা উঁচু (চড়া) হয়ে যায়। তাই সমালোচকদের মতে 'মধ্যে' শব্দটি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে পণ্ডিত শ্রীনিবাস ইতিপূর্বেই অন্যত্র এ সম্পর্কে বলেছেন : 'স্বরসংবাদিতাজ্ঞানম্ স্বরস্থাপন কারণম্" অর্থাৎ স্বরস্থাপনকালে 'ষড়্‌জপঞ্চমভাব' তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং সেই হিসাবেই স্বরস্থাপন করা কর্তব্য। সুতরাং উক্ত বর্ণনানুসারে, প্রথমে ঋষভের স্থান নিশ্চিত করে তারপঞ্চমস্বর হিসাবে ধৈবত স্থাপিত হবে। অতএব এখানে 'মধ্যে' শব্দের অর্থ মধ্যস্থান না মনে করে মধ্যবর্তী-স্থান মনে করলেই বিষয়টির সহজ সমাধান হয়ে যাবে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাই ধৈবত সম্পর্কে বলেছেন :

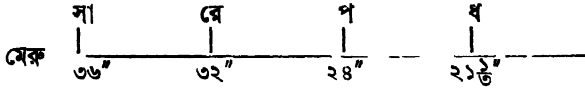
যথা শুদ্ধর্ষভস্তাসৌ প্রস্ফুটঃ পঞ্চমো ভবেৎ।

অর্থাৎ, সা—প স্বরদ্বয় যেমন সম্বন্ধে প্রস্ফুটিত, ধৈবতকে তেমনি ঋষভের সঙ্গে সম্পর্কিত করে স্থাপন করো। আর স্বর সংবাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

স্বর সংবাদ : সপয়ো রিধয়োশ্চৈব তথৈব গনিষাদয়োঃ।
সংবাদঃ সংমতো লোকে মসয়োঃ স্বরয়োর্মিথঃ॥

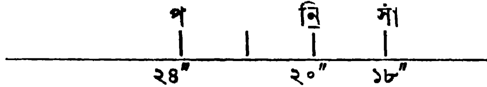
অর্থাৎ সা-প, রে-ধ, গ-নি, ম-সা প্রভৃতি সম্বন্ধগুলিকে স্বরসংবাদ বলে। অর্থাৎ এগুলিকেই 'ষড়্‌জপঞ্চমভাব' অথবা The Harmony of the fifth

বলা হয়েছে। অতএব ধৈবতের স্থান ঋষভের দেড়গুণ উঁচুতে। সুতরাং $৩২ \div ১\frac{১}{২}$ বা $৩২ \times \frac{২}{৩} = \frac{৬৪}{৩} = ২১\frac{১}{৩}$, ধ$=২১\frac{১}{৩}$ ইঞ্চি। যেমন,



নিষাদ ঃ পসয়োর্মধ্যভাগে স্যাৎ ভাগত্রয়সমন্বিতে
পূর্বভাগদ্বয়ংত্যক্ত্বা নিষাদো রাজতে স্বরঃ।

অর্থাৎ পঞ্চম ও তারষড়্‌জের মধ্যবর্তী স্থানকে তিনভাগ করে, দুইভাগ ছেড়ে উত্তরভাগে নিষাদ অবস্থিত। অতএব, $\frac{২৪ - ১৮}{৩} + ১৮ = ২০$; নি$=২০$ ইঞ্চি।



শ্রীনিবাস রচিত বিকৃত স্বর।

(কোমল ঋষভ) ঃ

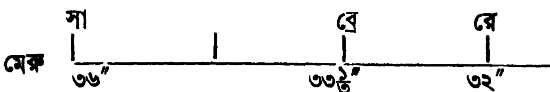
ভাগত্রয়োন্বিতে মধ্যে মেরোশ্বর্ষভসংজ্ঞিতাৎ।
ভাগদ্বয়োত্তরং মেরোঃ কুর্যাৎ কোমলরিস্বরম্॥

অর্থাৎ মেরু ও ঋষভের মধ্যবর্তী স্থানকে তিনভাগ করে, দুইভাগ ছেড়ে উত্তরভাগে কোমল ঋষভ অবস্থিত।

অতএব,

$$\frac{৩৬ - ৩২}{৩} + ৩২ = \frac{৪}{৩} + ৩২ = \frac{১০০}{৩} = ৩৩\frac{১}{৩}\ ;\ রে = ৩৩\frac{১}{৩}"\ ।$$

যেমন,



তীব্র গান্ধার ঃ মেরু ধৈবতয়োর্মধ্যে তীব্রগান্ধারমাচরেৎ।

অর্থাৎ মেরু ও ধৈবতের মধ্যস্থানে তীব্রগান্ধার অবস্থিত।

অতএব, $\frac{৩৬-২১\frac{১}{৩}}{২}+২১\frac{১}{৩}=\frac{৩৬-\frac{৬৪}{৩}}{২}+\frac{৬৪}{৩}=\frac{১০৮-৬৪}{৩}\div ২+\frac{৬৪}{৩}=$

$$\frac{৪৪}{৩}\times\frac{১}{২}+\frac{৬৪}{৩}=\frac{২২}{৩}+\frac{৬৪}{৩}=\frac{২২+৬৪}{৩}=\frac{৮৬}{৩}=২৮\frac{২}{৩},\ গ=২৮\frac{২}{৩}\text{ইঞ্চি}$$

যেমন,

মেরু — সা (৩৬″) — গ (২৮⅔″) — ধ (২১⅓″)

তীব্রতর মধ্যম : ভাগত্রয়বিশিষ্টেঽস্মিন তীব্রগান্ধারষড্‌জযোঃ।
পূর্বভাগোত্তবং মধ্যে মং তীব্রতরমাচরেৎ ॥

অর্থাৎ তীব্রগান্ধার ও তারষড্‌জের মধ্যবর্তী স্থানকে তিনভাগ করে দুই-ভাগ ছেড়ে পূর্বভাগে তীব্রমধ্যম অবস্থিত। অতএব,

$$\frac{২৮\frac{২}{৩}-১৮}{৩}-২৮\frac{২}{৩}=\frac{\frac{৮৬}{৩}-১৮}{৩}-\frac{৮৬}{৩}=\frac{৮৬-৫৪}{৩}\times\frac{১}{৩}-\frac{৮৬}{৩}$$

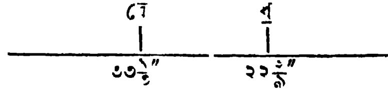
$$=\frac{৩২}{৯}-\frac{৮৬}{৩}=\frac{৩২-১৫৮}{৯}=\frac{২২৬}{৯}=২৫\frac{১}{৯}$$ ইঞ্চি = ম̍। যেমন,

মেরু — সা (৩৬″) — গ (২৮⅔″) — ম̍ (২৫ 1/9″) — সা (১৮″)

কোমল ধৈবত : ভাগত্রয়ান্বিতে মধ্যে পঞ্চমোত্তরষড্‌জয়োঃ।
কোমলো ধৈবতঃ স্থাপ্যঃ পূর্বভাগে বিবেকিভিঃ ॥

অর্থাৎ পঞ্চম ও তারষড্‌জের মধ্যবর্তী স্থানকে তিনভাগ করে দুইভাগ ছেড়ে পূর্বভাগে কোমল ধৈবত অবস্থিত। কিন্তু সেই হিসাবে স্বরস্থাপন করলে, শুদ্ধ ধৈবতের মতো, কিছুটা চড়া হয়ে যায়। তাই এক্ষেত্রেও, কোমল ঋষভ স্থাপন করে 'ষড়্‌জপঞ্চমভাব' অনুসারে কোমল ধৈবত স্থাপন করতে হবে।

এখানে 'বিবেকিভিঃ' শব্দটি সম্ভবতঃ এইজন্যই প্রযুক্ত হয়েছে। অতএব, কোমল রে × ১$\frac{১}{২}$ = ধ। অর্থাৎ ৩৩$\frac{১}{৩}$ × ১$\frac{১}{২}$ = $\frac{১০০}{৩}$ × $\frac{২}{৩}$ = $\frac{২০০}{৯}$ = ২২$\frac{২}{৯}$; ধ = ২২$\frac{২}{৯}$ ইঞ্চি। যেমন,

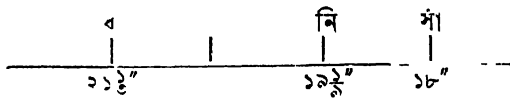


তীব্র নিষাদ : তয়োর্ধসয়োর্মধ্যে ভাগত্রয়সমন্বিতে।
প্রভাগদ্বয়াদধর্বং নিষাদং তীব্রমাচরেৎ॥

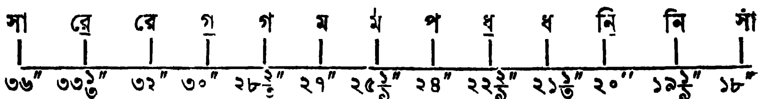
অর্থাৎ শুদ্ধ ধৈবত ও তারষড্‌জের মধ্যবর্তী স্থানকে তিনভাগ করে দুইভাগ ছেড়ে উত্তরভাগে তীব্র নিষাদ অবস্থিত। অতএব,

$$\frac{২১\frac{১}{৩} - ১৮}{৩} + ১৮ = \frac{৬৪}{৩} - ১৮ \times \frac{১}{৩} + ১৮ = \frac{৬৪ - ৫৪}{৩} \times \frac{১}{৩} + ১৮ = \frac{১০}{৩} \times \frac{১}{৩} +$$

$$১৮ = \frac{১০}{৯} + ১৮ = \frac{১০ + ১৬২}{৯} = \frac{১৭২}{৯} = ১৯\frac{১}{৯},$$ নি = ১৯$\frac{১}{৯}$ ইঞ্চি। যেমন,



শ্রীনিবাস রচিত শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরস্থাপন :



হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির প্রবর্তক পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, পণ্ডিত শ্রীনিবাস উল্লিখিত সূত্রানুসারেই প্রায় সবগুলি স্বরস্থান নিশ্চিত তথা স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু কোমল ঋষভ, কোমল ধৈবত এবং কড়িমধ্যম স্বরত্রয় স্থাপনের ক্ষেত্রে

কিঞ্চিত ভিন্ন অভিমত প্রচার করেছেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বিকৃত স্বরস্থান পাঁচটি সম্পর্কে বলেছেন :

মধ্যে ষড়্‌জর্ষভকয়োঃ সংস্থিতঃ কোমলর্ষভঃ।
ষড়্‌জপঞ্চমভাবেন তৎসংবাদী ধকোমলঃ॥
ষড়্‌জপঞ্চময়োর্মধ্যে গান্ধারঃ কোমলো ভবেৎ।
মধ্যপঞ্চময়োর্মধ্যে তীব্রমধ্যমাচরেৎ॥
সপয়োর্মধ্যভাগে স্যাদ্ভাগত্রয়সমন্বিতে।
পূর্বভাগদ্বয়াদগ্রে নিষাদঃ কোমলো ভবেৎ॥

অর্থাৎ সা এবং রে'র মধ্যস্থানে কোমল $\underline{\text{রে}}$, ষড়্‌জপঞ্চমভাব অনুসারে কোমল $\underline{\text{ধ}}$, সা এবং পা'র মধ্যস্থানে কোমল $\underline{\text{গ}}$; মধ্যম এবং পঞ্চমের মধ্যস্থানে তীব্রমধ্যম এবং প ও তার সা'র মধ্যবর্তী স্থানকে তিনভাগ করে দুইভাগ ছেড়ে উত্তরভাগে কোমল নিষাদ অবস্থিত।

এই সূত্র অনুসারে কোমল $\underline{\text{গ}}$ ও কোমল $\underline{\text{নি}}$ যথাক্রমে ৩০ ও ২০ ইঞ্চিতেই থাকে, অর্থাৎ শ্রীনিবাসের সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু $\underline{\text{রে}}$, ম', $\underline{\text{ধ}}$ স্বরত্রয়ের স্থানগুলি অভিন্ন নয়। সেগুলি এইরূপ—

$\underline{\text{রে}} = \frac{\text{সা} - \text{রে}}{২} - \text{সা}$, অতএব, $\frac{৩৬ - ৩২}{২} - ৩৬ = ৩৪$; $\underline{\text{রে}} = ৩৪$ ইঞ্চি।

ম' $= \frac{\text{ম} - \text{প}}{২} - \text{ম}$, অতএব, $\frac{২৭ - ২৪}{২} - ২৭ = ২৫\frac{১}{২}$, ম' $= ২৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

$\underline{\text{ধ}} = \underline{\text{রে}} \div ১\frac{১}{২}$; অতএব, $৩৪ \div ১\frac{১}{২} = ৩৪ \times \frac{২}{৩} = \frac{৬৮}{৩} = ২২\frac{২}{৩}$,
$\underline{\text{ধ}} = ২২\frac{২}{৩}$ ইঞ্চি। যেমন,

সা	$\underline{\text{রে}}$	রে	ম	ম'	প	$\underline{\text{ধ}}$
৩৬"	৩৪"	৩২"	২৭"	২৫½"	২৪"	২২⅔"

শ্রীনিবাস, হিন্দুস্থানী ও পাশ্চাত্য স্বরস্থান তালিকা :

পরপৃষ্ঠার তালিকায় শ্রীনিবাস, হিন্দুস্থানী তথা পাশ্চাত্য স্বরস্থান সমূহের দৈর্ঘ্য, আন্দোলনসংখ্যা অনুপাত প্রভৃতি দেখানো হোল।

স্বর	শ্রীনিবাস			হিন্দুস্থানী			পাশ্চাত্য			Notes
	দৈর্ঘ্য	কম্পনসংখ্যা	অনুপাত	দৈর্ঘ্য	কম্পনসংখ্যা	অনুপাত	দৈর্ঘ্য	কম্পনসংখ্যা	অনুপাত	
সা	৩৬"	২৪০	১	৩৬"	২৪০	১	৩৬"	২৪০	১	C
রে̱	৩৩ ১/৩"	২৫৯ ১/৫	২৭/২৫	৩৪"	২৫৪ ২/১৭	১৮/১৭	৩৪ ৩/৪"	২৫৬	১৬/১৫	C"
রে	৩২"	২৭০	৯/৮	৩২"	২৭০	৯/৮	৩২"	২৭০	৯/৮	D
গ̱	৩০"	২৮৮	৬/৫	৩০"	২৮৮	৬/৫	৩০"	২৮৮	৬/৫	D"
গ	২৮ ২/৩"	৩০১ ১৭/৪৩	৫৪/৪৩	২৮ ২/৩"	৩০১ ১৭/৪৩	৫৪/৪৩	২৮ ৪/৫"	৩০০	৫/৪	E
ম	২৭"	৩২০	৪/৩	২৭'	৩২০	৪/৩	২৭"	৩২০	৪/৩	F
ম̍	২৫ ১/৯"	৩৪৪ ৮/১১৩	১৬২/১১৩	২৫ ১/২"	৩৩৮ ১৪/১৭	২৪/১৭	২৫ ৩/৫	৩৩৭ ১/২	৪৫/৩২	F"
প	২৪"	৩৬০	৩/২	২৪"	৩৬০	৩/২	২৪"	৩৬০	৩/২	G
ধ̱	২২ ২/৯"	৩৮৮ ৪/৫	৮১/৫০	২২ ২/৩"	৩৮১ ৩/১৭	২৭/১৭	২২ ১/২"	৩৮৪	৮/৫	G"
ধ	২১ ১/৩"	৪০৫	২৭/১৬	২১ ১/৩"	৪০৫	২৭/১৬	২১ ৩/৫"	৪০০	৫/৩	A
নি̱	২০"	৪৩২	৯/৫	২০"	৪৩২	৯/৫	২০"	৪৩২	৯/৫	Bft
নি	১৯ ১/৯"	৪৫২ ৪/৪৩	৮১/৪৩	১৯ ১/৯"	৪৫২ ৪/৪৩	৮১/৪৩	১৯ ১/৫"	৪৫০	১৫/৮	B
সা̇	১৮"	৪৮০	২	১৮"	৪৮০	২	১৮"	৪৮০	২	Ċ

পূর্বপৃষ্ঠার তালিকানুসারে একথা স্পষ্ট যে, হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির স্বরসমূহ থেকে শ্রীনিবাসের রে, ম, ধ স্বরত্রয় এবং পাশ্চাত্য সংগীতের রে, গ, ম, ধ, ধ, নি স্বরগুলি পার্থক্যযুক্ত।

অতএব, মনে রাখতে হবে যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্বরসপ্তক রচনার সূত্র এক হলেও স্বরস্থানগুলি অভিন্ন নয়।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ও শ্রীনিবাসের স্বরস্থাপন ব্যবস্থার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য।

সাদৃশ্য :—

১। উভয় পণ্ডিতেরই শুদ্ধস্বরগুলি তথা বিকৃত গ, নি বর্তমান সংগীত পদ্ধতিতে স্বীকৃত ও প্রচলিত।

২। বিকৃত রে, ম, ধ স্বরত্রয় ছাড়া অন্যান্য স্বরস্থানগুলি সম্পর্কে উভয়ই অভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৩। উভয়ই শুদ্ধ ও কোমল ধৈবতকে ষড়্‌জপঞ্চমভাব অনুসারে নির্ণয় ও স্থাপন করেছেন।

৪। তীব্র নিষাদকে বিভিন্ন রীতিতে স্থাপন করলেও উভযই অভিন্ন স্বরস্থান স্বীকার করেছেন।

বৈসাদৃশ্য :—

শ্রীনিবাস	ভাতখণ্ডে
১। প্রাচীন রীতির অণুবর্তী শাস্ত্রী ছিলেন।	১। প্রাচীন রীতির অণুবর্তী হলেও নিজস্ব সিদ্ধান্তও প্রচার করেছেন।
২। কোমল গ নি যুক্ত শুদ্ধ থাট স্বীকার করেছেন।	২। শুদ্ধ স্বরসপ্তককে শুদ্ধ থাট বলে স্বীকার করেছেন।
৩। কোমল রে ষড়্‌জ ও ঋষভের মধ্যবর্তী স্থানের তিনভাগের এক ভাগে স্থাপন করেছেন।	৩। ষড়্‌জ ও ঋষভের মধ্যস্থানে কোমল রে স্থাপন করেছেন।
৪। কোমল ধ ২২$\frac{২}{৯}$ ইঞ্চিতে স্থাপন করেছেন।	৪। কোমল ধ ২২$\frac{২}{৩}$ ইঞ্চিতে স্থাপন করেছেন।

৫। তীব্রমধ্যম ২৫$\frac{১}{৯}$ ইঞ্চিতে স্থাপন করেছেন।	৫। তীব্রমধ্যম ২৫$\frac{১}{২}$ ইঞ্চিতে স্থাপন করেছেন।
৬। কোমল রে ৩৩$\frac{১}{৯}$ ইঞ্চিতে স্থাপন করেছেন।	৬। কোমল রে ৩৪ ইঞ্চিতে স্থাপন কবেছেন।
৭। বিকৃত রে, ম, ধ স্বরত্রয় প্রাচীন রীতিতে স্থাপন করেছেন।	৭। বিকৃত রে, ম, ধ স্বরত্রয় স্ব-উদ্ভাবিত স্থানে স্থাপন করেছেন।

সংগীতলিপি (স্বরলিপি) : লিপির উপযোগিতা সমগ্র বিশ্বে অনস্বীকার্য এবং মহত্বপূর্ণ। তা সে চিত্রলিপি, চিহ্নলিপি, বর্ণলিপি, সংগীতলিপি প্রভৃতি যাই হোক না কেন। কারণ লিপির সাহায্য ছাড়া হাজার হাজার বছব পূর্বের বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি এবং অন্যান্য বহু বিচিত্র ঘটনাবলী আমরা জানতে পারতাম না।

সাধারণতঃ সংগীতলিপিকে স্বরলিপি বলা হয়। কিন্তু তাতে যথার্থ অর্থ প্রকাশ করে না। কারণ সংগীতেব লিপিতে শুধু স্বর-ই থাকে না, তাল, লয়, মাত্রা প্রভৃতিরও সমাবেশ থাকে। সুতরাং এর নামকরণ সংগীতলিপি হওয়াই যুক্তি-যুক্ত। এর সংজ্ঞা (Defination) হিসাবে বলা যায় যে, 'সংগীতকে তাল, লয়, স্বর, কণ্ঠস্বর, বর্ণ প্রভৃতি সহযোগে লিপিবদ্ধ করাকে সংগীতলিপি বলে'। গানের লিপিতে ছন্দ বিভাগের মধ্যে উল্লিখিত স্বরসমূহের নীচে থাকে গানের কথা এবং যন্ত্রসংগীতের লিপিতে কথার স্থানে বিভিন্ন যন্ত্রের নিজস্ব সাংকেতিক চিহ্ন থাকে।

উপকারিতা : সংগীতলিপি যদি তাল, লয়, স্বর, কণ্ঠস্বর, মাত্রা প্রভৃতি সহযোগে যথাযথ রূপে রচিত হয়, তাহলে তা অবশ্যই উপকারী। কারণ অতীতের সংগীত-সংবাদ জানতে পারা, সংগীত সংরক্ষণ করা, সংগীত প্রচার করা, উচ্চশ্রেণীর সংগীত শিক্ষা করা প্রভৃতির জন্য সংগীতলিপি অপরিহার্য। অবশ্য একথা ঠিক যে, রাগ বিশেষের চলনবৈশিষ্ট্য, স্বরপ্রয়োগ কৌশল, শিল্পীর স্বকীয়তা প্রভৃতি নির্জীব সংগীতলিপির সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ কোন প্রকার সংগীতলিপিই সংগীতের হুবহু প্রতিচ্ছবি আঁকতে পারে না। যেমন কোন বক্তার বক্তব্যটুকু লিপিবদ্ধ করা যায় কিন্তু তাঁর নিজস্ব বাচন-ভঙ্গিটি লিপিবদ্ধ করা যায় না। সংগীতলিপি তেমনি সংগীতের মোটামুটি ধারণাটুকু দিতে পারে মাত্র। কিন্তু তবু এর উপকারিতা অনস্বীকার্য এবং ব্যাকরণগত

দৃষ্টিতে সার্থক। অনেকে স্বরলিপি সম্বন্ধে বক্রোক্তি করে থাকেন, তাঁরা ভাষার লিপি সম্বন্ধে কিন্তু কিছু বলেন না। এইরূপ মতাবলম্বীরা করুণার পাত্র। কিন্তু একথা সত্য এবং মনে রাখা কর্তব্য যে সংগীতলিপি সংগীতের নগ্ন দেহ মাত্র। কারণ রাগ বিশেষের চলনবৈশিষ্ট্য স্বর প্রয়োগ কৌশল প্রভৃতি গুরুপরম্পরায় কানে শুনে শিক্ষা করাই কর্তব্য।

অপকারিতা: অনেকে নানাবিধ সংগীত গ্রন্থাদি, সংগীতলিপি প্রভৃতির সাহায্যে সংগীতশিল্পী হবার চেষ্টা করেন। তাঁদের সেই প্রচেষ্টা যতই সার্থক মনে হোক না কেন, পরিণামে কতগুলি গলদ থাকা অনিবার্য। কারণ একথা সর্বমান্য যে, সংগীত 'গুরুমুখী বিদ্যা'। তাছাড়া এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, সংগীতলিপির অত্যধিক অনুশীলনে শিল্পীর স্বাভাবিক প্রতিভা, গাইবার সাবলীল গতি, শ্রুতিজ্ঞান প্রভৃতি গুণাবলী পঙ্গু হতে থাকে এবং তাকে অত্যন্ত নির্ভরশীল করে ফেলে। সুতরাং এ বিষয়ে সবলের বিশেষ সচেতন থাকা অবশ্য কর্তব্য।

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: সংগীতলিপির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে, বর্তমানে প্রাপ্ত, সংগীতশাস্ত্রাদি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর সর্বপ্রথম বিকাশ হয়েছিল আরবে, তারপরে পাশ্চাত্য সংগীতে এর প্রচলন হয়। কালক্রমে সেখানে সোলফা, হ্যমস্, চীভ প্রভৃতি সংগীতলিপির বিকাশ ঘটে। পাশ্চাত্যের এই তিনটি সংগীতলিপির উন্নততম বিকাশ হিসাবে প্রসিদ্ধ 'ষ্টাফ নোটেসন' স্বীকৃত। সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় সংগীতলিপি পদ্ধতি এই চার প্রকার সংগীতলিপি থেকেই নাকি উদ্ভাবিত। স্বভাবতঃই মনে হতে পারে যে, সংগীতলিপি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আমরা পাশ্চাত্য সংগীত পণ্ডিতদের কাছে ঋণী। একথা আংশিক সত্য হলেও অভ্রান্ত নয়।

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে একথা আজ প্রমাণিত যে, অতি প্রাচীন সামলিপিতে ব্যবহৃত স্বর, সংখ্যা, বিন্দু, রেখা প্রভৃতি সুর সংরক্ষণের জন্যই প্রযুক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ খৃষ্টীয় অব্দের বহুপূর্ব থেকেই ভারতবর্ষে সুর সংরক্ষণের প্রচলন ছিল। তবে ভারতীয় পূর্বাচার্যেরা সকল বিষয়ের সংরক্ষণের ব্যাপারেই সর্বদা রূপক এবং দুর্বোধ্য পন্থা অবলম্বন করেছেন। ফলে পরবর্তীকালে তার যথার্থ অর্থ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। অনেক বিষয় তো অমীমাংসিতই থেকে গেছে। তাই সামলিপিতে প্রযুক্ত সংকেত-চিহ্নগুলি যে সুর সংরক্ষণের

জন্যই হয়েছিল সেকথা বোঝা গেলেও তার অন্তর্নিহিত অর্থ আজও অস্পষ্ট ও রহস্যাবৃত রয়েছে। গান্ধর্ব-সংগীতকাল থেকে নারদ-ভরত আদি পরম্পরায় ধারাবাহিকরূপে যে সংগীতস্রোত প্রবাহিত ছিল তার পূর্ণ বিবরণ যদি আমরা পেতাম তাহলে বহু প্রশ্নেরই সমাধান হোত। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিদেশী আক্রমণে ভারতবর্ষের অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেই দুর্যোগের দিনে প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের অসংখ্য গ্রন্থাদি (পাণ্ডুলিপি) স্থানান্তরিত এবং ধ্বংস হয়েছিল। উপরন্তু আরব ও পারসিক যুগের প্রভাবে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির রূপান্তরও শুরু হয়। এবং বিদেশী শাসন ও শিক্ষার অধীনে আমরা নিজেদের গড়ে তুলতে বাধ্য হই। ফলে আলোচনা ও অনুশীলনের অভাবে, প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়গুলি আমরা ক্রমে বিস্মৃত হতে থাকি। মধ্যযুগে আমাদের সংগীতের সঙ্গে শাস্ত্রের সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ শিল্পীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সংগীত-সম্পদও লুপ্ত হতে থাকে, এবং প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়গুলি আমাদের কাছে আরো দুর্বোধ্য ও রহস্যময় হয়ে পড়ে। তবে সৌভাগ্যক্রমে তৎকালীন কয়েকজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী শাস্ত্রী প্রাচীন তত্ত্ব ও তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য দুর্বোধ্য বিষয়গুলির যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন। আধুনিককালে বিভিন্নস্থানে প্রাপ্ত সেই সকল প্রাচীন ও অতি প্রাচীন গ্রন্থাদি (পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি) এবং খননকার্যে প্রাপ্ত বাদ্যযন্ত্রাদি ও বহু বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার থেকে দেশবিদেশের পণ্ডিত ও গবেষকগণ নানা বিষয়ের অনুমান ও প্রমাণ করেছেন এবং নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এই সকল কার্যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা বিদেশীর কাছে অবশ্যই ঋণী।

প্রাচীন সংগীত-প্রগতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে সুষ্ঠু সংগীতলিপির আবিষ্কার মোটেই কঠিন ছিল না। বরং মনে হয় কতগুলি সংস্কারগত কারণে ইচ্ছাকৃতভাবেই তা করা হয়নি। কারণ তৎকালীন সংগীতজ্ঞেরা সাধারণের কাছে সংগীতকে সহজ সুলভ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। সংগীতকে তাঁরা গুরুমুখী বিদ্যা এবং গুরু পরম্পরায় এর শিক্ষাগ্রহণকেই সবশ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করতেন। সর্বোপরি তখন লিখন ও মুদ্রণের তেমন সুব্যবস্থাও ছিল না। সুতরাং সংগীতবিদ্যালাভের জন্য তখন শ্রবণ ও স্মৃতিশক্তির তীক্ষ্ণতাই প্রধান ও একমাত্র অবলম্বন ছিল। এই সকল কারণে তাঁরা নিজেদের সুবিধানুযায়ী

সংকেতচিহ্নাদি ব্যবহার করে সুর-সংরক্ষণ করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন ভারতে কলাকার ও শাস্ত্রকার ছিলেন একই ব্যক্তি। অর্থাৎ যিনি সংগীত অনুশীলন, পরিবেশন এবং শিক্ষাদান করতেন তিনিই সংগীতশাস্ত্র রচনা করতেন। কিন্তু মধ্যযুগে তার পরিবর্তন শুরু হয়, কারণ তখন শিল্পী ও শাস্ত্রকার দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে শেষের দিকে সংগীতের ক্রিয়াসিদ্ধ অংশে বিভিন্ন মতপার্থক্যযুক্ত ঘরাণার উদ্ভব হয়। আধুনিককালের শাস্ত্রী পণ্ডিত ভাতখণ্ডে সেই বিভেদের সংস্কার সাধনের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

ভারতবর্ষে সংগীতলিপির ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন সামলিপির সংকেত-চিহ্নাদির মর্মোদ্ধারে অক্ষম হওয়ার পরবর্তীকালে মাতঙ্গদেব (৫ম-৭ম শতাব্দী ?) এবং শার্ঙ্গদেব (১৩শ শতাব্দী) কথার উপরে স্বরোল্লেখাদি সহযোগে এক প্রকার সংগীতলিপি পদ্ধতির প্রচার করেছেন। কিন্তু তাল, মাত্রাদির ব্যাখ্যা না থাকায় তার সংগীতরূপটি ছিল অস্পষ্ট। ১৫শ শতাব্দীতে মহারাণা কুম্ভ তাঁর গ্রন্থে শার্ঙ্গদেব কৃত পদ্ধতিরই অনুসরণ করেছেন। তাছাড়া মধ্যযুগে সংগীতলিপি সম্পর্কে আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ১৮শ শতাব্দীতে ইংরাজদের আগমনের পরে ভারতীয় সংগীতজ্ঞেরা ষ্টাফ নোটেসনের সঙ্গে পরিচিত হন এবং সুষ্ঠু সংগীতলিপির উপযোগিতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। ১৯শ শতাব্দীতে বাংলাদেশের ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং তৎশিষ্য রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইংরাজী ষ্টাফ নোটেসনের অনুসরণে দণ্ডমাত্রিক সংগীতলিপির প্রবর্তন করেন। এঁদের অনুপ্রেরণায় শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর শিষ্য আসামের গৌরীপুরের রাজা প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া উৎসাহিত হয়ে উক্ত সংগীতলিপি প্রচারে সচেষ্ট হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা ষ্টাফ নোটেসনেরই প্রচার করেন। তবে সমগ্র ভারতবর্ষে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত 'সংগীতসার'ই সবপ্রথম সুষ্ঠু সংগীতলিপি গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। এই গ্রন্থে তৎকালীন প্রচলিত কতগুলি যাত্রাগানের গতের সংগীতলিপি আছে। এছাড়া শ্রীরামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সংগীতমঞ্জরী' এবং শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সংগীতচন্দ্রিকা' গ্রন্থদ্বয়ও উক্ত দণ্ডমাত্রিক সংগীতলিপি অবলম্বনে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এই পদ্ধতির সংকেত চিহ্নাদির জটিলতার জন্য এবং উন্নততর সংগীতলিপির বিকাশ হওয়ায় ক্রমে এর জনপ্রিয়তা কমে যায়। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একপ্রকার বাংলা সংগীতলিপির

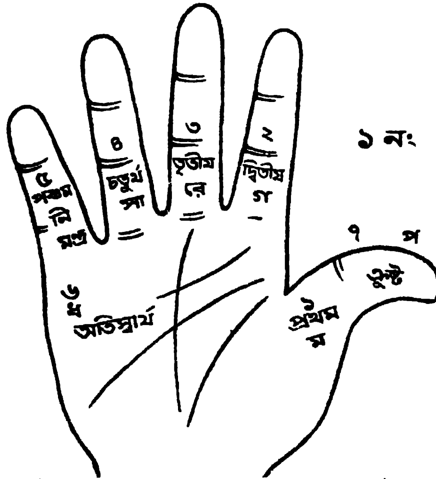
প্রবর্তন করেন এবং সেই পদ্ধতির ব্যাখ্যাসহ পাঁচটি ব্রহ্মসংগীত ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, "...বাংলায় প্রথম স্বরলিপি যে আমার রচিত তাহা একেবারে নিঃসন্দেহ..."। এই সংগীতলিপির সংস্কার সাধন করে, সহোদর শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ পরিমার্জিত রূপদান করেন। যা আকারমাত্রিক পদ্ধতি নামে বর্তমানে প্রসিদ্ধ। উত্তর পশ্চিম ভারতেও ওই সময়ে কয়েক প্রকার সংগীতলিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল, যার মধ্যে পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে উদ্ভাবিত হিন্দুস্থানী পদ্ধতি এবং পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর পলুস্কর উদ্ভাবিত পলুস্কর পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। সহজ-সরল তথা বিজ্ঞানসম্মত হওয়ায় হিন্দুস্থানী পদ্ধতি বর্তমানে সমগ্র ভারতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

উপরোক্ত আলোচনায় সংগীতলিপি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যে আমরা পাশ্চাত্য-সংগীতের কাছে ঋণী, একথা মনে হলেও তা যে সত্য নয়, এখন সেই বিষয়ে আলোচনা করা যাক। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে ষ্টাফ নোটেসন যে সকল সংগীতলিপির উন্নততম বিকাশ, সেই সোলফা, ন্যুমস্ চীভ প্রভৃতি সংগীতলিপিতে ভারতীয় সামলিপির সংকেতচিহ্নগুলিই অনুসৃত হয়েছে। সুতরাং সামলিপিকেই ঐ সংগীতলিপিগুলি বিকাশের উৎস বলা যায়। কারণ সময়কালের দৃষ্টিতে সামলিপি বহু পূর্বের রচনা। এইরূপে ষ্টাফ নোটেসনের সঙ্গেও প্রাচীন ভারতীয় হস্তাঙ্গুলির মুদ্রা তথা স্বরস্থান প্রভৃতির যোগসূত্র পাওয়া যায়। কারণ বৈদিকযুগে সামগ ব্রাহ্মণেরা পাঁচটি হস্তাঙ্গুলির মুদ্রার (Symbol) সাহায্যে স্বর সন্নিবেশ করে গানের স্বর, ছন্দ, ভাব প্রভৃতি প্রকাশ করতেন। সেই মুদ্রাদির আবিষ্কর্তা নারদ, ভরত, নন্দিকেশ্বর, কোহল বা যাষ্টিক এঁরা কেউ ছিলেন না। পূর্ববর্তী ঋত্বিক ব্রাহ্মণেরাই তা উদ্ভাবন করেছিলেন। পরবর্তী শাস্ত্রীরা সেই সকল মুদ্রাদির নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন নন্দিকেশ্বর ২৮ প্রকার অসংযুক্ত (Single) এবং ২৩ প্রকার সংযুক্ত (double বা combined) হস্তলক্ষণ বা হস্তমুদ্রার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য এগুলি নৃত্য ও নাট্যের বিচিত্র আঙ্গিক বিকাশ নিয়েই অধিক সম্পর্কিত। হস্তাঙ্গুলিতে বা হস্ত মুদ্রায় স্বরস্থান সম্পর্কে নারদীশিক্ষাকার প্রদত্ত বর্ণনা বেশ স্পষ্ট। যেমন,

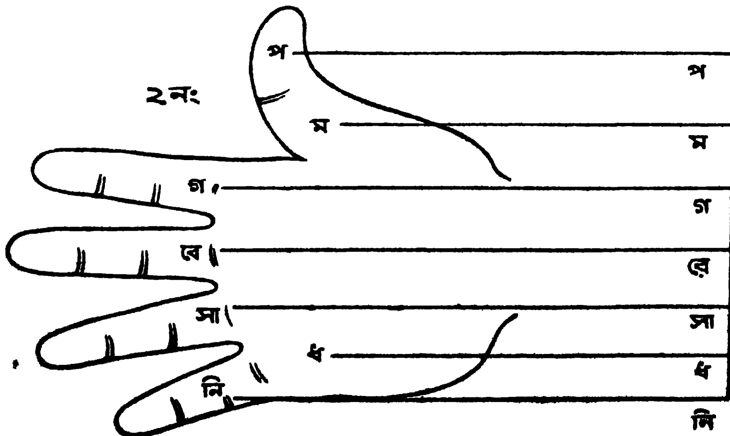
অঙ্গুষ্ঠস্যোত্তমে ক্রুষ্টোহঙ্গুষ্ঠে প্রথমঃ স্বরঃ।
প্রাদেশিন্যাং তু গান্ধার-ঋষভস্তদনন্তরম্ ॥

অনামিকায়াং ষড়্‌জন্তু কনিষ্ঠিকায়াং চ ধৈবতঃ।
তস্যাধস্তাচ্চ যোন্যস্তু নিষাদং তত্র বিন্যসেৎ॥

অর্থাৎ ক্রুষ্ট বা লৌকিক পঞ্চম স্বর অঙ্গুষ্ঠে, প্রথম বা মধ্যমস্বর অঙ্গুষ্ঠের মধ্যপ্রদেশে, দ্বিতীয় বা গান্ধার স্বর প্রাদেশে বা তর্জনিতে, মধ্যমায় ঋষভ বা তৃতীয় স্বর, অনামিকায় চতুর্থ বা ষড়্‌জ স্বর এবং কণিষ্ঠায় ধৈবত বা অতিস্বার্য ও মন্দ্র বা নিষাদের সন্নিবেশ। যেমন—



উপরোক্ত হস্তাঙ্গুলিতে স্বরস্থান বিষয়টিকে
নিম্নোক্তরূপে যদি কল্পনা করা যায় যেমন



প্রসঙ্গত প্রাচীন ক্রুষ্টাদি ও লৌকিক ষড়্‌জাদি স্বরগুলির পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে সামান্য পরিচয় দেওয়া উচিত □

সংখ্যা	সামস্বর	নারদ	সায়নাচার্য
৭	ক্রুষ্ট	পঞ্চম	নিষাদ
১	প্রথম	মধ্যম	ধৈবত
২	দ্বিতীয়	গান্ধার	পঞ্চম
৩	তৃতীয়	ঋষভ	মধ্যম
৪	চতুর্থ	ষড়্‌জ	গান্ধার
৫	মন্দ্র	ধৈবত	ঋষভ
৬	অতিস্বার্য	নিষাদ	ষড়্‌জ
৭	ক্রুষ্ট	পঞ্চম	নিষাদ

দুই নম্বর চিত্র অনুযায়ী আঙুলগুলিকে রেখা কল্পনা করে স্বরস্থাপন করলে সহজেই পাশ্চাত্য ষ্টাফ নোটেসনের সঙ্গে এর সাদৃশ্য এবং যোগসূত্র উপলব্ধি করা যায়। অতএব ষ্টাফের রেখা এবং স্বরস্থাপন প্রণালী যে এর থেকেই উদ্ভাবিত হয়নি, একথা কে বলতে পারে? বরং হওয়ার সম্ভাবনাই যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্গত। সুতরাং অন্যান্য নানাবিধ বিষয়ের মতো সংগীতলিপি সম্পর্কিত উপাদানাদির মর্মোদ্ধারও বাইরের দেশগুলিতে আগে হয়েছিল, একথা বলা অসঙ্গত নয়। ফলে বিদেশীরা স্বকীয়তাগুণে স্রষ্টা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

পরিশেষে একথা বলা কর্তব্য যে সংগীত সংরক্ষণ, শিক্ষা, প্রচার প্রভৃতির জন্য সমগ্র দেশে একটি মাত্র সংগীতলিপি পদ্ধতি থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে কোন একটি পদ্ধতিকে সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধ করার চেয়ে অনেকেই নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি প্রচারের দিকে আগ্রহী। ফলস্বরূপ আমাদের দেশে অনেকগুলি সংগীতলিপির প্রচলন হয়েছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে পাশ্চাত্য 'ষ্টাফ নোটেসন' যথেষ্ট সার্থক ও বিজ্ঞানসম্মত। বর্তমানে বিশ্বের বহুদেশে তাই এটি বহুল প্রচলিত। এমনকি ভারতীয় সংগীত পরিচালকেরাও যাবতীয় কার্যে এর ব্যবহার অপরিহার্য মনে করেন।

□ ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। কলিকাতা-১৯৬১। (পৃঃ ২৯৪ ১ম খণ্ড)

বিভিন্ন সংগীতলিপির পরিচয়

দণ্ডমাত্রিক সংগীতলিপির পরিচয়ঃ

১। মধ্যসপ্তকের শুদ্ধ স্বরঃ স ঋ গ ম প ধ নি, মন্দ্রসপ্তকের স্বরের নীচে বিন্দু থাকেঃ নি ধ্ প ম্ ইত্যাদি এবং তারসপ্তকের স্বরের উপরে বিন্দু থাকেঃ স ঋ গ ম ইত্যাদি।

২। কোমল স্বরের উপরে (△) ত্রিকোণ চিহ্ন দিয়ে বোঝান হয়ঃ ঋ গ ধ নি এবং কড়িমধ্যমের উপরে 'r' এই চিহ্ন দিয়ে বোঝান হয়ঃ ম'।

৩। স্বরের উপরে রেখা দিয়ে মাত্রাসংখ্যা বোঝান হয়ঃ স=একমাত্রা, স=দুইমাত্রা, স=তিনমাত্রা ইত্যাদি। স্বরের উপরে (˘) চন্দ্রবিন্দু দিয়ে অর্দ্ধমাত্রা এবং (×) গুণ চিহ্ন দিয়ে সিকিমাত্রা বোঝান হয়।

৪। একাধিক স্বর একমাত্রায় থাকলে শেষ স্বরটির উপরে রেখা দিয়ে বোঝান হয়ঃ সঋ, সঋগ, সঋগম ইত্যাদি।

৫। 'মীড়' দুটি সরল রেখার সাহায্যে বোঝান হয়ঃ স ম, প ঋ ইত্যাদি।

৬। 'স্পর্শ স্বর' মূল স্বরের পাশে ছোট করে লিখে বোঝান হয়ঃ ^ম^গ, ^ম^প ইত্যাদি।

৭। দ্বিতীয় বন্ধনীর '{ }' সাহায্যে পুনরাবৃত্তি বোঝান হয়।

৮। পুনরাবৃত্তিকালে কোন অংশ বাদ দিতে হলে, প্রথম বন্ধনীভুক্ত '( )' করা হয়।

৯। স্থায়ী অংশের যে স্থানে 'S' এই চিহ্ন থাকে, সেই পর্য্যন্ত গেয়ে পরবর্তী অংশ গাইতে হয়।

১০। তালাবর্তনের প্রথম মাত্রায় '+' সমচিহ্ন, অন্যান্য ছন্দবিভাগের সংখ্যা অনুসারে ২, ৩, ৪ ইত্যাদির সাহায্যে তালাঘাত এবং ফাঁক স্থানে 'O' ফাঁকচিহ্নের সাহায্যে অনাঘাত বোঝান হয়।

আকারমাত্রিক পদ্ধতির ব্যাখ্যা :

১। মধ্যসপ্তকের শুদ্ধ স্বর : সা রা গা মা পা ধা না, মন্দ্রসপ্তকের স্বরের নীচে হসন্ত থাকে : ন্া ধ্া প্া ম্া গ্া র্া এবং তারসপ্তকের স্বরের উপরে রেফ্ থাকে : র্সা র্রা র্গা র্মা র্পা র্ধা র্না।

২। বিকৃত স্বর অক্ষর পরিবর্তন করে বোঝানো হয়, যেমন, কোমল রা=ঋা, কোমল গা=জ্ঞা, কড়িমধ্যম=হ্মা, কোমল ধা=দা; কোমল না=ণা। অতিকোমল ও অণুকোমল স্বর প্রভৃতির শ্রুতিবৈচিত্র্য বোঝানোর জন্য স্বরের পাশে ১, ২ প্রভৃতি সংখ্যা ব্যবহৃত হয়।

৩। একমাত্রা=r, অর্দ্ধমাত্রা=ঃ, দুটি অর্দ্ধমাত্রা=সরা, চারটি সিকিমাত্রা=সরগমা, দুটি সিকিমাত্রা=সরঃ, দেড়মাত্রা=সাঃ, দেড়মাত্রা ও অর্দ্ধমাত্রা =রাঃ গঃ ইত্যাদি।

৪। স্পর্শস্বর মূল স্বরের পাশে ছোট হরফে লেখা হয়, যেমন : ^মরা, ^গরা, রা^সা. গা^ম ইত্যাদি।

৫। তালের ছন্দবিভাগের জন্য একটি দাড়ি '।' এবং প্রতি আবর্তনের শেষে 'I' দণ্ডচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। গানের প্রত্যেক অংশের আরম্ভে ও শেষে জোড়া দণ্ডচিহ্ন 'II' এবং সর্বশেষে দুইজোড়া দণ্ডচিহ্ন 'II II' থাকে।

৬। স্থায়ীর আরম্ভে II জোড়া দণ্ডচিহ্নের বাইরের অংশ প্রত্যেক কলির শেষে " " এইরূপ উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে থাকে।

৭। তালচিহ্ন বোঝানোর জন্য ফাঁকস্থানে শূন্য '০' ও ছন্দবিভাগ স্থানে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা ব্যবহৃত হয় এবং সমস্থানের সংখ্যার উপরে রেফ থাকে : ১´।

৮। সুরের রেশ বুঝাতে হাইফেনযুক্ত মাত্রা এবং হাইফেন বর্জিত মাত্রা সুরের স্তব্ধতা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৯। শিরোদেশে যুগল দাঁড়ি দিয়ে অবসান চিহ্ন প্রদর্শিত হয়, অর্থাৎ এখান থেকে পরবর্তী অংশ আরম্ভ করতে হবে বা একেবারে গান শেষ হবে।

১০। পুনরাবৃত্তির জন্য { } দ্বিতীয় বন্ধনী ব্যবহৃত হয়, পুনরাবৃত্তিকালে ( ) প্রথম বন্ধনীভুক্ত অংশ বর্জন করা হয়। পুনরাবৃত্তিকালে কোন অংশের পরিবর্তন হলে, উপরে [ ] তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে পরিবর্তিত স্বরগুলি দেওয়া থাকে। গানেব কলির শেষে যুগল দণ্ডের মধ্যে বা গানের শেষে যুগলদণ্ডের মধ্যে তৃতীয় বন্ধনী থাকলে স্থায়ীতে ফিরে পরিবর্তিত স্বর গাইতে হয়।

১১। স্বরেব নীচে প্রথম বন্ধনী দিযে মীড়চিহ্ন বোঝানো হয়, যেমন, না, পা।

১২। সংগীতলিপিতে যখন স্বরের পাশে হাইফেন এবং কথার স্থানে শূন্য থাকে তখন পূর্ববর্তী কথার উচ্চাবণের বেশ টেনে স্বরগুলি গাইতে হয়, যেমন,

সা -	রা -	গা -	মা	অথবা	সা -	r -	r -	r
মা	০	০	০		মা	০	০	০

১৩। গানেব অক্ষর সমাপ্ত না হলে স্বরের বাঁ পাশে হাইফেন বসে এবং গানের কথার শেষ অক্ষরটি হসন্তযুক্ত হয যেমন,

সা -	। -	। -	।	অথবা	সা -	রা -	গা -	ম
গা	০	০	ন		গা	০	০	ন্

সংগীতলিপিতে যাবতীয় শব্দগুলির উচ্চারণ অনুসারে ব্যাখ্যা করা হয।

পলুস্কর পদ্ধতির ব্যাখ্যা :

১। মধ্যসপ্তকের শুদ্ধস্বর : সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি, মন্দ্রসপ্তকের স্বরের উপরে বিন্দু থাকে : নি, ধ, প, ম ইত্যাদি এবং তারসপ্তকের স্বরের উপরে দাঁড়ি থাকে : সা, রে, গ, ম ইত্যাদি।

২। কোমল স্বরের নীচে হসন্ত থাকে : রে্, গ্, ধ্, নি্ এবং কড়িমধ্যমের নীচে উল্টো হসন্ত থাকে : ম্।

৩। মাত্রাসংখ্যা বোঝানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন স্বরের নীচে ব্যবহার করা হয় :

৪ মাত্রা = + = সা (নীচে +)

২ মাত্রা = ഗ = সা (নীচে ഗ)

১ মাত্রা = — = সা (নীচে —)

$\frac{1}{2}$ মাত্রা = ০ = সা (নীচে ০)

$\frac{1}{4}$ মাত্রা = ‿ = সা (নীচে ‿)

$\frac{1}{8}$ মাত্রা = ‿‿ = সা (নীচে ‿‿)

এছাড়া স্বরের নীচে ৩ বা ৬ প্রভৃতি লিখে একমাত্রায় ৩ বা ৬টি স্বর বোঝান হয়।

৪। সংগীতলিপিতে যেখানে স্বর বা গানের কথা থাকে না সেখানে যথাক্রমে 'S' অবগ্রহ ও '০' শূন্য লিখে বোঝান হয় :

গ	S	S	প	ইত্যাদি।
রা	০	০	ম	

৫। মূল স্বরের পাশে ছোট স্বর লিখে স্পর্শস্বর বোঝান হয় : প্ম, ম্প, গপ ইত্যাদি।

৬। সমস্থানে ১, ফাঁক স্থানে '+' যোগচিহ্ন এবং তালবিভাগের স্থানগুলিতে ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যার সাহায্যে তালবিবরণ বোঝান হয়।

পটবর্দ্ধন পদ্ধতির ব্যাখ্যা : এই পদ্ধতি পলুস্কর পদ্ধতির অনুসরণেই রচিত এবং অতি সামান্য পার্থক্যযুক্ত।

১। মধ্যসপ্তকের **শুদ্ধস্বর :** সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি, মন্দ্রসপ্তকের স্বরের উপরে বিন্দু থাকে : সা রে গ ম ইত্যাদি এবং তারসপ্তকের স্বরের উপরে রেখা থাকে : সা রে গ ম ইত্যাদি।

২। কোমল স্বরের নীচে হসন্ত থাকে : রে্ গ্ ধ্ নি্ এবং কড়িমধ্যমের পাশে উল্টো হসন্ত থাকে : ম৴।

৩। মাত্রা সংখ্যার জন্য স্বরের নীচে নানাপ্রকার সংকেত ব্যবহৃত হয়:

লঘু = ১ মাত্রা — = সা

দ্রুত = ½ মাত্রা ০ = সা

অণুদ্রুত = ¼ মাত্রা ‿ = সা

অণু-অণুদ্রুত = ⅛ মাত্রা ‿‿ = সা

৪। এছাড়া ⅓ বা ⅙ ইত্যাদি লিখে একমাত্রায় ৩টি বা ৬টি স্বর সমানাংশ বুঝান হয়।

৫। মূল স্বরের পাশে ছোট স্বর লিখে স্পর্শস্বর বোঝান হয়: গম, মপ, মগ ইত্যাদি।

৬। সমস্থানে ১, ফাকস্থানে + যোগচিহ্ন এবং তালবিভাগের স্থানগুলিতে ৫, ১৩, ২৪ প্রভৃতি লিখে তালবিবরণ প্রকাশ করা হয়। যেমন:

সা ঋে গ ম	প দ নি সা	সা নি দ প	ম গ ঋে সা
১	৫	+	১৩

হিন্দুস্থানী পদ্ধতির ব্যাখ্যা:

১। মধ্যসপ্তকের শুদ্ধস্বর: সা রে গ ম প ধ নি, মন্দ্রসপ্তকের স্বরের নীচে বিন্দু থাকে: নি ধ প ম গ রে সা এবং তারসপ্তকের স্বরের উপরে বিন্দু থাকে: সা রে গ ম প ধ নি।

২। কোমল স্বরের নীচে হাইফেন থাকে: রে গ ধ নি এবং কড়িমধ্যমের উপরে দাঁড়ি থাকে: ম।

৩। একমাত্রায় একটি স্বর থাকলে কোন মাত্রার চিহ্ন থাকে না, কিন্তু একাধিক স্বর থাকলে নীচে প্রথম বন্ধনী থাকে: সা রে, সা রে গ, সা রে গ ম ইত্যাদি।

৪। মাত্রাংশ বোঝানোর জন্য হাইফেন ব্যবহৃত হয়: অর্দ্ধমাত্রা= -সা বা সা-, ⅓ মাত্রা= --সা, ¼ মাত্রা= ---সা ইত্যাদি।

৫। কোন স্বর প্রথম বন্ধনীভুক্ত থাকলে, তাকে আগের ও পিছের স্বর সহ উচ্চারণ করা হয়। যেমন, (প)=ধপমপ, (ম = পমগম ইত্যাদি।

৬। স্বরসমূহের উপরে প্রথম বন্ধনী দিয়ে মীড় বোঝানো হয়। যেমন, প ৱে, সা গ ইত্যাদি।

৭। সংগীতলিপিতে যেখানে গানের কথা এবং স্বর থাকে না সেখানে যথাক্রমে অবগ্রহ ও হাইফেন দিয়ে বোঝানো হয়। যেমন, | গ - - ম | ৱা ঽ ঽ ৱ |

৮। মূলস্বরের পাশে ছোট হরফে লিখে স্পর্শস্বর বোঝানো হয়। যেমন, মপ, মগ, সরে ইত্যাদি।

৯। তালচিহ্ন বোঝানোর জন্য সমস্থানে ক্রশ '×', ফাকস্থানে শূন্য এবং তালবিভাগ স্থানে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা ব্যবহৃত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তালশাস্ত্র

তাল : সংগীতকে পরিমাপ করার জন্য যে কাল পরিমাণের ব্যবহার করা হয় তার নাম 'তাল'। অনাদিকালের অখণ্ড সময়কে আমরা যেমন ঘণ্টা, দিন, মাস, বৎসর প্রভৃতিতে বিভক্ত করেছি, সংগীতকে তেমনি মাত্রা, ছন্দ, আবর্তন প্রভৃতির সাহায্যে নিয়মাবদ্ধ করা হয়েছে। এই রীতিকেই বলা হয় তাল। ভাষাতে যেমন ব্যাকরণ অপরিহার্য, সংগীতে তালের উপযোগিতা ঠিক তেমনি।

তালের মহত্ত্ব : তাল সংগীতের সংযম ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নিয়মাবদ্ধ করে। তালের গতিভেদ বৈচিত্র্য সংগীতের চলন ভঙ্গির সৌন্দর্য বৃদ্ধি তথা বিভিন্ন রস-সৃষ্টিতে সহায়তা করে। যাবতীয় সংগীত তালের উপরেই প্রতিষ্ঠিত তাই একে সংগীতের প্রাণ বলা হয়। তালের সাহায্য ছাড়া সংগীতকে লিপিবদ্ধ এবং সংরক্ষণ করা যায় না। তালের মহত্ত্ব সম্পর্কে পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব বলেছেন :

মুখ প্রধান দেহস্থ নাসিকা মুখমধ্যকে।
তালহীনং তথা গীতং নাসাহীনং মুখং যথা ॥[১]

অর্থাৎ দেহের মধ্যে মুখ এবং মুখের মধ্যে নাসিকা প্রধান। তালহীন সংগীত যেন নাসিকাহীন মুখমণ্ডলের মত। তালের সার্থকতা সম্বন্ধে মহর্ষি ভরত বলেছেন : "যস্তু তালং ন জানতি ন স গাতা ন বাদকঃ"[২], অর্থাৎ তালজ্ঞান যার নেই সে গায়ক বা বাদক কিছুই নয়। বিবরণ সূত্রকার তো সমগ্র বিশ্বকেই তালময় বলে উল্লেখ করেছেন : "তালাত্মকং জগৎ সবং তালস্তু ব্যপকঃ স্মৃতঃ"[৩] কারণ তাল সর্বত্রই ব্যাপৃত এবং সর্বব্যাপক মহাকাল। বেদ, উপনিষদ, রামায়ন, মহাভারত প্রভৃতিতে যে বহু বিচিত্র তাল ও বাদ্যযন্ত্রাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, তাতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই যে তালের পূর্ণ বিকাশ ছিল সেকথা বোঝা যায়।

১। সংগীত রত্নাকর (তালাধ্যায়)
২। নাট্যশাস্ত্র (কাশীসংস্করণ)
৩। নন্দিকেশ্বর রচিত গ্রন্থ (?) (পাণ্ডুলিপি)।

তালের উৎপত্তি : 'তাল' শব্দ এবং তালের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা অভিমত প্রচলিত আছে। সংগীতাচার্য কোহল তাল শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে দার্শণিক তত্ত্বরূপ সৃষ্টি রহস্যের অবতারণা করেছেন :

তকারঃ শংকরঃ প্রোক্তো লকারঃ শক্তিরুচ্যতে।
শিবশক্তি সমাযোগাত্তালনামাভিধীয়তে ॥

অর্থাৎ শিব ও শক্তি এই দুইয়ের সংযোগে তালের উৎপত্তি। আর একটি বহুল প্রচলিত অনুরূপ অভিমত হোল, তাণ্ডব (পুরুষ) নৃত্যের 'তা' এবং লাস্য (স্ত্রী) নৃত্যের 'ল' এই বর্ণদ্বয়ের সংযোগে 'তাল' শব্দের বা তালের উৎপত্তি। এই প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব বলেছেন :

তালস্তল প্রতিষ্ঠায়ামিতি ধযোর্ণজ্ঞি স্মৃতিঃ।
গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং যতস্তালে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥[১]

অর্থাৎ 'তল' ধাতু থেকে 'তাল' শব্দের উৎপত্তি এবং যাবতীয় সংগীত তালের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কেহ কেহ বলেন যে, গতিশীল বস্তু ও প্রাণীর মাধ্যমে মানুষ ছন্দকে উপলব্ধি করেছে। যেমন, ঝরণার অবিরাম ঝরঝর শব্দ, নদীতরঙ্গের অবিরাম কলকল ধ্বনি, প্রানীবিশেষের বহুবিচিত্র ছন্দময় চলনভঙ্গি প্রভৃতি।

আবার কেহ বলেন যে, প্রাচীনকালে আদিম মানুষেরা নৃত্যের মাধ্যমে মনের উল্লাস প্রকাশ করতো এবং সেই নৃত্যের ছন্দ শব্দানুগভাবে অনুভব করার জন্য হাতে তালি অথবা অনুরূপ তালাঘাতের সাহায্যে নৃত্য করতো যার উৎকর্ষ সাধনেই তালের উৎপত্তি।

প্রাচীন তাল : ভারতীয় সংগীতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই যে বিশেষ রীতিতে তাল প্রযুক্ত ছিল সেকথার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে, কিন্তু সেই সকল তালের প্রকৃতি ও প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা সঠিকভাবে কিছুই বলতে পারি না। যেমন পারি না, প্রাচীন সংগীত সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট পরিচয় দিতে। তবে সেই সকল তালের নাম, মাত্রা, প্রয়োগ আদি সম্পর্কে উল্লিখিত তথ্যাদি থেকে, তা যে অত্যন্ত বিস্তৃত এবং নিয়মাবদ্ধ ছিল সেকথা বোঝা যায়।

মার্গতাল : মার্গ ও দেশী গানের মতো প্রাচীন তাল ছিল মার্গ ও দেশী ভেদে দুইভাগে বিভক্ত। মার্গতালকে গান্ধর্বতালও বলা হোত। শাস্ত্রে পাঁচটি

১। সংগীত রত্নাকর (তালাধ্যায়) শার্ঙ্গদেব।

মার্গতালের উল্লেখ পাওয়া যায়, মহাদেবের পঞ্চমুখ থেকে নাকি এই পঞ্চতালের উৎপত্তি। এই উক্তি সম্ভবতঃ কাল্পনিক, কারণ প্রাচীন কোন সংগীতাচার্যই হয়তো এই তালগুলি রচনা করেছিলেন তা সে সদাশিব ভরত বা যে কেহই হোক না কেন। নিম্নোক্ত তালিকায় উপলব্ধ বিবরণ দেওয়া হোল।

সংখ্যা	তাল নাম	জাতি	মাত্রাসংখ্যা	ছন্দ	সংকেতচিহ্ন
১	চচ্চৎপুটঃ	চতস্র	৮	২-২-১-৩	S S । ঔ
২	চাচপুটঃ	ত্রিস্র	৬	২ ১-১-২	S । । S
৩	ষটপিতাপুত্রকঃ	ত্রিস্র	১২	৩ ১ ২-২-১-৩	ঔ । S S । ঔ
৪	সম্পর্কেষ্টাকঃ	ত্রিস্র	১২	৩-২ ২-২-৩	ঔ S S S ঔ
৫	উদ্‌ঘট্ট	ত্রিস্র	৬	২-২-২	S S S

পঞ্চতালেশ্বর ঃ শার্ঙ্গদেব পঞ্চতালেশ্বর নামে এক শ্রেণীর প্রবন্ধগীতির উল্লেখ করেছেন, যাতে উক্ত পাঁচটি মার্গতালই নাকি একসঙ্গে ব্যবহৃত হোত। অবশ্য তিনি এই পাঁচটি মার্গতাল ছাড়াও দর্পণ, সিংহবিক্রম, সিংহলীল, রতিলীল, শ্রীরঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন তালের পরিচয় দিয়েছেন।

মার্গতালগুলি লঘু, গুরু ও প্লুত এই তিন প্রকার মাত্রার সাহায্যে গঠিত ছিল। এই মাত্রাত্রয়ের চিহ্ন ও সংখ্যা হোল এইরূপ—

১। লঘু=১ মাত্রা (।) দাঁড়ি চিহ্ন।
২। গুরু=২ মাত্রা (S) অবগ্রহ চিহ্ন।
৩। প্লুত=৩ মাত্রা (ঔ , ঔ চিহ্ন।

এই মাত্রাগুলি আবার বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত ভেদে ছিল বৈচিত্র্যময়। প্রকৃতপক্ষে মাত্রার কাল পরিমাণ চিরনূতন হতে পারে। কারণ গণনার গতির উপরে তা নির্ভরশীল।

নাট্যশাস্ত্রকার গান্ধর্বগানের পরিচয় প্রসঙ্গে তৎকালীন ২০টি তালের বর্ণনা করেছেন ঃ

আবাপশ্চথ নিষ্ক্রামো বিক্ষেপশ্চ প্রবেশকঃ।
শম্যাতালঃ সন্নিপাতঃ পরিবর্তঃ সবস্তুকঃ॥

মাত্রাবিদার্যাঙ্গুলয়া যতিঃ প্রকরণং তথা।
গীতয়োঽবয়বা মার্গো পাদভাগাঃ সপাণয়ঃ।
ইত্যেকবিংশকো জ্ঞেয়ো বিধিস্তালগতো বুধৈঃ॥ [১]

অর্থাৎ তখন আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষো, প্রবেশ বা প্রবেশক, শম্যা, তাল, সন্নিপাত, পরিবর্ত, বস্তু, মাত্রা, বিদারী, অঙ্গুলি, যতি, প্রকরণ, গীত, অবয়ব, মার্গ, পাদ, ভাগ ও পাণি এই কুড়িটি তালবিধির প্রচলন ছিল।

ভরত বলেছেন যে, সশব্দ ও নিঃশব্দ ভেদে মার্গতাল ছিল দুই রকম। নিঃশব্দ তালের নাম 'কলা' এবং সশব্দ তালের নাম 'পাত'। আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক ভেদে নিঃশব্দ তাল বা কলা ছিল চার রকম এবং ধ্রুব, শম্যা, তাল ও সন্নিপাত ভেদে সশব্দ তাল বা পাত ছিল চার রকম। এগুলির পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন যে,[২] ১। উত্থিত হস্তের অঙ্গুলি কুঞ্চনের নাম 'আবাপ', ২। অধস্তলের অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত করার নাম 'নিষ্ক্রাম', ৩। উত্থিত হস্তের বিস্তৃত অঙ্গুলিকে দক্ষিণ দিকে রাখার নাম 'বিক্ষেপ', ৪। পুনরায় অঙ্গুলি সংকোচের নাম 'প্রবেশ', ৫। দক্ষিণ হস্তে তালি দেওয়ার নাম 'শম্যা', ৬। বাম হস্তে তালি দেওয়ার নাম 'তাল', ৭। অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলির সাহায্যে ছোটিকা দিতে দিতে হস্ত নমিত করার নাম 'ধ্রুব' ও ৮। উভয় হস্তে তালি দেওয়ার নাম 'সন্নিপাত'।

বর্তমানে সশব্দ ও নিঃশব্দ তাল এবং উপরোক্ত ক্রিয়াগুলির কিছু কিছু স্বীকৃত ও প্রচলিত বটে, কিন্তু ওইরকম ঔপপত্তিক বিবরণ প্রচলিত নয়।

দেশী তাল : পূর্বে দেশীতালে, মার্গতালের সঙ্গে দ্রুত ও বিরাম বা অণুদ্রুত মাত্রার ব্যবহার ছিল। পরবর্তীকালে তার সঙ্গে কাকপদ নামক আরো একটি মাত্রা সংযুক্ত হয়। বিরাম চিহ্ন সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন যে, কোন মাত্রার পরে এই চিহ্ন দিয়ে সেই মাত্রাকে অর্ধমূল্য বৃদ্ধি করা হোত। মাত্রাগুলির মূল্য ও চিহ্ন ছিল এইরূপ—

বিরাম বা অণুদ্রুত — ১ মাত্রা, ◡ বক্ররেখা চিহ্ন।
দ্রুত — ২ মাত্রা, ০ শূন্য চিহ্ন।

১। নাট্যশাস্ত্র—(কাশীসংস্করণ)
২। সংগীত ও সংস্কৃতি—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (১৯৬১) ২৫০-২৫১ পৃঃ থেকে গৃহীত।

লঘু — ৪ মাত্রা, । দাড়ি চিহ্ন।
গুরু — ৮ মাত্রা ऽ অবগ্রহ চিহ্ন।
প্লুত — ১২ মাত্রা ঔ ঔচিহ্ন।
কাকপদ — ১৬ মাত্রা × গুণ চিহ্ন।

মাত্রা : 'মা' ধাতু থেকে মাত্রা শব্দের উৎপত্তি তাই এর আর এক নাম 'মান'। তালকে পরিমাপ করার জন্য মাত্রার সৃষ্টি। প্রতিটি বস্তুই প রমাপ করার জন্য কোন না কোন পরিমাণবোধক মাধ্যম স্থির করা আছে। যেমন গজ, ফুট, মিনিট, সেকেণ্ড ইত্যাদি। শাস্ত্রকারগণ বিভিন্নভাবে একটি লঘুমাত্রার সময়কাল নিশ্চিত করেছেন। মার্গ পদ্ধতিতে পাঁচটি অক্ষরকে (কচটতপ) একটি লঘু মাত্রার সময়কাল বলা হয়েছে। অবশ্য এবিষয়ে মতভেদ আছে। বস্তুতঃ মাত্রার কাল তালের গতির উপরে নিভরশীল, সুতরাং এর মূল্য চির নূতন হতে পারে।

তালের দশপ্রাণ : মাত্রা ছাড়া তালের আরও দশটি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। মকরন্দকার বলেছেন :

কালোমার্গক্রিয়াঙ্গানি গ্রহোজাতিঃ কলালয়ঃ ॥
যতিঃ প্রস্তারকশ্চেতি তালপ্রাণা দশস্মৃতাঃ ॥□

অর্থাৎ কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি ও প্রস্তার এই দশটি তালের প্রাণ। অতঃপর এগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হোল।

কাল : কাল অর্থ সময়। কালই তাল গঠনের প্রধান উপাদান। বিভিন্ন মাত্রা সংখ্যার (কাল) সাহায্যে সময়কে নিবদ্ধ করে বহু বিচিত্র ছন্দে তালাবর্তন রচিত হয়। প্রতি সেকেণ্ডকে যদি একমাত্রাকাল ধরা যায় তাহলে ১৬ মাত্রা বিশিষ্ট ত্রিতালের একটি আবর্তনে ১৬ সেকেণ্ড সময় লাগবে।

মার্গ : মার্গ বলতে এখানে হস্তমুদ্রাদি সহযোগে, তাল প্রদর্শণের রীতি বা ঢঙ বোঝায়। প্রাচীন মার্গ-ক্ষেত্রে যেমন বিলম্বিতাদি পরে মাত্রার আনুপাতিক সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ দ্রুতে'র অর্ধেক মধ্য এবং মধ্যে'র অর্ধেক বিলম্বিত, লয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন সম্পর্ক নেই। শাস্ত্রে চার প্রকার মার্গের উল্লেখ আছে;

□ নারদ : সংগীত মকরন্দ। (পণ্ডিত মঙ্গল রামকৃষ্ণ তেলাঙ্গ সম্পাদিত) (বরোদা সং, ১৯২০)

যেমন, ধ্রুব, চিত্র, বার্তিক ও দক্ষিণামার্গ। এগুলির নামানুসারে তালাদির ছন্দ বা পদের মাত্রাসংখ্যা নিশ্চিত ছিল। যেমন,

(ক) ধ্রুবমার্গে একমাত্রিক পদ ও প্রতি মাত্রায় তালাঘাত।

(খ) চিত্রমার্গে দ্বিমাত্রিক পদ ও প্রতি দুইমাত্রায় তালাঘাত।

(গ) বার্তিকামার্গে চতুর্মাত্রিক পদ ও প্রতি চারমাত্রায় তালাঘাত।

(ঘ) দক্ষিণামার্গে অষ্টমাত্রিক পদ ও প্রতি আটমাত্রায় তালাঘাত।

এগুলির মধ্যে ধ্রুবমার্গের তেমন প্রচলন ছিল না, অনেকে স্বীকারও করতেন না। অন্য তিনটির গতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, চিত্রমার্গে দ্রুত, বার্তিকমার্গে মধ্য এবং দক্ষিণামার্গে বিলম্বিত গতির ব্যবহার ছিল। এই তিনটির আবার নয় প্রকার গতিবৈচিত্র্য ছিল।

অঙ্গ ঃ অঙ্গ অর্থে অংশ বা পদ বুঝায়। তালাবর্তনের পদ বা ছন্দ-বিভাগকে অঙ্গ বলে। মার্গতালে লঘু, গুরু ও প্লুত এই তিন প্রকার মাত্রা অঙ্গ রচনায় প্রযুক্ত ছিল এবং দেশীতালে মোট ছয় প্রকার মাত্রার ব্যবহার ছিল। বর্তমান তাল পদ্ধতি দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক, চতুর্মাত্রিক, মিশ্রমাত্রিক প্রভৃতি অঙ্গবিভাগ প্রচলিত আছে।

ক্রিয়া ঃ তালাবর্তনের ছন্দ বিভাগে যে, তালাঘাত ও অনাঘাত থাকে তাকে ক্রিয়া বলে। সশব্দ ও নিঃশব্দ ভেদে ক্রিয়া দুই প্রকার। তালাবর্তনের মাত্রা গণনাকালে তালাঘাতের স্থানগুলিকে সশব্দ এবং ফাঁক বা অনাঘাত স্থানগুলিকে নিঃশব্দ ক্রিয়া বলে। এই দুটি আবার আবাপাদি রীতিতে বিস্তৃত ছিল। (প্রাচীন তাল দ্রষ্টব্য)।

কলা ঃ ৬৪টি কলার মধ্যে প্রধান তিনটি কলা হোল গীত, বাদ্য ও নৃত্য। তবে সংগীতশাস্ত্রে এই 'কলা' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত। যেমন, তান-ক্রিয়ায় অলঙ্কারের অংশ বিশেষকে কলা বলে, যন্ত্রসংগীতে বাদন বা হস্ত-কৌশলকে কলা বলে। নৃত্যের সুললিত অঙ্গভঙ্গির চারুকলা তা সবজন সুবিদিত। তবে তালশাস্ত্রে কলা'র প্রকারভেদ বহু বিচিত্র। যেমন, মাত্রার মতো কলা ও চিত্রা, বার্তিক ও দক্ষিণা ভেদে তিনরকম। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে তালশাস্ত্রে মাত্রা ও কলার মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই)। অনেকে ধ্রুবা কলা স্বীকার করে মোট চার রকম কলা বলে থাকেন। এছাড়া নিঃশব্দ তাল বা অনাঘাত

ক্রিয়াকেও কলা বলা হয়। তবে দৈনন্দিন ব্যবহারে যে কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ প্রভৃতি ক্ষণভেদ প্রচলিত আছে, তা তালের উপযোগী কলা'র পর্য্যায়ভুক্ত নয়।

জাতি : জাতি শব্দে জাতিগান, ঔড়বাদি বৃত্তি অক্ষরাদির সমবায় প্রভৃতি অর্থ পাওয়া যায়। তালশাস্ত্রে ছন্দবিভাগের মাত্রা সংখ্যানুসারে ত্রিশ্র (৩), চতস্র (৪), খণ্ড (৫), মিশ্র (৭), সংকীর্ণ (৯ মাত্রা) প্রভৃতি জাতি বহুকাল থেকেই প্রচলিত এবং বর্তমান সংগীতেও স্বীকৃত। কাব্যে যেমন লঘু, গুরু প্রভৃতি অক্ষর সহযোগে ছন্দ গঠন করা হয় ; তালাবর্তনেও তেমনি বিভিন্ন সংখ্যক মাত্রা-সহযোগে ছন্দ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বৈচিত্র্য ছন্দের গতি, তালাঘাত, মাত্রা বিশেষের বিরাম বা দীর্ঘ উচ্চারণ, উচ্চারণের সবল বা দুর্বল ভঙ্গি প্রভৃতি সহযোগে প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

লয় : মাত্রাকাল অথবা সময়ের ব্যবধান বা অন্তরকে লয় বলে। অর্থাৎ দুটি মাত্রা বা তালাঘাতের মধ্যবর্তী সময়কালের গতিকে লয় বলে। তবে প্রাচীন মার্গ-ক্ষেত্রে লয়ে যেমন আনুপাতিক সম্বন্ধ আছে, লয়-ক্ষেত্রে তেমন নেই। অর্থাৎ লয়-ক্ষেত্রে দ্রুত থেকে কিছুটা ধীরে হলেই মধ্য এবং মধ্য থেকে কিছুটা ধীরে হলেই বিলম্বিত বলা হয়ে থাকে। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত ভেদে লয় প্রধানতঃ তিনপ্রকার তবে প্রাচীনকাল থেকে লয়বৈচিত্র্য নিত্য-নতুনভাবে বিকাশ লাভ করে চলেছে। আধুনিক শাস্ত্রে সাত প্রকার লয়ভেদের উল্লেখ আছে। যেমন, ১। বিলম্বিত, ২। মধ্য বা বরাবর, ৩। আড়ি, ৪। কুয়াড়ি, ৫। পেরাড়ি, ৬। বড়ারি ও ৭। সুলফ। এখানে লক্ষনীয় যে, এর মধ্যে দ্রুতলয়ের উল্লেখ নেই। সুলফের উল্লেখ আছে, যা সম্ভবতঃ দ্রুত'র স্থান গ্রহণ করেছে।

বিলম্বিত : বিলম্বিত শব্দটি আপেক্ষিক। কারণ এর কোন নির্দিষ্ট কাল নির্ধারণ করা যায় না। তবে সাধারণভাবে মধ্যলয়ের অর্ধেক অথবা আরো ধীরগতিকে বিলম্বিত বলা যায়।

মধ্য বা বরাবর : মধ্য বা বরাবরকে স্বাভাবিক বা আদর্শ লয় স্থির করে যাবতীয় লয়-বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হয়ে থাকে। যাতে শ্রোতৃমণ্ডলী শিল্পীর লয়জ্ঞান ও রসসৃষ্টি উপভোগ করে থাকেন।

আড়ি : ছন্দের একপ্রকার ভেদকে আড়ি বলে। যেমন, চতুষ্মাত্রিক ছন্দকে ত্রিমাত্রিক ছন্দে পরিবর্তন করা হলে তাকে আড়ি ছন্দ বলা হয়। অর্থাৎ 'ধা ধি ধি না' এই চারটি বর্ণের উচ্চারণকাল স্থির রেখে 'ধা ধি না' এই বর্ণত্রয়ের এমনভাবে উচ্চারণ করতে হবে যে, প্রতিটি বর্ণের স্থায়ীত্ব $\frac{১}{৩}$ মাত্রাকাল বেশী হবে। অর্থাৎ তখন প্রতিটি মাত্রাকাল হবে ১$\frac{১}{৩}$ এবং একত্রে চার মাত্রা পূর্ণ হবে।

কুয়াড়ি : ছন্দের আর এক প্রকারভেদ হোল কুয়াড়ি। যাবতীয় ছন্দ বৈচিত্র্যই মধ্যলয় এবং চতুষ্মাত্রিক ছন্দকে আদর্শ করে প্রদর্শিত হয়। তবে এ বিষয়ে মতভেদও আছে। যেমন, কেহ বলেন যে, আড়ি দ্বিগুনিত হলেই কুয়াড়ি হয়। আবার কেহ বলেন যে, আড়ি ছন্দকে আড়ি করলে কুয়াড়ি হয়। শেষোক্ত প্রক্রিয়াকেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কারণ প্রথমোক্ত প্রণালীতে বর্ণসমষ্টি দ্বিগুণিত হলেও ছন্দের বিশেষ পরিবর্তন অনুভূত হয় না। শেষোক্ত মতে ১৬ মাত্রা বিশিষ্ট চতুষ্মাত্রিক মূল ছন্দকে আড়ি করলে হয় ১২ মাত্রা, এবং তাকে আবার আড়ি করলে হয় ৯ মাত্রা। অর্থাৎ ১৬ মাত্রার উচ্চারণকাল স্থির রেখে সেই সময়ের মধ্যে ৯ মাত্রা উচ্চারণ করলে কুয়াড়ি ছন্দ উৎপন্ন হয়। তখন এই ৯ মাত্রার প্রতিটি বর্ণের সময়কাল হবে ১$\frac{৭}{৯}$ মাত্রা।

পেরাড়ি : চতুষ্মাত্রিক ছন্দের ১৬ মাত্রার উচ্চারণকাল স্থির রেখে সেই সময়ের মধ্যে সমান লয়ে ১০$\frac{২}{৩}$ মাত্রা উচ্চারণ করলে পেরাড়ি ছন্দ উৎপন্ন হয়। তখন প্রতিটি বর্ণের সময়কাল হবে ১$\frac{১}{২}$ মাত্রা।

বরাড়ি : চতুষ্মাত্রিক ছন্দের ১৬ মাত্রার উচ্চারণকাল স্থির রেখে সেই সময়ের মধ্যে সমান লয়ে ৭ মাত্রা উচ্চারণ করলে বরাড়ি ছন্দ উৎপন্ন হয়। তখন প্রতিটি বর্ণের সময়কাল হবে ২$\frac{২}{৭}$ মাত্রা।

সুলুফ : মধ্যলয়ের চতুর্গুণ বা তার থেকে সামান্য কম-বেশী দ্রুতগতির লয়কে সুলুফ ছন্দ বলে। বর্তমানে এই লয়কেই দ্রুতলয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

যতি : প্রাচীন সংগীতে, যতির সাহায্যে লয়বৈচিত্র্য আরো অনেক বিস্তৃত ছিল। যেমন ছন্দোবদ্ধ কাব্যে, তেমনি সংগীতে যতি'র একটি বিশেষ স্থান আছে। সমা, স্রোতবহা, মৃদঙ্গা, পিপিলিকা ও গোপুচ্ছা ভেদে প্রাচীন সংগীতে পাঁচ প্রকার যতি'র ব্যবহার ছিল। যদিও নাট্যশাস্ত্রকার মাত্র প্রথম

তিনপ্রকার যতি স্বীকার করেছেন, কিন্তু পরবর্তী শাস্ত্রীরা পিপিলিকা ও গোপুচ্ছা নিয়ে মোট পাঁচ প্রকার যতি স্বীকার করেছেন।

সংগীতের আদি, অন্ত ও মধ্য সকল স্থানেই সমান লয়যুক্ত হলে 'সমাযতি', আদিতে বিলম্বিত মধ্যে মধ্য ও অন্তে দ্রুতলয়যুক্ত হলে স্রোতবহা যতি, আদি ও অন্তে দ্রুত ও মধ্যস্থানে মধ্য বা বিলম্বিত লয়যুক্ত হলে 'মৃদঙ্গাযতি', আদি ও অন্তে মধ্য বা বিলম্বিত ও মধ্যস্থানে দ্রুতলয়যুক্ত হলে 'পিপিলিকাযতি' এবং যে সংগীত দ্রুত থেকে ক্রমে বিলম্বিত লয়প্রাপ্ত হয় তাকে গোপুচ্ছাযতি বলে।

গতি ঃ প্রকৃতপক্ষে লয় ও গতি অভিন্ন অর্থবোধক। প্রাচীন সংগীতে দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত অথবা তত্ত্ব, ঘন ও ওঘ এই তিন রকম গতির উল্লেখ আছে। এই গতি অনুসারেই সংগীতে রসসৃষ্টি হয়। এই গতি নিত্য নতুন ভাবে প্রকাশ পেতে পারে। সুতরাং সংগীতের তিনটি গতি একটি সাধারণ নিয়ম মাত্র। বহু প্রকার গতিভেদ হওয়া সম্ভব।

বর্তমান সংগীতে আড়ি, কুয়াড়ি, বিয়াড়ি, দ্বিগুণ, চৌগুণ প্রভৃতি গতিবৈচিত্র্য প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এই সকল ক্রিয়াকে 'লয়কারী', 'বাটোয়ারা', বাট প্রভৃতি বলা হয়। দেড়গুণ গতির লয়কে 'আড়ি', সোওয়াগুণ গতির লয়কে 'কুয়াড়ি', পৌনে দুগুণ গতির লয়কে 'বিয়াড়ি', দুইগুণ গতির লয়কে 'দুগুণ', চারগুণ গতির লয়কে 'চৌগুণ' প্রভৃতি বলা হয়। মনে রাখতে হবে যে, এই গতিবৈচিত্র্য সর্বদা মূল লয়ের ভিত্তিতে এবং এর প্রয়োগ মূল লয়ের থেকে দ্রুতগতিযুক্ত হয়ে থাকে।

গ্রহ ঃ গ্রহ অর্থে গ্রহণ করা বুঝায়। প্রাচীন সংগীতে গ্রহ ও অংশ সমান অর্থবোধক ছিল। তালের ক্ষেত্রে, অংশের মতোই, যে মাত্রা থেকে সংগীত ক্রিয়া আরম্ভ হয় তাকে গ্রহ বলে। 'সম', অতীত ও অনাগত ভেদে গ্রহ তিন প্রকার। পণ্ডিত দামোদর বিসম গ্রহের উল্লেখ করে চার প্রকার গ্রহের কথা বলেছেন। বিসম গ্রহের পরিচয়ে তিনি বলেছেন যে, সংগীত ক্রিয়া তালাবর্তনের এমন স্থান থেকে আরম্ভ হবে যে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত অনিয়ম (বেতালা) প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু অতীত এবং অনাগত গ্রহযুক্ত সংগীতের বন্দিশও (রচনা) তেমন ছন্দবিন্যাসযুক্ত হতে পারে। সুতরাং তিনটি গ্রহ স্বীকার করাই সংগত।

তালাবর্তনের প্রথম মাত্রাকে 'সম' বলে। 'সম' প্রতি তালাবর্তনে একবার আসে এবং এই স্থানের তালাঘাতটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়। সম-স্থানেই সংগীতক্রিয়া সমাপ্ত করা হয়। তাললিপিতে বোলের নীচে সমস্থানে (+) যোগ চিহ্ন, ফাঁকস্থানে (০) শূন্যচিহ্ন এবং ছন্দবিভাগগুলি ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যার সাহায্যে প্রদর্শিত হয়। সংগীতলিপিতে কেবলমাত্র ছন্দবিভাগ ও সম-ফাঁক প্রভৃতি চিহ্নগুলি দেওয়া থাকে। সাধারণত 'সম' এর বিপরীত স্থানে ফাঁক হয়, তবে এর ব্যতিক্রমও আছে।

সম, অতীত ও অনাগতগ্রহ : গান ও তালের সমস্থান যদি এক হয় অর্থাৎ সমস্থান থেকেই যদি সংগীত আরম্ভ হয় তাহলে তাকে 'সমগ্রহ'যুক্ত বলা হয়। প্রাচীন সংগীতে একে 'তাল', 'সতাল', 'সমপাণি, প্রভৃতি বলা হোত। সমকালের কয়েক মাত্রা পরে যদি সংগীতক্রিয়া আরম্ভ হয় তাহলে তাকে 'অতীতগ্রহ'যুক্ত বলা হয়, প্রাচীন সংগীতে একে 'বিতাল', 'বিগতসম', 'অবপাণিক' প্রভৃতি বলা হোত। আর সমকালের কয়েক মাত্রা পূর্বে যদি সংগীত ক্রিয়া আরম্ভ হয় তাহলে তাকে 'অনাগতগ্রহ'যুক্ত বলা হয়। প্রাচীন-সংগীতে একে 'অতাল', 'আগতসম', 'প্রতিতাল' 'উপরিপাণিক' প্রভৃতি বলা হোত। প্রাচীন সংগীতে এই সকল গ্রহযুক্ত সংগীতের বিভিন্ন প্রকার গতিভেদ ছিল। যেমন 'সমগ্রহে' মধ্য, 'অতীতগ্রহে' বিলম্বিত এবং 'অনাগতগ্রহে' দ্রুতগতির ব্যবহার ছিল। তাছাড়া গ্রহভেদানুসারে সংগীত সমাপ্ত করারও নির্দিষ্ট রীতি ছিল। সেই রীতি অনুযায়ী গ্রহত্রয়ের নাম ছিল যথাক্রমে 'সমাবর্তন', 'অধিকাবর্তন' ও 'হীনাবর্তন' এবং এই রীতির নাম ছিল 'গ্রহন্যাস'। বর্তমান সংগীতে এই গ্রহভেদ-বৈচিত্র্য লুপ্তপ্রায়।

বোল : নানাবিধ তাল ও বোল প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। কতগুলি অর্থহীন অক্ষর বা বাণী সহযোগে বোল রচিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার বোল ব্যবহৃত হয়। যেমন, যাবতীয় ততবাদ্যের বোলসমূহ ডা, রা প্রভৃতি অক্ষর সহযোগে এবং যাবতীয় আনদ্ধযন্ত্রের বোলসমূহ ধা, তা, তি, না, তেন, দেন, ত্রাং প্রভৃতি অক্ষর সহযোগে রচিত হয়। সাধারণত যন্ত্রসংগীতে যাকে 'বোল' বলা হয় কণ্ঠসংগীতে তাকে বলে 'বাণী'।

ঠেকা : কোন তালের মাত্রা, ছন্দ ও লয় বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার বোল-সমষ্টিকে ঠেকা বলে। সাধারণত কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের স্থায়ীর মতো তালবিশেষের বোল অপরিবর্তনীয়রূপে বাজানোকে ঠেকা বলা হয়। তবে তান-অলংকারাদির মতো ঠেকার মধ্যেও পরণ, রেলা প্রভৃতি অলংকার সংযুক্ত করা হয়। ঠেকার অপর নাম থাপিয়া। সাধারণত পাখোয়াজ ও মৃদঙ্গের ক্রিয়াকে থাপিয়া এবং তবলার ক্রিয়াকে ঠেকা বলা হয়।

সংগত : সংগীতে 'সংগত' অর্থ মিলন। লহরা ছাড়া সর্বদাই বাদ্যযন্ত্র কণ্ঠ বা যন্ত্র সংগীতের অনুগামী হয়। সংগত দুই প্রকার, যথা 'সাথসংগত' এবং 'জবাবসংগত'। বাদ্যযন্ত্র যখন সংগীতের সঙ্গে সমভাবে বাদিত হয় তখন তাকে 'সাথসংগত' বলে। জবাব অর্থ উত্তর। কণ্ঠ বা যন্ত্র সংগীতে যখন কোন তান বা পরণ বাজাবার পরে স্থায়ীর (মুখ) অংশ গীত বা বাদিত হয়, সেই অবসরে উক্ত তান বা পরণের অনুকরণে বাদ্যযন্ত্রে বোলবিন্যাস সৃষ্টি করাকে 'জবাবসংগত' বলে।

উচ্চাঙ্গ সংগীত ছাড়া অন্যান্য সংগীতের সঙ্গে সংগতকালেও কুশল বাদকেরা কিছু কিছু অলংকারাদি প্রয়োগ করে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে থাকেন। তবে সেই অলংকারাদি প্রয়োগকালে মূল বোল এবং যন্ত্রীর অধিকার-সীমা সম্বন্ধে সচেতন থাকা কর্তব্য। যার জন্য শিল্পোচিত উপলব্ধি ও সাধনার প্রয়োজন।

গৎ : 'গৎ' গীত শব্দের অপভ্রংশ রূপ। খেয়াল বা তারাণার অনুকরণে ততযন্ত্রে বাদনোপযোগী স্বর রচনাকে গৎ বলে। কেহ কেহ 'বোল'কেও গৎ বলে থাকেন। সাধারণত স্থায়ী ও অন্তরা নিযে গৎ রচিত হয়। তবে বর্তমানে মাঞ্জা নামে আর একটি চরণ সংযোজিত হয়েছে, পূর্বে যা স্থায়ীর অবয়বেরই অন্তর্ভূক্ত ছিল।

পূর্বে মসীদখানি ও রেজাখানি এই দুই প্রকার গৎই প্রচলিত ছিল, তবে বর্তমানে ইমদাদখানি গৎ সর্বাধিক জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

প্রস্তার : প্রস্তার অর্থ বিস্তার বা বাড়ানো, মূল রচনার স্বর, অক্ষর, ছন্দ, গতি প্রভৃতি নানাভাবে পরিবর্তন করে প্রস্তাব করা হয়। ইংরাজীতে যাকে বলে **Permutation-Combination**। গাথিক, সামিক স্বরান্তর প্রভৃতি তানগুলি প্রস্তারের সাহায্যে নির্ণীত হয়েছে। আর্চিক এক স্বর বিশিষ্ট বলে এর

কোন প্রস্তার হয় না, কিন্তু অন্যান্য তানগুলিতে হয় যেমন, দুই স্বরযুক্ত তানে দুটি প্রস্তার হয়, যথা—সারে ও রেসা। তিন স্বরযুক্ত তানে ছয়টি প্রস্তার হয়, যথা—সারেগ, রেসাগ, সাগরে, গসারে, রেগসা ও গরেসা। এইরূপে চার স্বরযুক্ত তানে ২৪টি, পাঁচ স্বরযুক্ত তানে ১২০টি, ছয় স্বরযুক্ত তানে ৭২০টি এবং সাত স্বরযুক্ত তানে ৫০৪০টি প্রস্তার হয়। তেমনি ত্রিতালের ১৬টি মাত্রার (বাণী বা অক্ষর) সাহায্যে ৬৫৫৩৫টি প্রস্তার হওয়া সম্ভব।

আবৃত্তি : আবৃত্তি অর্থ পুনরুচ্চারণ বা পুনরাবৃত্তি। কোন বোলকে বার বার বাজানোকে আবৃত্তি, আবর্তক বা আবর্তন বলা হয়।

জর্ব : জর অর্থ আঘাত। কোন বাদ্যযন্ত্রে শিল্পোচিত আঘাত করাকে জর্ব বলে।

পল্টা : কণ্ঠ সংগীতের স্বরবিন্যাস, আবৃত্তির মতো কোন বোল বা টুক্ড়েকে বার বার বাজানোকে পল্টা বলে।

রেলা : তালাবর্তনের প্রতি ছন্দ বিভাগে বিভিন্ন অক্ষরযুক্ত বাণী (বোল) সহজ মধ্যলয়ে বাজানোকে রেলা বলে।

লড়ি : লড়ি অর্থ মালা। কোন টুক্ড়েকে বিভিন্ন লয়ে বার বার বাজানোকে লড়ি বলে।

কায়দা : কায়দা অর্থ কেরামতি বা ক্ষমতার নিদর্শন। বোল সমূহের সুন্দর ও স্পষ্ট আবৃত্তিকে কায়দা বলে।

টুক্ড়ে : টুক্ড়ে অর্থ খণ্ড বা অংশ। তালাবর্তনের কোন অংশে, দুগুণ, চতুর্গুণ প্রভৃতি লয়ে, কোন বোল প্রয়োগ করা হলে সেই গতিপরিবর্তিত অংশকে টুক্ড়ে বলা হয়।

পল্লু : যখন কোন বোলকে অখণ্ডরূপে তিনবার বাজিয়ে সমে মিলানো হয়, তেমন ক্রিয়াকে পল্লু বলে।

ত্রিপল্লী : যে টুক্ড়ে বা গতের ছন্দবিভাগ তিনমাত্রাযুক্ত হয় তাকে ত্রিপল্লী, এবং

চৌপল্লী : চার মাত্রাযুক্ত ছন্দ বিভাগ হলে চৌপল্লী বলে।

পেশকার : পেশ করা থেকেই পেশকার শব্দের উৎপত্তি। নানাভাবে ঠেকার বোল বাজানোকে পেশকার বলে। অর্থাৎ ঠেকা বাজানোর পরে

তাকে সুন্দর বাণী ও সুললিত ছন্দে নানাভাবে প্রস্তার করাকে পেশকার বলা হয়।

তোড়া : তান ও তোড়া প্রায় একই অর্থবোধক শব্দ। যন্ত্রের উপযুক্ত বন্দেশী গতের বাণী সম্বলিত টুকড়ে বা তানকে তোড়া বলে। তোড়া সর্বদা দ্বিগুণ, চতুর্গুণ প্রভৃতি লয়ে এবং সাধারণত তেহাই যুক্ত হয়।

তিয়া, তেহাই বা মোহরা : ঠেকা বাজানোর সময়ে কোন টুকড়েকে ভিন্ন লয়ে তিনবার বাজিয়ে সমে আসার ক্রিয়াকে তিয়া, তেহাই বা মোহরা বলে।

নবহক্কা : কোন তেহাইকে তিনবার বাজিয়ে সমে আসার ক্রিয়াকে নবহক্কা বলে

মুখড়া : কোন টুক্ড়েকে সম থেকে ফাঁক বা ফাঁক থেকে সম পর্যন্ত ভিন্ন লয়ে বাজানোর ক্রিয়াকে মুখড়া বলে।

পরণ : 'পরণ' শব্দটি সম্ভবতঃ পূরণ শব্দেরই অপভ্রংশ রূপ। তালাবর্তনের কোন অংশ থেকে কোন টুক্ড়েকে ভিন্ন লয়ে বাজিয়ে সমে আসার ক্রিয়াকে পরণ বলে।

লহরা : 'লহরা' অর্থ ঢেউ বা ধারা। সাধারণত আনদ্ধযন্ত্র কণ্ঠ বা যন্ত্র সংগীতের অনুগামী হয়, কিন্তু যখন আনদ্ধযন্ত্রের বাদনই মুখ্য হয়, তখন তাকে লহরা বলা হয়। অর্থাৎ নানাবিধ ছন্দ ও বোলবিন্যাস বিভিন্ন গতি বৈচিত্র্য সহযোগে একক তবলা বা পাখোয়াজ বাজানোকে লহরা বলে। লহরাতে সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসাবে সারেঙ্গী, হারমনিয়াম বা অনুরূপ যন্ত্রে তান-আলাপাদি ছাড়া শুধু কোন রাগের স্থায়ী বাজানো হয়। লহরা বাদনের সিলসিলা বা পারম্পর্য হিসাবে উঠান, সেলামী, পেশকার, কায়দা, গৎ, রেলা, চক্রদার, লগ্‌গি প্রভৃতি বাজানো হয়।

উঠান : ঠেকা আরম্ভ করার আগে মুখবন্ধ বা গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে যে টুক্ড়ে বাজানো হয় তাকে উঠান বলে।

সেলামী বা আমদ : লহরা বাজানোর প্রারম্ভে একটি সুদীর্ঘ তেহাইযুক্ত টুকড়ে বাজানো হয়; এই তেহাইয়ের মধ্যে মধ্যে সামান্য বিরামকালে শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে তিনবার অভিবাদন (সেলাম) করা হয়। এই ক্রিয়াকে সেলামীর টুকড়ে বা আমদ বলা হয়।

সিলসিলা ঃ সিলসিলা অর্থ পারম্পর্য (Sequence)। বিজ্ঞান ভিত্তিক যাবতীয় রচনারই বিশেষ পারম্পর্য বা সিলসিলা আছে। সংগীতেরও তেমনি সিলসিলা আছে, ওস্তাদেরা শিষ্যবর্গকে সেই অনুসারেই শিক্ষা দেন। সিলসিলা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ সংগীতজ্ঞদের 'আতাই' বলা হয়।

চক্রদার ঃ তান, তোড়া, তেহাই প্রভৃতি নিয়েই চক্রদার গঠিত হয়। এর বৈশিষ্ট্য হোল এই যে, চক্রদার সর্বদা দীর্ঘ এবং তেহাইযুক্ত হয় এবং তিন, চার কি পাঁচ বার বাজিয়ে সমে মিলান হয়। আর লয়ের গতি এক থাকে না।

লগ্‌গি ঃ যখন 'ধিন ধাধিন ধিনাড়া' প্রভৃতি টুক্‌ড়েকে আড়ি লয়ে দ্রুত বিস্তার করা হয়, তখন তাকে লগ্‌গি বলে। সাধারণত ঠুংরী গানে এর অধিক প্রয়োগ হয়।

উপজ ঃ গান বা গতের স্থায়ী অংশের একটি ক্ষুদ্রাংশকে (মুখ) নানাভাবে অলঙ্কৃত করাকে উপজ বলেন। কেহ কেহ টুক্‌ড়েকেও উপজ বলে। তবে গানে বা গতের মুখের নূতন নূতন রূপ প্রকাশকেই উপজ বা কায়দা বলে।

Metronome : সংগীত কেমন লয়যুক্ত হবে তাই নির্দেশ করার জন্যই সাধারণত মেট্রোনোম যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়। একটি পেণ্ডুলামযুক্ত (ঘড়ির মতো) যন্ত্র এমন যান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্মিত যে, চাবি দিয়ে চালনা করলে অবিরাম তথা সমান ব্যবধানযুক্ত শব্দ হতে থাকবে। এর পেণ্ডুলামের সঙ্গে ৪০ থেকে ২০৮ পর্যন্ত সংখ্যাযুক্ত একটি স্কেল আছে, এবং একটি ওজন এমনভাবে যুক্ত থাকে যে, ইচ্ছামত তাকে স্কেলের উপরে বা নীচের দিকে সরানো যায়। যার সাহায্যে শব্দাঘাতের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এবং মিনিটে ৪০ থেকে ২০৮টি পর্যন্ত শব্দ ধ্বনিত করা যায়।

মেট্রোনোম যন্ত্রটির স্রষ্টা হিসাবে যদিও ভ্রমবশতঃ Ratisbon নামক স্থানের Johann Nepomuk Maelzel (1772-1838) এর নামোল্লেখ করা হয় কিন্তু এর আসল উদ্ভাবক হোল ডাচ্ সংগীতজ্ঞ Dietrich Nikolaus Winkel (1776-1826)□.

বর্তমানে মেট্রোনোমের অনেক উন্নতি বিকাশ দেখা যায়। যাতে শব্দাঘাত-গুলির মধ্যে ইচ্ছামত ব্যবধানে ঘণ্টাধ্বনিও ধ্বনিত করা যায়। যেমন ত্রিতালের

□ **Encyclopaedia Britannica. 1971. (Vol. 15. P. 315)**

তিনটি শব্দাঘাতের পরে 'সম' এর জন্য একটি করে ঘণ্টাধ্বনি ধ্বনিত করা সম্ভব। আজকাল বিদ্যুৎচালিত মেট্রোনোমও আবিস্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানের সময়কাল নিরূপণ তথা সংগীত শিক্ষার্থীর লয়জ্ঞানের অভ্যাসের জন্য যন্ত্রটি অত্যন্ত সুবিধাজনক এবং মহত্বপূর্ণ।

বাদকের গুণ ও দোষ ঃ নাট্যশাস্ত্রকার উত্তম বাদক নির্ণয়ের জন্য যে সকল লক্ষণ ও গুণ থাকা আবশ্যক তার পরিচয়ে বলেছেন ঃ

অত উর্ধ্বং প্রবক্ষামি বাদকানাং তু লক্ষণম।
গীতবাত্ত কলাবাত্ত গ্রহমোক্ষ বিশারদঃ॥

* * * *

সবিহিত শরীর বুদ্ধিঃ সংসিদ্ধো বাদকঃশ্রেষ্ঠ॥

অর্থাৎ যিনি লঘু হস্ত এবং চিত্রপাণিবিধি সম্বন্ধে জ্ঞানী, যিনি ধ্রুবাগীতি ও বাত্তকলা সম্বন্ধে বিচক্ষণ, যিনি স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিমান এবং সুগঠিত আঙুলযুক্ত তিনিই সুবাদক হবার উপযুক্ত।

পরবর্তীকালের শাস্ত্রাদিতে এ'প্রসঙ্গে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা কিঞ্চিত বিস্তৃত হলেও মূলতঃ প্রায় অনুরূপ বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। যেমন,

গুণ ঃ যে গীত, বাত্ত ও নৃত্য কলা সম্বন্ধে জ্ঞানী।
যে বিভিন্ন বাত্তযন্ত্রাদির নির্মাণকৌশল সম্বন্ধে জ্ঞানী।
যে বিভিন্ন বাত্তযন্ত্র বাদনে বিচক্ষণ।
যে হস্ত ও অঙ্গুলি চালনে কুশলী।
যে বিভিন্ন তাল, লয়, গ্রহভেদ প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানী।
যে স্বরসমূহের রূপভেদ সম্বন্ধে সজ্ঞান।
কোন্ যন্ত্র বাদনে শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গের সাহায্য আবশ্যক সে বিষয়ে যে জ্ঞানী।

দোষ ঃ যে উপরোক্ত লক্ষণ ও গুণাবলীর অধিকারী নয় তার পক্ষে উত্তম বাদক হওয়ার সম্ভাবনা কম।

তাল পদ্ধতি ঃ ভারতবর্ষের যাবতীয় তালপদ্ধতিকে প্রধানতঃ চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন,

১। উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী তালপদ্ধতি।

২। দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটক তালপদ্ধতি।[১]

৩। বাংলাদেশে প্রচলিত কীর্তনাঙ্গ তালপদ্ধতি।

৪। মণিপুরে প্রচলিত মৈ তৈ তালপদ্ধতি।

এ ছাড়া বিশ্বকবি উদ্ভাবিত এবং তাঁর গানে প্রচলিত কয়েকটি তালের বিবরণও এই পরিচ্ছদে দেওয়া হোল যা 'রাবীন্দ্রিক ঠেকা' নামে পরিচিত।

হিন্দুস্থানী তালপদ্ধতি: দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলগুলি ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত তালপদ্ধতি, হিন্দুস্থানী তালপদ্ধতি নামে পরিচিত। প্রাচীনকালে সমগ্র ভারতবর্ষে অভিন্ন সংগীতপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মুসলমানদের আগমনের পরে, সম্ভবতঃ আমীর খসরু ও নায়ক গোপালের সময় থেকে এই পরিবর্তন আরম্ভ হয়। অর্থাৎ সেই সময় থেকে ভারতীয় সংগীতে বিদেশী সংগীত ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার আরম্ভ হয়। নানা কারণে পূব ও দক্ষিণ ভারতের কতগুলি অঞ্চলে বিদেশী প্রভাব তেমন বিস্তারলাভ করতে পারে নি। ফলে সেই সকল স্থানে প্রান্তীয় সীমাবদ্ধতার যে কৌলিন্য বিদ্যমান হিন্দুস্থানী সংগীতে তা নেই। তাই অন্যান্য পদ্ধতির মতো হিন্দুস্থানী তালপদ্ধতিকে কোন নিয়মাবদ্ধ প্রণালীতে ব্যাখ্যা করা যায় না। অতএব একে একটি মিশ্র তালপদ্ধতি বলা যায়।

হিন্দুস্থানী তালপদ্ধতিতে পদ, জাতি, বিশেষ করে ফাঁক ক্রিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে, বিভিন্ন প্রান্তীয় গুণীদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা যায়। ফাঁক ক্রিয়াটি তালাবর্তনের সমতা রক্ষার্থে প্রযুক্ত, এইরূপ কথিত আছে। অর্থাৎ এটি 'সম'-এর বিপরীত স্থানে অথবা দুটি তালাঘাতের মধ্যস্থানে হওয়া উচিত। কিন্তু বিভিন্ন তালে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। অর্থাৎ সূত্রটি সর্বত্র প্রযোজ্য নয়।

তালের জাতি: তালগুলিকে বিভিন্ন ছন্দ বিভাগের মাত্রাসংখ্যানুসারে তিস্র (ত্রিমাত্রিক), চতস্র (চতুর্মাত্রিক) ও মিশ্র (মিশ্রমাত্রিক) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই তিনটি মাত্র জাতির সাহায্যে তালগুলিকে বর্গীকরণ করা যায় না। কারণ চৌতাল, একতাল আড়াচৌতাল,

১। কর্ণাটক সংগীতশাস্ত্র পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সুরফাঁকতাল প্রভৃতির ছন্দবিভাগ হোল দুটি মাত্রাযুক্ত অথচ এগুলিকে অনেকে চতুর্মাত্রিক বলে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলিকে দ্বিমাত্রিক বলা যুক্তিসঙ্গত। আবার কতগুলি একমাত্রাযুক্ত ছন্দবিভাগের তালও আছে যাদের একমাত্রিক বলা উচিত। সুতরাং দ্বিমাত্রিক ও একমাত্রিক নামক দুটি অতিরিক্ত জাতি সংযুক্ত হলে তালগুলির জাতিবিভাগ সুষ্ঠুতর হতে পারে।

তালের পদ : সম ও বিসম ভেদে দুটি মাত্র পদ-বিভাগ সেদিক থেকে বেশ যুক্তিসংগত এবং সংক্ষিপ্ত। তালের ছন্দ বিভাগ সমান মাত্রাসংখ্যাযুক্ত হলে 'সমপদী' এবং অসমান মাত্রাসংখ্যাযুক্ত হলে বিসমপদী বলা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দুস্থানী পদ্ধতির তালগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় এবং সবদা স্বতন্ত্ররূপেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

গীতরীতি হিসাবে তালের শ্রেণীবিভাগ : বিভিন্ন গীতরীতিতে প্রযুক্ত তালগুলিকে সাধারণভাবে এইরূপে শ্রেণীভাগ করা যায়। যেমন,

১। ধ্রুপদ অঙ্গের গানে=চৌতাল, ধামার, সুরফাঁকতাল, ঝাঁপতাল, তেওরা, আড়াচৌতাল, রুদ্রতাল, লক্ষীতাল, ব্রহ্মতাল প্রভৃতি।

২। খেয়াল অঙ্গের গানে=একতাল, ত্রিতাল, তিলুযাড়া, আডাঠেকা, ঝুমরা, আডাচৌতাল প্রভৃতি।

৩। টপ্পা অঙ্গের গানে=মধ্যমান, পাঞ্জাবী, আদ্ধা প্রভৃতি।

৪। ঠুংরী অঙ্গের গানে=দীপচন্দী, রূপক, যৎ প্রভৃতি।

৫। লঘুসংগীতে=কাহারবা দাদরা, কাওয়ালী, খেমটা প্রভৃতি।

উপরোক্ত বর্গীকরণ অনুসারেই যে বিশেষ গীতরীতির জন্য বিশেষ তালগুলি নিশ্চিত, এমন ধারণা করা অনুচিত। কারণ মনে রাখতে হবে যে, কোন তাল-ই কোন বিশেষ গীতরীতির জন্য অথবা কোন বিশেষ বাদ্যযন্ত্রের জন্য রচিত হয় নি। অর্থাৎ যে কোন তালই যে কোন গীতরীতির অথবা বাদ্যযন্ত্রের জন্য প্রযুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ উক্ত বর্গীকরণ একটি সাধারণ নিয়ম মাত্র।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যেমন ঝাঁপতালের খেয়াল গান শোনা যায় তেমনি ত্রিতালের ধ্রুপদ। আর লঘু সংগীতে তো বহু বিচিত্র তালেরই ব্যবহার দেখা যায়।

তবে সাধারণ শিক্ষার্থীর সুবিধার্থে, মোটামুটিভাবে জাতি, পদ, গীতরীতি, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ সহযোগে, সাধারণত ব্যবহৃত তালগুলির একটি তালিকা নীচে দেওয়া হোল।

সংখ্যা	তাল-নাম	মাত্রা	জাতি	পদ	বাদ্যযন্ত্র	গায়নরীতি	মন্তব্য
১	চৌতাল	১২	দ্বিমাত্রিক	সম	পাখোয়াজ তবলা	ধ্রুপদ	—
২	ধামার	১৪	মিশ্র	বিসম	ঐ	ধামার	—
৩	আড়াচৌতাল	১৪	দ্বিমাত্রিক	সম	ঐ	ধ্রুপদ	খেয়ালও গাওয়া হয়।
৪	সুরফাঁকতাল	১০	ঐ	সম	পাখোয়াজ	ঐ	—
৫	ঝাঁপতাল	১০	মিশ্র	বিসম	পাখোয়াজ তবলা	ঐ	খেয়ালও গাওয়া হয়।
৬	তেওরা	৭	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	গজল আদি লঘু সঙ্গীতও গাওয়া হয়।
৭	একতাল	১২	দ্বিমাত্রিক	সম	তবলা	খেয়াল	—
৮	ত্রিতাল	১৬	ত্রিমাত্রিক চতস্র	ঐ	ঐ	ঐ	—
৯	তিলওয়ারা	১৬	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	—
১০	আড়াঠেকা	৮	দ্বিমাত্রিক	সম	তবলা	ঐ	—
১১	ঝুমরা	১৪	মিশ্র	বিসম	ঐ	ঐ	—
১২	মধ্যমান	১৬	চতস্র	সম	ঐ	টপ্পা	—
১৩	পাঞ্জাবী	১৬	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	—
১৪	আদ্ধা	৮	দ্বিমাত্রিক	ঐ	ঐ	ঐ	ঠুংরীও গাওয়া হয়।
১৫	যৎ	৮	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঠুংরীও গাওয়া হয়।
১৬	যৎ	৭	মিশ্র	বিসম	ঐ	ঠুংরী	—
১৭	দীপচন্দী	১৪	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	টপ্পাও গাওয়া হয়।
১৮	রূপক	৭	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	—
১৯	খেমটা	১২	ত্রিমাত্রিক	সম	ঐ	লঘু	—
২০	কাওয়ালী	৮	চতস্র	ঐ	ঐ	ঐ	—
২১	দাদরা	৬	ত্রিমাত্রিক	ঐ	ঐ	ঐ	—
২২	কাহারবা	৪	চতস্র	ঐ	ঐ	ঐ	—

হিন্দুস্থানী সংগীতের কতিপয় তালের বোল

চৌতাল: ১২ মাত্রা। সমপদী। দ্বিমাত্রিক। ২।২।২।২।২।২ ছন্দ।

I ধা ধা | দেন তা | কৎ ধাগে | দেন তা | তিট কতা | গদি ঘেনে I
+ | ০ | ২ | ০ | ৩ | ৪

প্রাচীন শাস্ত্রে একে **চতুস্তাল** বলা হয়েছে। বর্তমানে দেশ ও গ্রন্থভেদে একে **চৌতাল, চারতাল, চন্দতাল** প্রভৃতি বলা হয়েছে। পারস্থ ভাষায় এর নাম **চাহার্জব**। পূর্বে এই তাল নাকি ৬ মাত্রা ও ২।১।১।২ ছন্দ-যুক্ত ছিল। অবশ্য মূলগত ঐক্য বিদ্যমান আছে।

ধামার: ১৪ মাত্রা। বিসমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ৩।২।২।৩।৪ ছন্দ।

I ক ধি ট | ধি ট | ধা – | গ তি ট | তি ট তা – I
+ | ০ | ২ | ০ | ৩

দ্বিতীয় প্রকার। ১৪ মাত্রা। বিসমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ৫।২।৩।৪ ছন্দ।

I ক ধি ট ধি ট | ধা – | গ তি ট | তি ট তা – I
+ | ২ | ০ | ৩

প্রকৃতপক্ষে এর উচ্চারণ হোল **ধমার** বা **ধম্মার** (কেহ কেহ **ধর্মতাল** বলে থাকেন)। পূর্বে একে বলা হোত হোরী। শব্দগুলি রাধাকৃষ্ণের হোলীখেলার সঙ্গে সম্পর্কিত। বিখ্যাত সদারঙ্গ এই নামকরণ করেছেন বলে কথিত আছে।

ঝাঁপতাল: ১০ মাত্রা বিসমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ২।৩।২।৩ ছন্দ।

প্রথম প্রকার: I ধি না | ধি ধি না | তি না | ধি ধি না I

দ্বিতীয় প্রকার: I ধা - | ধা গি কি | ট কড় | ধা কি ট I
+ | ২ | ০ | ৩

বর্তমানে কেহ **ঝাঁপতাল, ঝুমরা** প্রভৃতি তালকে অর্ধসমপদী বলে থাকেন। এর অর্থ এই তালগুলির প্রথম পদের সঙ্গে তৃতীয় পদ এবং দ্বিতীয়

পদের সঙ্গে চতুর্থ পদের মাত্রাবিন্যাসের ঐক্য আছে। তবে বিসমপদী সংজ্ঞাকে এইরূপে বিভক্ত করলে তালশাস্ত্রের ঔপপত্তিক বিবরণ কিঞ্চিত বৃদ্ধি পাবে মাত্র।

প্রাচীন শাস্ত্রে **ঝাঁপতালকে** নাকি **ঝম্পাতাল** বলা হোত, কিন্তু **ঝম্পাতাল** হোল ৩।৩।৪ ছন্দের ১০ মাত্রাযুক্ত তাল, যার সঙ্গে **ঝাঁপতালের** সাদৃশ্য হতে পারে না। পশ্চিমী ওস্তাদেরা অনেকে একে **সাদরা** বলে থাকেন। **সাদরা** নামক একপ্রকার গীতরীতি আছে যা সাধারণত **ঝাঁপ-তালে** গাওয়া হয়, সেইজন্যই সম্ভবতঃ এই নামটির প্রচলন হয়েছে।

সুরফাঁকতাল: ১০ মাত্রা। বিসমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ৪।২।৪ ছন্দ। ফাঁক ক্রিয়া নেই।

ধা ঘেড়ে নাক দি	ঘেড়ে নাক	গৎ দি ঘেড়ে নাক
+	২	৩

দ্বিতীয় প্রকার: ১০ মাত্রা সমপদী। দ্বিমাত্রিক।

ধা ধা	দেন তা	তিট ধা	তিট কতা	গদি ঘেনে
+	০	২	৩	০

দেশ ও গ্রন্থভেদে একে **মুলতান, মত্‌তাল, মত্তভাল, বাঁকীতাল, সুরফাক্তা** প্রভৃতি বলা হয়েছে। আর প্রাচীন শাস্ত্রে একে **সূর্যফাঁক, কংকনক, সাত্তীতাল** প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে এর ছন্দ হোল ২।১।২। অবশ্য মূলগত ঐক্য বিদ্যমান আছে।

তেওরা: ৭ মাত্রা। বিসমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ৩।২।২ ছন্দ। ফাঁক ক্রিয়া নেই।

প্রথম প্রকার:

ধা দেন তা	তিট কতা	গদি ঘেনে
+	২	৩

দ্বিতীয় প্রকার:

ধা ঘেড়ে নাক	গৎ দি	ঘেড়ে নাক
+	২	৩

শাস্ত্রে একে **তীব্রা, গীতাঙ্গী** প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। পণ্ডিত-আপ্পাতুলসী তাঁর 'অভিনব তালমঞ্জরী' গ্রন্থে বলেছেন যে, যা **তেওরা** বা

ত্রিপুট নামে খ্যাত তাই 'সঙ্গীতরত্নাকর' গ্রন্থে '**অন্ত্যরক্রীড়া**' নামে কথিত। তবে এ'দুটির পার্থক্য হোল এই যে, **তেওরার** ছন্দ ৩।২।২ এবং **অন্ত্যর-ক্রীড়ার** ছন্দ ২।২।৩।

ঝুমরা ঃ ১৪ মাত্রা। বিসমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ৩।৪।৩।৪ ছন্দ।

I ধিন -ধা তৃকট | ধিন ধিন ধাগে তৃকট | তিন -তা তৃকট
+ ২ ০
ধিন ধিন ধাগে তৃকট I
৩

এর সংস্কৃত নাম **ত্রিবট**। পশ্চিমী ওস্তাদেরা একে **তেওট** বা **ঝুমরা** বলে থাকেন।

যৎ ঃ ৮ মাত্রা। সমপদী। দ্বিমাত্রিক।

I ধা ধিন | ধাধা ধিন না তিন | ধাধা ধিন I
+ ২ ০ ৩

দীপচন্দী ঃ ১৪ মাত্রা। বিসমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ৩।৪।৩।৪ ছন্দ।

I ধিন ধিন - | ধা গে তিন - | তিন তিন - | ধা গে ধিন - I
+ ২ ০ ৩

অনেকের মতে শাস্ত্রীয় **যতি** তালকেই বর্তমানে **যৎ** বলা হয়। বর্তমানে ১৬ বা ৮ মাত্রাযুক্ত এবং ১৪ বা ৭ মাত্রাযুক্ত দুইপ্রকার **যৎ** প্রচলিত আছে। ১৪ বা ৭ মাত্রাযুক্ত যৎকেই '**দীপচন্দী**' বলা হয়, বাংলাদেশে কেহ কেহ একে '**চাঁচর**'তাল বলে থাকেন। ১৪ বা ৭ মাত্রাযুক্ত তালটি পূর্বে হোলীগানে বেশী ব্যবহৃত হোত বলে কেহ কেহ একে **হোরী** তালও বলে থাকেন। তবে বর্তমানে দুইপ্রকার **যৎ**-ই ঠুংরীগানে অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

রূপক ঃ ৭ মাত্রা। বিসমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ৩।২।২ ছন্দ।

I তিন তিন না | ধিন ধিন | ধাগে তৃকট I
০ ২ ৩

শাস্ত্রে ১ম মাত্রায় ফাঁক প্রদর্শণ সহযোগে রূপক তালের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু 'সম' স্থানের উল্লেখ নেই। বিভিন্ন সংগীত পদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রূপক তালের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, কীর্তনাঙ্গ, ও মণিপুরী পদ্ধতিতে ২।৪ ছন্দের। কর্ণাটক পদ্ধতিতে পাঁচ প্রকার এবং হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে ৩।২।২ ছন্দের তেওরা ও রূপক তাল। প্রকৃতপক্ষে ৭ মাত্রা ও অনুরূপ ছন্দযুক্ত অনেক তাল হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে থাকায় একে একেবারে বর্জন করলেও বিশেষ ক্ষতি নেই।

কাহারবা ঃ ৪ মাত্রা। সমপদী। চতুস্মাত্রিক।

I ধাগে ধাতি নাগ ধিন I
+

দ্বিতীয় প্রকার ঃ ৮ মাত্রা। সমপদী। চতুস্মাত্রিক।

I ধা গে না তি | না. ক ধি ন I
+ | ০

কাওয়ালী ঃ ৮ মাত্রা। সমপদী। চতুস্মাত্রিক।

I ধা কৎ ধা ধিন | তা কৎ তা ধিন I
+ | ০

কাহারাদি শ্রেণীর গানে অধিক ব্যবহৃত হোত বলেই নাকি **কাহারবা** নামকরণ হয়েছে। কেহ কেহ একে **কার্ফা** বলে থাকেন। এর প্রকৃতি চঞ্চল তাই দ্রুতগতির গানেই অধিক ব্যবহৃত হয়। এটি ৪ মাত্রার তাল, তবে অনেক ক্ষেত্রে ৮ মাত্রাতেও পরিবেশিত হয়ে থাকে।

কাওয়ালী কাহারবার এক নামভেদ মাত্র। কাওয়াল বা কব্বালেরা তাদের গ্রাম্য তথা সমাজিক সংগীতে এর ব্যবহার করতো বলেই সম্ভবতঃ এই নামকরণ। **কাওয়ালী** নামে মুসলমানদের একপ্রকার ধর্মীয় সংগীত প্রচলিত আছে। যা অন্যান্য তালেও গীত হয়ে থাকে।

ছেপকা ঃ ৮ মাত্রা। সমপদী। চতুস্মাত্রিক।

I ধাগে তিট নাগ ধিন | তাগে তিট নাক ধিন I
+ | ০

ছেপকা **কাহারবার** নামভেদ মাত্র। **কাহারবার** ৪ মাত্রা দুবার বাজালে যা হয় তাই বাংলাদেশে **ছেপকা** নামে প্রচলিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে একই ছন্দ বা তালের সামান্য হেরফের করে তালশাস্ত্রের ঔপপত্তিক বিবরণ বৃদ্ধির কোন সংগত কারণ দেখা যায় না।

একতাল: ১২ মাত্রা। সমপদী। দ্বিমাত্রিক।

I ধিন ধিন | ধাগে তৃকট | থুন নানা | কৎ তে ধিন তৃকট
+ ০ ২ ০ ৩

ধিন ধাধা I
৪

দ্বিতীয় প্রকার: ১২ মাত্রা। সমপদী। ত্রিমাত্রিক।

I ধিন ধিন ধা | ধাগে থুন. না কৎ তা ধাগে | তৃকট ধিন না I
+ ২ ০ ৩

তৃতীয় প্রকার: বিলম্বিত। ২৪ মাত্রা। সমপদী। চতুর্মাত্রিক।

I ধিন তিরকিট ধিন তিরকিট | ধা ধাগে তির কিট |
+ ০

তিন তিরকিট না না - নানা | কৎ দেৎদেৎ তা তিরকিট |
২ ০

ধা ধাগে তেরে কেটে | ধিন তিরকিট ধা ধা - ধাধা I
৩ ৪

একতাল বর্তমানে দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক, চতুর্মাত্রিক প্রভৃতি ছন্দে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে চতুর্মাত্রিক ছন্দটি প্রাচীনতম বলে কথিত। ত্রিমাত্রিক বাংলাদেশে অধিক প্রচলিত এবং দ্বিমাত্রিক পশ্চিমী ওস্তাদদের প্রিয়। গতি-ভেদানুসারে বর্তমানে মধ্যলয়ে ১২ মাত্রা, বিলম্বিত ২৪ মাত্রা এবং অতি বিলম্বিত লয়ে ৪৮ মাত্রানুযায়ী পরিবেশিত হয়। এখানে বাহুল্যবোধে ৪৮ মাত্রার ঠেকাটি দেওয়া হোল না।

সওয়ারী ঃ ১৫ মাত্রা। বিসমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ৩।২।২।২।২।২।২ ছন্দ।

I ধা তৃকট ধিনা | কৎ ধিধি | নাধি ধিনা | তিনা তিনা
\+ | ২ | ০ | ৩

তৃকতুনা কিড়নাগ | কত্তা ধিধি | নাধি ধিনা I
০ | ৪ | ০

কাড়া, নাকাড়া, তাসা প্রভৃতির মতো সওযারী একপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের নাম। এই যন্ত্রে যে সকল তাল বাজানো হোত তাদের বলা হোত সওয়ারী। প্রায ১৮ রকম সওযারীর নামোল্লেখ পাওয়া যায। যথা—কয়েদ, কাওয়াল, কুর্ক, চপক, শেরকী, জেনানী, মর্দ্দানী, বসাবী, মঞ্জরী, লছমন, সীতা, ছোট, শুদ্ধ, তৃতীয় বা তাসাকে, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সওযারী। এগুলির মধ্যে পঞ্চম ছাড়া আর সবই বর্তমানে অপ্রচলিত। এই ঠেকা বর্তমানে পাখোয়াজ বা তবলাতে বাজানো হয।

তিনতাল / ত্রিতাল ঃ ১৬ মাত্রা। সমপদী। চতুর্মাত্রিক।

I ধা ধিন ধিন ধা | ধা ধিন ধিন ধা | না তিন তিন তাক | তিট ধিন ধিন ধা I
\+ | ২ | ০ | ৩

তিলুয়াড়া ঃ ১৬ মাত্রা। সমপদী। চতুর্মাত্রিক।

I ধা তৃকট ধিন ধিন | ধা ধা ধিন ধিন | তা তৃকট ধিন ধিন | ধা ধা ধিন ধিন I
\+ | ২ | ০ | ৩

আড়াঠেকা ঃ ৮ মাত্রা। সমপদী। দ্বিমাত্রিক।

I ধা-ক্রে ধিন ধা | -ধা তিন | তা-ক্রে ধিনধা | -ধা ধিন I
\+ | ২ | ০ | ৩

আদ্ধা ঃ ৮ মাত্রা। সমপদী। দ্বিমাত্রিক।

I ধাধিন -ধা | নাধিন -ধা | নাতিন -তা | নাধিন -ধা I
\+ | ২ | ০ | ৩

পাঞ্জাবী ঃ ১৬ মাত্রা। সমপদী। চতুর্মাত্রিক।

ধা -ধি -ক ধা	ধা -ধি -ক ধা	তা -তি -ক তা	ধা -ধি -ক ধা
+	২	০	৩

টপ্পাতাল ঃ ১৬ মাত্রা। সমপদী। চতুর্মাত্রিক।

ধিন তা ধিন ধিন	ধিন তা ধিন -	ধা ক্রে ধিন -	ধিন তা ধিন ধিন
+	২	০	৩

অনেকের মতে ত্রিতাল শাস্ত্রীয় নয়, মধ্যযুগে **খমসা** নামে নাকি এর প্রথম প্রচলন হয়েছিল। তবে কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে ত্রিতালের উল্লেখ থাকায় এ বিষয়ে মতভেদ আছে। বর্তমানে এটি বিবিধ রূপে প্রচলিত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়। যেমন বিলম্বিত ত্রিতালের কিঞ্চিৎ রূপভেদ বা আড়ি ছন্দকে **তিলুয়াড়া** বলা হয়। **আড়াঠেকা** এর আর এক প্রকারভেদ, তবে এটি ৮ মাত্রাযুক্ত এবং এর বাদনরীতি সাধনা সাপেক্ষ। পূর্বে খেয়াল গানে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে টপ্পাগানে এর অধিক প্রয়োগ দেখা যায়, তাই পশ্চিমী ওস্তাদেরা অনেকে একে **টপ্পা তাল** বলেন। তবে টপ্পাতাল ১৬ মাত্রায়ও পরিবেশিত হয়। এখানে তাই সবগুলি ঠেকাই দেওয়া হোল।

আদ্ধা শব্দটি পাঞ্জাবী, এটিও ত্রিতালের এক প্রকারভেদ। ত্রিতালের অর্ধ বলেই সম্ভবতঃ এই নামকরণ হয়েছে। কেহ কেহ **কাওয়ালী** ও **আদ্ধা**-কে অভিন্ন বলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ'দুটিতে বিশেষ সাদৃশ্য নেই। **পাঞ্জাবী** তালটি ত্রিতালের এক প্রকারভেদ মাত্র। পাঞ্জাবের বাদকেরা ত্রিতালকে উক্তরূপে বাজিয়ে থাকেন বলেই সম্ভবত এই নামকরণ হয়েছে।

দাদরা ঃ ৬ মাত্রা। সমপদী। ত্রিমাত্রিক।

ধা ধিন না	না তিন না
+	০

খেমটা ঃ ১২ মাত্রা। সমপদী। ত্রিমাত্রিক।

ধা তে টে	না ধি না	তে টে ধি	না ধি না
+	২	০	৩

আড়খেমটা ঃ ১২ মাত্রা। সমপদী। ত্রিমাত্রিক।

I	ধা	তৃকট	ধিন্	ধা	ধা	ধিন্	তা	তৃকট	তিন্	ধা	ধা	ধিন্	I
	+			২			০			৩			

কাশ্মিরী খেমটা (ভরজা) ঃ ৬ মাত্রা। সমপদী। ত্রিমাত্রিক।

I	ধিগ	-	না	ধা	তি	না	I
	+			০			

বস্তুতঃ একতালের দ্রুতরূপকেই **দাদরা খেমটা আড়খেমটা** প্রভৃতি বলা যায়। তবে **খেমটার** ছন্দ ত্রিমাত্রিক হলেও ঠেকার বাণী চতুর্মাত্রিক অনুভূত হয়, যা এর বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য। **দাদরা** হোল সরল ত্রিমাত্রিক ছন্দের তাল। **দাদরা** নামে একপ্রকার গীতরীতি আছে যার সঙ্গে **দাদরা** তালের বিশেষ সম্পর্ক নেই। **খেমটা** তাল আড়িছন্দে প্রযুক্ত হলেই আড়খেমটা বলা হয়। এর গতি ধীর হয়, প্রাচীন বাংলাগানে এর অধিক ব্যবহার ছিল। গানগুলিও আড়িছন্দযুক্ত হোত। **কাশ্মিরী খেমটা** প্রায় **দাদরা**'র মতোই, শুধু দ্বিতীয় মাত্রার অক্ষর বাদ দেওয়ার জন্যই এর ভিন্নতা প্রকাশ পায়। কাশ্মিরের লোকসংগীতে ব্যবহৃত হোত বলেই নাকি এই নামকরণ হয়েছে।

পোস্ত্ ঃ ৫ মাত্রা। বিষমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ২।৩ ছন্দ। ফাঁক ক্রিয়া নেই।

I	তিন্	তাক্	ধিন্	ধা	গে	I
	+		২			

দ্বিতীয় প্রকার। ৭ মাত্রা। বিষমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ৩।২।২ ছন্দ। ফাঁক ক্রিয়া নেই।

I	তৃক	ধিন	-	ধা	ধা	তিন্	-	I
	+			২		৩		

তৃতীয় প্রকার। ৭ মাত্রা। বিষমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ৩।৪ ছন্দ। ফাঁক ক্রিয়া নেই।

I তিন - তাক | ধিন - ধা গে I
  +   ২

পোস্ত, বা **পোস্তা** শব্দটি পারস্য দেশীয়, এর অর্থ চারা গাছ বা লতা। এই তাল সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত। কেহ একে ২।৩ ছন্দ ও ৫ মাত্রাযুক্ত বলেন, আবার কেহ কেহ ৩।২।২ বা ৩।৪ ছন্দ ও ৭ মাত্রাযুক্ত বলেন। এই দুটি প্রকারই যথাক্রমে হিন্দুস্থানী সংগীতের **ঝাঁপতাল** ও **তেওরা** তালের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত।

বসন্ত: ৯ মাত্রা। সমপদী। একমাত্রিক।

I ধা | দেৎ | দেৎ | থুং | থুং | তিট | কতা | গদি | ঘেনে I
  + | ২ | ৩ | ৪ | ০ | ৫ | ০ | ৬ | ০

রুদ্রতাল: ১১ মাত্রা। সমপদী। একমাত্রিক।

I ধি | না | ধি | না | তি | তি | না | ক | ত্তা | ধি | না I
  + | ২ | ০ | ৩ | ৪ | ৫ | ০ | ৬ | ৭ | ৮ | '

মনিতাল: ১১ মাত্রা। বিষমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ফাঁক ক্রিয়া নেই।

I ধি ধি ট | তি ট | ধা কি ট | তা কি ট I
  + | ২ | ৩ | ৪

বসন্ত, রুদ্র, মনিতাল প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত তাল হলেও বর্তমান সংগীতে এগুলি প্রায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে।

বিক্রমতাল: ১২ মাত্রা। বিষমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ২।৩।৩।৪ ছন্দ।

I ধা - | ধি ত্তা - | ক - ত্তা | তিট কতা গদি ঘেনে I
  + | ২ | ০ | ৩

আড়াচৌতাল ঃ ১৪ মাত্রা। সমপদী। দ্বিমাত্রিক।

I ধিন্ তূকট | ধি না | তূ না | ক ত্তা | তূকট ধি | না ধি | ধি না I
+ | ২ | ০ | ৩ | ০ | ৪ | ০

ফরদোস্ত ঃ ১৪ মাত্রা। বিষমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ৪।৪।২।২।২ ছন্দ। ফাঁক ক্রিয়া নেই।

I ধিন্ ধিন্ ধা তূকট | তূ না ক ত্তা | ধাত্রে কেটধি |
+ | ২ | ৩

নাক ধাত্রে | কেটধি নাক I
৪ | ৫

ফরদোস্ত শব্দটি পারস্য দেশীয়। এটি আমীর খসরু রচিত এইরূপ কথিত আছে। প্রকৃতপক্ষে এর সঙ্গে আড়াচৌতালের বিশেষ পার্থক্য নেই।

গজঝম্পা ঃ ১৫ মাত্রা। বিষমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ৪।৪।৪।৩ ছন্দ।

I ধা ধিন্ নক তক | ধা ধিন্ নক তক |
+ | ২

ধিন নক তক তিট | কত্তা গদি ঘেনে I
০ | ৩

যতিশেখর ঃ ১৫ মাত্রা। বিষমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ১।২।২।১।১।২।১।১।২।২ ছন্দ। ফাঁক ক্রিয়া নেই।

I ধা | কৎ ধি | না তূক | ধি | ধি | না কৎ | ধাগে |
+ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭

নধা | তূক ধিনা | গদি ঘেনে I
৮ | ৯ | ১০

চিত্রাতাল ঃ ১৫ মাত্রা। বিষমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ২।৩।৪।৪।২ ছন্দ।

I ধি না | ধি ধি না | তূ না কৎ তা | তূক ধি না ধি | ধি না I
+ | ২ | ৩ | ৪ | ০

বিক্রম, গজঝম্পা, ষতিশেখর, চিত্রা প্রভৃতি তালের উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এগুলি প্রায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে।

শিখরতাল: ১৭ মাত্রা। বিষমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ৬।৬।২।৩ ছন্দ। ফাঁক ক্রিয়া নেই।

I ধা তৃক ধিন নক থুং গা | ধিন নক ধূম কিট কৎ ধেৎ
+ | ২

ধা কিট | কতা গদি ঘেনে I
৩ | ৪

বিষ্ণুতাল: ১৭ মাত্রা। বিষমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ২।৩।৪।৪।৪ ছন্দ।

I ধিন না | ধিন ধিন না | ধিন তৃক ধি না |
+ | ২ | ৩

ধিন ধিন না ধিন | ধি না ধি না I
৪ | ০

মত্ততাল: ১৮ মাত্রা। সমপদী। দ্বিমাত্রিক।

I ধা - | ঘি ড় | ন ক | ঘি ড় | ন ক | তি ট | ক তা | গ দি ঘে নে I
+ | ০ | ২ | ৩ | ০ | ৪ | ৫ | ৬ ০

লক্ষ্মীতাল: ১৮ মাত্রা। সমপদী। একমাত্রিক।

I ধিন | তেৎ | ধেৎ | ধেৎ | দিন | তা | তিট | কতা | ধা | দিন | তা ধূম
+ | ২ | ৩ | ০ | ৪ | ৫ | ৬ | ০ | ৭ | ৮ | ১০

কিট | ধূম | কিট | কৎ | গদি | ঘেনে I
১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ০

গণেশতাল: ২১ মাত্রা। বিষমপদী। মিশ্রমাত্রিক। ৪।১।৪।১।১।৪।১।১।১।৩ ছন্দ। ফাঁক ক্রিয়া নেই।

I ধা তা দিন তা | কৎ | তিট ধা দিন তা | কৎ | তিট | ধা ধাগে দিন তা
+ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬

ধাগে | তা | তিট | কতা গদি ঘেনে I
৭ | ৮ | ৯ | ১০

ব্রহ্মতাল ঃ ২৮ মাত্রা। সমপদী। দ্বিমাত্রিক। (এই তালের ছন্দবিভাগ সম্পর্কে মতভেদ আছে)।

ধা ধিন্	ধিন্ ধা	তূক ধিন্	ধিন্ ধা	তি তি	না তি	তি না
+	০	২	৩	০	৪	৫

তি না	তু না	ক ত্তা	ধি না	ধাগে নধা	তূক ধি	গদি ঘেনে
৬	০	৭	৮	৯	১০	০

শিখর, বিষ্ণু, মত্ত, লক্ষী, গণেশ, ব্রহ্মা প্রভৃতি তালের উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এগুলি প্রায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে।

কীর্তনাঙ্গ তাল বিবরণ ঃ বাংলাদেশের প্রাচীন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংগীত কীর্তনের তালপদ্ধতি অত্যন্ত প্রণালীবদ্ধ, বিস্তৃত এবং প্রাচীনত্বের আভাসযুক্ত। এর প্রতিটি তাল বিলম্বিতাদি তিনটি লয়ে প্রযুক্ত হয়। তবে 'কাটা' নামে আর একটি শ্রেণীও আছে। যার বৈশিষ্ট্য হোল মাত্রাবিভাগগুলি কাটা কাটা; অর্থাৎ অন্যান্য লয়ের তুলনায় বাণীর প্রাধান্য কিঞ্চিত বেশী এবং প্রতিটি মাত্রাই বিশেষ ছন্দযুক্ত হয়ে থাকে। এছাডা মাত্রা বিশেষের কিঞ্চিত আড়ি ভাবও প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে কাটা দশকোশী, কাটা তেওট, কাটা ধরা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দ্রুতলয়কে 'ছোট' মধ্যলয়কে 'মধ্যম' এবং বিলম্বিতলয়কে 'বড়ো' তাল বলা হয়। এই লয়ভেদানুসারে মাত্রাসংখ্যারও পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন, দশকোশী তালটি দ্রুতলয়ে হলে ৭ মাত্রাযুক্ত 'ছোটদশকোশী', মধ্যলয়ে হলে ১৪ মাত্রাযুক্ত 'মধ্যদশকোশী' এবং বিলম্বিতলয়ে হলে ২৮ মাত্রাযুক্ত 'বড়ো-দশকোশী' নামে পরিচিত হয়। এছাড়া প্রায় সবগুলি তালই লঘু ও গুরু এই দুটি কলাযুক্ত বাণী সহযোগে পরিবেশিত হয়। অর্থাৎ দুটি আবর্তনের প্রথমটি 'গুরু' এবং দ্বিতীয়টি 'লঘু' বাণীযুক্ত হয়ে থাকে। তালাবর্তনের মাত্রাসংখ্যা অনুযায়ী তালগুলির জাতি নির্ণীত হয়। যেমন ৭ মাত্রা বিশিষ্ট তালকে সপ্তমমাত্রিক, ৮ মাত্রা বিশিষ্ট তালকে অষ্টমমাত্রিক ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে তালাঘাত ও ফাঁকের সঙ্গে 'কোশী' ও 'কাল' নামে আরও দুটি ক্রিয়ার প্রচলন আছে। এগুলি বিশেষ রীতি ও মুদ্রা সহযোগে প্রদর্শিত হয়, যেমন, তালাঘাত

স্থানে আঘাত করে, ফাঁক ও কোশী অনাঘাত করে এবং ফাঁক প্রদর্শণের পরবর্তী ক্রিয়ার জন্য হাত তুলে কাল ক্রিয়াটি প্রদর্শিত হয়। ফাঁক এবং কোশী এই দুটি অনাঘাত ক্রিয়ার পার্থক্য হোল, ছন্দটি যখন অঙ্গের অনুভাবক ক্রিয়া হয় তখন 'ফাঁক' এবং যখন মাত্রার সমতা রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয় তখন 'কোশী' বলা হয়। এই পদ্ধতিতে দুই প্রকার তালাঘাত আছে, 'জোড়া' ও 'ছুটা'। তাল বা ছন্দের ২।৪ অথবা ৪।৬ মাত্রার ব্যবধানের তালাঘাতকে জোড়া এবং অন্যান্য তালাঘাতকে ছুটা বলে। এই পদ্ধতিতে 'মূর্ছন' নামে একটি বিশেষ রীতি আছে। কীর্তন গানের শেষে তেহাই সহযোগে সমাপ্তির ঘোষনা করা হয় না; তার বদলে যে বিশেষ বোল/বাণীর প্রয়োগ করা হয় তাকে মূর্ছন বলে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি পদের শেষে বিবিধ আখর সংযোজন করে গায়ক যখন পদাবৃত্তি করেন তখন বাদক বিভিন্ন 'লহর', 'ঘাত' এবং 'মাতন' বাজিয়ে থাকেন। উক্ত ঘাত বা মাতন ক্রিয়ার পরে সাধারণত মূর্ছন বাজানো হয়। মনে রাখতে হবে যে, মূর্ছন সর্বদা একবারমাত্র বাজবে, এবং তার পরেই গায়ক পদান্তরে গমন করবেন।

অনেক সময়ে কীর্ত্তন গানে বিলম্বিত তথা মধ্যলয়ের তালে মাত্রার গতি সমান থাকে না, কারণ গানের ভাব ও রস তথা শিল্পীর মেজাজ অনুসারে এই ব্যতিক্রম প্রকাশিত হয়। এই প্রক্রিয়া প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। কারণ পরম ভক্ত শ্রীচৈতন্যদেব "দীনদয়াদ্রনাথ" গান আস্বাদন করার সময়ে 'ওই দীন', 'ওই দীন' বলে ভাবাবেশে বারবার উচ্চারণ করেছিলেন। সেই ভাবাবেশযুক্ত উচ্চারণে মাত্রার গতি কিঞ্চিত বিন্যস্ত হতে পারে। যার থেকে এই প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়েছে। অবশ্য এবিষয়ে সাংগীতিক-যুক্তিতে, অনেকে আপত্তি করে থাকেন।

কীর্তনাঙ্গ তালে 'যতি' প্রয়োগ একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যেমন বড়দশকোশী তালে গোবিন্দদাসের প্রসিদ্ধ "কালিয়াদমন দিনমাহ" গানে ঝুমরা বাদ্য প্রযুক্ত হয়। এই গানখানিতে নির্ধারিত ১৮টি 'কাটান' আছে প্রথমে বিলম্বিত এবং ক্রমে মধ্য তথা দ্রুত গতিতে এই সংগীত ক্রিয়া হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রাচীন 'যতি' বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ প্রাচীন যতি বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র কীর্তন গানেই এখনও প্রচলিত আছে। তবে উক্ত গানের শিল্পী বর্তমানে বিরল।

কীর্তন গানে প্রযুক্ত তালের মধ্যে অষ্টতাল নামে একটি তাল আছে, যা একপ্রকার তালগুম্ফন। জয়দেব বিরচিত প্রসিদ্ধ "প্রবন্ধ" 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' পদখানি এই তালে গাওয়া হয়। এই তালের বৈশিষ্ট্য হোল এই যে, এতে ক্রমানুসারে ৮টি তালের একবার করে 'লওয়া' বাজানো হয়। ওই ৮টি তাল হোল আড়, দোজ, যতি, শশীশেখর, গঞ্জন, পঞ্চম, রূপক ও সোমতাল। তালগুলির লয় ও বাদ্য দ্রুত তথা নির্ধারিত থাকে। অনুরূপ তালগুম্ফন-রীতি প্রাচীন তালশাস্ত্রে বহু বিচিত্ররূপে পাওয়া যায়। যেমন, রুদ্র তালে ১১টি তালের গুম্ফন (সমন্বয়), ইন্দ্রতালে ৬টি, ব্রহ্মতালে ৪টি, চতুর্দশতালে ১৪টি তালের গুম্ফন. ইত্যাদি।

শ্রীখোল ও কীর্তন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের পরিচয়

আখর বা অক্ষর : মূল কীর্তনগান থেকে মূল ভাবানুসারে যথোচিত রস সহযোগে, সহজ ও সরল যে শব্দ কয়টি সুর-তাল সহযোগে উচ্চারিত হয়, তাকে আখর বা অক্ষর বলে। এই আখর এবং রাগসংগীতের তানকে সমপর্যায়-ভুক্ত বলা যায়।

খোলাবাদ্য ঃ হাত সাধারণ অবস্থায় রেখে খোলা (জোরে) আঘাত করে খোল বাজানোকে খোলাবাদ্য বলে। ইহা খোলাবাদ্য ও নামমালাবাদ্য ভেদে দুই প্রকার। উভয় প্রকার বাদ্যই হাতটিতে, নামকীর্তনে এবং হাত, ঘাত, পরণ প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

গুপাবাদ্য ঃ এর অপর নাম টুকীবাদ্য। খোলা গুপা এবং চাপা গুপা ভেদে গুপাবাদ্য দুই প্রকার। এর বাদন প্রণালী যথেষ্ট সাধনা সাপেক্ষ।

হাতটি : কীর্তন গানের সূচনায় মহাপ্রভুর আগমনসূচক এবং শ্রোতৃ-মণ্ডলীর চিত্তবিনোদনের জন্য সুমধুর ও সুললিত ছন্দে শ্রীখোল ও করতাল সহযোগে যে বাদ্য বাজানো হয় তাকে হাতটি বাদ্য বলে।

লয়বাদ্য ঃ তাল-মাত্রাদি সহযোগে মূল গানের অনুগামী যে সঙ্গত করা হয় তাকে ঠেকা বা লয়বাদ্য বলে।

কাটান ঃ বড় মূলগান থেকে সুর তালযুক্ত যে অংশ আখর হিসাবে কেটে নিয়ে গাওয়া হয় তাকে গানের কাটান বলে।

হাত ও ঘাত : কীর্তন গানের আখর বা কাটান সাধারণতঃ দুই বা ততোধিক স্তরে বিকশিত থাকে। শেষ স্তরের আখর বা কাটানের সঙ্গে প্রথমে খোলা হাতে সহজ ও সরল ছন্দবিশিষ্ট যে বাদ্য বাজানো হয় তাকে হাতবাদ্য বলে। কয়েকবার হাতবাদ্য বাজানোর পরে নানাবিধ সুললিত ছন্দ ও লয় বিশিষ্ট যে খোলাহাতের বাদ্য বাজানো হয় তাকে ঘাতবাদ্য বলে।

লহর : লহর একজাতীয় টুকীবাদ্য। যা বহু বিচিত্র ছন্দ ও লয়যুক্ত হয়ে থাকে। শ্রীখোলের বাঁযাতে গুপা এবং ডানেতে আঙুল সহযোগে, লয়-বাদ্যের পরে, আখর বা কাটানের সঙ্গে লহর বাজানো হয়।

মাতান বা ভাঙ্গতি : হাত, ঘাত, লপ্টান প্রভৃতি বাদ্যের পরে দেভী ছন্দবিশিষ্ট সুমধুর তথা নৃত্যোব ভাব প্রকাশক বাদ্যকে মাতান বা ভাঙ্গতি বাদ্য বলে।

লপ্টান বা প্যাঁচ : গানের আখর বা কাটানের সঙ্গে প্রণালীবদ্ধভাবে নানাবিধ ছন্দ ও লয় বিশিষ্ট হাত-ঘুরানো বাদ্যকে লপ্টান বা প্যাঁচ বাদ্য বলে। পূর্বে এর বহুল প্রচলন ছিল।

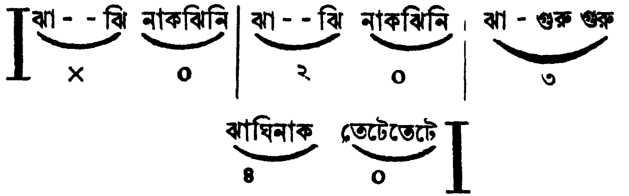
মূর্ছন বা মান : হাত, ঘাত, লপ্টান, মাতান প্রভৃতি কয়েকবার বাজানোর পরে নানাবিধ ছন্দ ও লয় বিশিষ্ট যে বাদ্য বাজানো হয় তাকে মূর্ছন বা মানবাদ্য বলে।

কীর্তনাঙ্গ প্রায় সব তালগুলিই লঘু গুরু এবং গতিভেদ বৈচিত্র্য অনুসারে বিস্তৃত। এখানে 'দশকোশী' তালটি বিভিন্ন গতি ও লঘু, গুরু বাণী সহযোগে দেওয়া হোল এবং অন্যান্য তালগুলির কেবলমাত্র লঘু বাণী ও 'ছোট' গতিযুক্ত বিবরণ দেওয়া হোল।

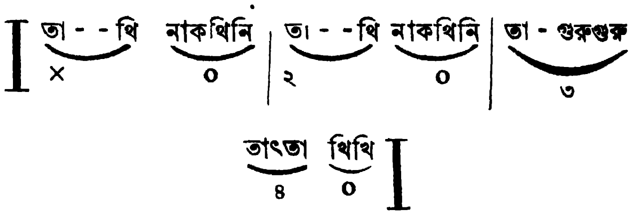
তাল চিহ্ন : সম — ×, কোশী বা ফাঁক—0, কাল—০ অন্যান্য তালচিহ্ন—২, ৩, ৪ ইত্যাদি।

ছোট দশকোশী : ৭ মাত্রা। ১ জোড়াতালী। ২ ছুটাতালী। ৩ ফাঁক ২।২।১।২ ছন্দবিভাগ।

গুরু লওয়া :

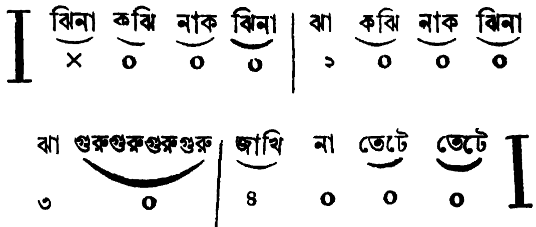


লঘু লওয়া :

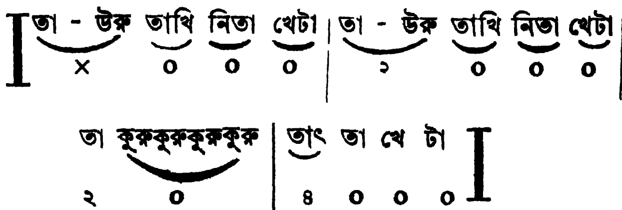


মধ্যম দশকোশী : ১৪ মাত্রা। ১ জোড়াতালী। ২ ছুটাতালী। ১০ কোশী। ৪।৪।২।৪ ছন্দবিভাগ।

গুরু লওয়া :



লঘু লওয়া :



বড় দশকোশী : ২৮ মাত্রা। ১ জোড়াতালী। ২ ছুটাতালী। ১০ কোশী ১৪ কাল। ৮।৮।৪।৮ ছন্দবিভাগ।

গুরু লওয়া :

I ঝাথি তাথি ঝাথি ঝাথি তাথি ঝাথি ঝাথি ঝাথি |
× ০ O ০ O ০ O ০

ঝাথি তাথি ঝাথি ঝাথি তাথি ঝাতা ঝাঝা ঝাঝা |
২ ০ O ০ O ০ O ০

ঝাতা তাতা থিথি গুরুগুরুগুরুগুরু | ঝাথি তা তিন দা
৩ ০ O ০ | ৪ ০ O ০

তিন দা থিথি তাথি I
O ০ O ০

লঘু লওয়া :

I তা - তিন দা তিন দা থিথি তাথি | তা - তিন দা তিন দা থিথি তাথি |
× ০ O ০ O ০ O ০ | ২ ০ O ০ O ০ O ০

তাতা তাতা থিথি গুরুগুরুগুরুগুরু | তা - তিন দা তিন দা থিথি তাথি I
৩ ০ O ০ | ৪ ০ O ০ O ০ O ০

ছোট দাসপ্যারী : ৪ মাত্রা। ২ তালী। ২ কাল। ২।২ ছন্দবিভাগ।

I ধাঘি নেতা | নাগ দিধা I
× ০ | ২ ০

ছোট লোফা : ৬ মাত্রা। ১ তালী। ৪ কাল। ৩।৩ ছন্দবিভাগ।

I তা ক তে | তা থি টি I
× ০ O | O ০ ০

ছোট রূপক : ৬ মাত্রা। ১ জোড়াতালী। ১ কোশী। ২।৪ ছন্দ-বিভাগ।

I তিনি থিটি | নাক থিনি থেই য়া I
× | ২ ০

ঝুঝ'টি তাল : ৬ মাত্রা। ১ তালী। ১ ফাঁক।

I - - ঝি না গুরু গুরু I
× ০

ছোট তেওট : ৭ মাত্রা। ৩ তালী। ৩ ফাঁক। ১ কাল। ৩।২।২ ছন্দবিভাগ।

I ঝা ঝা - | দিঘি দাঘি | নিতা খেটা I
× ০ ॰ | ২ ০ | ৩ ০

চঞ্চুপুট তাল : ৮ মাত্রা। ২ তালী। ২ ফাঁক। ৪।৪ ছন্দবিভাগ

I দা ঘি নি তা | - ধি ধি গুরুগুরু I
× ০ | ২ ০

নন্দন তাল : ৮ মাত্রা। ২ তালী। ২ ফাঁক। ৪।৪ ছন্দবিভাগ।

I গেন্ধা -ঘি নেদা ঘি | গেন্ধা -গি নেতা থি I
× ০ | ২ ০

ঝাঁতি তাল : ৮ মাত্রা। ২ তালী। ২ ফাঁক। ৪।৪ ছন্দবিভাগ।

I ধিন তা - থি | - ধা গে ধা I
× ॰ | ২ ০

ঝাঁতিতালের অপর নাম ছোট একতালী, যার মাত্রা সংখ্যা ৭। একতালীতে একটি তালাঘাত দুটি অঙ্গ (৪+৩=৭)। এই তাল অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন বলে এই ৭ মাত্রা অনেক ক্ষেত্রে কিঞ্চিত বিন্যস্ত হয়ে ৮ মাত্রার মতো মনে হতে পারে। যাকে ভুল বলা যায় না।

ছোট আড়তাল : ১০ মাত্রা। ১ জোড়াতালী। ১ ছুটাতালী। ২ কোশী। ৫ কাল। ৪।২।৪ ছন্দবিভাগ।

| তা -থি নাক থিনি | তা গুরুগুরু | তাং তা থি থি |
| × ০ ০ ০ | ২ ০ | ৩ ০ ০ ০ |

জোজতাল : ১২ মাত্রা। ৩ তালী। ৬ কাল। ৪।৪।৪ ছন্দবিভাগ।

| তা তিনি তা তা | - - থিটি তাথি | তা - - গুরুগুরু |
| × ০ ০ ০ | ২ ০ ০ ০ | ৩ ০ ০ ০ |

ছোট দোঠুকী : ১৪ মাত্রা। ২ তালী। ২ ফাঁক। ৪ কাল। ৩।৪।৩।৪ ছন্দবিভাগ।

| ঝা তে টে | তা - তে টে | তা থি টি | তা - গুরুগুরু গুরুগুরু |
| × ০ | ২ ০ | ০ ০ | ০ ০ |

টানাদশকোশী : ১৪ মাত্রা। ১ জোড়াতালী। ২ ছুটাতালী। ১০ কোশী ৪।৪।২।৪ ছন্দবিভাগ।

| তেটেথিটিনাকধা- থিথিতা- তেটেতা- তেটেতা- | তেটেথিটিনাকধা- থিথিতা-
× ০ ০ ০ | ২ ০

থিউরজাঝি - -জাঝি- | ঝা - থিথি -গুরুগুরু |
০ ০ | ৩ ০

জাথি তেটেতা - গেদাগেদা গেদাঘি |
৪ ০ ০ ০

ধরাতাল : ১৬ মাত্রা। ৪ তালী। ৪ কোশী। ৮ কাল। ৪।৪।৪।৪ ছন্দবিভাগ।

| ঝা থি - গুরুগুরু | ঝা - ঝা - | ঝি নি তা থি | তা - থি থি |
| × ০ ০ ০ | ২ ০ ০ ০ | ৩ ০ ০ ০ | ৪ ০ ০ ০ |

ধরাতালের সমস্থানকে কোন কোন মতে চতুর্থ তাল বলা হয়েছে। তেওট তালে ও অনুরূপ মতভেদ আছে।

কাটাধরা তাল: ১৬ মাত্রা। ৪ তালী। ৪ কোশী। ৮ কাল। ৪।৪।৪।৪ ছন্দবিভাগ।

I ধেন দাগ গেদা ঘিনি | তা - উরুঝি - নাক ঝিনি |
× ० ০ ० | ২ ० ० ০ ० |

- তেটে তেটে তেটে | তা খিখি - গুরুগুরুগুরুগুরু I
৩ ० ০ ० | ৪ ० ০ ० I

মদনদোলা: ২২ মাত্রা। ৭ তালী। ১৫ কোশী। ২।৪।৪।২।৪।২।৪ ছন্দ।

I ঝাখি গুরুগুরুগুরুগুরু | জাখি না দিদ্বা ঘেনা | ঝা ঝা দিদ্বা দিদ্বা |
× ০ | ২ ০ ০ ০ | ৩ ০ ০ ০ |

ঝা গুরুগুরুগুরুগুরু | জাখি না দিদ্বা ঘেনা |
৪ ০ | ৫ ০ ০ ০ |

ঝা গুরুগুরুগুরুগুরু | জাখি না তেটে খিটি I
৬ ০ | ৭ ০ ০ ০ I

ইন্দ্রভাষ তাল: ২৬ মাত্রা। ৮ তালী। ৫ কোশী। ১৩ কাল। ৪।৪।২।৪।২।৪।২।৪ ছন্দবিভাগ।

I তা - গুরুগুরু তাখি নেতা খিটি | তা - গুরুগুরু তাখি নেতা খিটি |
× ० ০ ० | ২ ० ০ ० |

তাখি গুরুগুরু | তাৎ তা তেটে তেটে | তাখি গুরুগুরু |
৩ ० | ৪ ० ০ ० | ৫ ० |

তাৎ তা তেটে তেটে | তাখি গুরুগুরু | তাৎ তা খিখি তাখি I
৬ ० ০ ० | ৭ ० | ৮ ० ০ ० I

বিষমপঞ্চম তাল ঃ ৩২ মাত্রা। ৫ তালী। ১১ কোশী। ১৬ কাল। ৪।৮।৮।৪।৮ ছন্দবিভাগ।

I তাতা তাতা থিথি গুরুগুরু | তা - তি নি তেন দা থিথি তাথি
× • ০ ০ | ২ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ •

তা - তি নি তেন দা থিথি তাথি | তাতা তাতা - গুরুগুরু |
৩ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ৪ ০ ০ ০ |

তা - তি নি তেন দা থিথি তাথি I
৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ I

গঞ্জন তাল ঃ ৩২ মাত্রা। ৪ তালী। ১২ কোশী। ১৬ কাল। ৮।৮।৮।৮ ছন্দবিভাগ।

I তা - তি নি তেন দা থি টি | তা - তি নি তেন দা থি টি |
× ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ২ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ |

তা - তা - - গুরুগুরু তি নি থি টি |
৩ ০ ০ ০ ০ ০ ০ |

তা - তা - থি থি গুরুগুরু গুরুগুরু I
৪ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ I

বীরবিক্রম তাল ঃ ৩৬ মাত্রা। ১ জোড়াতালী। ৩ ছুটাতালী। ৩ তালী ১৩ কোশী। ১৮ কাল। ৮।৮।৮।৪।৮ ছন্দবিভাগ।

I ঝা তা ঝা ঝা তা ঝা ঝা ঝা | ঝা তা ঝা ঝা তা ঝা ঝা ঝা |
× ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ২ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ |

ঝা - ঝা - ঝেন দা থি টি | ঝাতা তাতা - গুরুগুরু |
৩ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ৪ ০ ০ ০ |

ঝাথি তা তি নি তেন দা থি টি I
৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ I

শশীশেখর তাল: ৪৪ মাত্রা। ৬ তালী। ১৬ কোশী। ২২ কাল। ৮।৮।৪।৮।৮।৮ ছন্দবিভাগ।

I	ঝা	তা	ঝা	ঝা	তা	ঝা	ঝা	ঝা	|	ঝা	তা	ঝা	ঝা	তা	ঝা	ঝা	ঝা |
	×	০	O	০	O	০	O	০	|	২	০	O	০	O	০	O	০ |

ধেই	যা	গুরুগুরু	গুরুগুরু	|	ঝা	-	তি	নি	তিন	দা	থি	টি |
৩	০	O	০	|	৪	০	O	০	O	০	O	০ |

তা	-	তি	নি	তিন	দা	থি	টি	|	তা	-	তা	-	তা	-	থিথি	তাথি I
৫	০	O	০	O	০	O	০	|	৬	০	O	০	O	০	O	০ I

মৈ-তৈ তাল বিবরণ: মণিপুরে প্রচলিত তাল পদ্ধতিকে মৈ তৈ তাল বলে। প্রাচীন মণিপুরী সংগীতে 'কামরূপী তাল' নামে রুদ্র, গনেশ, নবগ্রহ, গন্ধব, বরপুট, থরপুট, বিদ্যাধর, ছুটা, লেহযতি, থরযতি বা থরপরি, যতিমান বা মাঠপরি, থামার, জিকিরী, একতালী প্রভৃতি তালের প্রচলন ছিল। কালক্রমে এই তালগুলি অপ্রচলিত হযে পডে। বর্তমানে সেখানে রূপক, ত্রিপুট, তাজ্জাউ, রাজমেল, তানচপ, মেনকুপ, স্বরফাঁক (রূপককাঁটা), অচৌবা (বড়ত্রিতাল) ঝম্পা প্রভৃতি প্রচলিত।

এই তাল পদ্ধতিতে তালাঘাত, অনাঘাত প্রভৃতি প্রদর্শনের রীতি বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। যেমন, তালাঘাত ডান হাতে হলে 'যেৎ' এবং বাঁ হাতে হলে 'ওই' বলা হয়। প্রতিটি ছন্দবিভাগেই তালাঘাত হয। 'ফাঁক', 'ওই' প্রভৃতি ক্রিয়া শুধু সমতা রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়। সম-আঘাত সবদা ডান হাতে এবং অন্যান্ত তালাঘাতগুলিতে দুটি হাতই সুবিধানুযায়ী ব্যবহৃত হয়। তালাঘাত ক্রিয়ার আর একটি বিশেষত্ব হোল এই যে, তিনটি তালাঘাতযুক্ত তালের প্রথম ও দ্বিতীয় তালাঘাতটি ডান হাতে এবং তৃতীয়টি বাঁ হাতে হয়। কিন্তু চারটি তালাঘাতযুক্ত তালের প্রথম ও তৃতীয়টি ডান হাতে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থটি বাঁ হাতে হয়। আবার একটিমাত্র তালাঘাতযুক্ত তালে ডান হাতে তালাঘাতের পরে মধ্যস্থানে সমতা রক্ষার্থে বাঁ হাতে স্বল্প তালাঘাত করা হয়।

এই পদ্ধতিতে কোন কোন তালাবর্তন কীর্তনেব মতো তিনবার বাজানোর রীতি আছে, যেমন, 'রাজমেল' তালটি তিনবার বাজিয়ে ২১ মাত্রার পূর্ণাবর্তন করা হয়, তখন এই তালের গতি হয় বিলম্বিত লয়ে। কর্ণাটক তাল-পদ্ধতির সঙ্গেও এর কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। কারণ কর্ণাটক পদ্ধতির মতোই এর তিস্র ও চতস্র জাতিভেদানুসারে তাল বিস্তার করা হয়। যেমন, তিস্র জাতিতে ত্রিপুট তালটি ৩।২।২ মাত্রার, আবার চতস্র জাতিতে তা ৪।২।২ মাত্রার ছন্দ বিভাগ হয়। তবে এর মূলগত নিয়মে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

প্রাচীন দেশী তালপদ্ধতির অনুসরণে এর মাত্রার সংখ্যা, নাম প্রভৃতি নিশ্চিত করা হয়েছে। যেমন,

অনুদ্রুত	১	অক্ষর	$\frac{১}{৪}$ মাত্রা
দ্রুত	২	,,	$\frac{১}{২}$,,
দবিরাম	৩	,,	$\frac{৩}{৪}$,,
লঘু	৪	,,	১ ,,
লবিরাম	৬	,,	১$\frac{১}{২}$,,
গুরু	৮	,,	২ ,,
প্লুত	১২	,,	৩ ,,

এই পদ্ধতির তাদের প্রসঙ্গে যে শব্দগুলি প্রচলিত সেগুলি এইরূপ :—

তালাঘাত	—	তান্থা।	বিলম্বিত	—	অতপ্পা।
ফাঁক	—	থৎহাই।	মধ্যলয়	—	ময়ায়।
মাত্রা	—	মাত্রা।	দ্রুতলয়	—	অনুবা।
সমাঘাত	—	তানকোক।	অতিবিলম্বিত	—	য়াম্নাতপ্পা।
২য় তালাঘাত	—	অনিশুবা।	আবর্তন	—	কোয়চা।
৩য় তালাঘাত	—	অনুমশুবা।	ঠেকা	—	মপুং।
৪র্থ তালাঘাত	—	মরিশুবা।	অতীত	—	হাইগত পদলোবা
			অনাগত	—	অনুগত।

মণিপুরী সংগীতে সাধারণত শ্রীখোল বা মাদল বাদ্যযন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে তবলার ব্যবহারও কদাচিৎ দেখা যায়।

মৈ তৈ পদ্ধতির মূল তালগুলির বিবরণ একটিমাত্র জাতিভেদ অনুসারে অতঃপর দেওয়া হোল।

তানচপ : ৪ মাত্রা। চতস্রজাতি। ২ আবর্তন। সমপদী।

I ধিন - খর খর | তা ঘিন ঘিন তা I
+ | +

মেনকুপ : ৬ মাত্রা। তিস্রজাতি। ২ আবর্তন। সমপদী।

I ধিন - তেন | তা ঘিন থেই | তা খিতা থেন | তা থেন তা I
+ | ২ | + | ২

উপরোক্ত তাল দুটিকে মণিপুরে শাস্ত্রীয় 'একতাল'ও বলা হয়। ('তানচপ'কে চতস্রজাতির এবং 'মেনকুপ'কে তিস্রজাতির একতাল বলা হয়)।

রূপক : ৬ মাত্রা। মিশ্রজাতি। বিষমপদী।

I ধিন ধিন্নগ্র | ধিন তেন্তা থেন তাংঘিন I
+ | ২

ত্রিপুট : ৮ মাত্রা। চতস্রজাতি। বিষমপদী।

I ধিন তেন - তা | খিৎ তা | দেন তা I
+ | ২ | ৩

তিস্র জাতিতে এই তালটি ৭ মাত্রা এবং ৩।২।২ চন্দযুক্ত হয়।

রূপককাঁটা : ১০ মাত্রা। মিশ্রজাতি। বিষমপদী।

I ধিন ধিন্নগ্র | ধিন তেন্তা তেন্তা তেন্তা | থেন - - ত্রগ্র I
+ | ২ ০ | ৩ ০

এই তালটিকে মণিপুরে 'সুরফাঁক' এবং শাস্ত্রীয় 'কলিঙ্গ মঠ' তালও বলা হয়। (চার মাত্রার মধ্যে সাম্য রক্ষার জন্য একটি করে 'ফাঁক' প্রদর্শনের রীতি আছে)।

রাজমেল / ভুষণা : ৭ মাত্রা। মিশ্রজাতি। ৩ আবর্তন। বিষমপদী।

| ধিন - থেন - | ধিন থেন - | ধিন - থেন - |
| + | ২ | + |

| ধিন ধিন - | তেন - তা - | খিৎ ঘিন্ন থর |
| ২ | + | ২ |

এই তালটিকে মণিপুরে কীর্তনাঙ্গ 'লোফা' তাল এবং শাস্ত্রীয় 'রথ্যা' তালও বলা হয়। সাধারণত এই তালটি বিলম্বিত লয়ে পরিবেশিত হয়।

তাঙ্গাউ : ১৪ মাত্রা। চতস্রজাতি। দুই আবর্তন। বিষমপদী।

| ধিন ভ্রভ্র | ধিন - থেন তা | তা থেন - থেন ¦ তা - - খুখু |
| + | ২ | ৩ ¦ ৪ |

| তা - | তা - থেন তা | তা থেন - থেন ¦ তা - - ভ্রভ্র |
| + | ২ | ৩ ¦ ৪ |

এই তালটিকে মণিপুরে শাস্ত্রীয় 'বর্ণযতি' ও 'সঞ্চয়' তালও বলা হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গীতরীতি প্রসঙ্গ

ধ্রুপদ ঃ ভারতবর্ষের এক অতি প্রাচীন গীতরীতি হোল ধ্রুপদ। এই শব্দটি ধ্রুবা, ধ্রুবপদ ইত্যাদির বিবর্তিত রূপ। ধ্রুব অর্থে স্থির এবং পদ অর্থে এখানে গানের ভাষা। এর সাংগীতিক সংজ্ঞা হোল—যে গানের পুনরাবৃত্তিকালে স্বর ও শব্দসমূহ তাল স্থান-ভ্রষ্ট হয়না তাকে ধ্রুপদ বলে। ভারতের যাবতীয় গীতরীতির মধ্যে এর স্থান ও সম্মান সর্বোচ্চ ভাগে। ধ্রুবা, প্রবন্ধ প্রভৃতিকে এর পূর্ববর্তী রূপ বলা যায়। প্রবন্ধ গানের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন তাল ব্যবহৃত হোত।

মধ্যযুগে ধ্রুপদ গায়কদের বলা হোত কলাবন্ত। ধ্রুপদ গান তখন চরম উৎকর্ষলাভ করেছিল। প্রসঙ্গত গোপাল নায়ক, হরিদাসস্বামী, বৈজু, তানসেন, যদুভট্ট প্রমুখ প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ-রচয়িতা ও গায়কগণ উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে যে, বর্তমানে প্রচলিত ধ্রুপদ গীতরীতির প্রচলন করেন বৈজু এবং তানসেন প্রমুখেরা এর নানাভাবে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন।

ধ্রুপদ বিশুদ্ধ রাগে রচিত হয়। এর প্রকৃতি গম্ভীর, গতি ধীর, স্থির ও অচঞ্চল এবং শৃঙ্গার, বীর, ভক্তি বা শান্ত রসযুক্ত হয়। আধ্যাত্মিক উপাসনা প্রকৃতির বর্ণনা, রাজার গুণগান প্রভৃতি এর রচনার বিষয়বস্তু। সাধারণতঃ এর চারটি তুক বা ধাতু (বর্ণ বা অংশ) থাকে। দুটি অংশযুক্ত ধ্রুপদও কদাচিৎ দেখা যায়। এতে মীড়; গমক প্রভৃতি অলংকারাদির প্রয়োগ হয় কিন্তু তান প্রয়োগ হয় না। সম, অতীত, অনাগত প্রভৃতি গ্রহভেদ তথা দুগুণ, চৌগুণ প্রভৃতি লয়কারী (বাটোয়ারা) সহযোগে এই গান অত্যন্ত বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়। এতে চৌতাল, সুরফাঁক, ঝাঁপতাল, তেওরা, ব্রহ্ম, রুদ্র প্রভৃতি তাল ব্যবহৃত তথা মৃদঙ্গ (পাখোয়াজ) সহযোগে গীত হয়।

ধ্রুপদ গায়কদের গায়নবৈশিষ্ট্য অনুসারে ধ্রুপদ গানের চারটি শ্রেণীবিভাগ (ঘরাণা) প্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে হাকিম মহম্মদ ইমাম তাঁর 'মাদহুল মৌসিকী' গ্রন্থে বলেছেন যে, বাদশাহ আকবরের দরবারে সংগীতের চারজন মহাগুণী ছিলেন। ১। তানসেন, ২। রাজা সমোখন সিংহ, ৩। রাজা ব্রজচন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং ৪। শ্রীচন্দ্র রাজপুত। এঁদের গায়নবৈশিষ্ট্য থেকেই নাকি এই চারটি শ্রেণীর (বাণী) উৎপত্তি। এই শ্রেণীগুলির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :—

১। তানসেন। গোবরহারবাণী (শুদ্ধবাণী), ধীর ও শান্ত প্রকৃতির গান।

২। রাজা সমোখন সিংহ। বীণকার। খণ্ডারবাণী। ইনি খণ্ডার নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। এর সংগীত ছিল তীব্ররস প্রধান, চঞ্চল, বেগময়, ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

৩। রাজা ব্রজচন্দ্র ব্রাহ্মণ। ডাগুরবাণী। ইনি ডাগুর নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এঁর সংগীত ছিল সরল ও লালিত্যময়, গতি সহজ কিন্তু কঠিন স্বরবিন্যাস ও বিচিত্র কারুকার্যপূর্ণ।

৪। শ্রীচন্দ্র রাজপুত। নোহারবাণী। ইনি নোহার নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। এঁর গান ছিল জোরদার ও আশ্চর্য রসোদ্দীপক। দুই-তিনটি স্বর লংঘন করে স্বর প্রযোগ ছিল এঁর রচনাবৈশিষ্ট্য।

সংগীত পণ্ডিতেরা এই বাণীগুলিকে যথাক্রমে রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি ও সেবকের পদে অভিষিক্ত করে শ্রেণীভাগ করেছেন। প্রাচীন গ্রামরাগের অন্তর্গত শুদ্ধা, ভিন্না, বেসরা, গৌড়া প্রভৃতি থেকেই নাকি এই বাণীগুলির উৎপত্তি।

দুঃখের বিষয় বর্তমানকালে এই বাণী-বৈশিষ্ট্যগুলি লুপ্তপ্রায়। এমন কি ধ্রুপদ গানের প্রচলনও লোপ হতে চলেছে।

ধামার : ধামার একটি তালের নাম। রাধাকৃষ্ণের হোলিখেলার বর্ণনা-মূলক গান ধামার তালে গাওয়া হলে তাকে বলা হয় ধামার। ধ্রুপদের তুলনায় ধামার কিঞ্চিৎ লঘু প্রকৃতির এবং অধিক অলংকৃত হয়। এতে শৃঙ্গার রস তথা নওহার বাণীর প্রাধান্য বেশী। পূর্বে ধ্রুপদের পরে ধামার গাওয়ার

রীতি ছিল। এখনও ধ্রুপদের আসরেই এর স্থান এবং ধ্রুপদের পরেই এর সম্মান।

ধ্রুপদের মতো ধামার গায়কেরও উত্তম স্বর, তাল ও রাগ-জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ধ্রুপদের মতোই এতে মীড়, গমক, গ্রহ্‌ভেদ প্রভৃতি প্রয়োগ করা হয়। এ ছাড়া আড়, কুয়াড় প্রভৃতি কঠিন লয়কারী সহযোগে বিবিধ ছন্দ-বৈচিত্র্য প্রদর্শন এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। একে অনেকে খেয়াল, সাদরা প্রভৃতি গীতরীতির জনক বলে মনে করেন। ধামার গানের প্রসিদ্ধ রচয়িতা হিসাবে সদারঙ্গ, অদারঙ্গ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ধামার তাল ছাড়াও একপ্রকার হোরীগান প্রচলিত ছিল যা ঠুংরী অঙ্গে গাওয়া হোত। এগুলি ছিল হোলি বা বসন্ত ঋতুর বর্ণনামূলক। এতে যৎ, চাচর, দীপচন্দী প্রভৃতি তাল ব্যবহৃত হোত। অবশ্য এই তালগুলির সঙ্গে ধামার তালের মূলগত ঐক্য আছে। তবে লয়েব গতি ও তাল প্রয়োগ রীতি ভিন্ন। দুঃখের বিষয় ধ্রুপদের মতো ধামার গানও ক্রমে লোপ হতে চলেছে।

খেয়াল: খেয়াল একটি ফার্সী শব্দ। এর অর্থ কল্পনা বা বিচার। মধ্যযুগের প্রারম্ভে ধ্রুপদের নিয়মাবলী লংঘন করে বিবিধ অলংকারাদি সহযোগে ধ্রুপদ গাওয়ার প্রচলন হয়। সেই যথেচ্ছাচারিতার জন্য এর নামকরণ হয় খেয়াল। শোনা যায় বিখ্যাত আমীর খুসরো এই গীতরীতির প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে এই গীতরীতি, বিলম্বিত বা বড়োখেয়াল এবং দ্রুত বা ছোট-খেয়াল এই দুটি শ্রেণীতে নিয়ন্ত্রিত হয়। কথিত আছে যে, ১৫শ শতাব্দীতে জৌনপুরের সুলতান হুসেন শর্কী বিলম্বিত এবং ১৮শ শতাব্দীতে মহম্মদ শাহের দরবারী গায়ক সদারঙ্গ দ্রুতখেয়াল গীতরীতির প্রবর্তন করেন। সদারঙ্গ খেয়ালের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা হিসাবে স্বীকৃত।

স্থায়ী ও অন্তরা এই দুটি অংশে খেয়াল রচিত হয়। এর প্রকৃতি চঞ্চল তথা শৃঙ্গার রসাত্মক হয়। রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক বর্ণনাই এর প্রধান বিষয়বস্তু। এতে তান অলংকারাদির বহুল প্রয়োগ হয়। বাঁয়া তবলা সহযোগে ত্রিতাল, একতাল আড়াচৌতাল, তিলুয়ারা, ঝুমরা প্রভৃতি তালে গাওয়া হয়। খেয়াল গানের ভিত্তিতেই টপ্পা, ভজন, ঠুংরী, তরাণা, ত্রিবট,

চতুরঙ্গ, রাগমালা, লক্ষণগীত, স্বরমালিকা প্রভৃতি এবং যন্ত্রসংগীতের ইমদাদখানি, মসীদখানি প্রভৃতি নানাবিধ গতের সৃষ্টি হয়েছে।

বিলম্বিত খেয়াল ধ্রুপদের মতোই সংযত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ কিন্তু এতে স্বর ও বাণীর পুনরাবৃত্তিকালে তেমন কঠোরতা অবলম্বন করা হয় না। রাগের শুদ্ধতা ও তাল রক্ষা করে, গানের শব্দসমূহকে যথেচ্ছ স্বরান্তর করা, বোলতান ও বিবিধ স্বরবিন্যাস প্রয়োগ করা এর বৈশিষ্ট্য। শিল্পীর নিজস্ব অনুভূতি ও ক্ষমতানুসারে এগুলির প্রয়োগ করে খেয়াল গান করা হয়। ছোটখেয়াল অপেক্ষাকৃত চঞ্চল প্রকৃতির হয়। বড়ো ও ছোট খেয়াল একই আসরে পরিবেশিত হলে সাধারণত একই রাগ ব্যবহৃত হয়। প্রারম্ভে ধ্রুপদ, ধামার বা আলাপগান করার রীতি আছে এবং পরিশেষে ভজন বা ঠুংরীগান করে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যানুসারে খেয়াল গানের অজস্র ঘরাণার প্রচলন দেখা যায়। এগুলির মধ্যে সেনী ঘরাণাই শ্রেষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃত। এছাড়া অন্যান্য ঘরাণার মধ্যে গোয়ালিয়র, আগ্রা, দিল্লী, উদয়পুর, অত্রৌলী, বেনারস, বিষ্ণুপুর, জয়পুর, কিরাণা, পাঞ্জাব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

টপ্পা: টপ্পা একটি হিন্দী শব্দ। এর অর্থ অন্তর, লম্ফন প্রভৃতি। প্রাচীন 'বেসরা' নামক গীতিরীতি থেকেই নাকি এর উৎপত্তি। ঐতিহাসিকদের মতে এটি পাঞ্জাবদেশীয় উটচালকদের জাতীয় সংগীত ছিল। পরবর্তীকালে লক্ষ্ণৌর নবাব আসফদ্দৌল্লার দরবারী গায়ক অযোধ্যানিবাসী, গোলাম নবি (শোরী মিঁয়া) এই গীতিরীতির সংস্কার সাধন তথা উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে উন্নয়ন করেন।

খেয়াল গানের মতো টপ্পাও দুটি অংশে রচিত ও গীত হয়। সাধারণত সিন্ধু, কাফী, ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, পিলু, বরবা প্রভৃতি রাগে টপ্পা গাওয়া হয়। সব রাগে টপ্পা হয় না। যৎ, মধ্যমান প্রভৃতি তালে অথবা তালছাড়া টপ্পা গাওয়া হয়। টপ্পা সাধারণত প্রেম বিষয়ক হয়। এর তান, বিস্তারাদি খেয়াল থেকে ভিন্ন কিন্তু অত্যন্ত সুললিত হয়ে থাকে। এতে জমজমা নামক এক বিশেষ প্রকার দানাদার সুর প্রয়োগ হয় যা সকল শিল্পীর দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এতে শিল্পীর অত্যন্ত রেওয়াজী ও সুমধুর কণ্ঠস্বর তথা উত্তম লয়জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বরং বলা যায় যে, শিল্পীর অদ্ভুত এক স্বর প্রয়োগ কৌশলের অধিকারী হওয়া আবশ্যক।

বাংলাদেশে টপ্পাগান রচয়িতা হিসাবে রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), শ্রীধর কথক, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ঠুংরী ঃ ঠুংরী খেয়ালের পরবর্তী রূপ এবং একটি ক্ষুদ্র ও চটুল প্রকৃতির শৃঙ্গার রসাত্মক গীতরীতি। খেয়াল গায়কেরা কল্পনা ও কবিত্বশক্তির আতিশয্যে রাগ বিস্তারের সময়ে বিবিধ স্বরবিন্যাস ও অলংকারাদি প্রয়োগকালে কিঞ্চিত রীতিভ্রষ্ট হয়ে পড়তেন, তার থেকেই এই গীতরীতির উৎপত্তি। প্রথম দিকে ঠুংরী যে খেয়ালের মতোই গম্ভীর ছিল, ঠুংরী সম্রাট মৈজুদ্দীনের রেকর্ডগুলি শুনলে সে কথা বোঝা যায়। ক্রমে স্বতন্ত্র রূপ গ্রহণ তথা বিভিন্ন ঘরাণার প্রবর্তন হয়।

লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ ঠুংরী রচয়িতা হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে, তার দরবারেই নাকি এই গীতরীতির উৎপত্তি হয়। তবে কেহ কেহ বলেন যে, লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের গ্রাম্য সংগীত হিসাবে মহিলারা নাকি ঠুংরী গান করতেন।

খেয়ালের মতো, স্থায়ী ও অন্তরা এই দুটি অংশে,প্রেমবিষয়ক সংক্ষিপ্ত শব্দ-বিন্যাস সহযোগে ঠুংরী রচিত ও গীত হয়। টপ্পার মতো কাফী, খমাজ, ঝিঁঝিট, পিলু, বরবা, ভৈরবী প্রভৃতি রাগে ঠুংরী গাওয়া হয়। তবে বর্তমানে কুশল গায়কেরা অন্যান্য রাগেও ঠুংরী গেয়ে থাকেন। এতে যৎ, আদ্ধা, কাহারবা, দাদরা প্রভৃতি তাল ব্যবহৃত হয়। বিবিধ স্বরবিস্তার ও অলংকারাদি প্রয়োগের পরে মুখে (স্থায়ী) ফিরে আসার সময়ে এক বিশেষ কায়দাতে তবলা বাজানো হয়, যাকে 'লগ্‌গী' বলে। এতে রাগের শুদ্ধতা তেমন কঠোরভাবে রক্ষিত হয় না। বরং মূল রাগ-রস অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন রাগের স্বরবিন্যাস প্রয়োগ করাই কৃতিত্বের পরিচায়ক। এছাড়া ঠুংরী গানে স্বর ও শব্দোচ্চারণ-কালে নানাবিধ অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গি করার রীতিও লক্ষিত হয়। ঠুংরী নামে একটি রাগ তথা একটি তালের সন্ধানও পাওয়া যায়।

ঠুংরী গানের তিনটি প্রধান ঘরাণা আছে। বেনারস, লক্ষ্ণৌ ও পাঞ্জাব ঘরাণা। বেনারসের ঠুংরী খেয়াল অঙ্গে রচিত হয় এর প্রকৃতি গম্ভীর, স্বরের চটুলতা কম এবং অন্যান্য রাগের মিশ্রন খুব সংযতভাবে করা হয়। প্রসিদ্ধ

মৈজুদ্দীন খাঁকে এর প্রধান প্রচারক বলা যায়। লক্ষ্ণৌর ঠুংরী অপেক্ষাকৃত চপলতাপূর্ণ ও দ্রুতগতি সম্পন্ন। এতে স্বরের একক প্রাধান্যের চেয়ে অলংকারিক শব্দের প্রাধান্য বেশী। এতে গিটকারী, মুরকী প্রভৃতি অলংকারের অত্যধিক ব্যবহার হয়ে থাকে। পাঞ্জাবী ও লক্ষ্ণৌর ঠুংরীতে বিশেষ প্রভেদ নেই। পাঞ্জাবী ঠুংরীর বৈশিষ্ট্য হোল, এতে সেখানকার গ্রাম্য সংগীতের কতগুলি বিশেষ অলংকার ব্যবহৃত হয়।

তরানা / তেলেনাঃ প্রাচীনকালে 'ওঁ অনন্ত হরি নারায়ণ", 'তুহি পরমব্রহ্ম" প্রভৃতি উপাসনাদি (ধ্রুবপদ) গাওয়া হোত। শোনা যায় মধ্যযুগে মুসলমান গায়ক শিল্পীরা সেই সংগীতে এমন আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, 'নোম তোম রি রে না' প্রভৃতি অর্থহীন শব্দ-সহযোগে ওই সকল উপাসনাদি অনুকরণ আরম্ভ করেন এবং কালক্রমে তরানা বা তেলেনা গীতরীতির উৎপত্তি হয়। কথিত আছে প্রসিদ্ধ আমীর খুসরো এই গীতরীতির আবিষ্কারক।

কিন্তু তরানার রচনা ভঙ্গীতে শব্দ-ঝংকার, ছন্দ-মাধুর্য প্রভৃতির যে সকল পরিচয় পাওয়া যায় তাতে একে শুধুমাত্র মধ্যযুগের রচনা বলে মনে হয় না। পূর্ববর্তী শার্ঙ্গদেব সংগীতে 'তেন তেনা' প্রভৃতি নিরর্থক শব্দ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন স্তোভ, বহির্গীত প্রভৃতি গীতরীতিতে এইরূপ নিরর্থক শব্দ প্রয়োগের রীতি ছিল। মনে হয় এই ধরণের গীত বা গীতাংশের প্রচলন প্রাচীনকাল থেকেই ছিল, যা মধ্যযুগীয় সংগীত প্রতিভাবানদের প্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করে একটি স্বতন্ত্র গীতরীতিতে রূপায়িত হয়েছে।

তরানা খেয়াল গানেরই এক প্রকারভেদ, খেয়ালের মতোই দুটি অংশে রচিত এবং তান অলংকার ও ছন্দ-বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে থাকে। তবে খেয়ালের থেকে এর গায়নরীতি যথেষ্ট কঠিন এবং সাধনাসাপেক্ষ। বাহাদুর খাঁ, তানরস খাঁ, নথ্থু খাঁ প্রমুখ অতিগুণী তরানা গায়ক ছিলেন।

তরানাতে ব্যবহৃত শব্দগুলি (তাদিম, তাদিয়ানা, নোম, তোম, দেরদের, আলালুম ইত্যাদি) সম্পূর্ণ নিরর্থক হলেও এগুলি, গঠনপ্রণালী, ছন্দ ও লয়মাধুর্য প্রভৃতিতে অনুপম। পরবর্তীকালে তরানার ভিত্তিতেই নাকি রেজাখানী গতের সৃষ্টি হয়।

রাগমালা : কয়েকটি রাগ একটি গানে প্রকাশ করা হয় বলেই এর নাম রাগমালা। এর বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন রাগের বর্ণনা ও স্বরবিন্যাস থাকে। এই গানে ব্যবহৃত রাগগুলির নামোল্লেখও গানের নির্দিষ্ট অংশে করা হয়। খেয়াল ও ধ্রুপদ উভয় গীতরীতিতেই রাগমালা রচিত হয়। বর্তমানে এই গীতরীতি প্রায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে।

ত্রিবট : ত্রিবট তরানারই এক প্রকারভেদ মাত্র। তবে এর গীতরীতি তরানার চেয়েও কঠিন। তরাণা, সরগম এবং মৃদঙ্গের বোল এই তিনটি অংশ নিয়ে রাগ ও তালযোগে ত্রিবট রচিত হয়। এই অংশত্রয়ের কোন এক স্থানে 'ত্রিবট' শব্দটির উল্লেখ থাকে। এতে মৃদঙ্গের বোল অধিক থাকে, যা সুরে উচ্চারণ করা যথেষ্ট সাধনা সাপেক্ষ। এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যই ত্রিবট গানকে বিশেষরূপে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলে। বর্তমানে এই গীতরীতিও লুপ্ত প্রায়।

চতুরঙ্গ : চারটি অংশযুক্ত বলেই এর নাম চতুরঙ্গ। খেয়ালের সঙ্গে ত্রিবট যোগ করে এই গীতরীতি সৃষ্ট। অর্থাৎ এই গানে খেয়াল, তরানা, সরগম ও মৃদঙ্গের বোল এই চারটি অংশ যথাক্রমে গাওয়া হয়। শেষ অংশে সুললিত বোলযুক্ত একটি পরণ' থাকে। এই গীতরীতি অনেকটা খেয়ালের মতো তবে এতে তান, অলংকারাদি খুব কম থাকে। বর্তমানে এই গীতরীতিও লুপ্তপ্রায়।

লক্ষণগীত : রাগ বিশেষের বাদী, সমবাদী, ঠাট, স্বররূপ, বর্জিত স্বর, গাইবার সময় প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বর্ণনা যে গানে থাকে তাকে লক্ষণগীত বলা হয়। শিক্ষার্থীর পক্ষে লক্ষণগীত বিশেষ মহত্বপূর্ণ। কারণ পাঠ্যতালিকার রাগসমূহের লক্ষণগীতগুলি জানা থাকলে রাগরূপ এবং শাস্ত্রীয় বিবরণ মনে রাখা খুব সহজ হয়।

স্বরমালিকা : রাগ বিশেষের স্বররূপ তালবদ্ধরূপে রচিত বা গীত হলে তাকে স্বরমালিকা বলা হয়। প্রায় লক্ষণগীতের মতোই এর মহত্ব। এর অনুশীলনে শিক্ষার্থীর স্বর ও রাগজ্ঞান লাভ এবং তালে গাইবার অভ্যাস পাকা হয়।

স্বরমালিকা সর্বদা গীত হয়। কারণ বাদিত হলে তখন তাকে গৎ বলা হয়। খেয়াল ও ঠুংরী গানের অঙ্গ হিসাবে এবং চতুরঙ্গ, ত্রিবট, তরানা প্রভৃতিতেও স্বরমালিকা প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

গীত : নানাবিধ গানের ব্যাপক নাম হোল গীত। তবে বিশেষ একটি গীতরীতি হিসাবে এর সংজ্ঞা হোল—যে সকল সাহিত্যিক রচনা করুণ ও শৃঙ্গার রসাত্মক তথা বিচিত্র সুর ও তালে রচিত এবং ভাবপ্রধান হয় তাকে 'গীত' বলে। এতে তান, সরগম, আলাপ, বিস্তার প্রভৃতি প্রযুক্ত হয় না। গীত, গজল, আধুনিক গান প্রভৃতিকে একই পর্যায়ভুক্ত বলা যায়। গীত হিন্দীতে রচিত এবং বিষয়-বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে থাকে।

ভজন : রাধাকৃষ্ণ-লীলা, ঈশ্বরের গুণগান, লীলা বা প্রার্থনামূলক হিন্দী ভাষায় রচিত গানকে ভজন বলে। মারাঠী, ভোজপুরী, রাজস্থানী, দেহাতী প্রভৃতি ভাষায়ও বহু ভজন শোনা যায়। যা বিভিন্ন অঞ্চলের ভক্তদের দ্বারা রচিত এবং স্বীকৃত। তবে অন্যান্য ভাষার ভক্তিগীত ভজনরূপে স্বীকৃত নয়।

সাধারণত ভজন কোন রাগে রচিত হয় কিন্তু রাগ বিশেষের শুদ্ধতা কঠোর-রূপে রক্ষিত হয় না। এর রচনা করুণ, ভক্তি ও শৃঙ্গার রসাত্মক তথা ত্রিতাল কাহারবা, দাদরা, ধমার্লী প্রভৃতি তালে গীত হয়। খেয়ালের অনুসরণে বিকাশলাভ করায় স্থায়ী ও অন্তরা এই দুটি অংশেই ভজন রচিত হয়ে থাকে। তবে সঞ্চারী অংশ সংযুক্ত হলেও কোন ক্ষতি নেই। বরং এই সংযোজনে ভজনের আরও শ্রীবৃদ্ধি হবে বলে মনে হয়।

স্বামী হরিদাস, কবীরদাস, সুরদাস, গুরুনানকদেব, মীরাবাঈ, তুলসীদাস, দাদু দয়াল, ব্রহ্মানন্দ, দরিয়া সাহব, মলুকদাস, রৈদাস প্রমুখ পরম ভক্তগণ তাঁদের রচনা এবং ভজন গানের জন্য চিরস্মরণীয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এবং মনে রাখা কর্তব্য যে, গান প্রধানতঃ দুই প্রকার—আসরের এবং মন্দিরের গান। আসরের গানে বহুজনের মনোরঞ্জনের জন্য প্রয়োজন, সুরের নানাবিধ কারসাজি, চটুলতা প্রভৃতি, আর মন্দিরের গানে, আপন আরাধ্য দেবতার কাছে প্রয়োজন শুধুমাত্র অন্তরের সহজ-সরল অভিব্যক্তি। ভজন হোল মন্দিরের গান।

গজল : গজল উর্দু ও ফার্সী ভাষায় রচিত হয়। এর বিষয়বস্তু সাধারণত প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়াবেগের বর্ণনামূলক হয়ে থাকে। স্থায়ী ও অন্তরা এই দুই প্রকার সুর সহযোগে সম্পূর্ণ গানটি গাওয়া হয়। এতে কাহারবা, দাদরা, রূপক, পস্তো, দীপচন্দী প্রভৃতি তাল ব্যবহৃত হয়। শিল্পীর

অতি উত্তম স্বর ও ভাষাজ্ঞান এবং স্পষ্ট ও সুমধুর উচ্চারণ গজল গান গাইবার জন্য অপরিহার্য। বর্তমানে ছায়াচিত্রের মাধ্যমে এই গান বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয় হয়ে চলেছে। বিখ্যাত আমীর খুসরো এই গীতরীতির প্রবর্তক বলে কথিত আছে।

কাওয়ালী ঃ হজরত মহম্মদের গুণকীর্তনই কাওয়ালী গানের প্রধান উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য। এটি মুসলমানদের সামাজিক গান। বিখ্যাত আমীর খুসরো এই গানের প্রবর্তক বলে কথিত আছে। মনে হয় হিন্দুদের কীর্তন-গানের অনুকরণে এর সৃষ্টি।

সাধারণত উর্দু ও ফারসী ভাষায় কাওয়ালী রচিত হয়। এর স্থায়ী ও অন্তরার মাঝে মাঝে 'শের' থাকে যা তালছাড়া সুরে আবৃত্তি করা হয়। মূল গায়কের সঙ্গে অনেকে মিলে একসঙ্গে হাতে তালি দিয়ে হারমনিয়ম, ঢোল ইত্যাদি সহযোগে কাওয়ালী গাওয়া হয়। এতে কাহারবা, দাদরা, পস্তো প্রভৃতি তাল ব্যবহৃত হয়। কাহারবা তালটি এতে অধিক ব্যবহৃত হয় বলে অনেকে কাহারবা তালটিকে কাওয়ালী বলে থাকেন। খুসরোর পরবর্তীকালে বিখ্যাত সদারঙ্গ এই গানের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করেছেন।

কাওয়ালী গানে দুটি দলে পাল্টাপাল্টি (লড়াই) করারও রীতি আছে। এই প্রথা বাংলাদেশের কবিগান ও তর্জাগানেও দেখা যায়। বর্তমানে ছায়া-চিত্রের মাধ্যমে কাওয়ালী গান বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয় হয়ে চলেছে।

সাদরা ঃ কথিত আছে যে, দিল্লীর কাছে শাহদরা গ্রাম নিবাসী এবং বৈজুবাওরার শিষ্য পরম্পরাভুক্ত ভ্রাতৃদ্বয় শিবমোহন ও শিবনাথ ঝাঁপতালের ধ্রুপদ গানে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রীতির প্রচলন এবং স্বগ্রামের নামানুসারে তার 'সাদরা' নামকরণ করেন।

সাদরা একটি ক্ষুদ্র ও চঞ্চল প্রকৃতির শৃঙ্গার রস প্রধান গীতরীতি। এতে অন্যান্য তাল ব্যবহৃত হলেও ঝাঁপতালের প্রয়োগই বেশী দেখা যায়। অনেকের মতে সাদরা কেবলমাত্র ঝাঁপতালেই রচিত ও গীত হয়। ধ্রুপদ ও খেয়াল উভয় অঙ্গেই সাদরা রচিত হয়।

দাদরা ঃ উত্তর ভারতীয় এক আঞ্চলিক গীতরীতিকে দাদরা বলা হোত। দাদরা নামে একটি তালও প্রচলিত আছে। চটুল ও শৃঙ্গার রসাত্মক দাদরা

গানের প্রকৃতি অনেকট। গজলের মতো এবং কোন এক সময়ে নাকি খুব জনপ্রিয় ছিল। বর্তমানে এই গীতরীতি লুপ্ত প্রায়।

খমসা : উর্দ্ ভাষায় রচিত মুসলমানদের একপ্রকার সামাজিক গীত-রীতিকে খমসা বলে। কাওয়ালী গানের সঙ্গে এর কিছুটা সাদৃশ্য আছে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের গ্রামাঞ্চলেই এর বেশী প্রচলন দেখা যায়।

লোকসংগীত : সাধারণত মানুষের সুখ, দুঃখ ও বেদনার কথা, ধর্ম ও পৌরাণিক কাহিনী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি নানা উপলক্ষে লোকসংগীত রচিত হয়, এবং একক বা সমবেত কণ্ঠে স্ত্রী বা পুরুষ আপন আপন প্রান্তীয় ভাষায় এই গান গেয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের সংগীত রসিকতা, প্রতিভা, ভাবপ্রবণতা প্রভৃতি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পাওয়া যায়। এর কোনটি প্রাণবন্ত, কোনটি গুরুগম্ভীর, কোনটি তালপ্রধান, আবার কোনটিতে তালের প্রাধান্যই দেওয়া হয় না। এর গায়ন পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সরল কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাবটি খাঁটি। কোন কোনটিতো উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিকতাপূর্ণ হয়ে থাকে। সবচেয়ে আশ্চর্য ও লক্ষণীয় বিষয় হোল এই যে, শুধু ভারতবর্ষেরই নয়, সমগ্র পৃথিবীর লোকসংগীতের মূল ভাব ও স্বররচনার মধ্যে অদ্ভুত ঐক্য ও সাদৃশ্য আছে। লোকসংগীত বা পল্লীগীতিকে (Folk Song) সঠিক শ্রেণীবিভাগ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, কারণ এর বহু বিচিত্র শাখা, ভৌগলিক প্রান্ত, জল-বায়ু, ভাষা, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি অনুসারে অজস্র ধারায় পল্লবিত। সুতরাং সমগ্র ভারতবর্ষের লোকগীতির পরিচয় দিতে গেলে, একখানি বিশাল স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হওয়া আবশ্যক। তাই এখানে শুধু উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের কিছু লোকগীতির পরিচয় সংকলন করা হোল।

শ্রীচৈতন্যদেব নামকীর্তন প্রবর্তন করার আগে ও তাঁর সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পালাগানের বিশেষ প্রচলন ছিল, যার বিষয়বস্তু ছিল গোষ্ঠলীলা, মানভঞ্জন, মাথুর, রাস প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী। এই পালাগানগুলির পাশাপাশি প্রচলিত ছিল চণ্ডী ও মনসাদি বিভিন্ন মঙ্গলগান, গীতগোবিন্দের পদগান, চর্যাগীতি, পাঁচালী, ঝুমুর, বাউল যাত্রাগান প্রভৃতির। ক্রমে কথকতা, কবিগান, তরজা, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী, সারি, জারি প্রভৃতি গানের বিকাশ

হয়। এগুলি বহু বিচিত্র তাল, লয়, ছন্দ, ধাতু প্রভৃতির সমাবেশ অভিজাত দেশী রাগ রাগিনী সহযোগে লীলায়িত ছিল। আসামের বনগীত, বড়গীত (বরগীত) ও মণিপুরের কীর্তনাদিতেও বাংলার গীতধারার প্রভাব স্পষ্ট।

প্রাচীন সংগীত ও সংস্কৃতির ধারা যে বাংলাদেশে বিশেষভাবে প্রবাহিত তার প্রমাণ ১৭শ—১৮শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। তখন বাংলা সাহিত্য পদ্যে রচিত হোত এবং সুরে পাঠ করা হোত। অর্থাৎ বাঙালীরা চিরকালই সংগীত রসিক, তাই বাংলার লোকসংগীত সাধারণ সীমা অতিক্রম করে অনেক এগিয়ে গেছে। এগুলির সুর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এতে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলের মতো দুটি বা তিনটি স্বর নয়, সাতটি স্বরেরই ব্যবহার করা হয়েছে।

বারহমাসী : উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে বারহমাসী গান শোনা যায়। রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিরহাদি লীলা, রামলীলা প্রভৃতি বর্ণনার সঙ্গে বারোমাসের নামোল্লেখ করে একক বা সমবেত কণ্ঠে স্ত্রী বা পুরুষেরা ঢোল সহযোগে বা তালছাড়া এই গান করে থাকেন।

বিরহা : বিরহা উত্তর ভারতীয় গোয়ালাদের (যাদব) সামাজিক গান। বিবাহ উৎসবে কন্যাপক্ষের লোকেরা বরপক্ষের বাড়ি গিয়ে বাদ্য ও নৃত্য সহযোগে সারারাত্রিব্যাপী এই গান করে থাকেন।

লাবণী : উত্তর-পশ্চিম ভারতে লাবণীগানের প্রচলন দেখা যায়। সাধারণত শৃঙ্গার ও ভক্তি রসাত্মক তথা কাহারবা তালে এবং 'চঙ্গ' নামক একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র সহযোগে একক অথবা সমবেত কণ্ঠে এই গ্রাম্যগীতি গাওয়া হয়।

সাবণী : সাবণী, উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত একপ্রকার ক্ষুদ্র গ্রাম্য-গীতি। বর্ষাঋতুতে (শ্রাবণ মাসে) গ্রামের মেয়েরা দোলনায় (ঝুলা) দুলে দুলে এই গান গায়। এতে সাধারণতঃ করুণ ও বিরহ রসাত্মক বর্ণনা থাকে। এই গীতরীতিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় লোকেরা হিণ্ডোলে, নিহালদে, মল্‌হার প্রভৃতি বলে থাকেন।

কজরী / কজলী : বেনারস ও মিরজাপুরের বিভিন্ন স্থানে কজরী বা কজলী গানের বহুল প্রচলন দেখা যায়। এটি একটি ক্ষুদ্র প্রকৃতির শৃঙ্গার

রসাত্মক গ্রাম্যগীতি। রাধাকৃষ্ণের লীলা, বর্ষাঋতুর বর্ণনা প্রভৃতি হোল এর রচনার বিষয়বস্তু।

নির্বহী : বর্ষাঋতুতে (শ্রাবণ মাসে) ক্ষেতে কাজ করার সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের স্ত্রী-পুরুষেরা নির্বহী গান করে থাকেন।

চন্দৈণী : চন্দৈণী একপ্রকার ক্ষুদ্র গ্রাম্যগীতি। উত্তর-পশ্চিম ভারতের গোয়ালাদের সামাজিক গান। বিভিন্ন উৎসবে এই গান গাওয়া হয়।

চৈতী : হোলি উৎসবের পরে চৈত্র মাসে বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে চৈতী গান গাওয়া হয়। এই গান রামলীলা বিষয়ক ও আঞ্চলিক (পূর্বী ইত্যাদি) ভাষায় রচিত তথা ঠুংরীর চালে গীত হয়।

সোহর : উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্ত্রীলোকেরা শিশুর জন্মোপলক্ষে সমবেত কণ্ঠে সোহর গান করে থাকেন। এটি একটি ক্ষুদ্র প্রকৃতির গ্রাম্যগীতি। এতে প্রথমে শুধু ঢোলের ব্যবহার ছিল তবে আজকাল হারমোনিয়ম প্রভৃতিও সংযুক্ত হয়েছে।

মাণ্ড : মাণ্ড একটি ক্ষুদ্র গ্রাম্যগীতি। এর উৎপত্তি রাজপুতানার মাড়োয়াড় অঞ্চলে হলেও, উত্তর পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক উৎসবাদিতেও এর প্রচলন দেখা যায়।

আল্‌হা : আল্‌হা উত্তর পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক গান। আল্‌হা-উদলের ঐতিহাসিক লড়াই হোল এর রচনার বিষয়বস্তু। এই ক্ষুদ্র প্রকৃতির গ্রাম্যগীতি অত্যন্ত তেজোদ্দীপক এবং এর সুর ও ছন্দ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং বীররস প্রধান হয়।

ঘোড়ী, বন্না, জৌনার, জনেউ, ভাত ও গারী : উত্তর ভারতের ব্রজভূমি প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে বিবাহ এবং বিবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবাদিতে, সাধারণত স্ত্রীলোকেরা ঘোড়ী, বন্না, জৌনার, জনেউ, ভাত, গারী প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রকৃতির গ্রাম্যগীতি একক বা সমবেত কণ্ঠে গেয়ে থাকেন। গীতরীতিগুলির নামগুলিই এদের মোটামুটি পরিচয় বহন করছে।

ঝুমর : ঝুমর একপ্রকার ক্ষুদ্র গ্রাম্যগীতি। উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ঝুমর গান শোনা যায়। যেমন গোয়ালা, নিষাদ, খটীক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা একপ্রকার ঝুমর গান করেন। আর

একপ্রকার হোল কজরীর ঝুমর। এগুলি বর্ষাঋতুর বর্ণনামূলক এবং বর্ষাকালে গাওয়া হয়। আর একপ্রকার ঝুমর শীতলাদেবীর বন্দনা উপলক্ষে রচিত ও গীত হয়।

ঝুমুর: উড়িষ্যা, বিহার ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের স্ত্রী ও পুরুষেরা মিলে বৃত্তাকারে নৃত্য সহযোগে সমবেত কণ্ঠে ঝুমুর গান করে থাকেন। বাঁশী ও মাদল এবং অত্যন্ত সরল স্বরবিন্যাস সহযোগে এই গান রচিত হয়। তবে এর ভাষা সাধারণত অমার্জিত ও অশ্লীল হয়ে থাকে। একই সুর বার বার আবৃত্তি করে আদি রসাত্মক এই গান গাওয়া হয। নৃত্যকালে স্ত্রী ও পুরুষদের অঙ্গভঙ্গি কিছুটা অশালীন হলেও অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে থাকে। একে মহাকবি কালিদাস উল্লিখিত জম্ভালিকার বিবর্তিত রূপ বলে কেহ কেহ মনে করেন।

মঙ্গলকাব্য: খৃষ্টীয় ১৩শ থেকে ১৮শ শতাব্দীকে বাংলাদেশের মঙ্গলকাব্যের যুগ বলা যায়। চণ্ডী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি নানা দেব-দেবীর মহিমা ও গুণকীর্তন করে বাঙালি কবিগণ তখন মঙ্গলকাব্যগুলি রচনা করেন যা বাংলাসাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে। এগুলি রাগ সংগীত হিসাবেই গাওয়া হোত। উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব ও আভোগ এই তিনটি অংশ নিয়ে বীণা, মৃদঙ্গ, বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রাদি এবং নৃত্য সহযোগে মঙ্গলকাব্য অনুষ্ঠিত হোত। এতে বোট্ট বা কৈশিক রাগ, নিঃসারু তাল তথা বিলম্বিত লয় ব্যবহৃত হোত।

মঙ্গলকাব্য হিসাবে শিবমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল সম্ভবত মঙ্গলকাব্যের শেষ রচনা।

চর্যাগীতি: চর্যাগীতির প্রকৃতি, রচনা ও গীতরীতি সম্পর্কে কল্লিনাথ, সিংহভূপাল, শার্ঙ্গদেব, ব্যংকটমুখী প্রমুখ শাস্ত্রীরা উল্লেখ করেছেন। কেহ কেহ চর্যাগীতিকে মহাকবি কালিদাস উল্লিখিত চচরীর বিবর্তিত রূপ বলে মনে করেন। মহাকবি তাঁর 'কুমারসম্ভব' গ্রন্থে যেমন কৈশিকরাগের সঙ্গে সম্পর্কিত করে গীতিমঙ্গল, মঙ্গলগীতি, মঙ্গলপ্রবন্ধ প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন, তেমনি বিক্রমোর্বশী' নাটকে ককুভরাগের উল্লেখের সঙ্গে জম্ভালিকা, চর্চরী, দ্বিপাদিকা প্রভৃতি

প্রবন্ধগীতির পরিচয় দিয়েছেন। চর্চরী বা চর্চরীকাপ্রবন্ধ বসন্তকালে নবপল্লবিত প্রকৃতিকে অভিনন্দন জানিয়ে হোলি উৎসবে গাওয়া হোত। চর্চরী দেশী ভাষায় রচিত তথা ক্রীড়াতালে গঠিত ছিল। এবং এতে নাকি হিন্দোলরাগ ব্যবহৃত হোত। তখন চর্চরী নামে একটি তালও প্রচলিত ছিল।

আসলে ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদের আচরণমূলক গাথাগানই চর্যাগীতি। কারণ চর্যা শব্দের অর্থ আচরণ বা ব্যবহার। চর্যাপদ বা চর্যাপ্রবন্ধ যে আধ্যাত্মসাধনার সহকারী ছিল সেকথা বাংলায় রচিত বজ্রযানীদের বৌদ্ধ দোঁহাগুলি থেকে বোঝা যায়। চর্যা ও বজ্রগীতিগুলি বাংলার নিজস্ব সম্পদ। ১০ম থেকে ১১শ শতকের মধ্যে এগুলির উৎপত্তি ও প্রচলন হয়েছে।

প্রাচীনকালে পদ শব্দটি প্রায় সব সংগীতেই ব্যবহৃত হোত এবং গান মাত্রই ছিল প্রবন্ধ। চর্যাপদ ছিল পদ ও তাল এই দুটি অঙ্গবিশিষ্ট, অর্থাৎ তারাবলী শ্রেণীর প্রবন্ধ। সাধারণত এই গান বীররস প্রধান এবং সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হোত। এগুলি পদ্ধড়ি, রাহড়ি প্রভৃতি ছন্দ এবং দ্বিতীয়াদি তালযুক্ত হোত। এর পদের শেষে অনুপ্রাস থাকতো। পূর্ণ ও অপূর্ণ ভেদে চর্যা ছিল দুই রকম এবং সমধ্রুবা ও বিষমধ্রুবা ভেদে দুই শ্রেণীর। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উভয় উদ্দেশ্যেই এগুলি গাওযা হোত। এতে রাগনামের উল্লেখ থাকলেও তা শুদ্ধভাবে পালিত হোত না। কীর্তনের সঙ্গে এর কিছুটা সাদৃশ্য থাকায় কেহ কেহ একে কীর্তনের পূর্ববর্তী রূপ বলে মনে করেন। তবে একথা ঠিক যে, চর্যাগীতিই পরবর্তীকালে জয়দেবকে 'গীতগোবিন্দ' রচনায, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে নাম-সংকীর্তন রূপায়ণে, ঠাকুর নরোত্তম দাসকে রসকীর্তন-প্রবন্ধে রূপ দিতে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

চর্যাগীতির রচয়িতারা অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। এগুলির বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে সহজ ও সরল মনে হলেও অন্তর্নিহিত অর্থটি সকলে উপলব্ধি করতে পারতো না। এর ভাষাকে তাই সন্ধ্যাভাষা, সন্ধ্যাসংকেত বা সন্ধ্যাবচন বলা হোত। কারণ সন্ধ্যাকালের ঘনায়মান অন্ধকারের মতোই রহস্যময়তা প্রতিটি চর্যাপদকে ঘিরে আছে। বর্তমানে চর্যাগীতি অপ্রচলিত এবং লুপ্তপ্রায়।

কীর্তন : কীর্তনের ইতিহাস অত্যন্ত বিস্তৃত। ভারতের প্রায় সর্বত্রই কীর্তনধারার প্রচলন আছে। নাট্যশাস্ত্রকার, শৌর্য-বীর্য-গুণ-গাথা-রূপ

স্তুতিমূলক ধ্রুবা গানকে সংকীর্তন বলেছেন। কীর্তনের প্রচলন খৃষ্টীয় শতাব্দীর সূচনায় বা তাঁরও আগে থেকে ছিল। অর্থাৎ কীর্তন কেবলমাত্র মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব সাধক পদকর্তাদের সৃষ্ট বা উদ্ভাবিত নয়। প্রাক্‌চৈতন্যযুগে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ পদকর্তাগণ একে সমৃদ্ধ করেছেন। অমর গীতিকাব্য গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেবই সর্বপ্রথম পদাবলী রচনা করেন। পরবর্তী পদাবলী রচয়িতা হিসাবে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, বাসুদেবঘোষ, ঘনশ্যাম, রায়শেখর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তবে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন রচিত হবার পরে কীর্তন সুষ্ঠরূপ গ্রহণ করে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলার সমাজে এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। তিনিই কীর্তনগান সার্থকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাই তাঁকেই বর্তমান কীর্তনের প্রবর্তক বলা হয়। বৈষ্ণব সাধকদের প্রভাবে ভারতের নানাস্থানে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সংগীত বিস্তারলাভ করেছিল। এই প্রসঙ্গে মিথিলার বিদ্যাপতি, যুক্তপ্রদেশের সুরদাস, রাজপুতনার মীরাবাঈ, পাঞ্জাবের গ্রন্থসাহেব, পশ্চিম ভারতের বল্লভাচার্য, এমনকি, রসখান, অবদর রহিমখান প্রমুখ মুসলমান কবিগণও উল্লেখযোগ্য। যাঁরা রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গান রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ভারতের থালবারদের নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত তামিল ভাষার পদাবলী 'তামিলবেদ' নামে প্রসিদ্ধ।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংগীতের ভগবতবিষয়ক বা রাধাকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি বর্ণনাত্মক প্রশংসাগীতিতে কীর্তনের প্রভাব লক্ষিত হলেও এটি বাংলা ও বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ এবং বাঙালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি। বাংলাদেশের যাবতীয় গীতধারায় কীর্তনের প্রভাব সুস্পষ্ট।

পদাবলীসমূহের মূল রস হোল শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি। তবে বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ দশপ্রকার রসের উল্লেখ করেছেন, যথা—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত ও বাৎসল্য। গোস্বামীগণ আবার শৃঙ্গাররসকে প্রাধান্য দিয়ে বিপ্রলম্ভ (বিরহ) ও সম্ভোগ (মিলন) ভেদে ৬৪টি রসের অবতারণা করেছেন।

কীর্তন দুই শ্রেণীর, নামসংকীর্তন এবং লীলা বা রসকীর্তন। নাম-সংকীর্তনের সার্থকতা হোল চিত্তশুদ্ধিলাভ। নাম-মাহাত্ম্যে কামনা-বাসনাদিতে

নিমগ্নচিত্ত ধীরে ধীরে ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধিতে সমর্থ হয়। সাধারণত নামসংকীর্তনে, 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরে হরে

হরেরাম হরেরাম হরেরাম হরে হরে',

অথবা

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ

হরেকৃষ্ণ হরেরাম শ্রীরাধে গোবিন্দ' প্রভৃতি।

পদগুলি বিবিধ রাগ ও তাল সহযোগে সমবেতকণ্ঠে গাওয়া হয়। পাশ্চাত্য গীর্জা বা জাতীয় সংগীতের পাশে নামসংকীর্তনকে ভারতের জনসংগীত (Mass Singing) বলা যায়। তাই বলে এর আভিজাত্য ভজন বা পল্লীগীতির মধ্যেই সীমিত নয়; একে অভিজাত ক্লাসিকাল সংগীতের সমপর্যায়ভুক্ত বলা যায়, কারণ এটি আসলে প্রবন্ধগীতির অন্তর্ভুক্ত। কীর্তনের আঁখর রাগসংগীতের তানের সমপর্যায়ভুক্ত না হলেও প্রায় সমগোত্রীয়। রাগসংগীতে ওস্তাদের গুণপনা যেমন তাঁর সুরসৃষ্টিতে, কীর্তনীয়ার প্রতিভার পরিচয় তেমনি তাঁর আঁখর যোজনায় পাওয়া যায়। পদের ভাব গম্ভীর বা অর্থ জটিল হলে গায়ক আঁখর সহযোগে তাকে সহজ ও রসপূর্ণ করার চেষ্টা করেন। এই কাযে শিল্পীর সুর, তাল ও রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কীর্তনের মতো কাব্য সুর ও ধর্মীয় ভাবের এমন অপূর্ব 'ত্রিবেনী সঙ্গম' পৃথিবীর কোন দেশের সংগীতে দেখা যায় না।

লীলা বা রসকীর্তনে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক বর্ণনাত্মক পালাগান গাওয়া হয়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের গায়ন পদ্ধতিতে সামান্য পার্থক্য থাকলেও সুর, তাল, রস প্রভৃতিতে বিশেষ পার্থক্য নেই। প্রান্তীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে কীর্তন-গানের পাঁচটি শাখা আছে। নামকীর্তনের পরে ১৬শ শতকের ঠাকুর নরোত্তম-দাসের কীর্তনধারা গড়েরহাটি পরগণায় জন্মলাভ করেছিল বলে 'গরাণহাটি' পদ্ধতি নামে পরিচিত। কিন্তু সেই ধীর স্থির গম্ভীর রীতির গান বেশীদিন চলেনি। ক্রমে এই রীতির ভিত্তিতে মনোহরসাহি পরগণা থেকে 'মনোহরসাহি', বর্ধমান জেলার রাণীহাটি পরগণা থেকে 'রেণেটি', সরকার মন্দারণ থেকে 'মন্দারণী' ও ঝারখণ্ডী পদ্ধতিগুলির সৃষ্টি হয়। গরাণহাটিকীর্তনে প্রধাণতঃ ১০৮টি, মনোহরসাহিতে ৫৪টি, রেণেটিতে ২৬টি এবং মন্দারিণীতে ৯টি তাল

ব্যবহৃত হয়। ঝারখণ্ডী পদ্ধতি প্রায় লোপ পেয়েছে। অর্থাৎ গুরুগম্ভীর রীতি থেকে কীর্তনগান ক্রমে সহজ সরল ধারার দিকে নমিত হয়েছে। যার পূর্ণপরিণতি লক্ষিত হয় ১৯শ শতকের বাংলা সমাজে মধুসূদন কিন্নর তথা মধু কান প্রবর্তিত ঢপগান বা ঢপকীর্তন গানে।

বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী অবলম্বনে লীলাকীর্তন গাওয়া হয়। বহুবিচিত্র রস সৃষ্টির জন্য এর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ভাবটি সকলে উপলব্ধি করতে পারে না। তবে কীর্তন গায়কদের সুর ও রসসৃষ্টি এবং আখর যোজনার অদ্ভুত প্রতিভা রসিকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গানে কথা ও সুরের প্রাধান্য সমান। এতে কথা, দোঁহা, আঁখর, তুক ও ছুট এই পাঁচটি উপাঙ্গের সহযোগ অনিবার্য। এতে ব্যবহৃত নানা রাগ-রাগিনীর মধ্যে কামোদ, গৌরী, ভীমপলশ্রী, ধানশ্রী প্রভৃতির অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে এর প্রধান উপকরণ হোল শ্রীখোল ও করতাল। তবে আধুনিককালে এতে হারমনিয়ম প্রভৃতি অন্যান্য যন্ত্রাদিরও ব্যবহার দেখা যায়। কীর্তনগানের তালপদ্ধতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও স্বতন্ত্র। কীর্তনগানে বাদকেরও উচ্চস্তরের শিল্পোচিত অনুভূতি থাকা আবশ্যক, কারণ আখরের মতো সঙ্গতকালে 'কাটান' আদিও স্তরে স্তরে বিস্তৃত হয়ে এর পরিপাট্য বিধান করে। সুতরাং গায়ক ও বাদকের পূর্ণ সহযোগিতা অপরিহার্য।

এছাড়া ৬৪টি রস-তত্ত্বের সমাবেশে কীর্তনগান নানা রূপবৈচিত্র্য ও ভাব-মাধুর্যকে নিয়ে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। মিলনান্তক পরিসমাপ্তির জন্ত কোন পালাগান গাওয়ার পরে মিলনগান গাইবার রীতি আছে। তাছাড়া এতে যুগলরূপ, প্রকাশ ও বিলাস, পূর্বরাগ ও অনুরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, মিলন প্রভৃতি ১২টি তত্ত্বের সমাবেশ থাকে।

৬৪টি রসের বর্ণনায় শাস্ত্রকারেরা বলেছেন যে, পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য ও প্রবাস এই চারপ্রকার বিপ্রলম্ভ এবং সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান এই চারপ্রকার 'সম্ভোগ'। এগুলির প্রত্যেকটির আবার আট রকমভেদ আছে। যেমন,

৮ প্রকার পূর্বরাগ :—স্বপ্নে, চিত্রে, সাক্ষাত দর্শনে, বন্দী বা ভাটমুখে শ্রবণে, সখী বা দূতীমুখে শ্রবণে এবং গুণীজনের গানে বা বংশীধ্বনি শ্রবণে।

৮ প্রকার মান :— শুকমুখে, সখীমুখে, বা মুরলীধ্বনি শ্রবণে, বিপক্ষ বা প্রিয়গাত্রে ভোগচিহ্ন দর্শনে, গোত্রস্খলনে, স্বপ্নে বা জাগরণে অন্য নায়িকার সঙ্গে দর্শনে।

৮ প্রকার প্রেমবৈচিত্র্য :— প্রিয়, সখী, দূতী বা নিজের প্রতি আক্ষেপ, মুরলী বা বিধাতার প্রতি আক্ষেপ, কন্দর্প বা গুরুজনদের প্রতি আক্ষেপ।

৮ প্রকার প্রবাস :— মথুরা, দ্বারকা, কালীয়দমন, গোচারণ বা কার্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন, নন্দমোক্ষণ এবং ভবিষ্যতে বা রাসে অন্তর্ধান।

৮ প্রকার সম্ভোগ :— বাল্যাবস্থায়, গোষ্ঠেগমনকালে, গোদহনকালে, অকস্মাৎ, হস্তাকর্ষন বা বস্ত্রাকর্ষণরূপ মিলন এবং বর্ত্মরোধ বা রতিভোগরূপ মিলন।

৮ প্রকার সংকীর্ণ :— মহারাস, জলকেলি, কুঞ্জলীলা, দানলীলা, বংশীচৌর্য, নৌকাবিলাস, মধুপান এবং সূর্যপূজা।

৮ প্রকার সম্পন্ন :— সুদূর দর্শন, ঝুলনযাত্রা, হোলিলীলা, প্রহেলিকা, পাশকক্রীড়া, নর্তকরাস, রাসালস ও কপটনিদ্রা।

৮ প্রকার সমৃদ্ধিমান :— স্বপ্নে, কুরুক্ষেত্রে, ভাবোল্লাস, ব্রজেগমনকালে, বিপরীত সম্ভোগ, ভজনকৌতুক, একত্রনিদ্রা এবং স্বাধীন ভর্তৃকা।

কীর্তনের আসরে ভাবরস রক্ষার নিয়মাবলী

১। কীর্তন গায়কগণ তথা শ্রোতৃমণ্ডলীর বিলাসিতা বিবর্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। কীর্তনের আসরে সকলের আচরণ প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ হওয়া কর্তব্য।

৩। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী এবং গায়কগণ যেন শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ চিত্তে ওই সময়ে শান্তভাবে অবস্থান করেন।

৪। সেখানে পান-তামাকাদি সেবন, পাদুকা আনয়ন প্রভৃতি দোষনীয়। উচ্চ-নীচ এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলে একাসনে অথবা শুধু মৃত্তিকার উপরেই উপবেশন করা কর্তব্য।

৫। সুর তাল ও রসজ্ঞ এবং সুকণ্ঠী কীর্তনাভিজ্ঞ মূল গায়ক তথা সুসঙ্গতী-বাদক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যাত্রাগান : যাত্রাগান রামায়ণের বিবর্তিত রূপ। অয়ণ অর্থ যাত্রা, রাম+অয়ণ=রামায়ণ। শাস্ত্রে লবকুশকে শ্রেষ্ঠ রামায়ণ গায়ক বলা হয়েছে।

গোড়ার দিকে যাত্রাগানে গানই মুখ্য ছিল। ক্রমে বিভিন্ন চরিত্রের অভিব্যক্তির জন্ম অভিনেতাদের বক্তৃতা ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ যুক্ত হয়ে এর শ্রীবৃদ্ধি করা হয়। প্রাচীনকালে মঙ্গলাচার (মঙ্গলগীতি) সহযোগে যাত্রাগান আরম্ভ করা হোত। পরবর্তীকালে নটরাজ, বীণাপাণি প্রভৃতির বন্দনাগান করে পালা স্নর করা হোত যা এখনও প্রচলিত। তবে পশ্চিম ভারতে এখনও প্রাচীন রীতিই অনুসৃত হয়। যাত্রাগান সমগ্র ভারতবর্ষেই প্রচলিত।

বাংলাদেশে বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা হিসাবে পূর্বে পরমানন্দ অধিকারী এবং তাঁর শিষ্য বদন ও গোবিন্দ অধিকারী শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। এছাড়া রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গোপাল উড়ে, মদন মাষ্টার, বৈকুণ্ঠ, লোকা ধোপা, ব্রজরায়, কৃষ্ণমণ্ডল গোস্বামী প্রমুখও যাত্রাওয়ালা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তী-কালে নীলকণ্ঠ, মতিরায় প্রমুখের পালাগানগুলিও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। নীলকণ্ঠ ছিলেন একজন সাধকবিশেষ। তাঁর রচিত পদাবলী এখনও পশ্চিমবঙ্গের পল্লীপথে বৈষ্ণব ও ভিখারীরা গেয়ে থাকেন। আধুনিককালের প্রারম্ভে কলকাতার যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে উমানাথ ঘোষাল ও নবদ্বীপ সাহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বরিশালের মুকুন্দদাস স্বদেশী যাত্রার প্রবর্তন করে অক্ষয় কীর্তিলাভ করেছেন। সমাজ সংস্কাব ও জন-জাগরণই ছিল তাঁর যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য।

পাঁচালীগান : 'পাঁচালী' শব্দটি বা এই গানের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিমত প্রচলিত। কেহ প্রাচীন 'পঞ্চালিকা' বা পঞ্চতালেশ্বর থেকে এর উৎপত্তি বলে মনে করেন। কেহ বলেন মঙ্গলগীতিই পরে কাব্যগীতি পাঁচালীতে রূপান্তরিত হয়। কারণ জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও শংকরদেবের নটযাত্রার রচনা পাঁচালীর মতো। কেহ বলেন এর পাঁচটি পদ এর জন্যই এই নামকরণ হয়েছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, পাঁচালীগানে পদকর্তারা আসরের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে পদচালনা-পূর্বক গানের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করেন বলেই শব্দটির উৎপত্তি।

বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে পাঁচালী রচিত হয়। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, উমাপতি ধর প্রমুখের সময়ে কীর্তনের পাশাপাশি পাঁচালী গানের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। বাংলাদেশে চৈতন্যদেবের সময় থেকে পাঁচালীর সুষ্ঠ প্রচলন হয়। পাঁচালী গায়কেরা একহাতে চামর ও অপর হাতে প্রেমজুড়ি

এবং পায়ে নূপুর বেঁধে নৃত্য সহযোগে এই গান করেন। পটহ ·হুরুক্কা, শঙ্খ, কাঁসর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এই গানে ব্যবহৃত হয়। এর পাঁচটি পদের প্রথমটিতে তালছাড়া রাগালাপ থাকে এবং প্রতিটি পদে তাল পরিবর্তন করে গাওয়া হয়। এই গান বীর ও শৃঙ্গার রসাত্মক হয়।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে পঞ্চতালেশ্বর বিভিন্ন মার্গ তালে গাওয়া হোত বলা হয়েছে, এছাড়া গায়নপদ্ধতির আর কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে 'চিত্রপদা', 'চিত্রকলা', 'ধ্রুপদ' ও 'পাঁচালী' প্রভৃতিকে ক্ষুদ্র গীতরীতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গোড়ার দিকে পাঁচালীগান মাত্র ছডাগানেব আকারে ছিল। তবে একে বিভিন্ন রাগ, তাল ও কবিত্ব প্রয়োগ করে কাব্যসংগীতেব পর্যায়ে উন্নীত করেন দাশরথি রায়। পববর্তীকালে কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কন, কাশীদাস, ভরতচন্দ্র প্রমুখ রচয়িতাগণ পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে এই গানের শ্রীবৃদ্ধি করেন। বর্তমানে পাঁচালীগান লুপ্তপ্রায়।

কবিগান : কবিগানের প্রচলন খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী থেকে হয়। গোডার দিকে এর বিষয়বস্তু ছিল পৌরাণিক কাহিনী. কিন্তু ক্রমে সামাজিক ও সাধারণ মানুষের কথাও এর বিষয়বস্তুর অন্তর্গত হয়। তখন এই গান এত জনপ্রিয় ছিল যে, বহু দূর দূরান্ত থেকে জনসমাগম হোত। কবিগান গায়কদের কবিয়াল বলা হোত। হারুঠাকুর (হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী), রাম বসু, নিতাই বৈরাগী, এন্টনী ফিরিঙ্গী, ভোলা ময়রা, গোঁজলা গোঁসাই প্রভৃতি বিখ্যাত কবিয়াল সেই সময়ে বাংলদেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। প্রেম প্রসঙ্গে হারুঠাকুরের উক্তি আজও চমৎকৃত করে, যেমন :—"নাম প্রেম তার, আকার নহে বস্তুটি নিরাকার, জীবন যৌবন ধন কিবা মনপ্রাণ বশীভূত তার"…। আবার পীরিতি সম্পর্কে নিতাই বৈরাগীর উক্তিও উল্লেখযোগ্য, যেমন :—"বিধি একচিতে ভাবিতে ভাবিতে এ তিন অক্ষর করিলে সংযোগ, রসিকের সুখ আশ্রয়।…" ইত্যাদি। কবিগান রচয়িতাদের বলা হোত 'সরকার'।

কবিগানের বৈশিষ্ট্য হোল দুই কবিয়ালের লড়াই। যা অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং উপভোগ্য। মুখে মুখে উত্তর প্রত্যুত্তর সহ কবিগানের রীতির প্রবর্তন

করেন রামবসু। ঢোল কাঁসর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহ এই গান করা হয় এবং প্রধান গায়কের সঙ্গে কয়েকজন সহযোগী গায়ক থাকে। বর্তমানে কবিগানের প্রথাও লুপ্তপ্রায়।

কথকতা : ভগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থ সুরে পাঠ এবং ব্যাখ্যা করাকে 'কথকতা', এবং যিনি পাঠ করেন তাঁকে 'কথক' বলা হয়। সহজ কথায় ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে জনসাধারণকে শিক্ষাদানের প্রকৃষ্ট উপায় ছিল কথকতা। ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের যাবতীয় বিষয় সুর ও সুললিত ছন্দে, অভিজ্ঞ কথক উচ্চারণ করে সর্বসাধারণের চিত্তে যে প্রভাব বিস্তার করতেন তা সুদূর প্রসারি হোত। এই প্রসঙ্গে তাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন : "...আমি কথকের মুখে কথকতা শুনিয়া বাল্যকালেই শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সম্পূর্ণ আয়ত্ব করিয়াছিলাম।"...

গোড়ার দিকে শুধুমাত্র আবৃত্তিতেই কথকতা হোত। কথিত আছে বাঁকুড়ার সোনামুখী গ্রামনিবাসী বিখ্যাত কথক গদাধর শিরোমণি সুর সহযোগে কথকতার প্রবর্তন করেন। ইনি সুবক্তা এবং অতি সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। সর্বপ্রথম ইনি ভগবত গীতাতে সুরারোপ করে বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি 'ধ্রুবচরিত্র', 'প্রহ্লাদচরিত্র', 'বামনভিক্ষা', 'দক্ষযজ্ঞ' প্রভৃতি বিখ্যাত অংশগুলিতেও সুরারোপ করেন।

বাংলাদেশে শ্রীধর কথক, রামধন শিরোমণি, কৃষ্ণধন শিরোমণি, ধরণী শিরোমণি প্রমুখ কথক হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। বর্তমানে কথকতাও প্রায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে।

দাঁড়াকবি : দাঁড়াকবি গান পাঁচালীগানেরই একটি প্রকারভেদ। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীই এর রচনার বিষয়বস্তু। দাঁড়াকবি গায়কগণ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হতেন। কারণ এর বৈশিষ্ট্য হোল, এই গানে দুটি দল মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সমবেতভাবে গান করেন এবং দুই পক্ষের নেতাদ্বয় আপন আপন দল পরিচালনা করেন। এঁরা যে কাহিনী অবলম্বন করে গান করেন, তার কোন একটি বিশেষ চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে আপন আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য নানা যুক্তিতর্ক, বিচার, বিশ্লেষণ প্রয়োগ করে অপর পক্ষকে পরাজিত

করার চেষ্টা করেন। এই সংগীত-যুদ্ধে মুখে মুখে কবিতা রচনা করা এবং তীক্ষ্ণ উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিতে হোত। এঁরা সাধারণত স্বভাব কবি, সুবক্তা এবং অসাধারণ সংগীত পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতেন। বর্তমানে অনুশীলনের অভাবে তেমন প্রতিভার আবির্ভাব দেখা যায় না।

প্রাচীন বাংলার হারুঠাকুর, গোঁজলা গোঁসাই, রামবসু, নিতাই বৈরাগী প্রভৃতি কবিয়ালেরা দাঁড়াকবি গানেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। বর্তমানে এই গানের প্রচলন নেই।

পটশিল্প : কাপড়ের উপরে ধারাবাহিকভাবে কোন পৌরাণিক কাহিনীর ছবি এঁকে পর্যায়ক্রমে পটুয়ারা ছড়াগানে সেই কাহিনীর ব্যাখ্যা করতেন, যাকে বলা হোত পটশিল্প। এই চিত্রমালা ছাড়া যে সকল স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্র আছে তা চিত্রকলার অন্তর্গত, সুতরাং এই আলোচনার বহির্ভূত। 'পট্ট' থেকেই পট শব্দটির সৃষ্টি, কারণ সেই চিত্রমালা পাটের কাপড়ে আঁকা হোত। এই গায়নরীতি বৌদ্ধযুগ থেকে প্রচলিত। বৌদ্ধজীবনীই এর প্রধান বিষয়বস্তু ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণের লীলা নিয়েও অনেক পটশিল্প রচিত হয়। পটশিল্পের বিষয়বস্তু হিন্দুভাবাশ্রিত হলেও পটুয়ারা কিন্তু সকলেই মুসলমান সম্প্রদায়ের। তাই মনে হয় এঁরা আগে বৌদ্ধ ছিলেন এবং নানা কারণে ধর্মান্তরিত হন। বর্তমানে পটশিল্পও লুপ্তপ্রায়।

নাচাড়ি গান : পাঁচালীগানের নৃত্য সম্বলিত এক প্রকারভেদ হোল নাচাড়িগান। নানা পৌরাণিক কাহিনীই এর রচনার বিষয়বস্তু। নাচাড়ি গায়ক বিশেষ বিশেষ ঘটনা বিশ্লেষণকালে নৃত্য সহযোগে প্রকৃত ভাবটিকে সরস ও বলিষ্ঠ করে তুলতেন। এতে পদচালনা ও নৃত্য দুই-ই থাকতো। বর্তমানে নাচাড়িগানও লুপ্তপ্রায়।

শ্যামাসংগীত : কীর্তন যেমন বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বনে রচিত, শ্যামাসংগীত তেমনি শাক্তপদাবলী অবলম্বনে রচিত হয়। প্রায় চার হাজার শক্তিবিষয়ক গান এবং দেড় শতাধিক রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালিমির্জা), কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, রামবসু, হারু ঠাকুর, গোবিন্দ চৌধুরী, এণ্টনী ফিরিঙ্গী, দাশরথী রায়, মহারাজ মহতাবচাঁদ ও রামকৃষ্ণ রায় এবং রামপ্রসাদ সেন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সর্বপ্রথম কবে এবং কে এই শাক্তসংগীত রচনা করেছিলেন তা নির্ণয় করা আজ অসম্ভব, তবে এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা যে পরমভক্ত রামপ্রসাদ সেন সেকথা সর্বজন সমর্থিত। ইনি এক অভূতপূর্ব ও অভিনব গায়ন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন যা ভক্তহৃদয়ে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম এবং বর্তমান শ্যামাসংগীতের বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বীকৃত। কোন সাধনসংগীত শ্যামা-সংগীতের মতো এতো তাড়াতাড়ি হৃদয় স্পর্শ করে না। রামপ্রসাদ প্রবর্তিত এই স্বতন্ত্র গায়ন পদ্ধতি, যা বহু বিচিত্র শাস্ত্রীয় রাগ ও তাল সম্বলিত, তাঁর অসাধারণ সংগীত প্রতিভা, পাণ্ডিত্য তথা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। তিনিই সর্বপ্রথম মা'কে মেয়ে রূপে কল্পনা করে গান রচনা করেছেন যা আর কোথাও দেখা যায় না।

ভাটিয়ালী : কথিত আছে যে, পূর্ববঙ্গের মাঝিরা ভাঁটার টানে নৌকা ছেড়ে দিয়ে, মুক্ত ও উদাত্ত কণ্ঠে যে সকল গান করে, সেই গায়নরীতি থেকেই 'ভাটিয়ালী' শব্দ এবং এই গায়ন পদ্ধতির সৃষ্টি। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দী থেকে বাংলা, মিথিলা, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে সম্ভবত ভাটিয়ালী গানের সর্বপ্রথম প্রচলন হয়।

বাংলাদেশের যাবতীয় লোকসংগীতের কেন্দ্র হোল এই ভাটিয়ালী গান। এর নানা শ্রেণীভেদ আছে। কারণ যার জীবন সহজ সরল এবং যার জীবন সর্বদা বিপদসঙ্কুল, তাদের মানসিক গঠন যেমন কখনও এক হতে পারে না। তেমনি নৌকার মাঝি, গরুর রাখাল, মহিষের রাখাল প্রভৃতি সকলেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভাটিয়ালী গান করে থাকেন। যেমন মাঝ দরিয়ায় ভাঁটার টানে নৌকা ছেড়ে, দাঁড় তুলে মাঝিরা তাদের দেহ মনের বিশ্রামের অবসরে একপ্রকার ভাটিয়ালী গায়। তেমনি রাখালেরা তাদের বিশ্রামের অবসরে বা ফেরার পথে কিঞ্চিত ভিন্ন প্রকার ভাটিয়ালী গায়। অবশ্য গানের বিষয়বস্তু একই থাকে। অর্থাৎ মানব জীবনের বিরহ, বেদনা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি নিয়েই ভাটিয়ালী রচিত হয়। এতে রাগ সংগীতের আইন-কানুন রক্ষা করা হয় না বটে, কিন্তু সুরের সামঞ্জস্য ও মাত্রাবোধ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এতে তালের বন্ধন কম কারণ খুব উঁচু সুরে টেনে টেনে এই গান করা হয়। বর্তমানে রুচিসম্পন্ন সংগীত সমাজেও এই গান সমাদৃত।

বাউলগান : হিন্দি 'বাওরা' শব্দ থেকেই বাউল শব্দটির উৎপত্তি বলে কথিত আছে। বাওরা অর্থ পাগল, তবে বাউলেরা পাগল নয়। এঁরা আধ্যাত্মিক স্তরের আত্মভোলা একটি সম্প্রদায়। আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তা ও মমত্ববোধই এঁদের ধর্মের মূল তত্ত্ব। এঁরা ভগবান বা ভগবদ্ভক্তির ধার ধারে না। আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমে আসার পরে, সিদ্ধ যোগীদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে একটি সহজিয়া সম্প্রদায় গড়ে ওঠে তাঁরাই বাউল নামে পরিচিত। এঁদের আধ্যাত্মিকতা অতি উচ্চস্তরের হয়। এঁদের প্রকৃতি ও পোষাক প্রভৃতির সঙ্গে, সুফী সম্প্রদায়ের ফকীর, দরবেশ প্রভৃতির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ফকীর, দরবেশ বা সন্ন্যাসীর মতো পোষাক পরে, হাতে একতারা ও পায়ে নূপুর বেঁধে, নেচে নেচে এঁরা গান করেন। গানগুলি প্রায়ই দ্ব্যর্থবোধক হয়, এবং গাইবার সময়ে এঁরা পার্থিব পরিবেশ ভুলে অন্য জগতে মনস্থির করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাউলগানের পরম ভক্ত ছিলেন এবং এর অনুসরণে বহু গান তিনি রচনা করেছেন। এমনকি তাঁর অধিকাংশ গানেই বাউলের প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে করেন। বর্তমানে বাউলগান সমগ্র ভারতবর্ষে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ভাওয়াইয়াগান : উত্তরবঙ্গের কুচবিহার, রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে ভাওয়াইয়াগান প্রচলিত। 'ভাও' শব্দের অর্থ অভিব্যক্তি, মুদ্রা বা প্রকাশ। মনে হয় সুরের ব্যঞ্জনা অন্তরের আবেগকে যথাযথ রূপ দিতে পারে, তাই এই নামকরণ হয়েছে। ভাটিয়ালী গানের সঙ্গে এর সুর ও ব্যঞ্জনার সাদৃশ্য আছে তবে এর গায়ন পদ্ধতি যথেষ্ট বলিষ্ঠ ও তাল-লয়বিশিষ্ট হয়। সাধারণত এই গান করুণ ও বিরহ রসাত্মক হয়। বাউলদের মতো, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই 'বাউদিয়া' নামে একটি সম্প্রদায় আছে যাঁরা দোতারা সহযোগে ঘুরে ঘুরে ভাওয়াইয়া গান করে থাকেন।

চটকা : চটকদার বলেই সম্ভবত এর নাম হয়েছে চটকাগান। এটি ভাওয়াইয়ার একটি শাখা এবং ওই সকল অঞ্চলেই প্রচলিত। সাধারণ রঙ্গ-রস এর বিষয়বস্তু, প্রকৃতি চটুলতাপূর্ণ এবং হাল্‌কা রসের প্রাধান্য থাকে। এর গায়ন পদ্ধতি খুব সহজ তবে দ্রুতলয়যুক্ত হয়।

ভাদুগান : 'ভাদুগান' বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের প্রসিদ্ধ লোকগীতি। লক্ষ্মীপূজার মতো, ভাদ্রমাসে ওই সকল অঞ্চলে কুমারী মেয়েরা

ভাদু প্রতিমা তৈরী করে গান গায় ও পূজা করে। এই উৎসবে পাড়ায় পাড়ায় তরজাগানের মতো, পূজারিণীদের মধ্যে গানের পাল্টাপাল্টি হয়, যা অত্যন্ত উপভোগ্য। ওই সকল অঞ্চলে এই গানের খুব সমাদর এবং প্রভাব আছে।

সারিগান : 'সারিগান' নদী-মাতৃক পূর্ববঙ্গের একপ্রকার লোকগীতি। সারি বেঁধে সমবেত কণ্ঠে এই গান করা হয়। এর রচনার বিষয়বস্তু হোল মাঝি বা মজদুরদের বিপদ সংকুল জীবনের অভিজ্ঞতা, দুঃখ, বিরহ প্রভৃতি। নৌকার দাঁড় টানা, ছাদ পেটানো প্রভৃতি সমবেত-ছন্দ-মেলানো উপলক্ষে অনেকে মিলে এই গান করেন। ভাটিয়ালীব সঙ্গে এর ভাবের ঐক্য থাকলেও ছন্দের পার্থক্য আছে। কারণ 'ভাওয়াইয়া'র পাশে 'চটকা'র মতো ভাটিয়ালীর পাশে সারিগানকে তুলনা করা যায়।

সাধারণত বর্ষাঋতুতে, 'বাইচ' প্রতিযোগীতায়, সারিগানের ছন্দের তালে তালে বৈঠার আঘাত পড়ে, এবং নৌকার গতি বৃদ্ধি করার জন্য গানের লয় ক্রমে দ্রুততর করা হয়। এই গানে প্রায়ই অশ্লীল ভাষার অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। প্রতিযোগীতায় বিজিত ও পরাজিত দুই দলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গানের প্রয়োজনেই সম্ভবত এই বিকৃতির উদ্ভব হয়েছে। ছাদ পেটানো বা অন্যান্য বিষয়ক সারিগানের রচনা কিঞ্চিত ভিন্ন হয়ে থাকে।

গম্ভীরা গান : নানাবিধ রাগ মিশ্রিত লোকগীতি 'গম্ভীরা' মালদহ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ গান। নীল, গাজন, গম্ভীরা প্রভৃতি গানের সৃষ্টি শিবকে কেন্দ্র করে। মহাদেবকে গ্রামবাসীর সাজে সাজিয়ে গ্রামের যাবতীয় ভালমন্দের দায়িত্ব চাপিয়ে, বিবিধ অভাব অভিযোগ, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ আবদার প্রভৃতি জানিয়ে গম্ভীরাগান গাওয়া হয়। সঙ্-সহ শোভাযাত্রা ও নাচ প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাও বর্ণিত হয়। এছাড়া গম্ভীরাগানের সুরে যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাক, ঢোল, বা শ্রীখোল ও কাঁসি প্রভৃতি সহযোগে গম্ভীরাগানের দল সমস্ত গ্রাম পরিক্রমা করে বেড়ায়।

জারীগান : জারীগান হোল মুসলমানদের সামাজিক গান। কারবালার ঘটনা হোল এর বিষয়বস্তু। পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ দলবদ্ধভাবে এই গান করে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের সুর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। এই গানের ভাবধারা করুণ হলেও সুর ও তাল যথেষ্ট প্রাণবন্ত হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ

প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র : ঋগ্বেদে উল্লিখিত নটরাজের 'ডমরু' প্রাচীনতম চর্মবাদ্য হিসাবে স্বীকৃত। প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে ক্ষোনী, আঘাটি, কাণ্ড, ঘাটলিকা, বাণ, ঔদম্বরী, কাত্যায়ণী, পিচ্ছোরা প্রভৃতি বীণা ও বেণু এবং চর্ম-নির্মিত গর্গর, পিঙ্গ, নাড়ী, বনস্পতি, কর্করি প্রভৃতির বৈদিক বাদ্যযন্ত্র হিসাবে উল্লেখ আছে। বাগ, অজান্তা, ইলোরা, এলিফেন্টা, সাঁচী প্রভৃতি গিরিগুহায় খোদাই করা বা আঁকা ভাস্কর্য ও চিত্রাদিতে খৃষ্টপূর্বাব্দে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত এই সকল বাদ্যযন্ত্রাদির নিদর্শন পাওয়া যায়। কালস্রোতের বিবর্তনে এর সবগুলিই প্রায় অপ্রচলিত বা রূপান্তরিত। তবে এগুলিই যে সমগ্র পৃথিবীর বাদ্যযন্ত্রাদি সৃষ্টির উৎস সেকথা ঐতিহাসিক সত্য এবং সমর্থিত।

খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকেই সম্ভবত, বৈদিকযুগের বহু বিচিত্র প্রকার বীণাগুলি লোপ পেয়েছিল তাই নাট্যশাস্ত্রকার কয়েকটি মাত্র বীণার উল্লেখ করেছেন। তিনি তন্ত্রীবাদ্য হিসাবে বিপঞ্চী, চিত্রা, দারবী, ঘোষা বা ঘোষকা, কচ্ছপী প্রভৃতি বীণা এবং চর্মবাদ্য হিসাবে পুষ্কর, মৃদঙ্গ, দর্দুর, পণব, ঝল্লরী, পটহ প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন। এগুলির আকৃতির পরিচয়ে হরিতকী, গোপুচ্ছা, জবা প্রভৃতির নামোল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এগুলির গঠন ও বাদন প্রণালীরও বিস্তৃত পরিচয় তিনি দিয়েছেন।

বাদ্যযন্ত্রাদির আলোচনাকালে ভরত পুষ্করকেই সর্বাধিক সম্মান দিয়েছেন। এর সাংগীতিক উপাদানের বর্ণনায় ষোল অক্ষর, চার মার্গ, ছয় কারণ, তিন যতি, ত্রি-গত, তিন লয়, ত্রি-প্রচার, ত্রি-যোগ, ত্রি-পাণি, ত্রি-প্রহার, ত্রি-মার্জনা, পঞ্চপাণি প্রহার, কুড়ি অলংকার, আঠার জাতি, বিলেপন প্রভৃতির বর্ণনা করেছেন। পুষ্কর ও মৃদঙ্গের বর্ণনা প্রায় একই। এদের গঠন প্রণালী ছিল

অনেকটা বর্তমান শ্রীখোলের মতো। গোড়ার দিকে এগুলি মৃত্তিকা নির্মিতই ছিল, কিন্তু কবে থেকে যে খদির, গাম্ভার, রক্তচন্দন, পানস প্রভৃতি কাষ্ঠনির্মিত হতে আরম্ভ হয়েছে, তা জানা যায় না। তবে ১৩শ শতাব্দীর পূর্বেই যে এই বিবর্তন হয়েছিল সেকথা সংগীতরত্নাকরের ভাষ্যে বোঝা যায়।

আধুনিক সংগীতসমাজে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রাদির পরিচয় দেবার আগে এগুলির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন :

"বর্তমান কালে ক্ল্যাসিকাল গানে আমরা যেমন তবল (তল মৃদঙ্গ) ও বাঁয়া (বামমৃদঙ্গ) এই দুটি মৃদঙ্গ ব্যবহার করি, প্রাচীন ভারতে (খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত) তেমনি গানে তিনটি মৃদঙ্গের ব্যবহার হ'ত : দুটি সমান আকারের—বর্তমান পাখোয়াজের মতো দেখতে ও একটি ছোট মৃদঙ্গ। সেই মৃদঙ্গকে পুষ্কর বলা হোত। বড়ো পুষ্কর দুটি সোজাভাবে দাঁড় করানো আর ছোটটি শোয়ানো (শায়িত আকারে) থাকত। পাথরের গায়ে খোদাই করা ভাস্কর্যচিত্রে কখনো কখনো দুটি পুষ্করের প্রতিকৃতি দেখা যায়। বেশীর ভাগ লোকের বিশ্বাস যে প্রাচীন ভারতে মাত্র একটি মৃদঙ্গের ব্যবহার ছিল এবং বর্তমান তবল ও বাঁয়ার প্রচলন মুসলমান রাজত্বের সময় পারসিক ও আরবদের প্রভাবের ফলে হয়েছিল। অনেকে আবার আমীর খসরুকেই তবল ও বাঁয়ার স্রষ্টা বলে অভিমত প্রকাশ করেন। কতগুলি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের বেলায়ও তাই (সেতার, রবাব, সরোদ, বেহালা প্রভৃতি)। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এ'সকল অভিমতের তেমন কোন সার্থকতা দেখা যায় না। বর্তমান তবল ও বাঁয়ার গঠন ও বাদন পদ্ধতি মুসলমান যুগে নতুন রূপ গ্রহণ করতে পারে এবং করাও স্বাভাবিক; কেননা যুগধর্ম ও পরিবর্তনশীল কালস্রোতের স্বভাব হোল পুরাতনের মাঝে নতুন কিছু পরিবর্তন সৃষ্টি করা। সমাজবাসী মানুষের বিবর্তনশীল রুচিই অবশ্য এ পরিবর্তন এনে দেবার পক্ষপাতী। কিন্তু তাই বলে প্রাচীন ভারতে তবল ও বাঁয়ার মতো গানে দুটি মৃদঙ্গের ব্যবহার ছিল না একথা বললে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হয়। প্রাচীনকালে তিনটি পুষ্করের মধ্যে বড় দু'টির একটিকে বামহাতে ও অপরটিকে ডানহাতে ও ছোটটিকে সম্ভবতঃ উভয় হাত দিয়ে বাজানো হোত। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীতে

ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর-মন্দিরে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বোম্বাইয়ের বাদামী-মন্দিরে ও তাছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন বৌদ্ধ, বিহার ও মন্দির-গুলিতে তিনটি পুষ্করের প্রস্তরচিত্র উৎকীর্ণ দেখা যায় : ···নটরাজ শিব অপরূপ মূর্তিতে নৃত্যরত। তাঁর আটটি হাতে হস্তমুদ্রার প্রতিফলন খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর ভারতীয় সমাজে নাট্যশাস্ত্রের অনুযায়ী নৃত্য, মুদ্রা ও অঙ্গহারাদির অনুশীলনের মর্মকথা প্রকাশ করে। নটরাজের দক্ষিণে নৃত্যশীল গণপতি একটি বাঁশী বাজাচ্ছেন শিবের নৃত্যকে সুষমায়িত করার জন্ত। তাঁর বাঁদিকে একটি লোক চারটি পায়া (পদ) যুক্ত একটি আসনে উপবেশন ক'রে দু'টি সমান আকারের পুষ্কর বাজাচ্ছে নটরাজের নৃত্যের তালে তালে। বাদামী-মন্দিরে (৬ষ্ঠ শতাব্দী) উৎকীর্ণ শিব নটরাজের ষোলটি হাত। প্রত্যেকটি হাতে শাস্ত্রীয় হস্তমুদ্রার রূপায়ণ। দক্ষিণের দিকে একহাতে নটরাজ একটি ত্রিশূল ধরে আছেন। নটরাজ নৃত্যভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। তাঁর বামদিকে গণপতি মুক্তেশ্বর-মন্দিরের গণেশের মতো একটি বাঁশী বাজাচ্ছেন। গণপতির পাশে একজন বাদক দু'হাতে দুটি সমান আকারের মৃদঙ্গ (পুষ্কর) বাজাচ্ছে। তার সামনে আর একটি সামান্য ছোট আকারের মৃদঙ্গ শোযানো আছে। প্রাচীন ভারতের তিনটি বা দু'টি পুষ্কর যে কালস্রোতের বিবর্তনে পড়ে মুসলমান যুগে বাঁয়া ও তবলে পরিবর্তিত হয়নি তা কে বলতে পারে। বরং হওয়াই স্বাভাবিক। ···রূপবিবর্তিত সকল জিনিষের মধ্যেই বিদেশী প্রভাব থাকা কিছু বিচিত্র নয়, কিন্তু সকল সময় দেশীয় সৃষ্টি-প্রতিভার অবদানকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে বিদেশী ব'লে সিদ্ধান্ত করাও বিশেষ চক্ষুষ্মানতার কাজ নয়। বিশেষ ক'রে প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্যচিত্রগুলিতে পুষ্করাদি বাদ্যযন্ত্রগুলির আকার ও বাদন প্রণালী লক্ষ করলে যুক্তির সারতা ও অসারতার কথা অনুভব করা যায়···"।□

বাদ্যশ্রেণী : বাদ্যশ্রেণীর উল্লেখ সর্বপ্রথম নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। সেই শ্রেণীভাগ আজও প্রচলিত। সংগীতে ব্যবহৃত যাবতীয় বাদ্যযন্ত্রকে তিনি চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, যথা—১। ততবাদ্য, ২। সুষিরবাদ্য, ৩। অবনদ্ধ-বাদ্য এবং ৪। ঘনবাদ্য।

ততবাদ্য : বিভিন্ন প্রকার তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্রকে ততবাদ্য বলে। এগুলিকে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যথা—'তত' ও 'বিতত' বাদ্য।

□ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস। ২য় খণ্ড, ৩০৬ পৃঃ

যে তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্রগুলি মিজরাব বা অনুরূপ কিছুর সাহায্যে বাজানো হয়, যেমন, বীণা, সেতার, সরোদ একতারা, তানপুরা প্রভৃতিকে বলা হয় 'ততবাদ্য' এবং যে তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্রগুলি গজ বা ছড়ি (Bow) প্রভৃতির সাহায্যে বাজানো হয়, যেমন, বেহালা, এস্রাজ, সারেঙ্গী প্রভৃতিকে বলা হয় 'বিততবাদ্য'।

সুষিরবাদ্য: যে সকল বাদ্যযন্ত্র ফুঁ বা হাওয়া দিয়ে বাজানো হয়, যেমন, বাঁশী, শানাই, হারমনিয়ম, অর্গান, ব্যাগপাইপ প্রভৃতি, এগুলিকে সুষিরবাদ্য বলে।

অবনদ্ধবাদ্য: চামড়ার তৈরী বাদ্যযন্ত্রগুলিকে অবনদ্ধবাদ্য বলে, যেমন, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, তবলা, শ্রীখোল, ঢোল, মাদল প্রভৃতি।

ঘনবাদ্য: যে সকল বাদ্যযন্ত্র আঘাত দিয়ে বাজানো হয়, যেমন, ঝাঁঝ, করতাল, জলতরঙ্গ, পিয়ানো প্রভৃতি, এগুলিকে ঘনবাদ্য বলে।

বাদ্যযন্ত্রের অঙ্গবর্ণনা: বাদ্যযন্ত্রাদির পরিচয় প্রসঙ্গে তাদের বিভিন্ন অংশের যে সকল নাম ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলির পরিচয় এইরূপ:

তবলী তুম্ব। লংগোট: বীণা, সুরবাহার, তানপুরা বা সেতার জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের নিম্নভাগ কাঠ ও লাউয়ের খোল নির্মিত দুটি অংশে থাকে, যার উপরের অংশকে 'তবলী' এবং নীচের অংশকে 'তুম্ব।' বলে। এ'দুটির সংযোগ-স্থলে অর্থাৎ যন্ত্রমূলে হুকজাতীয় একটি কাঠের টুকরো লাগানো থাকে যার সঙ্গে তারগুলির একপ্রান্ত লাগানো হয়, তাকে লংগোট (Tail Piece) বলে।

খুঁটি / কান: যন্ত্রশীর্ষে ও যন্ত্রকাণ্ডে তারসংখ্যানুসারে খুঁটি বা কানগুলি (Pegs) লাগানো থাকে, এগুলির সঙ্গে তারগুলির অপরপ্রান্ত লাগানো হয়।

ঘুড়চ / ঘোড়ি / তন্ত্রাসন / সওয়ারী: তবলীর কেন্দ্রস্থলে কাঠ, হাড়, গজদন্ত, মৃগশৃঙ্গ প্রভৃতি নির্মিত চৌকো একটি টুকরো বসানো থাকে, যাকে 'ঘুড়চ', 'ঘোড়ি', 'সওয়ারী', 'তন্ত্রাসন' (Bridge) প্রভৃতি বলা হয়। যন্ত্রভেদে এর আকৃতির তারতম্য ঘটে।

ডাঁড ও গুলু: লম্বা ও ফাঁপা কাঠের তৈরী যন্ত্রকাণ্ডকে 'ডাঁড' বলে এবং তুম্বার সঙ্গে এর সংযোগ স্থলকে 'গুলু' বলা হয়।

তারগহণ : যন্ত্রশীর্ষে প্রধান খুঁটিগুলির নীচে যন্ত্রের গ্রীবাদেশে গজদন্ত, হাড় প্রভৃতি নির্মিত, তারসংখ্যানুযায়ী ছিদ্রযুক্ত একটি টুকরো লাগানো থাকে, যার ভিতর দিয়ে নিয়ে খুঁটির সঙ্গে তারগুলি জড়ানো হয়, তার নাম 'তারগহণ'।

সারিকা সুন্দরী পর্দা : ধাতু-নির্মিত কতগুলি বাঁকা ও সরু টুকরো যন্ত্রকাণ্ডে মুগা সুতা দিয়ে বাঁধা বা মোমজাতীয় আঠার সাহায্যে লাগানো থাকে। এগুলিকে 'সারিকা,' 'সুন্দরী', পর্দা প্রভৃতি বলা হয়। রাগানুসারে এগুলিকে স্থান পরিবর্তন করা চলে।

মনকা : ঘুড়চের নীচে এক বা একাধিক তারের সঙ্গে হাড়, চন্দনকাঠ বা কাঁচ নির্মিত পুঁথি জাতীয় একটি করে 'মনকা' থাকে। সুর বাঁধার সময় এর সাহায্যে সুর সামান্য কম-বেশী করা হয়।

জোয়ারী : সুর-ঝংকারের স্থায়িত্বকে জোয়ারী বলে, আবার সুর-ঝংকার-স্থায়িত্ব সংশোধন করাকেও জোয়ারী বলা হয়। ঘুড়চটিকে সামান্য ঘসে-মেজে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

তরফের তার : বীণা, সেতার, সরোদ, সারেঙ্গী প্রভৃতি যন্ত্রে প্রধান তারগুলি ছাড়াও সারিকার নীচে কতগুলি তার লাগানো থাকে, এগুলিকে তরফের তার বলে। এগুলি রাগানুযায়ী সুরে বাঁধা হয়, কিন্তু বাজানো হয় না। প্রধান তারে গত্ বাজালে এগুলি থেকে আপনিই রাগ-রূপের ঝংকার উৎপন্ন হয়।

মিজরাব জওয়া / কোন : ষ্টীলের তার দিয়ে তৈরী এক বিশেষ ধরণের আংটি যার সাহায্যে তারযন্ত্র বাজানো হয় তাকে মিজরাব বলে। কাঠ, বাঁশ, হাড় বা নারকেলের মালা দিয়ে তৈরী একটি ত্রিকোনাকার টুকরো, যার সাহায্যে একতারা, দোতারা, সরোদ প্রভৃতি বাজানো হয় তাকে 'কোন' (Plectrum) বা জওয়া বলে।

গজ / ছড়ি : দুই বা আড়াই ফুট লম্বা সরু একখণ্ড কাঠ বা বাঁশের ছড়ির সঙ্গে অশ্বপুচ্ছ দিয়ে তৈরী ধনুকের মত যন্ত্র, যার সাহায্যে সারেঙ্গী, বেহালা, এস্রাজ প্রভৃতি বাজানো হয়, তাকে 'গজ', 'ছড়ি' (Bow) প্রভৃতি বলে।

বীণা ঃ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম তারযন্ত্র বীণাতে রাগ সংগীতের সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশ সম্ভব বলে কথিত আছে। প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে নানাবিধ বীণার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন ১ম শতকে নারদ উল্লেখ করেছেন যে, সামগানে গাত্রবীণা এবং গান্ধর্ব ও দেশী সংগীতে দারবী বীণা ব্যবহার করা হোত। ২য় শতকে ভরত সাতটি তন্ত্রীযুক্ত চিত্রা ও নয়টি তন্ত্রীযুক্ত বিপঞ্চী বীণার উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তিনি ঘোষা বা ঘোষকা, কচ্ছপী প্রভৃতি বীণার আকৃতি ও বাদন প্রণালীর উল্লেখ করেছেন। ১৩শ শতকে শার্ঙ্গদেব একতন্ত্রী, ত্রিতন্ত্রীকা, চিত্রা, নকুলী, বিপঞ্চী, আলাপিণী, কিন্নরী, মত্তকোকিলা, নিঃশংক, পিনাকি প্রভৃতি দশ প্রকার বীণার উল্লেখ করেছেন। ভরত থেকে শার্ঙ্গদেব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত অন্যান্য শাস্ত্রাদিতে কয়েকটি নতুন বীণারও নামোল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন মহতী, রঞ্জনী, রুদ্র, নারদীয়, ময়ূরী, কাত্যায়নী, প্রসারিণী প্রভৃতি। সংগীতমকরন্দকার নারদ (১৪শ-১৫শ) উনিশ প্রকার বীণার উল্লেখ করেছেন, যেমন—কচ্ছপী, কুব্জিকা, চিত্রা, বহন্তী, পরিবাদিনী, জয়া, ঘোষাবতী, জ্যেষ্ঠা, নকুলী, মহতী, বৈষ্ণবী, রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, কূর্মী, রাবণী, সারস্বতী, কিন্নরী, সৌরন্ধ্রী, ঘোষকা প্রভৃতি।

এইরূপ বহুবিচিত্র বীণার নামোল্লেখ করে প্রাচীন শাস্ত্রীরা তৎকালীন সংগীত সমাজের নানাপ্রকার তন্ত্রীবাদ্য বোঝাতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। সুতরাং বীণা অর্থ তন্ত্রীবাদ্য এবং ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগুলি বর্তমানে প্রচলিত বীণা, সেতার, সরোদ, এস্রাজ, সুরবাহার, সারেঙ্গী, বেহালা প্রভৃতি নানাবিধ নামগ্রহণ করেছে।

দক্ষিণ ভারতের মহীশূর, তাঞ্জোর ও পশ্চিম ভারতের মীরাজ প্রভৃতি স্থান বীণার জন্য বিখ্যাত। সাধারণতঃ কাঁঠাল, কৃষ্ণকাঠ (Black wood) প্রভৃতি দিয়ে বীণা তৈরী হয়। গজদন্তের নানাপ্রকার কারুকার্য এর শোভা বর্ধন করে। প্রধান চারটি ও পাশের তিনটি মোট সাতটি তার এবং উনিশ থেকে চব্বিশটি পর্যন্ত সারিকা ব্যবহৃত হয়। প্রধান চারটির দুটি ষ্টীল ও দুটি পিতলের তার হয়। এগুলির নাম যথাক্রমে সারণী, পঞ্চম, মন্দারণ ও অনুমন্দারণ এবং পাশের তিনটি ষ্টীলের তারের নাম যথাক্রমে পক্কা, সারণী ও চিকারী। সারিকাগুলি ষ্টীল বা পিতলের হয় এবং মোম জাতীয় আঠার

সাহায্যে যন্ত্রকাণ্ডের সঙ্গে লাগানো থাকে, প্রযোজন হলে সামান্য উত্তাপ দিয়ে স্থান-পরিবর্তন করা হয়।

অচল থাট : সেতারের মতো বীণাতে কোন পর্দা ওঠানো-নামানোর ব্যাপার নেই। তাই এর পর্দ বা সারিকাশ্রেণীকে অচল থাট বলা হয়। পর্দাগুলি, মন্দ্রকড়িমধ্যম থেকে তারসপ্তকের গান্ধার পর্যন্ত সবগুলি স্বররূপ নিয়ে গঠিত। তাই বীণাই 'অচল ঠাট' যন্ত্র হিসবে সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। আঙুলে মিজরাব লাগিয়ে অথবা নখ দিয়ে প্রধান দুটি তারে গৎ বাজানো হয়। নিপুণ বাদকেরা অন্যান্য তারগুলিও ব্যবহার করে থাকেন। জানুর উপরে রেখে বা দাঁড় করিয়ে বীণা বাজানো হয। এর সুর বাঁধার নানাপ্রকার প্রণালী প্রচলিত, যার কয়েকটি এইরূপ—

	প্রধান তার	পাশের তার
ক।	সা প সা সা	প সা প
খ।	প সা প প	স প সা
গ।	ম সা প সা	সা সা প

প্রায় দুই হাত লম্বা একখণ্ড কাঠ কুদে যন্ত্রকাণ্ডটি নির্মিত হয়। তবলীর খোলটি আর একখণ্ড কাঠ কুঁদে তৈরী হয। এব গ্রীবাদেশ বক্র থাকে, সেখানে ময়ুর বা অনুরূপ কোন চিত্র খোদাই করে সৌন্দর্যবৃদ্ধি করা হয়। গ্রীবার পিছনে একটি লাউযের খোল স্বরবর্ধনের জন্য লাগানো থাকে, যাকে ইচ্ছামত খুলেও রাখা যায়। এর সওয়ারীর গড়ন সাধারণ নয়, কারণ প্রধান সওয়ারীর পাশে ধাতুনির্মিত আর একটি সওযারী পাশের তার তিনটির জন্য, লাগানো থাকে। তারগুলি যন্ত্রমূল (লংগোট) থেকে সওয়ারী ও পর্দাগুলির উপরে লম্বিত হয়ে যন্ত্রশীর্ষে সাতটি খুঁটির সঙ্গে লাগানো থাকে।

বর্তমানে প্রচলিত বীণাকে শাস্ত্রোক্ত মহতীবীণা বলে অনেকে মনে করেন। প্রচলিত যাবতীয় ততযন্ত্রের সঙ্গে এর মূলগত দুটি পার্থক্য আছে, যেমন—

১। অন্যান্য যাবতীয় যন্ত্রে খোল ও তবলীর ব্যবহার আছে কিন্তু বীণাতে তবলী নেই। বীণার তবলী একটি কাষ্ঠখণ্ড বা চর্ম দিয়ে তৈরী যার উপরে সওয়ারী অধিষ্ঠিত থাকে।

২। অন্যান্য যাবতীয় ততযন্ত্রে নায়কী তারটি যে পাশে থাকে, বীণাতে থাকে তার বিপরীত দিকে, ফলে এর বাদন পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়।

বীণ : বীণা এবং বীণযন্ত্রে মূলগত বিশেষ পার্থক্য নেই। বীণের বৈশিষ্ট্য হোল, এর যন্ত্রকাণ্ডটি বংশ নির্মিত হয় এবং ১৯ থেকে ২২টি পর্যন্ত সারিকা থাকে। সাতটি তারের তিনটি ষ্টীল এবং চারটি পিতলের হয়। তারগুলি যথাক্রমে "সা়, গ, প, সা, ম, সা, সা" এই সুরে বাঁধা হয়। প্রাচীনকালে বাণার ডাণ্ডিটিও বংশ নির্মিত হোত। কিন্তু এক-পববিশিষ্ট বংশদণ্ডের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য বর্তমানে তা কাষ্ঠনির্মিত হয়।

সুরবাহার : সেতারের সঙ্গে এর মূলগত বিশেষ পার্থক্য নেই। বস্তুতঃ একে সেতারের এক বৃহৎ সংস্করণ বলা যায়। এর সাতটি তার খুব মোটা হওয়ায় মীড ও গমকের কাজ তথা মন্দ্রস্বরের ব্যবহার অধিক হয়। এতে বীণার অধিকাংশ সুরের কাজই করা যায়, কিন্তু গৎ বাজানো যায় না। এতে আলাপাদি খুব শ্রুতিমধুর হয়, তাই এতে রাগালাপ বাজানোর প্রচলনই অধিক। এর প্রধান চারটি তার যথাক্রমে "ম সা় প় গ় / ম়" এবং পাশের তিনটির দুটি মধ্যষড্‌জ ও তৃতীয়টি রাগানুসারে গ, ম অথবা প সুরে বাঁধা হয়। এর বাদন পদ্ধতি সেতারেরই মতো। গোড়া থেকেই এতে তরফের তার সংযোজিত ছিল। যখন সেতারে মাত্র পাঁচটি তার ছিল। এর অনুসরণেই নাকি সেতারের অপর তার দুটি সংযুক্ত হয়।

কথিত আছে, তানসেন বংশীয় প্যার খাঁ এবং দৌহিত্রবংশীয় ওমরাও খাঁর শিষ্য গোলাম মহম্মদ ১৮শ শতকে সুরবাহারের প্রচলন করেন। কেহ কেহ বলেন যে, স্বয়ং ওমরাও খাঁ-ই এর উদ্ভাবন করে তার প্রিয় শিষ্য গোলামকে শিক্ষা দেন।

শোনা যায় প্রাচীন গুণীরা সংস্কারবশতঃ সকলকে বীণাবাদন শিক্ষাদান করতেন না। তাই বিকল্পরূপে এর সৃষ্টি হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ওমরাও খাঁর দুই পুত্র আমীর খাঁ ও রহিম খাঁ কৃতী বীণকার ছিলেন। ওমরাও খাঁর দুই শিষ্য ছিল, কুতুবউদ্দৌলা ও গোলাম মহম্মদ। এঁদের প্রথম জনকে সেতার এবং দ্বিতীয় জনকে সুরবাহার শিক্ষাদান করেন। এঁরা দুজনেই শ্রেষ্ঠ সেতার এবং সুরবাহার বাদকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। গোলাম মহম্মদ ও

তাঁর পুত্র সাজ্জাদ সেতার বাদনেও নিপুণ ছিলেন এবং বহু নতুন নতুন গৎ সৃষ্টি করেছিলেন যা আজও প্রচলিত আছে।

তানপুরা: কথিত আছে, প্রাচীন সংগীতাচার্য তুম্বুরু উদ্ভাবিত তুম্বুরু-বীণার ক্রমবিবর্তিত রূপই বর্তমান ভারতীয় সংগীতের অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র 'তানপুরা'। প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে 'তুম্বী', 'তুম্বীবীণা', 'তুম্বুরা' প্রভৃতির উল্লেখ থাকায় তানপুরা যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত সেকথা স্পষ্ট, কিন্তু—রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর 'Universal History of Music' গ্রন্থে আরব পারস্য, আসারিয়া, ইজিপ্ট, প্যালেষ্টাইন ও হিব্রুজাতির সংগীত প্রসঙ্গে 'তুম্বুরু' বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ তথা ভারতীয় সংগীত প্রসঙ্গে তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব তুম্বুরুবীণার উদ্ভাবক একথা স্বীকার করলেও বর্তমানে প্রচলিত তানপুরা যে তারই অপভ্রংশ শব্দ বা ক্রমবিবর্তিত রূপ সেকথা স্বীকার করেন নি। এমন কি ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাদ্যযন্ত্রাদির নামোল্লেখকালেও এই নামটি বর্জন করেছেন।

ডাঃ হেলমহোলজের 'Sensation of Tone' (1895) গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে খোরাসানী এবং বাগদাদী তুম্বুরের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। Cassel and Co Ltd. কর্তৃক প্রকাশিত 'The Encyclopaedic Dictionary (1889) তে তুম্বুরা শব্দের উল্লেখ আছে, এবং পারশ্য, তুরস্ক, ইজিপ্ট ও হিন্দুস্থানে এই বাদ্যযন্ত্রটি প্রচলিত, বলা হয়েছে। এইরূপ নানা অভিমত সত্বেও তানপুরাকে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র এবং অন্যান্য বিষয়ের মতো এটিও বিদেশে প্রচলিত হয়েছিল বলেই আমাদের বিশ্বাস।

তিনহাত পরিমাণ লম্বা সেগুন, তুঁত, কাঁঠাল প্রভৃতি কাঠ কুঁদে এর যন্ত্রকাণ্ড তৈরী হয়। তবলী কাঠের এবং তুম্বা লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরী হয়। তবলীর কেন্দ্রস্থলে সওয়ারী বসানো থাকে। দুটি ষ্টীল ও দুটি পিতলের (অনেকে পঞ্চমের তারটিও ষ্টীলের ব্যবহার করেন) মোট চারটি তার যন্ত্রমূল থেকে সওয়ারীর উপর দিয়ে যন্ত্রশীর্ষের চারটি খুঁটির সঙ্গে লাগানো থাকে। তারগুলির ১মটি মন্দ্রপঞ্চম ২য় ও ৩য়টি মধ্যষড্‌জ এবং ৪র্থটি মন্দ্রষড্‌জ সুরে বাঁধা হয়। কোন রাগে যদি পঞ্চম বর্জিত বা দুর্বল হয় তাহলে রাগানুসারে পঞ্চমের তারটিকে গান্ধার, মধ্যম, নিষাদ প্রভৃতি অন্য কোন সুরে বাঁধা হয়।

তানপুরার ব্যবহার অত্যন্ত সহজ ও সরল। এতে কোন প্রকার 'গত্' বাজানো হয় না। দুটি আঙুলের সাহায্যে অবিরাম আঘাত করে কেবলমাত্র সুর রাখা হয়। সংগীতে এর উপযোগিতা অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ এবং অতুলনীয়।

প্রচ্ছন্ন স্বর : ষড়্জ ও পঞ্চম স্বর দুটিকে কেন্দ্র করে সুর বাঁধা তানপুরাতে আঘাত করলে মধ্যম ছাড়া অবশিষ্ট স্বর সমূহের আভাস পাওয়া যায় এবং ষড়্জ ও মধ্যমকে কেন্দ্র করে সুর বাঁধা হলে নিষাদ ছাড়া অন্যান্য স্বরগুলির আভাস পাওয়া যায়। এগুলিকে প্রচ্ছন্ন স্বর (overtone) বলে। প্রচ্ছন্ন স্বরগুলি মূল স্বরের দ্বিগুণ বা আরো বেশী উঁচু হয়ে থাকে।

সেতার : সেতার শব্দটি 'সেহ-তার' শব্দের অপভ্রংশ রূপ। ফরাসী ভাষায় 'সেহ' অর্থ তিন। প্রাচীন শাস্ত্রে ত্রিতন্ত্রী, কচ্ছপী প্রভৃতি বহু বিচিত্র বীণার উল্লেখ আছে। মনে হয় সেতার ও কছুয়া সেতার ত্রিতন্ত্রী ও কচ্ছপী বীণারই পরবর্তী নাম। ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ত্রিতন্ত্রী বীণারই বেশী প্রচলন ছিল। ১৪শ শতাব্দীতে আমীর খসরু একে সেতার আখ্যা দিয়ে প্রচার করেন। অনেকে তাই আমীর খসরুকেই এর আবিষ্কর্তা বলে মনে করেন, কিন্তু সেকথা ঠিক নয়। ১৮শ শতাব্দীতে মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে সেতারে আরও তিনটি তার সংযুক্ত হয়। সম্ভবতঃ তানসেন বংশীয় মসীদখানি রাজের প্রবর্তক মসীদ খাঁ এই তার কয়টি যুক্ত করেছিলেন। তিনি সেতার বাদন-পদ্ধতিরও যথেষ্ট উন্নতিবিধান করেছিলেন। সেতারের সপ্তম (চিকারীর) তারটি সংযুক্ত হয় আরো পরবর্তীকালে। সম্ভবতঃ সুরবাহার যন্ত্রের উৎপত্তির পরে, তার অনুসরণে এই তারটি যুক্ত হয়।

বীণার সঙ্গে সেতারের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। তবে এর বাদন পদ্ধতি ভিন্ন। সাধারণত বাঁ হাতের আঙুলে তার চেপে, ডানহাতের তর্জনীতে মিজরাব লাগিয়ে এবং কোলের উপরে আড়াআড়িভাবে রেখে সেতার বাজানো হয়। বাইরে থেকে আঘাত করলে 'ডা' বা 'দ্রা' এবং ভিতর থেকে আঘাত করলে 'রা' বোল সৃষ্টি হয়। এই দুটি মুখ্য বোলের সাহায্যেই যাবতীয় বোলবৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়। গোড়ার দিকে এর তিনটি মাত্র তার ও ১৪টি সারিকা ছিল। তার তিনটি যথাক্রমে মধ্যমষড়্জ ও পঞ্চমসুরে বাঁধা হোত। কালক্রমে এর তার ও সারিকা সংখ্যার বৃদ্ধি তথা বাদনপদ্ধতির উন্নতিবিধান হয়। সারিকাগুলি

মুগা সুতোর সাহায্যে এমনভাবে বাঁধা থাকে যে, রাগানুসারে সামান্য স্থান পরিবর্তন করা সম্ভবপর হয়। অর্থাৎ স্বররূপ পরিবর্তনের জন্যই এই ব্যবস্থা। প্রথম ও প্রধান তারটিকে বোল বা বাজকি তার, ২য় ও ৩য়কে জোড়িকি তার, ৪র্থকে পঞ্চমকি তার, ৫মকে লরজকি তার এবং ৬ষ্ঠ ও ৭মকে চিকারীকি তার বলে। তারগুলির ১মটি মধ্যমধ্যম, ২য় ও ৩য়টি মধ্যষড়্জ, ৪র্থটি মন্দ্রপঞ্চম, ৫মটি অতিমন্দ্রপঞ্চম, ৬ষ্টটি মধ্যষড়্জ এবং ৭মটি মধ্যষড়্জ বা পঞ্চম সুরে বাঁধা হয়। অর্থাৎ তারগুলি যথাক্রমে ম, সা, সা, প়, প় সা ও সা/প সুরে বাঁধা হয়।

তরফদার সেতার: আধুনিককালে তরফদার সেতারের প্রচলন হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য হোল, প্রধান সাতটি তার ছাড়াও ১১ থেকে ১৩টি তার সওয়ারী ও সারিকার নীচে যন্ত্রকাণ্ডের উপরে লম্বিত থাকে। তারসংখ্যানুযায়ী খুঁটিগুলি যন্ত্রকাণ্ডের পাশে লাগানো থাকে। এই তারগুলিকে তরফের তার বলে এবং যে সেতারে এই তারগুলি থাকে তাকে তরফদার সেতার বলে। তরফের তারগুলির সুর রাগানুসারে বাঁধা হয়, কিন্তু বাজানো হয় না। প্রধান তারে রাগের গৎ বাজালে এই তারগুলি থেকে আপনিই রাগ রূপের ঝংকার উৎপন্ন হয়।

এস্রাজ: এস্রাজের গঠনপ্রণালী প্রায় সেতারের মতো। শুধু তুম্বার অংশটি সারিন্দার মতো এবং যন্ত্রটি দু'হাত পরিমাণ লম্বা হয়। তবলী চামড়ায় মোড়া থাকে। প্রধান চারটি তার তাঁত বা ধাতুনির্মিত হয়। তরফের তার পনেরটি পর্যন্ত হয় এবং ষোল থেকে উনিশটি পর্যন্ত সারিকা থাকে। তার-সংখ্যানুযায়ী খুঁটিগুলি পাশের কাঠের পটরী ও যন্ত্রশীর্ষে লাগানো থাকে। প্রধান তারগুলি যথাক্রমে ম় সা় প় / সা এবং সা / প আর তরফের তারগুলি রাগানুযায়ী সুরে বাঁধা হয়। সারিকাগুলি সেতারের মতোই মন্দ্রকড়িমধ্যম থেকে তারগান্ধার পর্যন্ত স্বরস্থানে বাঁধা থাকে এবং রাগানুযায়ী স্থান পরিবর্তন করা যায়। বাঁ হাতে সেতারের মতো তার চেপে এবং ডানহাতে গজ/ছড়ি নিয়ে কোলের উপরে দাঁড় করিয়ে সারেঙ্গীর মতো বাজানো হয়। একক এবং অনুগামী যন্ত্র হিসাবে এর ব্যবহার হয়।

সারেঙ্গী : দেড় দুই হাত পরিমাণ একখণ্ড কাঠ কুঁদে সারেঙ্গী তৈরী হয়। তবলী চামড়ায় মোড়া থাকে। প্রধান চারটি তারের একটি ধাতুর এবং তিনটি তাঁতের হয়। এতে ১৫ থেকে ৩০টি পর্যন্ত তরফের তার থাকে। প্রধান তারগুলি যথাক্রমে মধ্যমধ্যম, মধ্যষড়্জ, মন্দ্রপঞ্চম ও মন্দ্রষড়্জ সুরে বাঁধা হয়। তরফের তারগুলি রাগানুযায়ী সুরে বাঁধা হয়। এতে কোন সারিকা থাকে না। বাঁ হাতের আঙুলে তার চেপে এবং ডানহাতে ছড়ি বুলিয়ে সাধনালব্ধ উপায়ে সারেঙ্গী বাজানো হয়।

রাগসংগীতের আসরে তানপুরার মতো সারেঙ্গীও প্রায় অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র। রাগসংগীতে শিল্পীকে অনুসরণ করাই এর প্রধান কাজ তবে একক বাদনেরও প্রচলন আছে।

রবাব : শোনা যায় আরব বা খোরাসান থেকে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে আনুমানিক তিন-চার শতাব্দী পূর্বে 'রবাব' যন্ত্রটি ভারতে এসেছে। কেহ কেহ প্রাচীন রুদ্রবীণার বিবর্তিত রূপ বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

দেড়হাত পরিমাণ একখণ্ড কাঠ কুঁদে রবাব তৈরী হয়। তবলী চামড়ায় মোড়া থাকে এবং গজদন্তের সওয়ারী হয়। ছয়টি প্রধান তাঁতের তার যন্ত্রশীর্ষ ও যন্ত্রকাণ্ড সংলগ্ন ছয়টি খুঁটির সঙ্গে লাগানো থাকে। এতে কোন সারিকা থাকে না। বাঁ হাতে মাছের আঁস (শল্ক) টেনে এবং ডানহাতে জওয়া (কোণ) দিয়ে আঘাত করে সাধনালব্ধ উপায়ে রবাব বাজানো হয়। তারগুলি সাধারণত মধ্যসপ্তকের 'প রে ম প গ এবং সা' সুরে বাঁধা হয়।

সরোদ : শোনা যায় আরবী ভাষার শা-রুদ শব্দ থেকে সরোদ নামটির উৎপত্তি এবং আনুমানিক দুই-তিন শতাব্দী পূর্বে আরব ও আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে এটি ভারতে এসেছে। কাবুল ও কাশ্মীরে এটি বহুল প্রচলিত। রবাবের সঙ্গে এর আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। কেহ কেহ একে প্রাচীন ভারতের শারদীয়বীণার বিবর্তিত রূপ বলে মনে করেন।

দুই হাত পরিমাণ একখণ্ড কাঠ কুঁদে সরোদ তৈরী হয়। তবলী চামড়ায় মোড়া থাকে এবং হাড় বা গজদন্তের সওয়ারী হয়। প্রধান ছয়টি তার তাঁত ও ধাতু নির্মিত হয় এবং নয়টি থেকে পনেরটি পর্যন্ত তরফের তার থাকে। এতে কোন সারিকা থাকেনা, সেই স্থানে লোহার পাত লাগানো থাকে।

বাঁ হাতের আঙুলে চেপে এবং ডানহাতে 'কোণ' দিয়ে আঘাত করে সাধনালব্ধ উপায়ে সরোদ বাজানো হয়। তারগুলি যথাক্রমে ম প সা প সা ও ম সুরে বাঁধা হয়। প্রসিদ্ধ ওস্তাদ আলাউদ্দীনের পুত্র ওস্তাদ আলিআকবর খাঁ বিখ্যাত সরোদ বাদক হিসাবে পরিচিত।

বেহালা : বেহালার উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। পাশ্চাত্য সংগীতজ্ঞদের মতে Violin বিকাশে ১৬শ শতাব্দীর Viola যন্ত্রটি বিশেষ মহত্বপূর্ণ তথা পূর্ববর্তী সংস্করণ। ইতালীর Cremona নামক স্থানের বিখ্যাত বেহালা-নির্মাণ কেন্দ্রে ১৬শ শতাব্দীতে এর বর্তমান রূপদান করেন Amati, Guarneri, Stradivari প্রমুখেরা□ ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে লংকাপতি রাবণ আবিষ্কৃত 'রাবণস্ত্রম' যা ছড়ির সাহায্যে বাজানো হোত ; পরবর্তীকালে যাকে বলা হোত 'বাহুলীন' ; বেহালা তারই বিবর্তিত রূপ। যা মধ্যযুগে আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়ে য়ুরোপে প্রচলিত হয়।

বেহালা উৎপত্তির উৎস ভারতবর্ষ হলেও বর্তমান বেহালা যে পাশ্চাত্য অবদান সেকথা অনস্বীকার্য। মধ্যযুগে বেহালা শুধু ইতালীতেই সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল, ক্রমে সমগ্র পৃথিবীতে এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।

আনুমানিক দেড়-দুই ফুট লম্বা ফাঁপা কাঠের তৈরী বেহালাতে কোন সারিকা থাকে না। এতে চারটি ধাতু নির্মিত তার থাকে, যেগুলি যথাক্রমে প / ম সা প এবং রেঁ সুরে বাঁধা হয়। বাঁ হাতের আঙুলে তার চেপে, ডানহাতে ছড়ি বুলিয়ে সাধনালব্ধ উপায়ে বেহালা বাজানো হয়। পাশ্চাত্য সংগীতের বিবিধ স্কেলবৈচিত্র্যানুসারে অন্যান্য পদ্ধতিতেও এর সুর বাঁধা হয়ে থাকে। বর্তমানে ভারতীয় রাগসংগীতের অনুষ্ঠানে এর বহুল প্রচলন দেখা যায়। এর বিভিন্ন অঙ্গের পাশ্চাত্য নামগুলি এইরূপ।

১। সুর অনুরণনে সাহায্যকারী মধ্যবর্তী মুখ্য অংশকে বলা হয় Belly.

২। বেলীর চারিপাশের অংশকে Ribs বা Sides বলে।

৩। যে অংশে খুঁটিগুলি লাগানো থাকে তাকে Neck বলে।

৪। খুঁটিগুলিকে Pegs বলে।

□ The World of Music, London 1957, (Vol. II. P. 1995)

৫। যন্ত্রশীর্ষের প্রান্তভাগকে **Head** বা **Serol** বলে।

৬। সওয়ারীকে **Bridge** বলে।

৭। লংগোটকে **Tail piece** বলে।

৮। যে স্থানে আঙুল রেখে বাজানো হয় সেই অংশকে **Finger Board** বলে।

৯। বেলীর ভিতরে, ব্রীজের নীচে একটি ছোট কাঠের খুঁটি লাগানো থাকে, যাকে **Sound Post** বলে।

ন্যাসতরঙ্গ : ধাতুর তৈরী লম্বা প্রায় এক ফুট দুটি বাঁশী বা শানাইয়ের মতো ছিদ্রহীন' যন্ত্র নিয়ে ন্যাসতরঙ্গ বাজাতে হয়। এই যন্ত্র ফুঁ দিয়ে বাজানো হয় না। যন্ত্রদ্বয়ের সরু মুখের নলের মধ্যে একটি করে ঝিল্লিময় সূক্ষ্ম অংশ থাকে। বাদক যন্ত্রদ্বয়ের মুখ দুটি গলার দু'পাশে লাগিয়ে, গলার তন্ত্রীতে শ্বাস-প্রশ্বাসের আশ্চর্য কৌশলে চাপ দেওয়ার ফলে ওই ঝিল্লিময় অংশে বায়ুতরঙ্গ আন্দোলিত হয় এবং সুরবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। যন্ত্র হিসাবে এর ঝিল্লিময় অংশ দু'টিই আসল, কারণ স্বরগ্রামের ছিদ্র না থাকায় সুরের যা কিছু কাজ ওইখানেই উৎপন্ন হয়।

ন্যাসতরঙ্গ বাদন যেন একটি ভেল্‌কিবাজী ছিল। সুরের যাবতীয় সূক্ষ্ম কাজও তাতে দেখানো যেত, সুতরাং এর সাংগীতিক মূল্যও যথেষ্ট ছিল। অন্তত কালীপ্রসন্নের ক্ষেত্রে। কারণ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এর শ্রেষ্ঠ বাদক ছিলেন। তাঁর আগে ও পরে কয়েকজন মাত্র ন্যাসতরঙ্গ বাদকের নাম শোনা যায়। যেমন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগীতসভার নীলমাধব চক্রবর্তী, গোপাল সিংহরায়, আফতাবুদ্দীন (প্রসিদ্ধ আলাউদ্দীন খাঁ'র ভ্রাতা ইত্যাদি।

এই যন্ত্রের বাদক খুব কম হওয়ার কারণ, এই যন্ত্র শুধু বাজানো কঠিনই নয় অত্যন্ত কষ্টসাধ্যও। এই কষ্টকর প্রক্রিয়ার জন্য, আজকাল এর কোন যন্ত্রী আছে কিনা সন্দেহ, এই বাদ্যযন্ত্রটিও লুপ্তপ্রায়।

সুরবীণ / সুরচয়ন / সুরচৈন : 'স্বরবীণ' সেতারের বৃহৎ সংস্করণ। প্রধানত আলাপচারীর এই বাদ্যযন্ত্রটি সেতার ও সরোদের সমন্বয়ে গঠিত। সেতারের যন্ত্রকাণ্ড এবং সরোদের তবলী, তবে তা কাঠের তৈরী। এর আকৃতি সরোদের মতো কিন্তু পর্দা এবং সওয়ারীযুক্ত। সেতারের মতো এই সচল

ঠাটের পর্দাগুলি কিন্তু মুগা সুতায় বা তাঁত দিয়ে বাঁধা নয়, সুরবাহারের মতো পিতলের উপরে পর্দার সারি বসানো। সরোদের মতো কোলে বা বুকে রেখে, মিজরাব বা জবা দিয়ে বাজানো হয়। এর শ্রেষ্ঠ বাদক ছিলেন অসগর আলী খাঁ। যিনি তালিম পেয়েছিলেন রামপুর ঘরাণার অন্যতম প্রবর্তক ও ওমরাও খাঁর পুত্র আমীর খাঁর ভ্রাতা রহিম খাঁ'র (বীণকার) কাছে।

অসগর আলী বীণা ও সরোদ বাদনেও দক্ষ ছিলেন কিন্তু সুরচৈন ছিল তাঁর খুব প্রিয়, যাকে কখনো কখনো সুরবীণ বলেও অভিহিত করতেন। একে তিনি তাঁর ঘরাণার যন্ত্র বলতেন। দ্বারবঙ্গের দরবারেই এঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে।

সুরশৃঙ্গার: রবাবের কাঠের খোলের বদলে লাউ, চর্মাচ্ছাদনীর বদলে কাঠের তবলী, কাষ্ঠপটবীর বদলে সরোদের মতো লৌহপাত নির্মিত পটবী এবং তাতের বদলে লৌহ বা পিতলের তার ব্যবহার করে সুরশৃঙ্গার নির্মিত হয়েছে। এর ধ্বনি গম্ভীর এবং সুমধুর, তাছাড়া সুরের রেশ রবাবের থেকে অনেক বেশীক্ষণ থাকে। শোনা যায় তানসেনের পুত্রবংশীয় সাদিক আলীর পিতা জাফর খাঁ এই যন্ত্রের প্রচলনকর্তা। কাশীরাজ উদিতনারায়ণের দরবারে তার উদ্ভাবিত এই যন্ত্রটি তিনি প্রথম বাজিয়েছিলেন।

একতারা: একতারা একটি তত জাতীয় যন্ত্র। এর আকৃতি ছোট তানপুরার মতো। তবে একটিমাত্র তারযুক্ত। একখণ্ড কাঠ কুঁদে বা লাউয়ের খোলকে দুপাশে ছিদ্র করে, একখণ্ড সুগোল বংশদণ্ড লাগিয়ে যন্ত্রটি তৈরী হয়। খোলের উপরিভাগ চর্মাবৃত থাকে, যার কেন্দ্রস্থলে সওয়ারী অবস্থিত থাকে। যন্ত্রশীর্ষের খুঁটি থেকে একটি তার সওয়ারীর উপর দিয়ে যন্ত্রমূলে লাগানো থাকে। শিল্পী আপন কণ্ঠস্বর অনুসারে সুর বেঁধে সেই একটি-মাত্র সুর আঙুলে বাজিয়ে গান করেন। উত্তর ও পূর্ব ভারতে এবং অন্য কোন কোন স্থানে, বিশেষ করে লোকসংগীতে এর বহুল প্রচলন দেখা যায়। শাস্ত্রে একেই সম্ভবতঃ 'একতন্ত্রীবীণা' বলা হয়েছে। যাবতীয় বীণার উৎস হিসাবে এটি উল্লেখযোগ্য।

দোতারা: দোতারা প্রায় একতারার মতোই, তবে দুটি তারযুক্ত বলেই সম্ভবত এর নাম 'দোতারা' হয়েছে। বর্তমানে চারিটি তারযুক্ত

সরোদের মতো দোতারাও দেখা যায়। এর তারগুলি তাঁত বা ধাতু নির্মিত হয়ে থাকে। সেগুন, তুঁত, নিম প্রভৃতির একটি কাষ্ঠখণ্ড কুঁদে এটি তৈরী হয়। তুম্বার অংশ কিছু মোটা এবং তবলী চর্মাবৃত হয়। বাঁ হাতের আঙুলে চেপে বাজানোর জন্য সেই স্থানে লোহার পাত মোড়া থাকে। ডানহাতে 'কোণ' অথবা আঙুল দিয়ে সরোদের মতোই বাজানো হয়। এই যন্ত্রে কোন গৎ বা হুবহু গান বাজানো হয় না বটে তবে গানের প্রকৃতি অনুসারে কয়েকটি সুর বার বার বাজিয়ে গান গাওয়া হয়। ভারতের সর্বত্রই এর প্রচলন দেখা যায় এবং লোকসংগীতে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণের তাঞ্জোর অঞ্চলে একে 'ঠনঠনা' বলা হয়।

গোপীযন্ত্র : আনন্দলহরীর ঢোলের মতো লাউ নির্মিত একটি খোলের দুই পাশে বাঁশের চটা লাগিয়ে গোপীযন্ত্র তৈরী হয়। চটা দুটি দু-হাত পরিমাণ লম্বা হয় এবং শীর্ষস্থান মিলিত থাকে। যেখানে একটিমাত্র ধাতু নির্মিত তার জড়াবার খুঁটিটি লাগানো থাকে। বাঁশের চটা দুটির একটিকে ডানহাতে ধরে মেজরাবযুক্ত তর্জনীর সাহায্যে এটি বাজানো হয়। চটা দুটির সাহায্যে এর ধ্বনি সামান্য পরিমাণে কমবেশীও করা যায়। বাউল, বৈরাগী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেই এর সবাধিক ব্যবহার দেখা যায়।

সারিন্দা : সারিন্দার আকৃতি অনেকটা সরু সারেঙ্গীর মতো। একখণ্ড কাঠ কুঁদে সারিন্দা তৈরী হয়। এর তুম্বার অংশ অনেকটা বাংলার পাঁচের মতো, যা চর্মাবৃত থাকে। তবলীর উপরের দিকের কিছুটা অংশ বাদ দিয়ে বাকি যন্ত্রকাণ্ডটি কাঠ দিয়ে ঢাকা থাকে। এতে কোন সারিকা থাকেনা, বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে তার চেপে ডানহাতে ছড়ি বুলিয়ে সারেঙ্গীর মতো সাধনালব্ধ উপায়ে বাজানো হয়। এর তিনটি মাত্র তার তাঁত বা ধাতু নির্মিত হয় এবং যথাক্রমে সা প্ সা সুরে বাঁধা থাকে। পূর্ববঙ্গের লোকসংগীতে এটি বহুল প্রচলিত।

আনন্দলহরী, খমক বা গাবগুবাগুব : আনুমানিক ছয় ইঞ্চি লম্বা ও চার ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত ছোট ঢোলের মতো কাষ্ঠনির্মিত বাদ্যযন্ত্র, যার একদিক চর্মাবৃত থাকে এবং অপরদিক খোলা। চর্মাবৃত দিকের কেন্দ্রস্থল থেকে একটি তাঁত জাতীয় তার একহাত পরিমাণ লম্বা টানা দেওয়া থাকে যার অপর প্রান্তে একটি

মাটি বা কাঠের খুঁটি থাকে। এই খুঁটিটি বাঁ হাতের মুঠিতে ধরে এবং ঢোলটিকে বগলে চেপে ডানহাতের আঙুল দিয়ে আঘাত করে এই যন্ত্রটি বাজানো হয়। এই আঘাতের ফলে বাঁ হাতের খুঁটিটি কম্পমান হয় এবং অত্যন্ত সুমধুর ধ্বনিলহরী উৎপন্ন হয়। এই ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের জন্যই সম্ভবত এর নামকরণ হয়েছে আনন্দ-লহরী। চলতি ভাষায় একে 'খমক' বা 'গাবগুবাগুব' বলে। বাংলার বাউলেরা লোকসংগীতে এর সর্বাধিক ব্যবহার করেন।

বাঁশী / মুরলী / বংশী / বেণু : বাঁশী পৃথিবীর প্রাচীনতম ফুৎকার বাদ্যযন্ত্র। একহাত পরিমাণ লম্বা সরু ও সুগোল এক বিশেষ প্রকার বাঁশ দিয়ে এই যন্ত্র তৈরী হয়। একে বাঁশী, বেণু, বংশী, মুরলী প্রভৃতি বলা হয়। একদিকে মুখের কাছে গিঁট বা ছিপি থাকে যার পাশে একটি ছিদ্র এবং অপরদিকে ছয়-সাতটি ছিদ্র থাকে। অপরদিকের ছিদ্রগুলিকে দু-হাতের আঙুলে চেপে বাঁদিকের ছিদ্রে ফুঁ দিয়ে বাঁশী বাজানো হয়।

আড় বাঁশী, সরল বাঁশী, টিপারা বাঁশী : যে বাঁশীর গিঁটের কাছের ছিদ্রতে ফুঁ দিয়ে আড়াআড়ি ধরে বাজানো হয় তাকে 'আড় বাঁশী', যে বাঁশীর গিঁটের কাছে মুখ তৈরী করা থাকে এবং সেই মুখে ফুঁ দিয়ে সোজাসুজি ধরে বাজানো হয় তাকে 'সরল বাঁশী' এবং ত্রিপুরায় তৈরী একপ্রকার বাঁশী, যার মুখের আকৃতি সামান্য বাঁকা ও ছিদ্রযুক্ত, যাকে সরল ও আড় বাঁশীর মাঝামাঝি অবস্থায় ধরে বাজানো হয় তাকে 'টিপারা ফ্লুট' বলে। বর্তমানে টিপারা বাঁশীর প্রচলন অধিক দেখা যায়।

লোকসংগীত ও অন্যান্য গানে বাঁশী বহুল প্রচলিত। বাঁশীতে রাগসংগীতেরও সুন্দর প্রকাশ সম্ভব।

স্বরোৎপত্তি-কৌশল : বাঁশী বাদনের প্রথম ও প্রধান বিষয় হোল ফুৎকার-বৈশিষ্ট্য, যেমন—সবগুলি ছিদ্র বন্ধ করে আস্তে ফুঁ দিলে মন্দ্রপঞ্চম (প) স্বর উৎপন্ন হয়, এবং ফুৎকারের ওজন বাড়ালে যথাক্রমে মধ্য ও তারসপ্তকের পঞ্চম উৎপন্ন হবে। অনুরূপ ফুৎকার কৌশলে নীচের দিক থেকে প্রথম ছিদ্রটি খুলে বাজালে মন্দ্র, মধ্য ও তারধৈবত বাজবে। এইরূপে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ ছিদ্র খুলে বাজালে যথাক্রমে নি, সা, রে, গ ও ম স্বরগুলি উৎপন্ন হবে। আঙুলগুলি সামান্য পরিমাণ সরিয়ে, সাধনালব্ধ

উপায়ে কোমল ও অতিকোমল স্বরগুলি বাজানো হয়। বিভিন্ন স্কেলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাঁশী প্রয়োজন।

শানাই : শানাইয়ের আকৃতি অনেকটা ধুতরা ফুলের মতো। এর মুখটি সরলবাঁশীর মতো এবং কাষ্ঠ নির্মিত হয়। এর বাদন কৌশলও বাঁশীর মতো। কেহ শাহ+নাই=শানাই আবার কেহ প্রাচীন 'সুনাদি' নামক যন্ত্র থেকে এর উৎপত্তি বলে থাকেন। তবে এটি যে বাঁশীরই বিবর্তিত রূপ সে বিষয়ে মতভেদ নেই। এর প্রচলন মুসলমান রাজত্বকালে হয়।

রাগসংগীত ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার লঘু সংগীতে এর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বিভিন্ন মঙ্গলানুষ্ঠানে শানাই প্রায় অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র।

শ্রীখোল : শ্রীচৈতন্যদেবের সময় থেকে কীর্তন গানের প্রধান অনুসঙ্গরূপে শ্রীখোল প্রচলিত। এটি বাংলাদেশে সৃষ্ট এবং বর্তমানে বাংলা, আসাম, মনিপুর এবং আরো নানাস্থানে প্রচলিত। প্রাচীন মৃদঙ্গের (পুষ্কর) সাথে সাদৃশ্য থাকায় একে মৃদঙ্গেরই বিবর্তিত রূপ বলা যায়।

দেড়-পৌনে দুই হাত লম্বা মাটির খোল, যার মধ্যস্থান অপেক্ষাকৃত মোটা, ডানদিকের মুখের ব্যাস তিন-চার ইঞ্চি এবং বাঁদিকের মুখের ব্যাস তার দ্বিগুণ হয়। চর্মাবৃত দুই মুখের বিনুনীর সঙ্গে চামড়ার দেয়ালী টানা দেওয়া থাকে। দুই মুখের ছাউনীতে বৃত্তাকার খিরন দেওয়া থাকে। বসে বা দাঁড়িয়ে শ্রীখোল বাজানো হয়। কীর্তন ছাড়াও রবীন্দ্র ও লোকসংগীতে এর যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়।

কাড়া / নাকাড়া / টিকারা / জগঝম্প : এগুলি অবনদ্ধ শ্রেণীর গ্রাম্য বাদ্যযন্ত্র। এগুলির আয়তন বিভিন্ন প্রকার হলেও আকৃতি প্রায় একই রকম। কাড়া মৃত্তিকা বা কাঠের তৈরী এবং এর আকৃতি বড়ো বাটির মতো হয়। এর উন্মুক্ত মুখটি চর্মাচ্ছাদিত, যা দড়ি বা চর্মরজ্জুর সাহায্যে টানা দেওয়া থাকে। এটি গলায় ঝুলিয়ে দুটি কাঠির সাহায্যে সামরিক এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বাজানো হয়।

নাকাড়ার শাস্ত্রীয় নাম ছিল দুন্দুভি। এটিও অর্ধগোলাকার মৃত্তিকা নির্মিত ও চর্মাচ্ছাদিত এবং সামরিক এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বাজানো হয়।

টিকারা তাম্র, পিতল, কাঠ বা মৃত্তিকা নির্মিত এবং কাড়ার থেকে কিঞ্চিত ছোট হয়। এছাড়া চর্মাচ্ছাদিত দিকের অপর দিকটি কোনাকৃতি হয়। এটি সাধারণত শানাইয়ের অনুগামী যন্ত্র হিসাবে বাজানো হয়।

জগঝম্প আয়তনে কাড়ার থেকে অনেক বড়, এছাড়া এই দুটি বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

জলতরঙ্গ: জলতরঙ্গ একটি ঘনশ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র। কতগুলি চীনামাটি নির্মিত বাটির মধ্যে জলের পারমাণের তারতম্য ঘটিয়ে বিভিন্ন স্বর ধ্বনিত হয়। বাটিগুলি এক খণ্ড কাঠের উপরে শক্তভাবে বসানো থাকে। দুই হাতে দুটি কাঠির সাহায্যে জলতরঙ্গ বাজানো হয়। এর ধ্বনি অত্যন্ত সুমধুর এবং একক ও ঐক্যতানে ব্যবহৃত হয়।

পাখোয়াজ: মৃদঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় পাখোয়াজ যে মৃদঙ্গের অনুসরণেই উদ্ভাবিত বা মৃদঙ্গের নবীনতম বিকাশ সে বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। এর নামটি মুসলমান যুগের অবদান। কারণ পাক+আওয়াজ= পাখোয়াজ। উর্দু ভাষায় পাক অর্থ পবিত্র। ধ্বনি মাধুর্যের দৃষ্টিতে পাখোয়াজ নামটি সার্থকতম।

আনুমানিক দেড়-পৌনে দুই হাত লম্বা একখণ্ড গাম্ভার, খদির, রক্তচন্দন পানস, নিম প্রভৃতির কাঠ কুঁদে এর খোল তৈরী হয়। দুই মুখের ব্যাস চার থেকে সাত ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। ডানদিক অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। চর্মাবৃত দুই মুখের বিনুনীর সাথে চামড়ার দোয়ালী টানা দেওয়া থাকে। সুর বাঁধার জন্য দোয়ালীর সঙ্গে আটটি কাঠের 'গুলি' লাগানো থাকে। ডানদিকের মুখে খিরণ দেওয়া থাকে এবং বাঁদিকের মুখে বাজানোর সময়ে আটা বা ময়দার প্রলেপ দিয়ে নেওয়া হয়।

নাট্যশাস্ত্রকার মৃদঙ্গের (পুষ্কর) যে ষোলটি বর্ণের পরিচয় দিয়েছেন "ক খ গ ঘ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ য র ল হ" সেগুলি পাখোয়াজ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। বর্তমানকালে অবশ্য বিবিধ বাণী ও বোলের প্রচলন হয়েছে তবে প্রাচীন বর্ণগুলিই তার ভিত্তি। যেমন বর্তমানে মুখ্য বোল হোল—ত তা দী থুন না ধেড় ঘে দিগ থির্ড় ঝে ম ইত্যাদি এবং আশ্রিত বোল হোল—ক গ ণ ঝাঁ ধু ধি লাং থেই কিটি ড্যাঁ ইত্যাদি।

বোল উচ্চারণের তিনটি শ্রেণীভাগ আছে যেমন—'খোলা বোল',—সুরেলা রেশযুক্ত ধ্বনি, 'বন্দবোল'—রেশহীন আওয়াজ এবং 'থাপ', (সব আঙুল মিলিয়ে আঘাত করেই হাত সরিয়ে নেওয়ার ক্রিয়াকে থাপ বা থপ্পী বলে)। এই শ্রেণীভাগ তবলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শাস্ত্রীয় ধ্রুপদ, ধামার প্রভৃতি গানে পাখোয়াজ ব্যবহৃত হয়।

বাংলার শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজ বাদক হিসাবে বিশেষভাবে কেশব মিত্র, বসন্ত হাজরা, মুরারী গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

তবলা : শোনা যায়, বিখ্যাত আমীর খসরু নাকি 'তবলা আবিষ্কার করেছেন আবার কেহ কেহ দিল্লীর সিদ্ধার খাঁ'কে এর আবিষ্কর্তা বলে মনে করেন। তবে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, তবলা প্রাচীন পুষ্কর-বাদ্যেরই ক্রমবিবর্তিত রূপ।

'তবলা' বাঁয়া ও তবলা এই দুটি অংশ হয়। এ'দুটিকে পাশাপাশি খড় বা ঘাস নির্মিত বৃত্তের (বিড়ে) উপরে বসিয়ে দু'হাতে বাজানো হয়। এ'দুটির একটি করে মুখ থাকে। আম, কাঠাল, নিম প্রভৃতির একখণ্ড কাঠ কুঁদে তবলের খোল তৈরী হয় এবং বাঁয়াটি সাধারণত মৃত্তিকা নির্মিত হয়। তবে বর্তমানে ধাতু নির্মিত বাঁয়াও প্রচলিত। তবলের মুখের ব্যাস চার-পাঁচ ইঞ্চি এবং বায়ার আট-নয় ইঞ্চি হয়। উভয়ের মুখ চর্মাবৃত এবং মুখের বিনুনীর সাথে নীচেকার বৃত্তাকার ছটের সঙ্গে দোয়ালী টানা দেওয়া থাকে। দোয়ালী সাধারণত চামড়ার হয়, কেহ কেহ বায়াতে রশির দোয়ালী ব্যবহার করেন। সুর বাঁধার জন্য তবলের দোয়ালীর সঙ্গে আটটি 'গুলি' লাগানো থাকে। চামড়ার দোয়ালীযুক্ত বায়াতে কিছু না থাকলেও রশির দোয়ালীযুক্ত বাঁয়াতে সুর বাঁধার জন্য পিতলের কড়া লাগানো থাকে। তবলের সুর সাধারণত ষড়্জ, পঞ্চম বা রাগ বিশেষের বাদী স্বরে বাধা হয়। বায়াতে সাধারণত সুর বাধা হয় না, তবে এর সুর তবলের এক সপ্তক নীচে হওয়া উচিত।

তবলার দশটি মুখ্য বর্ণ সম্বন্ধে শাস্ত্রাকার উল্লেখ করেছেন :—

ধা ধিন তিট তিন না ক ধি, তাকিন কও বিচারে।
তবলাকে দশবর্ণ হৈঁ, ইনকো লেউ সুধারে॥

তবলার বর্ণগুলিকে নিম্নরূপে ভাগ করা হয়েছে—

তবলা বা ডানহাতের বোল :—

না, তা, তিট, কিট, দিন, তিন, থুন ইত্যাদি।

বাঁয়া বা বাঁ হাতের বোল :—

ক, গ, ধি, কৎ ইত্যাদি।

দু'টিকে একসঙ্গে বা দুই হাতের বোল :—

ধা, ধিন্না, ধিনক, গদ্দি, তৃক, তাকিট, কিডনাগ ইত্যাদি।

বর্তমান ভারতীয় সংগীত সমাজে তবলা প্রায় অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্ররূপে প্রচলিত। তবলাতে সংগত করা এবং লহরা বাজানো হয়। তাছাড়া রাগ বিশেষের স্বরসংখ্যানুসারে তবলা এবং একটি বাঁযার সাহায্যে 'তবলা তরঙ্গ' বাজানো হয়।

তবলার চারটি বিখ্যাত ঘরাণার সংবাদ পাওয়া যায়, যেমন ১। দিল্লী ঘরাণা। ২। পঞ্জাব ঘরাণা। ৩। বেনারস ঘরাণা এবং ৪। লক্ষ্ণৌ বা পূর্বী ঘরাণা। সংগত এবং লহরা বাদনে এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। তবে আজকাল আরো কিছু নবীন ঘরাণার সংবাদ পাওয়া যায়।

ঢোল : দেড়হাত পরিমাণ লম্বা তাকিয়ার মতো একখণ্ড মোটা কাঠ কুঁদে ঢোলের খোল তৈরী হয়। এর দুদিকেই মুখ হয় যা চর্মাবৃত থাকে। মুখ দুটির ব্যাস ১০" থেকে ১৪" ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। দু'মুখের বিনুনীর সঙ্গে চামড়া বা রশির দোয়ালী টানা দেওয়া থাকে। বা দিকে খালি হাতে এবং ডানদিকে সাপের ফণার মতো দশ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা সরু একটি ছড়ি দিয়ে ঢোল বাজানো হয়। ঢোল বাংলাদেশে সৃষ্ট এবং পাঁচালীগান, তরজাগান ও নানাবিধ পূজা পার্বণে ব্যবহৃত হয়।

ঢাক : ঢাকের আকৃতি ও উপকরণাদি ঢোলেরই মতো, তবে আকারে অনেক বড়ো হয়। দু'হাত লম্বা ও এক হাত ব্যাসযুক্ত একটি মোটা কাঠের গুঁড়ি কুঁদে ঢাক তৈরী হয। একে দাঁড করিয়ে দুই হাতে দুটি ছড়ি নিয়ে এক দিকে বাজানো হয়। ঢাক বাংলাদেশে সৃষ্ট এবং নানাবিধ পূজা পার্বণে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও এর প্রচলন দেখা যায়।

ঢোলক : ঢোলকের আকৃতি ও উপকরণাদিও ঢোলের মতো। তবে আকারে অনেক ছোট হয়। এক-সোয়া হাত লম্বা এবং চার থেকে আট ইঞ্চি

ব্যাসযুক্ত মুখ হয়। এর দোয়ালী রশির এবং স্বর বাঁধার জন্য পিতলের কড়া লাগানো থাকে। একে খালি হাতে বাজানো হয়।

মহারাষ্ট্রের ঢোলক কিছু লম্বা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের ঢোলকে কিছু না কিছু আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থাকে। ঢোলক সমগ্র ভারতে প্রচলিত। যাত্রা, পাঁচালী, তরজা, কাওয়ালী প্রভৃতি লঘুসংগীত ও লোকসংগীতে ঢোলক ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এর চেয়ে ছোট 'নাল' নামক বাদ্যযন্ত্র ঢোলকের স্থান গ্রহণ করছে।

মাদল: মাদলের খোলটি মাটির তথা সরু হয় এবং চার—ছয় ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত দুই মুখে সামান্য খিরন দেওয়া থাকে। তাছাড়া এর আকৃতি ও উপকরণাদি সবই ঢোলের মতো। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সাঁওতাল, কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে মাদল ব্যবহৃত হয়। এছাড়া আসাম ও মণিপুরেও মাদল প্রচলিত।

খঞ্জনী: ঢোলকের কোন একটি মুখ দু'ইঞ্চি পরিমাণ কেটে নিলে যেমন দেখায়, খঞ্জনীর আকৃতি ঠিক তেমনি। এর চামড়ার ছাউনী আঠা দিয়ে কাঠের চাকাটির সঙ্গে লাগানো থাকে। একহাতে চাকাটি ধরে অপর হাতে বাজিয়ে ছন্দ রাখা হয়, এতে কোন বোল বাজানো যায় না। বিহার ও উত্তর ভারতে এটি অধিক প্রচলিত। লোকসংগীত, ভজন প্রভৃতি গানে খঞ্জনী ব্যবহৃত হয়।

আধুনিককালে, কিঞ্চিত বড় আকৃতির আর এক প্রকার খঞ্জনীর প্রচলন হয়েছে। এর চাকাটির কয়েক স্থানে কেটে, জোড়া জোড়া টিনের চাকতি এমনভাবে লাগানো থাকে যে, বাজানোর সময়ে ঘুঁঘুরের মতো সুন্দর ধ্বনি উৎপন্ন হয়। 'জিপসী' নামক নৃত্যে এর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

করতাল: করতালী থেকেই 'করতাল' নামটি ও এই বাদ্যযন্ত্রটির উৎপত্তি। কাঁসার পাত দিয়ে তৈরী দুটি গোলাকার চাকতি, যার কেন্দ্রস্থলের ছিদ্রে রসি লাগানো থাকে। সেই রসি আঙুলে জড়িয়ে বা দু'আঙুলে ধরে করতাল বাজানো হয়। কেবলমাত্র ছন্দ রাখার জন্যই এটি ব্যবহৃত হয়। তবে নিপুণ বাদকেরা নানা ছন্দো-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে বাজিয়ে থাকেন। কীর্তন, ভজন, রবীন্দ্রসংগীত প্রভৃতিতে এর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

ক্ল্যারিওনেট ঃ ক্ল্যারিওনেট বা ক্ল্যারিনেট একটি সুষির শ্রেণীর পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র। পাশ্চাত্য 'ওবো' নামক বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এ'দুটির মধ্যে পার্থক্য হোল শুধু এই যে, 'ওবো'তে দুটি এবং ক্ল্যারিনেটে একটি মাত্র রীড থাকে। এর আকৃতি কিঞ্চিত বড়ো সানাই ও শানাইয়ের যুক্তরূপ। এ্যাবোনাইট বা আবলুষ কাঠ দিয়ে এটি তৈরী হয়, তবে ইদানিং ধাতুনির্মিতও হয়ে থাকে। এর ছিদ্রগুলি রূপার স্প্রিংযুক্ত চাবির সাহায্যে আচ্ছাদিত থাকে। এটি কেবলমাত্র 'B' এবং 'A' স্কেলেই আগে তৈরী হোত, তবে বর্তমানে বিভিন্ন স্কেলে পাওয়া যায়। যন্ত্রটি কয়েকটি অংশে বিভক্ত থাকে, বাজানোর সময়ে অংশগুলি জুড়ে নেওয়া হয়। অংশগুলির নাম যথাক্রমে Mouth piece, Socket, Main body এবং Horn। 'বেত' বা শর' জাতীয় গাছের সারাংশ থেকে তৈরী 'পাত'-এর মুখে লাগানো থাকে যাকে রীড বলে। এই রীডটি Ligature নামক জার্মান-সিলভার দিয়ে তৈরী একটি অংশের সাহায্যে মুখের সঙ্গে লাগানো থাকে। মুখের এই অংশটি সংরক্ষণের জন্য একটি Mouth cap ব্যবহৃত হয়। গানের অনুগামী, একক এবং বিবিধ ঐক্যতানের উপযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসাবে এটি প্রায় সর্বদেশেই প্রচলিত

ঝাঁঝ ঃ ঝাঁঝ একটি ঘন শ্রেণীর পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র। এর আকৃতি হুবহু করতালের মতো, তবে আয়তনে অনেক বড়ো। এর ব্যাস প্রায় ১৮-২০ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য ঐক্যতান বাদনে (Orchestra) এটি প্রায় অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র। বর্তমানে যাত্রা, থিয়েটার এবং সমবেত যন্ত্রসংগীত প্রভৃতিতে এটি ভারতবর্ষেও বহুল প্রচলিত। ঝাঁঝকে কোথাও 'গঙ্' নামেও অভিহিত করা হয়। একটি দণ্ডের (Stand) উপরে রেখে ছড়ির সাহায্যে অথবা করতালের মতো এটি বাজানো হয়।

ব্যাগ পাইপ ঃ ব্যাগপাইপ একটি সুষির শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র। ইংল্যাণ্ডে ১১শ শতাব্দী থেকে নাকি ব্যাগপাইপ প্রচলিত, তবে এর আবিষ্কার তার বহু পূর্বেই হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। স্কটল্যাণ্ডে এই ফুৎকারবাদ্যটি ভারতীয় শঙ্খের মতো সমাদৃত।

চামড়া বা ক্যাম্বিসের ব্যাগের সঙ্গে কতগুলি (সাধারণতঃ পাঁচ-ছয়টি) বাঁশির মতো পাইপ লাগানো থাকে। ব্যাগটিকে বগলে চেপে এগুলির একটিকে

ফুঁ দিয়ে এবং আর একটিকে (যা বাঁশির মতো ছিদ্রযুক্ত হয়) বাঁশির মতো বাজানো হয়। অন্যান্য পাইপগুলিতে সা, ম, প প্রভৃতি একটি করে সুর বাজতে থাকে।

এর ধ্বনি বিশেষ শ্রুতিমধুর না হলেও বাদ্যবৃন্দের অন্যান্য যন্ত্রের সমবায়ে এর মাধুর্য্য প্রকাশ পায়। উদ্দীপনামূলক উৎসব, March song প্রভৃতিতে এর প্রচলন বেশী। তবে আজকাল অন্যান্য অনুষ্ঠানেও এর ব্যবহার দেখা যায়।

অর্গান: অর্গান সুষির শ্রেণীর বাদ্য। এর উৎপত্তি হয় ২৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। এর স্রষ্টা CTESIBIUS আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী ছিলেন। গোড়ার দিকে এর বায়ু নিয়ন্ত্রণ (Bellow) জলধারার সাহায্যে হোত। তখন এর নাম ছিল জল-অর্গান (Hydraulus Organ)। প্রকৃতপক্ষে বায়ু নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রাদির সৃষ্টি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী থেকে আরম্ভ হয়। বাইজেন্টিয়াম যার নির্মাণকেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত ছিল। স্পেনে ৫ম এবং ইংলণ্ডে ৬ষ্ঠ শতকের শেষে এর নির্মাণ শুরু হয়। ১০ম শতক থেকে চার্চ-সংগীতে এর প্রচলন হলেও এর সুষ্ঠ প্রয়োগ শুরু হয় ১৪শ শতক থেকে। ১৯শ শতকের গোড়া থেকে এর নানা উন্নতিবিধান আরম্ভ হয় যার মধ্যে Octave Coupler উল্লেখযোগ্য। □

অর্গানের আকৃতি পিয়ানোর মতো হলেও এর যান্ত্রিক ব্যবস্থা সবই হারমনিয়মের মতো। এর Bellow নীচের দিকে থাকে এবং দুই পায়ে Pedal করে বাজানো হয়। বর্তমানে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাও প্রচলিত হয়েছে। বায়ু প্রবেশের জন্য Bellow'র সাথে ধাতু নির্মিত পাইপ থাকে। এই পাইপ (নল) দুই প্রকার, ফ্লু ও রীডনল। নলগুলি মোটা ও বড়ো থেকে ক্রমানুসারে সরু ও ক্ষুদ্র হওয়ায় যথাক্রমে মন্দ্র থেকে তার স্থানের স্বরোৎপন্ন হয়। নলের মুখে Valve থাকে, যার সাহায্যে হাওয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। Pedal করে কোন পর্দা চাপলে হারমনিয়মের মতো অবিরাম ধ্বনি উৎপন্ন হয়। সাধারণত বাঁ হাতে Bass chord এবং ডানহাতে মূল সুর বাজানো হয়। তবে নিপুণ বাদকেরা দুটি হাতই সমানভাবে চালাতে পারেন। গৃহস্থ অর্গান অপেক্ষাকৃত ছোট (৫টি সপ্তকযুক্ত) হয়। তবে চার্চের অর্গান সাত সপ্তক পর্যন্ত হয়ে থাকে।

□ The World of Music : K. B. Sandved. 1957. (Vol-2).

গীটার : গীটার তত শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র। মধ্যযুগীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রাদি থেকে এর উৎপত্তি। তখন এর আকৃতি কিঞ্চিত ভিন্ন ছিল তথা ৪টি মাত্র তার ব্যবহৃত হোত এবং কোন বা আঙুলের সাহায্যে বাজানো হোত। কারো মতে ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্পেনে গীটারের উৎপত্তি হয় এবং তখন এতে ৫টি তারের ব্যবহার ছিল। আবার কারো মতে গীটার স্পেনের Gittern যন্ত্রের উন্নত রূপ এবং উক্ত শব্দ থেকেই এই নামকরণ হয়েছে। এর ৬ষ্ঠ তারটি নাকি ১৮শ শতকে যুক্ত হয়। অবশ্য ১৭শ শতাব্দী থেকেই সমগ্র য়ুরোপে গীটার খুব জনপ্রিয় ছিল এবং Paganini, Berlicz প্রমুখ সংগীতগুণীরা একে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সাধারণভাবে, এর তারগুলি যথাক্রমে "E-A-d-g-b-e" সুরে বাঁধা হোত যা প্রায় অপরিবর্তনীয়রূপেই প্রচলিত আছে। ১৯শ শতাব্দীতে পূর্ববর্তী গীটারের সংস্কার সাধন করে বর্তমান রূপদান করেন স্পেনের Antonio Torres। য়ুরোপের Folk song তথা Popular music বিকাশের ক্ষেত্রে গীটারের ভূমিকা অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। □□

রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর যন্ত্রকোষ গ্রন্থে বলেছেন যে, ভারতবর্ষ থেকে কচ্ছপীবীণা পারস্যে যায় এবং গীতার, সিতার, এ্যসোর প্রভৃতি নামে প্রচলিত হয়। পরে মূরগণ গীতার স্পেনে নিয়ে যায়। সেখান থেকে হাওয়াই দ্বীপে এবং পরে সর্বত্র এর প্রসার হয়। বর্তমানে তাই স্প্যানিশ ও হাওয়াইন এই দুই প্রকার গীটার প্রসিদ্ধ। উভয় গীটার প্রায় একই প্রকার, তবে সুর বাঁধার প্রণালী তথা বাদন পদ্ধতি কিঞ্চিত ভিন্ন। স্প্যানিশ গীটার বাঁ হাতের আঙুল ও পর্দার সাহায্যে বাজানো হয় এবং হাওয়াইন গীটার বাঁ হাতে দুই-আড়াই ইঞ্চি লম্বা একটি সুগোল দণ্ড (Steel bar) তারের উপরে বুলিয়ে এবং ডানহাতের তিনটি আঙুলে তিনটি বিশেষ প্রকার আংটি (Picks) লাগিয়ে, চেয়ারে বসে, দুই জানুর উপরে যন্ত্রটি শায়িত রেখে বাজানো হয়। ভারতবর্ষে হাওয়াইন গীটারের প্রচলন বেশী। এটি আবার কাঠের এবং কাঠ বা ধাতু নির্মিত ইলেক্ট্রিক গীটার ভেদে দুই রকম। এর আকৃতি অনেকটা বড়ো বেহালার মতো। এর যন্ত্রকাণ্ডে (Fret board) ১৮ থেকে ২০টি পর্দা (ইলেক্ট্রিক গীটারে

□ E. B. 1971. London (Vol. X. P. 1026.)
□ The World of Music. 1957. London. (Vol. II. P. 1995)

১৮ থেকে ৩০টি পর্যন্ত) স্বরস্থান চিহ্ন (Position marks) থাকে। তার ছয়টির (ইলেক্‌ট্রিক গীটারে সাত-আটটিও হয়) প্রথম ৩টিকে Treble এবং অপর ৩টিকে Bass string বলে। প্রধানত দুই প্রকার স্বর বাঁধার রীতি দেখা যায়। যেমন,

১। গ সা প সা় গ় প়

২। সা প সা গ প় সা়

গীটারের ধ্বনি অত্যন্ত সুমধুর এবং প্রাণস্পর্শী হয় তাই বর্তমানে এর বহুল প্রচলন দেখা যায়। রবীন্দ্র-সংগীত, লঘুসংগীত এমনকি রাগসংগীতেও এককভাবে গীটার বাজানো হয়। সংগীতের অনুগামী যন্ত্র হিসাবেও গীটার অত্যন্ত সমাদৃত। সমবেত বাদ্যবৃন্দেও এর সমাদর উল্লেখযোগ্য।

পিয়ানো: কিঞ্চিত মতভেদ থাকিলেও পিয়ানোর স্রষ্টা হিসাবে ফ্লোরেন্সের Bartolommeo Cristofori (1655-1713) স্বীকৃত। যিনি ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে "Gravecembalo Col Piano e fort" যন্ত্র নির্মাণ করেন। অবশ্য এই জাতীয় যন্ত্র এটাই প্রথম ছিল না, কারণ ১৪৪০ সালে Henri Arnault of Zwolle বর্ণিত 'Ducle Melos', ১৬১০ সালে Belle Skinner উল্লিখিত Holyoke, Mass প্রভৃতিকে Piano জাতীয় তথা এর পূর্ববর্তী সংস্করণ বলা যায়। পরবর্তীকালে একে Pianofort বলা হোত এবং ক্রমে শুধু Piano নামেই এটি প্রসিদ্ধিলাভ করে। জার্মানেরা এর শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিল। Stein এবং Streicher ১৭৮৩ সালে Damper এবং ফ্রান্সের Erard ১৮২৩ সালে আধুনিক Double-escapement action সৃষ্টি তথা সংযোজন করে Piano'কে আরো সমৃদ্ধ করেছেন।[1, 2]

গবেষকদের মতে প্রাচীন হার্পসিকর্ড যন্ত্রের অনুকরণে নাকি এর উৎপত্তি এবং প্রাচীন হার্প বা হার্পসিকর্ড প্রাচীন ভারতীয় 'কানন' যন্ত্রের অনুসরণে সৃষ্ট। কানন বাদ্য অতি প্রাচীন ভারতীয় শততন্ত্রী বা কাত্যায়নী বীণার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল বলে কথিত আছে। কানন যন্ত্রটি ছিল বাক্সের মতো, দুই পাশের লোহার খুঁটির সঙ্গে (প্রথমে ৪০/৪২টি তার ছিল, পরে

1. Encylopaedia Britannica . 1971 London (Vol. XVII. P. 1039)
2. The World of Music : 1957. London. (Vol. II. P. 1997)

আরো বৃদ্ধি পায) তারগুলি লাগানো থাকতো এবং আঙুল বা কাঠির সাহায্যে বাজানো হোত।[১]

হার্প, কানন আদির মতো পিয়ানোতে তারগুলি বিন্যস্ত থাকলেও এটি আধুনিককালের সুন্দরতম সৃষ্টি। পিযানো দুই প্রকার : ছোট (Cottage) এবং বড়ো (Grand)। বা-হাতে Bass chord ডানহাতে মূল সুর এবং দুই পাযে সুর নিযন্ত্রন করে পিযানো বাজানো হয। নিপুণ বাদকেরা দুটি হাতই সমানভাবে ব্যবহার করে থাবেন। এর বাইরের আকৃতি প্রায় অর্গানের মতো হলেও, ভিতরের যান্ত্রিক ব্যবস্থা একেবারে ভিন্ন। এতে পাঁচ থেকে সাত সপ্তক পর্যন্ত Keyboard থাকে এবং প্রতিটি পর্দার জন্য ১টি, ২টি বা ৩টি করে তার—শক্তভাবে স্বর বাধা থাকে। এগুলি একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত, পর্দাসংখ্যানুসারে থরে থরে সাজানো থাকে। পর্দার উপরে আঙুলের সাহায্যে আঘাত করলেই যান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি ছোট হাতুড়ি (যা প্রতিটি পদর জন্যই নিশ্চিত থাকে) Pinboard এর তারে আঘাত করে। ফলে সমধুর ধ্বনি উৎপন্ন হয়। Pinboard এর কাছে আবার একটি করে ফেল্ট মোড়া কাঠের টুকড়ো (Damper), এমন যান্ত্রিক ব্যবস্থায সংযুক্ত থাকে যে, পর্দা থেকে আঙুল সরালেই সেটি তার স্পর্শ করে, ফলে ধ্বনির কম্পন স্তব্ধ হযে যায। তবে স্বরের স্থাযীত্ব নিযন্ত্রণের জন্য দুটি Pedal থাকে ডান পাযেরটি চাপলে Damper গুলি নিষ্ক্রিয় হযে যায, ফলে ধ্বনি-কম্পন বেশীক্ষণ স্থাযী হয, আর বাঁ-পায়েরটি চাপলে সম্পূর্ণ Pinboardটি সামান্য দূরে সরে যায, ফলে স্বরাঘাতগুলি দুর্বল হয়। এইরূপে Pedal এর সাহায্যে স্বর নিযন্ত্রিত হয। পাশ্চাত্য সংগীতের বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ বাদ্যযন্ত্র হিসাবে Piano স্বীকৃত। বর্তমানে সবদেশেই এটি অত্যন্ত জনপ্রিয।

হার্প : হার্প ততশ্রেণীর তথা পাশ্চাত্যের প্রাচীনতম বাদ্যযন্ত্র হিসাবে স্বীকৃত। ধনুকারতি হার্পের চিত্র, ২০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে ইজিপ্টের সমাধি-গম্বুজে উৎকীর্ণ পাওয়া গেছে। ১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে কোনযুক্ত হার্পের চিত্র পাওযা গেছে, যাকে Assyrians বলা হয়। খৃষ্টীয ৫ম শতাব্দীতে Irish হার্প বিকাশলাভ করে, যা ক্রমে যুরোপে প্রচলিত হযেছিল। গানের সহযোগী যন্ত্র

১। ভারতীয় সংগীতকোষ : বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী : বৈশাখ, ১৩৭২।

হিসাবে হার্পকে Minnesinger আদি সম্প্রদায়েরা ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যবহার করতো। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে জার্মান Hochbrucker সাতটি Pedals যুক্ত একপ্রকার উন্নত হার্প নির্মাণ করেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের[1] Erard পূর্বোক্ত হার্পের আরো উন্নতি বিধান করেন।

খৃষ্টপূর্ব ১৩শ শতাব্দীতে মিশরেও নাকি হার্প প্রচলিত ছিল। হার্প বহুবিচিত্র আকৃতির হয়ে থাকে। য়োরোপে সকলেই হার্প বাজানোর অধিকার পেত না। এমন কি সাধারণ এবং রাজপরিবারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হার্প ব্যবহৃত হোত। সাধারণত তিনটি বাহু যন্ত্রের (ত্রিভুজাকৃতি) দুটির মধ্যে তারগুলি বিন্যস্ত থাকে, যার একটির সঙ্গে বাক্সের মতো একটি ধ্বনিকোষ সংযুক্ত থাকে। বাদক উচ্চাসনে বসে দুই জানুর মধ্যে স্থাপন করে, দুই হাতের আঙুলের সাহায্যে হার্প বাজিয়ে থাকে। প্রাচীন ভারতের কাত্যায়নী বীণা তথা কাননের সঙ্গে এর সাদৃশ্য প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

হারমনিয়ম: Anton Haeckl (Vienna 1818) উদ্ভাবিত Physharmonica-কে সম্ভবত হারমনিয়ম জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বলা যায়। তবে এর স্রষ্টা হলেন Alexandre Debain (Paris, 1840)। প্যারিসের Victor Mustel এবং আমেরিকার Jacob Estey ১৮৫০ সালে এর কিছু উন্নতি সাধন করেন।[2] কিন্তু তখন এর Bellow ব্যবস্থা এবং আকৃতি ছিল প্রায় অর্গানের মতো তথা বিশাল।[2] বর্তমানের সুদৃশ্য ও সুবিধাজনক হারমনিয়মের উদ্ভাবক হোল কলিকাতা Dwarkin & Son কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা দ্বারিকানাথ ঘোষ (১৮৮০ খৃঃ)।[3]

এই সুষির শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রের আকৃতি একটি বাক্সের মতো। সাধারণত ৩/৩½ Octave সমন্বিত Keyboard থাকে। ভিতরে Pinboard স্থানে প্রতিটি পর্দার জন্য একটি বা একাধিক রীড-যুক্ত সারি থাকে। রীড-সারি-সংখ্যানুসারে Single, double আদি রীডের হারমনিয়ম বলা হয়। অপর পাশের Bellow বাঁ হাতে চালনা করে ডানহাতে পর্দা চেপে বাজানো হয়।

1. The World of Music. (Vol. II. P. 1998) London 1957.
2. E. B. London, 1971 (Vol. XI P. 109).
3. Dwarkin & Son, Catalogue 'H': May, 1971

এই প্রক্রিয়ায় যেসকল পর্দা চাপা হয়, যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেগুলি অবিরাম বাঁশির মতো বাজতে থাকে। তবে আঙুল সরালেই ধ্বনি স্তব্ধ হয়ে যায়। Bellow'র বিপরীত দিকে Keyboard এর নীচে কতগুলি চাবি (Stopper) থাকে, যেগুলির সাহায্যে হাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে একটি বা একাধিক Red set ইচ্ছানুযায়ী বাজানো যায়।

আজকাল সরল ও স্কেলচেঞ্জ ভেদে দুইরকম হারমনিয়ম প্রচলিত। এদের যান্ত্রিক ব্যবস্থা একই রকম। তবে স্কেলচেঞ্জে Keyboardটি এমন যান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্মিত যে, কয়েকটি পর্দা পর্যন্ত তাকে আগে-পিছে সরানো যায়। এছাড়া coupler ব্যবস্থা থাকায়, বাজানোর সময় একসপ্তক নীচের স্বরগুলিও বাজতে থাকে। অবশ্য coupler ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয়ও করা যায়। এইরূপ coupler ব্যবস্থা সরল হারমনিয়মেও কদাচিৎ দেখা যায়।

বর্তমানে হারমনিয়ম সুবিধাজনক ও সহজলভ্য হওয়ায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রাথমিক শিক্ষার্থী প্রায় সকলেই এই যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু এর গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন নয়। পিয়ানো, অর্গান, হারমনিয়ম প্রভৃতির স্বর-পর্দাগুলি সমান স্বরান্তরালযুক্ত হয়, ফলে পাশাপাশি যে কোন দুটি স্বরের ব্যবধান প্রায় সমান থাকে। তাই যে কোন পর্দাকে 'সা' (ষড্‌জ) নিশ্চিত করে সংগীত সাধনা করা সম্ভব। কিন্তু ভারতীয় স্বর রচনার দৃষ্টিতে, অর্থাৎ শ্রুতিভেদ অনুসারে, উক্ত স্বরসজ্জা ভ্রান্তিপূর্ণ। সুতরাং এই যন্ত্র সহযোগে স্বর সাধনা যতই সফল মনে হোক না কেন পরিণামে কিছু ত্রুটিপূর্ণ হওয়া অনিবার্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কর্ণাটক সংগীতশাস্ত্র

কর্ণাটক ও হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি ঃ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, ১৩শ-১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে সংগীতের রূপ ও রীতি-নীতি, সামান্য আঞ্চলিক বিভেদ-বৈচিত্র্যাদি ছাড়া প্রায় একই রকম ছিল। অর্থাৎ তখন পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণ কিংবা পূর্ব-পশ্চিম প্রভৃতি কাল্পনিক সীমারেখা টেনে ভারতকে বিভক্ত করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ১১শ-১২শ শতাব্দী থেকেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ আরম্ভ হয়, যার চরম পরিণতি হোল হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির বিকাশ।

বর্তমানে মাদ্রাজ, মহীশূর, অন্ধ্র প্রভৃতি বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত সংগীতকে দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটক সংগীত পদ্ধতি এবং এছাড়া সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে প্রচলিত সংগীতকে উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি বলা হয়। গোয়ালিয়রের ধ্রুপদ, মথুরার হোরী, ব্রজধামের গোপীনৃত্য, গুজরাটের গর্বানৃত্য, লক্ষ্ণৌর কত্থক নৃত্য, মণিপুরের মণিপুরী নৃত্য প্রভৃতি হিন্দুস্থানী সংগীতেরই অন্তর্ভুক্ত।

কর্ণাটক সংগীতের সময়কাল বিভাজন : সংগীত-ক্রমবিকাশের সময়কালকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রাচীনকাল বলতে প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে মতঙ্গের সময় পর্যন্ত বোঝায়। যার মধ্যে অন্তর্বিভাগ হিসাবে ভরতপূর্ব ও ভরতের পরবর্তীকাল আছে। অর্থাৎ উদাত্তাদিস্বর কাল থেকে গ্রাম, মূর্ছনা, জাতি তথা বৈদিক মন্ত্রগান প্রভৃতির প্রচলন ছিল ভরতের পূর্বে। রাগাদির বিকাশ হয় পরবর্তীকালে। মধ্যযুগ হিসাবে মতঙ্গ থেকে পুরন্দর দাসের (১৪৮৪-১৫৬৪) সময়কাল পর্যন্ত স্বীকৃত। যার মধ্যে অন্তর্বিভাগ হিসাবে সংগীতরত্নাকরের পূর্ব ও পরবর্তীকাল

আছে। বস্তুতঃ রত্নাকরের পরবর্তীকালেই গীত স্বতন্ত্র কলারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আগে গীত ছিল নাটকাদির অণুসঙ্গরূপে প্রযুক্ত।[১]

আধুনিককালকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, ত্যাগরাজের পূর্ব (৭২ থাটের কল্পনা ওই সময়ে হয়েছিল), ত্যাগরাজের (১৭৬৭-১৮৪৭) সময়-কাল (বিবিধ আধুনিক সংগীতের বিকাশকাল) এবং তাঁর পরবর্তীকাল। এই বিভাজনকে এইরূপেও কেহ কেহ উল্লেখ করে থাকেন। যেমন,

১। ১৬৫০-১৭৫০ খৃঃ—সংগীত-গবেষণাদির সময়কাল,

২। ১৭৫০-১৮৫০খৃঃ—ত্যাগরাজ, মথুস্বামী, শ্যামশাস্ত্রী, রামস্বামী প্রমুখ অতিগুণী সংগীতস্রষ্টারা জন্মগ্রহণ করেন।

৩। ১৮৫০-১৯৫০খৃঃ—শুধু সংগীতশিল্পীরা জন্মগ্রহণ করেছেন।

কর্ণাটক সংগীতের ক্রমবিকাশ: বৈদিক যুগে সংগীতের প্রাথমিক ওঁ ধ্বনি স্বরিত স্থানে আবদ্ধ হয়ে ক্রমে উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরযোগে লীলায়িত ছিল। সপ্তস্বর তিনগ্রাম বিকাশের পরেও সামগান ষড়্‌জগ্রাম থেকে চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতি স্বরগ্রামে বিকশিত ছিল। সেই গীতরীতি ছিল অত্যন্ত কঠিন, কারণ বিভিন্ন স্বরগ্রামে গাওয়া সহজসাধ্য নয়। পরবর্তীকালে বীণার সাহায্যে "আধার ষড়্‌জের" বিকাশ হয়। যার ভিত্তিতে কণ্ঠ-সংগীত অনেক সহজসাধ্য হয়। কালক্রমে মূর্ছনা, জাতি তথা জাতিরাগাদির বিকাশ হয়।

দক্ষিণ ভারতে চিরদিনই সংগীতচর্চার আধিক্য ছিল। সেখানকার ভৌগলিক পরিস্থিতি, রীতিনীতি, ভাষা প্রভৃতি বহুবিধ কারণে, নানা বিবর্তনের মধ্যেও প্রান্তীয় কৌলিন্য রক্ষা পেয়েছে। তাই প্রাচীন ভারতীয় সংগীত-রূপের আভাস কিছু পরিমাণে কর্ণাটক সংগীতেই বিদ্যমান।

প্রাচীন তামিল সংগীতের শুদ্ধ মেল ছিল ষড়্‌জগ্রামের মধ্যম মূর্ছনা 'মৎসরীকৃতা', যার রূপ অনেকটা বর্তমান উত্তর ভারতীয় ইমন রাগের মতো ছিল। প্রাচীন দক্ষিণ ভারতীয় রাগ হিসাবে এখনও সেখানে পুরনির, ইনদিস, কনককুরিঞ্জি, নবরসম্ প্রভৃতি এবং অপ্রচলিত রাগ হিসাবে বিজবন্তী, পতি, গোপীকাবসন্ত, গৌলিপন্ত, কেদারপন্ত, কম্বরম্ প্রভৃতির সমাবেশ দেখা যায়।

১ P. Sambomoorthy : History of Indian Music. 1960.

প্রাচীন তামিল নাটকাদিতে সাংগীতিক নানা উপাদানাদির পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে ষড়্জাদি স্বরকে যথাক্রমে কুরাল, তুত্তাম, কেক্কিলাই, উলাই, ইলাই, বিলারি ও তারম ; লয়কে অসাই, দ্রুতকে কুট্টু ; গুরুকে তুক্কু ; প্লুতকে অসবু ; অনুদ্রুতকে চীর প্রভৃতি বলা হয়েছে. তাল হিসাবে তখন চেম্পট, অদন্ত মুরিয়দন্ত, চম্প, পঞ্চারি প্রভৃতির প্রচলন ছিল। পরে এগুলি আদি, অট, ঝম্প, রূপক প্রভৃতি নামে রূপান্তরিত তথা সপ্ততালম পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়।

পাদুকোট্টারাজ্যে মেলাইক্কোবিলের কাছে কুডুমিয়ামলই নামক স্থানে শিক্ষনাথ মন্দিরের পিছনে প্রাপ্ত শিলালিপি একটি অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এই শিলালিপিতে মহর্ষি নারদ (১ম শতাব্দী) উল্লিখিত সাতটি গ্রামরাগের সংকেতলিপি খোদাই করা আছে। রামাপ্পা মন্দিরের ভাস্কর্য এবং অন্যান্য স্মারক স্তম্ভ প্রভৃতিতেও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের বিচিত্র নিদর্শন পাওয়া যায়।[১]

দক্ষিণের অধিকাংশ সংগীত ছিল হরিকাম্ভোজি (খমাজ) বা এর মধ্যম মূর্ছনা খরহরপ্রিয় (কাফী) বা ষড়্জগ্রামের ভিত্তিতে রচিত। কেরলের সংগীত ছিল সোপান ও দেশীয় এই দুটি গায়কীধারা নিয়ে বিকশিত। সোপান হোল অভিজাত ক্লাসিকাল শ্রেণীর গান। মন্দিরের সোপানে গাওয়া হোত বলেই সম্ভবত এই নামকরণ হয়েছে। সোপান থেকেই নাকি গীতিনাট্য তথা কথাকলি নৃত্যের বিকাশ হয়েছে। এই নৃত্য ও নাট্য সম্বলিত সোপানকে অট্টককথা (কথাকলির আর এক নাম) বলে, এগুলি গানের আকারে শ্লোকে রচিত। কেরলে প্রায় তিনশত অট্টককথার প্রচলন আছে। ১৯শ শতক থেকে দেশীয় সংগীতের প্রচলন হয়।

তাঞ্জোর তথা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে জয়দেবের গীতগোবিন্দ-গানের বহুল প্রচলন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথা লক্ষণীয় বিষয়। পণ্ডিত চেরুকুরি লক্ষ্মীধর ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে গীতগোবিন্দ গ্রন্থের 'শ্রুতিরঞ্জনী' টীকা রচনা করেন। কেরলের বহু মন্দিরে 'এডক্ক'-বাদ্য সহযোগে অষ্টপদী গান করা হয়। রামপুরত্থু বরিয়ার মলয়ালম ভাষায় গীতগোবিন্দ গানের প্রচলন করেন. যার নাম

১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : রাগ ও রূপ (২য় খণ্ড) ১৯৬১।

ভাষাষ্টপদী। অবশ্য গীতগোবিন্দে উল্লিখিত প্রাচীন রাগ তথা তাল নামগুলির যথেষ্ট রূপ পরিবর্তন হয়েছে।

কর্ণাটক সংগীতধারা বিকাশের পরে যে সকল অতিগুণী সংগীত সাধক ও স্রষ্টা স্বনামধন্য হয়েছেন তাদের মধ্যে পুরন্দর দাস (১৪৮৪-১৫৬৪), ভদ্রাচল রামদাস (১৬২০-১৬৮৮), ত্যাগরাজ (১৭৬৭-১৮৪৭), মুথুস্বামী দীক্ষিতর (১৭৭৬-১৮৩৫), ·রামস্বামী দীক্ষিতর (১৭৩৫-১৮১৭), শ্যামশাস্ত্রী (১৭৬২-১৮২৭) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া ত্রিবাংকুরাধিপতি স্বাতি তিরুনল (১৮১৩-১৮৪৭) সংগীতের একজন অতি উচ্চ শ্রেণীর স্রষ্টা ছিলেন। তিনি কীর্তনম, পদ, বর্ণ, জাবালি, স্বরজাতি, রাগমালিকা, প্রবন্ধ প্রভৃতি শ্রেণীর পাঁচ শতাধিক গান রচনা করেছেন। এতো অল্প জীবনকালের মধ্যে এঁর মতো কীর্তিবান সমগ্র ভারতবর্ষে বিরল।

ভারতীয় সংগীত প্রগতির ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতীয় শাস্ত্রীদের গ্রন্থসমূহ বিশেষ মহত্বপূর্ণ। যে সকল গ্রন্থ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় উভয় পদ্ধতিরই প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত, অতঃপর তেমন কতগুলি গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্তাদের নামোল্লেখ করা হোল। যেমন,

৯ম-১১শ শতকের পার্শ্বদেব রচিত সংগীতসময়সার, ১২শ শতকেব রাজা সোমেশ্বর রচিত অভিলাষচিন্তামণি বা মানসোল্লাস, রাজা প্রতাপ রচিত সংগীতচূড়ামণি, ১৩শ শতকের শার্ঙ্গদেব রচিত সংগীতরত্নাকর, সিংহভূপাল রচিত রত্নাকরের টীকা, সংগীতসুধাকর ও রসবর্ণসুধাকর (নাটক), ১৪শ শতকের রাজা হরিপালদেব রচিত সংগীতসুধাকর, মাধব বিদ্যারণ্য বচিত সংগীতসার, ১৫শ শতকের চতুর কল্লিনাথ রচিত রত্নাকরের টীকা, ১৬শ শতবের রামামাত্য রচিত স্বরমেলকলানিধি, পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল রচিত রাগমালা, সদ্রাগচন্দ্রোদয়, নর্তননির্ণয় ও রাগমঞ্জরী, সোমনাথ রচিত রাগবিবোধ, ১৭শ শতকের রাজা রঘুনাথ রচিত সংগীতসুধা, ব্যংকটমুখী রচিত চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা, ভাবভট্ট রচিত অণুপবিলাস, অণুপাংকুশ ও অণুপসংগীতবিলাস, ১৮শ শতকের তুলজাজী রচিত সংগীতসারামৃত প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

১৪ শতকের বিদ্যারণ্য সর্বপ্রথম ১৫টি জনক এবং ৫০টি জন্য রাগের কল্পনা তথা পরিচয় দিয়েছেন। মেলচক্র বা জন্য-জনক রীতিতে রাগ বর্গীকরণের

ইনিই প্রথম প্রবর্তক। এঁর বর্ণিত শুদ্ধমেল 'মুখারী' বর্তমান হিন্দুস্থানী সংগীতের কাফীর মতো ছিল। রাজা রঘুনাথ এঁকে কর্ণাটসিংহাসনভাগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। মেল বর্ণনাকালে তিনি বিদ্যারণ্যের ভাষ্যের উল্লেখ করে বলেছেন:

রাগস্তুপঞ্চাশৎ ইহোপদিষ্টাঃ নষ্টদয়সর্বজগৎ প্রসিদ্ধাঃ।
তেষাংমতাঃ পঞ্চদশৈব মেলাঃ ক্রমাৎতদুদ্দেশামহামিনামঃ॥

সুতরাং স্বরমেল কলানিধিকার রামামাত্য, রাগবিবোধকার সোমনাথ বা রাগতরঙ্গিণী ও রাগসর্বসংগ্রহকার লোচন প্রমুখের বহুপূর্ব থেকেই মেলপদ্ধতির বিকাশ বা কল্পনা হয়েছিল।

পণ্ডিত ব্যংকটমুখীই সর্বপ্রথম ষড়্জ ও পঞ্চমকে অবিকৃত (অচল স্বর) এবং অন্যান্য স্বরের বিকৃতভাব স্বীকার করে ৭২টি থাট পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। ইতিপূর্বে শার্ঙ্গদেব ষড়্জ ও পঞ্চমেরও বিকৃতভাব তথা দশটির পরিবর্তে তেরোটি রাগলক্ষণ স্বীকার করেছিলেন।

পণ্ডিত ব্যংকটমুখী রাগগুলিকে গ্রহ, অংশ, ন্যাস প্রভৃতি অনুসারে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে সম্পূর্ণ রাগ বলতে আরোহাবরোহণ মিলে সাতটি স্বর বোঝায়, কিন্তু গোবিন্দাচার্যের মতে আরোহাবরোহণ উভয়েতেই সাতটি করে স্বর থাকা চাই। ষাড়ব ও ঔড়ব সম্পর্কেও ব্যংকটমুখীর অভিমত স্বতন্ত্র। গোবিন্দাচার্য ৭২টি থাট তথা রাগকে সম্পূর্ণ শ্রেণীর বলেছেন। ব্যংকটমুখী এগুলিকে জন্যরাগ বলে উল্লেখ করেছেন। এঁদের দুজনের স্বর পার্থক্য হোল শুধু চতুঃশ্রুতি ঋষভ ও ধৈবত স্বরদ্বয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মহাগুণী ত্যাগরাজ, গোবিন্দ দীক্ষিত প্রমুখ পণ্ডিত ব্যংকটমুখীর রাগনাম ও বিভাগকে স্বীকার করে বহু সংগীত রচনা করেছেন।

শোনা যায় ব্যংকটমুখী, ৭২ থাট প্রবর্তনের বিষয়ে তাঁর পিতা গোবিন্দ দীক্ষিতের (যিনি রাজা রঘুনাথের মন্ত্রী বা আমত্য ছিলেন) কাছে অণুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

৭২টি থাটের রচনা পদ্ধতি: পণ্ডিত ব্যংকটমুখী ও গোবিন্দাচার্য একই পদ্ধতিতে ৭২টি থাট রচনা করেছেন। যেমন, সপ্তকের ১২টি স্বর। প্রতি ম'কে

(কড়ি মধ্যম) বাদ দিয়ে, তারষড্‌জকে যোগ করে ১২টি স্বরসংখ্যা পূর্ণ এবং পূর্ব ও উত্তর এই দুটি অঙ্গে ১২টি স্বরকে এইরূপে ভাগ করেছেন—

১। পূর্বাঙ্গ।	২। উত্তরাঙ্গ।
সা রে রে গ গ ম	প ধ ধ নি নি সাঁ

থাট রচনার নিয়মানুসারে তারষড্‌জ সহ সর্বদা ৮টি স্বর হওয়া প্রয়োজন, অতএব এই অর্ধমেল দুটি থেকে ৪টি করে স্বর নিয়ে অদল-বদল করে এইরূপে সাজানো হয়েছে।

পূর্বাঙ্গ।	উত্তরাঙ্গ।
১। সা রে রে ম	১। প ধ ধ সা
২। সা রে গ ম	২। প ধ নি সাঁ
৩। সা রে গ ম	৩। প ধ নি সা
৪। সা রে গ ম	৪। প ধ নি সা
৫। সা রে গ ম	৫। প ধ নি সা
৬। সা গ গ ম	৬। প নি নি সা

অর্থাৎ সর্বাধিক ৬টি করে অর্ধমেল উৎপন্ন হয়। এখন এই অর্ধমেলগুলিকে ১+১, ১+২, ১+৩, ১+৪ প্রভৃতি বিভিন্নভাবে, যোগ করে সাজালে সর্বাধিক ৬×৬=৩৬টি মেল উৎপন্ন হতে পারে। এ পর্যন্ত প্রতি ম (কড়ি মধ্যম) ব্যবহৃত হয় নি, সুতরাং শুদ্ধমধ্যম স্থানে কড়ি মধ্যম প্রযোগ করে, পূর্ব-প্রক্রিয়ানুসারে আরো ৩৬টি মেল উৎপন্ন হবে। এইরূপে ৩৬+৩৬=৭২টি থাট রচনা করা হয়েছে।

এখানে একটি কথা মনে আসা স্বাভাবিক যে, থাট রচনার নিয়মানুসারে যখন কোন স্বরের পাশাপাশি দুটি রূপ নেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ ছিল তখন পূর্বোক্ত প্রণালী কেমন করে গৃহীত হোল ? পণ্ডিত ব্যংকটমুখী এই প্রশ্নের সমাধান এক অভিনব পন্থায় করেছেন, যা নিম্নোক্ত তালিকাটিতে ব্যাখ্যা করা হোল :—

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ব্যংকটমুখী ১২টি স্বরস্থান/নাম স্বীকার করলেও স্বরসাম্য রক্ষার্থে ১৬টি স্বরসংকেত ব্যবহার করেছেন, যেগুলিকে পরবর্তী গোবিন্দাচার্য স্বর হিসাবে স্বীকার করেন।

দক্ষিণী স্বর-তালিকা

সংখ্যা	ভেংকটমখীর স্বর	স্বর-সংকেত	গোবিন্দাচার্যের স্বর	সংখ্যা
১	ষড্‌জ (অচল)	স	ষড্‌জ (অচল)	১
২	শুদ্ধ ঋষভ	র	শুদ্ধ ঋষভ	২
		রি	চতুঃশ্রুতি ঋষভ	৩
৩	পঞ্চশ্রুতি রে বা শুদ্ধ গ	রু	ষট্‌শ্রুতি ঋষভ	৪
৪	ষট্‌শ্রুতি রে বা সাধারণ গ	গ	শুদ্ধ গান্ধার	৫
		গি	সাধারণ গান্ধার	৬
৫	অন্তর গান্ধার	গু	অন্তর গান্ধার	৭
৬	শুদ্ধ মধ্যম	ম	শুদ্ধ মধ্যম	৮
৭	বরালী বা প্রতি মধ্যম	মি	প্রতি মধ্যম	৯
৮	পঞ্চম (অচল)	প	পঞ্চম (অচল)	১০
৯	শুদ্ধ ধৈবত	ধ	শুদ্ধ ধৈবত	১১
		ধি	চতুঃশ্রুতি ধৈবত	১২
১০	পঞ্চশ্রুতি ধ বা শুদ্ধ নি	ধু	ষট্‌শ্রুতি ধৈবত	১৩
১১	ষট্‌শ্রুতি ধ বা কৈশিক নি	ন	শুদ্ধ নিষাদ	১৪
		নি	কৈশিক নিষাদ	১৫
১২	কাকলি নিষাদ	নু	কাকলি নিষাদ	১৬

অর্থাৎ 'সা রে রে ম' কে 'স র গ ম', 'সা রে গ ম' কে 'স র গি ম' এবং 'প ধু ধ সা' কে 'প ধ ন স', 'প ধু নি সা' কে 'প ধ নি স' প্রভৃতি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, ব্যংকটমুখী রচিত থাটগুলি সবই সম্পূর্ণ তথা জনকরাগ কিন্তু পরবর্তী গোবিন্দাচার্য রচিত থাটগুলি তা নয়। ব্যংকটমুখী রচিত ৭২টি থাটনাম হোল এইরূপ :—

১	কণকাম্বরী	১৯	ঝংকারভ্রমরী	৩৭	সৌগান্ধিণী	৫৫	শ্যামল
২	ফেনদ্যুতি	২০	ভৈরবী	৩৮	জগন্মোহন	৫৬	ত্রিমূর্তি
৩	সামবরালী	২১	কিরণাবলী	৩৯	বরালী	৫৭	সীমন্তিনী
৪	ভানুমতী	২২	শ্রীরাগ	৪০	নভোমণি	৫৮	সিংহরব
৫	মনোরঞ্জনী	২৩	বেলাবলী	৪১	প্রভাবতী	৫৯	ধৌম্যরাগ
৬	তনুকীর্তি	২৪	বীরবসন্তম	৪২	রঘুলীল	৬০	নিষাদ
৭	সেনাগ্রণী	২৫	শারদ্বতা	৪৩	গীর্বান	৬১	কুন্তল
৮	তোড়ী	২৬	তরঙ্গিণী	৪৪	ভবানী	৬২	রত্নভানুবা
৯	ভিন্নষড়্জ	২৭	সুরসেন	৪৫	পন্তুবরালী	৬৩	গোত্রারি
১০	নটভরণম্	২৮	কাম্ভোজি	৪৬	তীব্রবাহিনা	৬৪	ভূষাবলী
১১	কোকিলরব	২৯	শংকরাভরণ	৪৭	সৌবার	৬৫	কল্যাণী
১২	রূপ্যনগ	৩০	সামন্ত	৪৮	জীবন্তিনী	৬৬	চতুরঙ্গিণী
১৩	হেজুজ্জী	৩১	কলহংস	৪৯	ধবলাঙ্গা	৬৭	সত্যবতী
১৪	বসন্তভৈরবী	৩২	রাগচূড়ামণি	৫০	নর্মদা	৬৮	জ্যোতিস্মতী
১৫	মায়ামালবগৌল	৩৩	গঙ্গাতরঙ্গিণী	৫১	বামক্রিয়া	৬৯	ধৌতপঞ্চম
১৬	বেগবাহিণী	৩৪	ছায়ানট	৫২	রামমনোহরি	৭০	নাসামণি
১৭	সুপ্রদীপ	৩৫	দেশাক্ষী	৫৩	গমকক্রিয়া	৭১	কুসুমাবলী
১৮	শুদ্ধমাধবী	৩৬	নট	৫৪	বৈশাখ	৭২	রসমঞ্জরী

পণ্ডিত ব্যংকটমুখী উক্ত ৭২টি থাটের সাহায্যে গাণিতিক হিসাবে সর্বাধিক ৩৪,৭৭৬টি রাগোৎপন্ন সম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন। যেগুলি রাগ, রাগিণী, পুত্র-রাগাদিরূপে তথা সম্পূর্ণ, ষাড়ব ঔড়ব ও মিশ্র জাতিতে বিস্তৃত (মিশ্র বলতে চারটি স্বরযুক্ত আরোহাবরোহণের সঙ্গে সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব আরোহাবরোহণযুক্ত রাগ বোঝায়)। তাঁর এই সিদ্ধান্ত গাণিতিক হিসাবে শুদ্ধ হলেও বাস্তবক্ষেত্রে যে তা: গ্রহণযোগ্য নয় সেকথা তিনি নিজেও পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন। কারণ

তিনি স্বয়ং রাগ রচনায় মাত্র ১৯টি থাট ব্যবহার করেন, তার সাহায্যে ৫০টি রাগের পরিচয় দিয়েছেন। নিম্নোক্ত তালিকায় বিষয়টি স্পষ্ট করা হোল।

ক্রম সংখ্যা	সংখ্যা	থাট নাম	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি	উৎপন্ন রাগ নাম
১	১	কণকাম্বরী	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	মুখারী
৩	২	সামবরালী	,,	,,	সাধারণ	,,	,,	,,	কাকলি	সামবরালী
৯	৩	ভিন্নষড্‌জ	,,	,,	,,	,,	,,	,,	কৈশিক	ভূপাল
১৩	৪	হেজুজ্জী	,,	,,	অন্তর	,,	,,	,,	শুদ্ধ	রেবগুপ্তি
১৪	৫	বসন্তভৈরবী	,,	,,	,,	,,	,,	,,	কৈশিক	বসন্তভৈরবী
১৫	৬	মায়ামালবগৌল	,,	,,	,,	,,	,,	,,	কাকলি	১
১৯	৭	ঝংকারভ্রমরী	,,	পঞ্চশ্রুতি	সাধারণ	,,	,,	,,	কৈশিক	২
২০	৮	ভৈরবী	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৩
২২	৯	শ্রীরাগ	,,	,,	,,	,,	,,	পঞ্চশ্রুতি	,,	৪
২৮	১০	কাম্ভোজী	,,	,,	অন্তর	,,	,,	,,	,,	৫
২৯	১১	শংকরাভরণ	,,	,,	,,	,,	,,	,,	কাকলি	৬
৩০	১২	নাগাভরণ	,,	,,	,,	,,	,,	ষট্‌শ্রুতি	,,	সামন্ত
৩৫	১৩	দেশাক্ষী	,,	ষট্‌শ্রুতি	,,	,,	,,	পঞ্চশ্রুতি	,,	দেশাক্ষী
৩৬	১৪	নাট	,,	,,	,,	,,	,,	ষট্‌শ্রুতি	,,	নাট
৩৯	১৫	বরালী	,,	শুদ্ধ	শুদ্ধ	বরালী	,,	শুদ্ধ	,,	শুদ্ধবরালী
৪৫	১৬	পন্তুবরালী	,,	,,	সাধারণ	,,	,,	,,	,,	পন্তুবরালী
৫১	১৭	রামক্রিয়া	,,	,,	অন্তর	,,	,,	,,	,,	শুদ্ধরামক্রিয়া
৫৮	১৮	সিংহরব	,,	পঞ্চশ্রুতি	সাধারণ	,,	,,	পঞ্চশ্রুতি	কৈশিক	সিংহরব
৬৫	১৯	কল্যানী	,,	,,	অন্তর	,,	,,	,,	কাকলি	কল্যানী

১। গৌল, গুণ ও ক্রিয়া, সালঙ্গনাট, নাদরাসক্রিয়া, ললিতা, পাড়ি, বহুলী, মল্লারী, সাবেরী, ছায়াগৌল, কর্ণাটক, বঙ্গাল, সৌরাষ্ট্র।

২। ভৈরবী, হিন্দোল, ঘণ্টারব্।

৩। অহীর, আভেরী, হিন্দোলবসন্ত।

৪। সালগভৈরব, ধন্যাসী, মালশ্রী, দেবগান্ধার।

৫। কাম্ভোজী, কেদারগৌল, নারায়ণগৌল।

৬। শংকরাভরণ, আরভি, নাগধ্বনি, সাম শুদ্ধবসন্ত, নারায়ণী, নারায়ণ দেশাক্ষী।

১৮শ শতাব্দীর গোবিন্দাচার্য রচিত সংগ্রহ চূড়ামণি এবং তুলজাজী রচিত সংগীত সারামৃত গ্রন্থদ্বয় ব্যংকটমুখীর অনুসরণেই রচিত। এঁদের, পরস্পরের স্বরনাম, থাটনাম প্রভৃতিতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও মূলগত সিদ্ধান্তে বিশেষ মতভেদ নেই।

গোবিন্দাচার্য কয়েকটি সূত্রের সাহায্যে মেলগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে বর্ণনা করেছেন। তিনি মেলগুলিকে স্বর-রূপসহ সহজে মনে রাখার জন্য ১২টি চক্রের কল্পনা করেছেন। যেমন, ইন্দু, নেত্র, অগ্নি, বেদ, বাণ, ঋতু, ঋষি, বসু, ব্রহ্মা, দিক, রুদ্র ও আদিত্য। এই নামগুলির সার্থকতা হোল, ইন্দু বলতে চন্দ্র বোঝায়, চন্দ্র একটি, অতএব এক সংখ্যা বুঝতে হবে। এইরূপে নেত্র দুটি; অগ্নি ভৌম, দিব্য ও জাঠর ভেদে ত্রিবিধ, অতএব তিন, বেদ চতুষ্টয় হওয়াতে চার, বাণ তথা মন্মথশর পাঁচটি; ঋতু ছয়টি, ঋষি সাতজন; বসু বলতে গঙ্গা থেকে উৎপন্ন ধর, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনল, অনিল, প্রত্যুষ ও প্রভাস এই অষ্ট গণদেবতা বোঝায়, অতএব আট. ব্রহ্মা তথা প্রতিকল্পের প্রজাপতি নয়জন, অতএব নয়, দিক দশটি, পুরাণে এগারোজন রুদ্রের উল্লেখ আছে, অতএব এগারো; এবং অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি হয়, অতএব বারো বুঝতে হবে। চক্রগুলি আবার ছয়টি করে দুইভাগে বিভক্ত; অর্থাৎ প্রতিটি চক্রের সঙ্গে ছয়টি করে মেলকর্তা সম্পর্কিত। স্পষ্টি-করণের জন্য পর পৃষ্ঠায় একটি তালিকা দেওয়া হোল—

তালিকাটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি বিভাগকে নির্দেশ করার জন্য চক্র-নামগুলি ইঙ্গিতপূর্ণ। এখন এই চক্রনামগুলির সাহায্যে কিভাবে স্বররূপগুলি নিরূপণ করা যাবে সেকথা আলোচনা করা যাক।

মনে রাখতে হবে যে, ৭২টি মেলকর্তাতেই ষড়্জ ও পঞ্চম স্বরদ্বয় এবং পূর্ব-ভাগের ৩৬টিতে শুদ্ধমধ্যম তথা উত্তরভাগের ৩৬টিতে প্রতিমধ্যম ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব বাকি রইল ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ স্বরচতুষ্টয়।

প্রতিটি চক্রের মধ্যে উক্ত স্বরচতুষ্টয়ের দুটি করে আছে, অর্থাৎ পূর্বভাগে ঋষভ, গান্ধার এবং উত্তরভাগে ধৈবত নিষাদ। প্রথম চক্রে পূর্বভাগে কোন পরিবর্তন নেই শুধু উত্তরভাগের স্বরদ্বয় পরিবর্তিত হয়েছে। অন্যান্য চক্রে ঠিক সমান প্রণালীতে পূর্বভাগের স্বরদ্বয়কে অনুরূপ ক্রমানুসারে পরিবর্তন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগের স্বরবিন্যাসে শুধুমাত্র শুদ্ধমধ্যম স্থানে প্রতিমধ্যম প্রযুক্ত হবে। পর পৃষ্ঠার তালিকাতে বিষয়টি স্পষ্ট করা হোল।

প্রথম ভাগের ৩৬টি শুদ্ধ মধ্যমযুক্ত বা পূর্ব মেলকর্তা		
সংখ্যা	চক্রনাম	সম্পর্কিত মেলকর্তা
১	ইন্দু	১—৬টি
২	নেত্র	৭—১২টি
৩	অগ্নি	১৩—১৮টি
৪	বেদ	১৯—২৪টি
৫	বাণ	২৫—৩০টি
৬	ঋতু	৩১—৩৬টি
দ্বিতীয় ভাগের ৩৬টি বিকৃত প্রতি। মধ্যমযুক্ত বা উত্তর মেলকর্তা		
৭	ঋষি	৩৭—৪২টি
৮	বসু	৪৩—৪৮টি
৯	ব্রহ্মা	৪৯—৫৪টি
১০	দিক	৫৫—৬০টি
১১	রুদ্র	৬১—৬৬টি
১২	আদিত্য	৬৭—৭২টি

শুদ্ধ মধ্যমযুক্ত প্রথমভাগের ৩৬টি মেলকর্তা

চক্রনাম ও সংখ্যা	পূর্বাঙ্গের স্বর	উত্তরাঙ্গের স্বর	মেলকর্তার সংখ্যা	মেলকর্তার নাম
১ ইন্দু	র গ	ধ ন	১	কণকাঙ্গী
		ধ নি	২	রত্নাঙ্গী
		ধ নু	৩	গানমূর্তি
		ধি নি	৪	বনস্পতি
		ধি নু	৫	মানবতী
		ধু নু	৬	তানরূপী
২ নেত্র	র গি	ধ ন	৭	সেনাবতী
		ধ নি	৮	হনুমত্তোড়ী
		ধ নু	৯	ধেনুকা
		ধি নি	১০	নাটকপ্রিয়া
		ধি নু	১১	কোকিলপ্রিয়া
		ধু নু	১২	রূপাবতী
৩ অগ্নি	র গু	ধ ন	১৩	গায়কপ্রিয়া
		ধ নি	১৪	বকুলাভরণম্
		ধ নু	১৫	মায়ামালবগৌল
		ধি নি	১৬	চক্রবাকম্
		ধি নু	১৭	সূর্যকান্তম্
		ধু নু	১৮	হাটকাম্বরী
৪ বেদ	রি গি	ধ ন	১৯	ঝংকারধ্বনি
		ধ নি	২০	নঠভৈরবী
		ধ নু	২১	কিরবানী
		ধি নি	২২	খরহরপ্রিয়
		ধি নু	২৩	গৌরীমনোহরি
		ধু নু	২৪	বরুণপ্রিয়া

৫ বাণ	রি গু	ধ ন	২৫	মাররঞ্জনী
		ধ নি	২৬	চারুকেশী
		ধ নু	২৭	সরসাঙ্গী
		ধি নি	২৮	হরিকাম্ভোজি
		ধি নু	২৯	ধীরশকরাভরণম্
		ধু নু	৩০	নাগনন্দিনী
৬ ঋতু	রু গু	ধ ন	৩১	যাগপ্রিয়া
		ধ নি	৩২	রাগবর্ধনী
		ধ নু	৩৩	গাঙ্গেয়ভূষণী
		ধি নি	৩৪	বাগধীশ্বরী
		ধি নু	৩৫	শূলিনী
		ধু নু	৩৬	চলনাট

উপরোক্ত তালিকাতে বর্ণিত ৩৬টি প্রথম ভাগের মেলকর্তার স্বর সমূহের শুদ্ধ মধ্যমস্থানে প্রতিমধ্যম ব্যবহার করলে আরো ৩৬টি দ্বিতীয় ভাগের মেলকর্তা উৎপন্ন হবে। সেগুলির নাম যথাক্রমে এইরূপ—

৩৭	সালগম	৪৯	ধবলাম্বরী	৬১	কান্তামণি
৩৮	জলার্ণবম্	৫০	নামনারাযনী	৬২	ঋষভপ্রিয়া
৩৯	ঝলবরালী	৫১	কামবর্ধিনী	৬৩	লতাঙ্গী
৪০	নবনিতম্	৫২	রামপ্রিয়া	৬৪	বাচস্পতি
৪১	পাবনী	৫৩	গমনাশ্রম	৬৫	মেচকল্যানী
৪২	রঘুপ্রিয়া	৫৪	বিশ্বম্ভরী	৬৬	চিত্রাম্বরী
৪৩	গবাম্ভোধী	৫৫	শ্যামলাঙ্গী	৬৭	সুচরিত্র
৪৪	ভবপ্রিয়া	৫৬	ষন্মুখপ্রিয়া	৬৮	জ্যোতিস্বরূপিনী
৪৫	শুভপন্তুবরালী	৫৭	সিংহেন্দ্রমধ্যম	৬৯	ধাতুবর্ধিনী
৪৬	ষড়্‌বিধমার্গিনী	৫৮	হেমবতী	৭০	নাসিকাভূষনী
৪৭	সুবর্ণাঙ্গী	৫৯	ধর্মবতী	৭১	কোসলম্
৪৮	দিব্যমণি	৬০	নীতিমতী	৭২	রসিকপ্রিয়া

প্রতিটি চক্রের সঙ্গে ছয়টি করে মেল সম্পর্কিত। প্রতিটি মেলকে সহজে চেনার জন্য পা, শ্রী, গো, ভূ, মা এবং ষা এই ছয়টি বিশিষ্ট অক্ষর নির্দিষ্ট হয়েছে। এছাড়া মেলগুলিকে নির্ধারণ করার জন্য 'ক-ট-প-য়' এই সাংকেতিক অক্ষর সহযোগে এক অভিনব গাণিতিক সূত্রের অবতারণা করেছেন। সূত্রটি ব্যাখ্যা করার আগে নিম্নোক্ত তালিকাটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। যার নাম Katapayādi formula[২] :—

Katapayādi formula	1	2	3	4	5	6	7	8	9	c
Kadinava (a series of 9 letters from ka)	K ক	KH খ	G গ	GH ঘ	NG ঙ	CH চ	CHH ছ	J জ	JH ঝ	JN ঞ
Tadınava (a series of 9 letters from ta)	T ট	TH ঠ	D ড	DH ঢ	N ণ	T ত	TH থ	D দ	DH ধ	N ন
Padi Pancha (a series of 5 letters from Pa)	P প	PH ফ	B ব	BH ভ	M ম	---	—	—	—	–
Yādiasta (a series of 8 letters from yā)	Y য়	R র	L ল	V ব়	Ṡ শ	SH ষ	S স	H হ	—	–

উপরোক্ত তালিকায় উল্লিখিত সংখ্যাগুলির সাহায্যে কীভাবে, ৭২টি থাটের যেকোন থাটসংখ্যা তথা স্বরসজ্জা নির্ণয় করা যায়, অতঃপর সেই বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

যে কোন মেলকর্তার প্রথম দুটি অক্ষর অনুসারে উপরোক্ত তালিকা থেকে দুটি সংখ্যা নিয়ে তাকে উল্টে লিখলেই মেলকর্তার বিশেষ সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। যেমন কণকাঙ্গী : এর ক ও ন=অক্ষরের সংখ্যাদ্বয় হোল ১ এবং ০, একে উল্টে লিখলে '০১' অতএব ১ম মেল বুঝতে হবে। (বলা বাহুল্য

২। P. Sambomoorthy: South Indian Music 19. p 36.

প্রথম সংখ্যাটি শূন্য হলে তা বাদ যাবে)। অথবা নাটকপ্রিয়া তার প্রথম অক্ষরদ্বয়ের সংখ্যা হোল ০১ অতএব ১০ম মেল বুঝতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, প্রথম বা দ্বিতীয় কোনটি যদি যুক্তাক্ষর হয়, তাহলে সর্বদা শেষেরটি ধরতে হবে। যেমন, 'রত্নাঙ্গী' র ন, গঙ্গাভূষণীতে গ গ, ইত্যাদি বুঝতে হবে।

পা, শ্রী, গো, ভূ, মা এবং ষা অক্ষরগুলি ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ মেলকর্তা নির্দেশ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ উপরোক্ত কটপয়াদি সূত্রের চক্রের সঙ্গে এই অক্ষরগুলি যোগ করে মেলকর্তার ক্রম বোঝান হয়। যেমন অগ্নি-পা বলতে ৩য় চক্রের ১ম মেল বোঝায়। যার মেলক্রম হোল ১৩। এইরূপে নেত্র-ষা বলতে ২য় চক্রের ৬ষ্ঠ মেল বা ১২ মেলকর্তা বোঝায়।

হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটক ঐক্যমূলক থাট/রাগ: হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির ১০টি থাটের সঙ্গে কর্ণাটক যে ১০টি থাটের স্বররূপের ঐক্য আছে সেগুলি হোল—

সংখ্যা	হিন্দুস্থানী থাট নাম	কর্ণাটক থাট নাম	ক্রমিক সংখ্যা
১	বিলাবল	ধীরশংকরাভরণম	২৯
২	কল্যান	মেচকল্যাণী	৬৫
৩	খমাজ	হরিকাম্ভোজি	২৮
৪	ভৈরব	মায়ামালবগৌল	১৫
৫	পূরবী	কামবর্ধিনী	৫১
৬	মারবা	গমনশ্রম	৫৩
৭	কাফী	খরহরপ্রিয়	২২
৮	আশাবরী	নঠভৈরবী	২০
৯	ভৈরবী	হনুমত্তোড়ী	৮
১০	তোড়ী	শুভপন্তুবরালী	৪৫

এছাড়াও কয়েকটি সাদৃশ্যমূলক রাগ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যেমন-

হিন্দুস্থানী রাগ	কর্ণাটক রাগ
ভূপালী	মোহনম্
মালকোষ	হিন্দোলম্
মধ্যমাদি সারং	মধ্যমাদি
ঝিঁঝিট	জিন্‌ঝটি
রাগেশ্বরী	নটকুঞ্জী

কীর্তনম্ঃ কীর্তনম্ ধ্রুপদ শ্রেণীর গান এবং পবিত্র সংগীত হিসাবে স্বীকৃত যা পল্লবি, অনুপল্লবি ও চরণ এই তিনটি ধাতুযুক্ত হয়ে থাকে। কী৹নম্ সাধারণতঃ উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য তথা ঈশ্বর বন্দনামূলক হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত 'দিব্যনাম', 'উৎসব সম্প্রদায়', 'মনসাপূজা', 'সমক্ষেপ রামায়ণ' প্রভৃতি বিচিত্র কীর্তনম উল্লেখযোগ্য।

কৃতিঃ কৃতি খেয়াল শ্রেণীর গান এবং দক্ষিণভারতের শ্রেষ্ঠ সংগীত হিসাবে স্বীকৃত। কীর্তনম থেকে এর বিকাশ হয় ১৪শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। কীর্তনে সাহিত্যই মুখ্য কিন্তু কৃতিতে তা গৌন, সেখানে সাহিত্য শিল্পীকে রাগ প্রকাশে সাহায্য করে মাত্র। একথা পুরন্দর দাসের বাসুদেব নানামাভ্যলিয় (মুখারী রাগ) সংগীত প্রমাণ করে। তিনি প্রায় ৪,৭৫,০০০ কৃতি রচনা করেছিলেন।

ভাষাঙ্গ রাগঃ আনুমানিক ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভাষাঙ্গ রাগের বিকাশ হয়। এক, দুই বা তিনটি স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত রূপ নিয়ে এবং সুন্দর সুন্দর রাগে ভাষাঙ্গ গঠিত হয়। এর মোট সংখ্যা হোল ২৭টি। অতিগুণী সংগীতাচার্যেরা এগুলি রচনা করেছেন। মুখ্য (Major) ও গৌন (Minor) এই দুই শ্রেণীতে ভাষাঙ্গ রাগগুলি বিভক্ত। মুখ্য শ্রেণীতে আলাপ হয় বিস্তারিত কিন্তু গৌণ শ্রেণীতে খুব সংক্ষিপ্ত থাকে। ভৈরবী, কাম্ভোজী আদি মুখ্য শ্রেণীর ভাষাঙ্গ রাগ। কমপক্ষে ৫০টি করে ক্লাসিকাল রচনা এই দুটি শ্রেণীতে আছে।

শিল্পী বিস্তারিত তথা ক্রমানুসারে এগুলির আলাপ করে পল্লবিগুলি উপস্থাপিত করে থাকেন। ভাবাঙ্গ রাগের উল্লেখ সর্বপ্রথম পার্শ্বদেবের এবং পরে শার্ঙ্গদেবের গ্রন্থে পাওয়া যায়।

অভ্যাস গান : অভ্যাসগান বলতে সংগীত সাধনা বোঝায়। স্থূলাভি তালে স্বরাবলী ও অলংকারাদি সর্বপ্রথম পুরন্দরদাস (১৪৮৪-১৫৬৪) রচনা করেন, যাকে কর্ণাটক সংগীতের পিতামহ মানা হয়। কারণ ব্যবহারিক দিক থেকে ইনিই নানাভাবে সংগীতকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যদিও তাঁর পূর্ব থেকেই গীত প্রচলিত ছিল, কিন্তু তিনিই এর সুষ্ঠ রূপদান তথা মল্লারী রাগে পিল্লারী-গীত এবং অন্যান্য রাগে সঞ্চারী গীতাদি রচনা করেন। সঞ্চারীগীত লক্ষণ-গীতের পূবে রচিত হয়। পইদলা গুরুমূর্তি শাস্ত্রী (১৮শ শতাব্দী) অনেকগুলি গীত তথা লক্ষণগীত রচনা করেন।

স্বরজাতি : স্বরজাতি হোল নৃত্যানুষ্ঠানের উপযোগী সংগীত, যার উৎপত্তি হয়। ১৮শ শতাব্দীতে। এর প্রথম রচনা হয় হুসেনী রাগে যার নাম ইম্যায়ালাদি (Emayalādi)। এর প্রথম ভাগে 'মুক্তায়ি অংশযুক্ত জাতি প্রযুক্ত ছিল, পরে জাতি বর্জন করে সুন্দর রূপদান করেন পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী (১৭৬২-১৮২৭), যিনি এর স্রষ্টা হিসাবে স্বীকৃত। বর্তমানে এর ধাতুগুলি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যযুক্ত হলেও এর পরিবেশনায় অতি সুন্দর কল্পনা এবং শৃঙ্খলা আছে।

জাতি স্বরম্ : জাতি স্বরম্ও নৃত্যানুষ্ঠানের উপযোগী সংগীত, যার উৎপত্তি ১৯শ শতকের গোড়ার দিকে হয়েছিল। রচনাগুলি জাতির ক্রম অনুসারে গঠিত ছিল, জাতিতে পল্লবি, অনুপল্লবি তথা চরণের অংশগুলি গাওয়ার প্রথা পরিবর্তিত হয়ে পরে স্বরাক্ষর সহযোগে অনুষ্ঠানের রীতি প্রবর্তিত হয়। তাঞ্জোরের রাজা স্বাতি তিরুনল (১৮১৩-১৮৪৬) বহু জাতি স্বরম্ রচনা করেছেন, তার রচিত 'রাগমালিকা জাতি স্বরম্'টি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মনিপ্রবাল কৃতি : কথিত আছে, মনিপ্রবাল সাহিত্য প্রাচীন কালেও ছিল। বর্তমান শ্লোকগুলির প্রথম অংশ সংস্কৃত ও দ্বিতীয় অংশ তেলেগু ভাষায় রচিত ; সংস্কৃত ও মালয়ালম ভাষায় রচিত মনিপ্রবালম্ও পাওয়া যায়।

মনিপ্রবাল কৃতি সবপ্রথম রচনা করেন প্রসিদ্ধ সংগীতগুণী মুথুস্বামী দীক্ষিতর (১৭৭৬-১৮৩৫), তাঁর রচিত ব্যাংকটচলপতি (Venkatachalapate) (কাপি রাগ তথা সংস্কৃত, তামিল ও তেলেগু ভাষায় রচিত। একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এছাড়া তেলেগু ও তামিল ভাষায় রচিত 'নিসারি সমানা' (Nisari Samānā) এবং ত্যাগরাজ রচিত (তেলেগু ও তামিল ভাষা তথা বাচস্পতি রাগে) মনিপ্রবাল কৃতিও একটি সুন্দর উদাহরণ।[১]

জাবালি : ১৯শ শতকে সৃষ্ট জাবালি একপ্রকার লঘুসংগীত। সুর বা সাহিত্য কোন দিক দিয়েই একে উচ্চাঙ্গ সংগীতের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। তেলেগু ও কন্নড় ভাষায় এগুলি রচিত। স্বর রচনায় মাধুর্য সৃষ্টির জন্য এতে রাগের শুদ্ধতা সর্বদা রক্ষিত হয় না। অবশ্য 'ইমানডুন মড্ড়' (মুখারি রাগ) ও আপাহুরুকুনো (খমাস রাগ) ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

তিল্লানা : তরানা ও তিল্লানা অভিন্ন গীতরীতি; এর প্রচলন হয় ১৮শ শতাব্দী থেকে। মহাবিদ্যানাথ আয়ার রচিত 'গৌরী নায়ক' তিল্লানা, যা কানাড়া রাগ তথা সিংহনন্দন তালে গঠিত একটি প্রসিদ্ধ সৃষ্টি হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

উপাঙ্গ রাগ : উপাঙ্গ রাগ সর্বদা মেলকর্তার স্বর-যুক্ত হয়। যেমন, সাবেরী, কেদারগৌল ইত্যাদি। এগুলির স্বরক্রম সরল হয় না এবং সর্বদা সম্পূর্ণ জাতিরও হয় না।

উপাঙ্গ বক্ররাগ : এগুলির স্বরসজ্জা অত্যন্ত আঁকাবাঁকা হয়ে থাকে। যেমন ২৮ সংখ্যক মেল থেকে উৎপন্ন সাহানা একটি উপাঙ্গ বক্ররাগ। এর আরোহাবরোহণ হোল সা রে গ ম প ম ধ নি সাঁ, সাঁ নি ধপ মগ ম রে গরে সা।

স্বরান্তরো রাগ : এগুলির আরোহাবরোহণের কোনটি চার স্বরযুক্ত হয়ে থাকে। যেমন, নবরসকন্নড়। এর স্বরক্রম হোল—

সা গ ম প সা, সা নি ধ মগ রে সা।

১। P. Sambomoorthy : History of Indian Music. 1960.

কয়েকটি রাগের পরিচয় :

১। হনুমত্তোড়ী (৮)—সা রে গ ম প ধ নি সা।

২। খরহরপ্রিয় (২২)—সা রে গ ম প ধ নি সা।

৩। নটভৈরবী (২০)—সা রে গ ম প ধ নি সা।

৪। কিরবানী (২১)—সা রে গ ম প ধ নি সা, (একে কাফী ও ভৈরবের মিশ্রণে উৎপন্ন বলা যায়)।

৫। কেদারগৌল (জন্যরাগ)—হরিকাম্ভোজি থেকে উৎপন্ন।

আরোহাবরোহণ— { সা রে ম প নি স।
সা নি ধ প ম গ রে সা।

৬। সাবেরী—(জন্যরাগ) মায়ামালবগৌল থেকে উৎপন্ন।

আরোহাবরোহণ— { সা রে ম প ধ সা
সা নি ধপ ম গ . সা।

যোগিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

৭। সিংহেন্দ্রমধ্যম (৫৭)—সা রে গ ম প ধ নি সা।

দশবিধ গমক : শার্ঙ্গদেব ১৫ প্রকার গমকের বর্ণনা দিয়েছেন (সংগীত-শাস্ত্র প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তীকালে প্রাচীন অলংকার তথা শার্ঙ্গদেব বর্ণিত গমকগুলির মধ্য থেকে দশবিধ গমক নির্বাচিত হয়েছে, যা দক্ষিণী সংগীতে প্রচলিত। যথা—

১। আরোহণ—সা রে গ ম প ধ নি সা।

২। অবরোহণ—সা নি ধ প ম গ রে সা।

৩। ধালু—কোন স্বর থেকে রাগ ভাবানুসারে উচ্চ স্বর সমূহ উচ্চারণ করা। যেমন, সাপ সাম সাগ সারে ইত্যাদি।

৪। স্ফুরিত—সসসা রেরেরে গগগ মমম ইত্যাদি।

৫। কম্পিত—সসা রেরে গগ মম পপ ইত্যাদি।

৬। আহত—সারে রেগ গম মপ ইত্যাদি।

৭। প্রত্যাহত—সানি নিধ ধপ পম ইত্যাদি।

৮। ত্রিপুচ্ছ—সাসাসা রেরেরে গগগ মমম ইত্যাদি।

৯। আন্দোল—সারেসাধধ সরেসাপপ সরেসামম ইত্যাদি।

১০। মূর্ছনা—সারেগমপধনি রেগমপধনিসা গমপধনিসারে মপধনিসারেগা পধনিসারেগাম ইত্যাদি।

গমকগুলি রব (Vibrato) এবং জাক (Portamento) ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অবশ্য উপরোক্ত গমকগুলি ছাড়া আরও নানাপ্রকার গমক সংগীতে হতে পারে।

কর্ণাটক ও হিন্দুস্থানী সংগীতের তুলনামূলক আলোচনা: এই দুটি পদ্ধতির মূল সিদ্ধান্তগুলিতে বিশেষ পার্থক্য না থাকলেও ভাষা গায়কীরীতি, তাল পদ্ধতি প্রভৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

১। উভয় পদ্ধতিতেই ১২টি স্বর স্বীকৃত কিন্তু স্বরূপ ভিন্ন।

২। থাট-রাগ-পদ্ধতি স্বীকৃত কিন্তু হিন্দুস্থানী সংগীতে মাত্র ১০টি এবং কর্ণাটক সংগীতে ৭২টি থাট স্বীকৃত।

৩। শুদ্ধ ও কোমল স্বরূপের লক্ষণ বিপরীত, কারণ কর্ণাটক শুদ্ধস্বরকে হিন্দুস্থানী সংগীতে কোমল স্বর বলা হয়।

৪। শ্রুতি ও তার বিভাগ অভিন্ন হলেও প্রয়োগ-পার্থক্যের জন্য কর্ণাটক স্বর রচনাগুলিকে ভিন্ন মনে হয়।

৫। তান, আলাপ, গমক প্রভৃতি অলংকারাদিতে ঐক্য থাকলেও প্রয়োগ কৌশল ভিন্ন।

৬। উভয় পদ্ধতিতেই ধাতুর ব্যবহার আছে। প্রাচীন ভারতীয় উদগ্রাহ, মেলাপকাদি বা বর্তমান স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী প্রভৃতি এবং দাক্ষিণী পল্লবি, অনুপল্লবি, চরণম্, মুক্তায়ি, চিত্তেশ্বরম্ প্রভৃতি সমশ্রেণীর।

৭। হিন্দুস্থানীর মতো দাক্ষিণী সকল গানের ধাতুর সংখ্যাও সমান নয়। কৃতি বা কীর্তন, পদম্, জাবালি, রাগমালিকা, বর্ণ, জাতিস্বর প্রভৃতি গীতিধারায় শুধু পল্লবি, অণুপল্লবি ও চরণম্ এই তিনটি ধাতু থাকে। (কোন কোন গানে আবার অণুপল্লবি থাকে না)। অপরাপর ধাতুগুলি অন্যান্য গানে ব্যবহৃত হয়।

৮। কর্ণাটক সংগীতে ধ্রুপদকে কীর্তনম্, খেয়ালকে কৃতি, তরাণাকে তিল্লানা, রাগমালাকে রাগমালিকা, আলাপকে আলাপম, স্তোত্রগানকে বিরুত্তম বা শ্লোকম্ বলা হয়। এগুলির গায়কীতে যথেষ্ট

পার্থক্য আছে। কারণ এই দুটি পদ্ধতির রাগ-নাম, তালপদ্ধতি, গায়নকৌশল প্রভৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

৯। হিন্দুস্থানী সংগীতে সাধারণত হিন্দী, ব্রজভাষা, মারাঠী, উর্দু, পাঞ্জাবী (ক্বচিৎ বাংলা) প্রভৃতি, কিন্তু কর্ণাটক সংগীতে তামিল, তেলেগু, কন্নড প্রভৃতি ভাষা ব্যবহৃত হয়।

১০। হিন্দুস্থানী সংগীতে তাল থেকে গানকে (রাগ) কিন্তু কর্ণাটক সংগীতে গান থেকে তালকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়।

১১। কর্ণাটক তালপদ্ধতি অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ কিন্তু হিন্দুস্থানী তালপদ্ধতিতে তেমন কোন বন্ধন নেই; প্রতিটি তালই স্বতন্ত্ররূপে মহিমান্বিত।

১২। কর্ণাটক সংগীতে বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত প্রভৃতিকে যথাক্রমে চৌকাকলা, মধ্য বা মধ্যমকলা ও লঘু দ্রুতম্ বা অণুদ্রুতম্ বলা হয়।

১৩। কর্ণাটক সংগীতে মুখ্য তাল ৭টি এবং প্রত্যেকটি তালের পাঁচ প্রকার জাতিভেদ আছে; অর্থাৎ ৭ × ৫ = ৩৫টি। এগুলি আবার পঞ্চগতি ভেদানুসারে পাঁচ প্রকার জাতিভেদে বিস্তৃত, অর্থাৎ মোট তাল সংখ্যা হোল ৩৫ × ৫ = ১৭৫টি।

১৪। লঘুর মাত্রাসংখ্যা 'চার' হলেও জাতিভেদানুসারে এই চিহ্নের মাত্রাসংখ্যা পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

১৫। কর্ণাটক তালপদ্ধতিতে প্রতিটি ছন্দ বিভাগেই তালাঘাত হয়। এই তালাঘাতগুলিতে প্রকারভেদ আছে বটে, কিন্তু হিন্দুস্থানী পদ্ধতির মতো 'ফাঁক' ক্রিয়ার প্রচলন নেই।

বর্তমানে উভয় পদ্ধতির শিল্পীরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এইরূপ পারস্পরিক প্রীতি ও সহানুভূতির ফলে উভয়ের মধ্যে মৈত্রীভাব বাড়বে বলেই আশা করা যায়, যা সংগীত প্রগতির ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়।

গায়ন সময়ঃ কর্ণাটক সংগীতেও দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়ে রাগ-গায়নের বিশেষ রীতি প্রচলিত আছে। যদিও তা কঠোরভাবে অনুসৃত হয় না।

কতগুলি রাগ সর্বকালিক, যাদের সারবকালিকা রাগ বলে। ভূপাল, রেবগুপ্তি, বাউলী, মলয়ামারুত ও দেশাক্ষী সূর্যোদয়ের পূর্বে; বিলাহারী,

কেদারাম, ধন্যাসী প্রাতঃকালে , দিবাভাগে আশাবেরী এবং মধ্যমাবতী দ্বিপ্রহরে গাওয়া হয়। তারপরে মুখারী ও বেগড় আর বসন্ত, নাটকুরঞ্জী ও পূর্বকল্যাণী বিকালে গাওয়া হয়। চক্রবাক, ভৈরবী, কাম্ভোজি, আরভি প্রভৃতি সর্বকালিক রাগ হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

গায়ক পাখি ঃ দক্ষিণ ভারতে নানাবিধ গায়ক পাখির সন্ধান পাওয়া যায়, যারা আশ্চর্যভাবে স্বরসৃষ্টি করে থাকে। সেই স্বরসৃষ্টিতে হরিকাম্ভোজী বা অন্যান্য প্রসিদ্ধ রাগও প্রতিফলিত হয়ে থাকে। কোয়েম্বাটুরের Chinchona জঙ্গলে Manikkuruvi নামে এক প্রকার গায়ক পাখি দেখা যায়।

মাদুরা জেলার পলনী (Palni) পর্বতশ্রেণীর পার্বত্যগ্রাম তন্দিক্কুডিতেও (Tandikkudi) Kānamayil নামক পাখি সকাল সন্ধ্যাতে গান গেয়ে থাকে। একজোড়া পাখি মুখোমুখি শাখায় বসে মাথা দুলিয়ে গান গায় এবং যেন সেই সংগীতের রস গ্রহণ করে। এই পাখির নাকে ছিদ্র আছে যা বাঁশির মতো ধ্বনি উৎপন্ন করে। তাদের স্বরসৃষ্টির সীমা হোল এক স্বরাষ্টক। তাদের স্বর রচনা সাধারণতঃ হরিকাম্ভোজী বা খরহরপ্রিয় মেল হয়ে থাকে। যখন একটি পাখি প ধ্ প ম গ ম প প এইরূপ স্বরোচ্চারণ করে তখন অপরটি সাঁসা সাঁসা সাঁসাসাঁসা এইরূপ স্বর সহযোগে প্রত্যুত্তর করে। স্বরগুলি বিছিন্নভাবে (Staccato) উচ্চারিত হয়। আবার যখন প্রথমটি ম ধ প ম গ রে সা এইরূপ স্বরোচ্চারণ করে তখন অপরটি আবার পূর্বোক্ত স্বরোচ্চারণ সহ প্রত্যুত্তর করে এদের যথাক্রমে Tune bird এবং Dorne bird নামকরণ করা যায়।

তিরুপতির কপিল তীর্থেও অনুরূপ গায়ক পাখি দেখা যায়। যার সংগীত Tape record করে পরীক্ষা করলে প্রমাণিত হবে যে, পশ্চিমীরা যে সকল পাখির সন্ধান দিয়েছে তার তুলনায় ভারতীয় পাখিরা অনেক বেশী সংগীত প্রকাশক। অবশ্য এযাবৎ ভারতবর্ষে এইরূপ গবেষণা হয় নি।[১]

কর্ণাটক তালপদ্ধতি ঃ কর্ণাটক সংগীতে প্রাচীনকাল থেকে তিন প্রকার তালপদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। ১। অষ্টত্তরশততালম্, ২। অপূর্বতালম্ এবং ৩। সপ্ততালম্ পদ্ধতি। প্রাচীন অষ্টত্তরশততালম্ পদ্ধতিতে ১০৮টি

১। P. Sambomoorthy : History of Indian Music. P. 15S.

এবং পরবর্তী অপূর্বতালম্ পদ্ধতিতে ৫৬টি তালের প্রচলন ছিল। বর্তমানে এই দুটি পদ্ধতিই অপ্রচলিত হয়ে সপ্ততালম্ পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে।

সপ্ততালম্ পদ্ধতি, প্রধান সাতটি তালনাম, জাতি এবং পঞ্চগতিভেদ অনুসারে বিস্তারিত। এই তাল সাতটির কোনটিকে জাতি অথবা জাতি তথা পঞ্চগতিভেদ-সহ উল্লেখ না করলে তার মাত্রা সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না। প্রধান সাতটি তালের নাম হোল—

প্রধান সাতটি তাল-নাম ঃ

১। ধ্রুবম্ বা ধ্রুবতাল।
২। মঠম্ বা মঠতাল।
৩। রূপকম্ বা রূপকতাল।
৪। ঝম্পম্ বা ঝম্পতাল।
৫। ত্রিপুটম্ বা ত্রিপুটতাল।
৬। অড্ডম বা অঠতাল।
৭। একম্ বা একতাল।

তাল-সংকেত ঃ পঞ্চজাতি ও গতিভেদ আলোচনার আগে, তালগুলি লিপিবদ্ধ করার জন্য সংখ্যা ছাড়াও যে সংকেতচিহ্নগুলি, মাত্রাসংখ্যা ও ছন্দ-বিভাগ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় তার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এই চিহ্নগুলির আকৃতি, নাম ও মাত্রাসংখ্যা হোল এইরূপ ঃ—

১।	অনুদ্রুত বা বিরাম চিহ্ন	⌒	যার মাত্রাসংখ্যা হোল ১।
২।	দ্রুত চিহ্ন	o	যার মাত্রাসংখ্যা হোল ২।
৩।	লঘু চিহ্ন	|	যার মাত্রাসংখ্যা হোল ৪।
৪।	গুরু চিহ্ন	S	যার মাত্রাসংখ্যা হোল ৮।
৫।	প্লুত চিহ্ন	३	যার মাত্রাসংখ্যা হোল ১২।
৬।	কাকপদ চিহ্ন	×	যার মাত্রাসংখ্যা হোল ১৬।

উপরোক্ত চিহ্ন ছয়টির মধ্যে বর্তমানে প্রথম তিনটি মাত্র ব্যবহৃত হয়। পরের তিনটি প্রাচীন তালপদ্ধতিতে ছিল, বর্তমানে অপ্রচলিত। বর্তমানে ব্যবহৃত চিহ্নত্রয়ের মধ্যে

লঘুচিহ্নের বৈশিষ্ট্য: লঘু চিহ্নটি বিশেষ মহত্বপূর্ণ। কারণ জাতি ভেদানুসারে এর মাত্রাসংখ্যার পরিবর্তন হয়ে থাকে। অর্থাৎ লঘু চিহ্নের মাত্রাসংখ্যা জাতি অনুসারে নিশ্চিত হয়; এর নিজস্ব মাত্রাসংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। যেমন,

জাতি ভেদানুসারে লঘুর মাত্রাসংখ্যা:

১। তিস্রম্ বা তিস্রজাতিতে লঘুর মাত্রাসংখ্যা ৩।
২। চতস্রম্ বা চতস্রজাতিতে লঘুর মাত্রাসংখ্যা ৪।
৩। খণ্ডম্ বা খণ্ডজাতিতে লঘুর মাত্রাসংখ্যা ৫।
৪। মিশ্রম্ বা মিশ্রজাতিতে লঘুর মাত্রাসংখ্যা ৭।
৫। সংকীর্ণম্ বা সংকীর্ণজাতিতে লঘুর মাত্রাসংখ্যা ৯।

কর্ণাটক তাল: জাতি ভেদানুসারে তালগুলির চিহ্ন, মাত্রাসংখ্যা-মাত্রাবিভাগ প্রভৃতি হোল এইরূপ:—

	তাল নাম	জাতি	তাল চিহ্ন	মাত্রাবিভাগ	মাত্রাসংখ্যা
১।	ধ্রুবতাল	তিস্রজাতি	I O II	৩+২+৩+৩	১১
		চতস্রজাতি	I O II	৪+২+৪+৪	১৪
		খণ্ডজাতি	I O II	৫+২+৫+৫	১৭
		মিশ্রজাতি	I O II	৭+২+৭+৭	২৩
		সংকীর্ণজাতি	I O II	৯+২+৯+৯	২৯

	তাল নাম	জাতি	তাল চিহ্ন	মাত্রাবিভাগ	মাত্রাসংখ্যা
২।	মঠতাল	তিস্রজাতি	। O ‘।’	৩+২+৩	৮
		চতস্রজাতি	। O ‘।’	৪+২+৪	১০
		খণ্ডজাতি	। O ‘।’	৫+২+৫	১২
		মিশ্রজাতি	। O ‘।’	৭×২+৭	১৬
		সংকীর্ণজাতি	। O ‘।’	৯+২+৯	২০
৩।	·রূপকতাল	তিস্রজাতি	। O	৩+২	৫
		চতস্রজাতি	। O	৪+২	৬
		খণ্ডজাতি	। O	৫+২	৭
		মিশ্রজাতি	। O	৭+২	৯
		সংকীর্ণজাতি	। O	৯+২	১১
৪।	ঝম্পতাল	তিস্রজাতি	। ⌒ O	৩+১+২	৬
		চতস্রজাতি	। ⌒ O	৪+১+২	৭
		খণ্ডজাতি	। ⌒ O	৫+১+২	৮
		মিশ্রজাতি	। ⌒ O	৭+১+২	১০
		সংকীর্ণজাতি	। ⌒ O	৯+১+২	১২
৫।	ত্রিপুটতাল	তিস্রজাতি	। OO	৩+২+২	৭
		চতস্রজাতি	। OO	৪+২+২	৮
		খণ্ডজাতি	। OO	৫+২+২	৯
		মিশ্রজাতি	। OO	৭+২+২	১১
		সংকীর্ণজাতি	। OO	৯+২+২	১৩
৬।	অঠতাল	তিস্রজাতি	।। OO	৩+৩+২+২	১০
		চতস্রজাতি	।। OO	৪+৪+২+২	১২
		খণ্ডজাতি	।। OO	৫+৫+২+২	১৪
		মিশ্রজাতি	।। OO	৭+৭+২+২	১৮
		সংকীর্ণজাতি	।। OO	৯+৯+২+২	২২

	তাল নাম	জাতি	তাল চিহ্ন	মাত্রাবিভাগ	মাত্রাসংখ্যা
৭।	একতাল	তিস্রজাতি	।	৩	৩
		চতস্রজাতি	।	৪	৪
		খণ্ডজাতি	।	৫	৫
		মিশ্রজাতি	।	৭	৭
		সংকীর্ণজাতি	।	৯	৯

উপরোক্ত তালিকাতে ছন্দবিভাগ, মাত্রাসংখ্যা প্রভৃতি দেওয়া হলেও জাতিভেদানুসারে প্রত্যেকটি তালের স্বতন্ত্র নামও আছে। যেমন, ধ্রুবতালের অপর তালগুলির নাম যথাক্রমে শ্রীকর, প্রমাণ, পূর্ণ ও ভুবনতাল। এইরূপে মতমের ৩।২।৩ ছন্দকে সারতাল, ত্রিপুটের ৫।২।২ ছন্দকে দুষ্করতাল; রূপকের ৭।২ ছন্দকে ফুলতাল ও ৪।২ ছন্দকে পত্তিতাল, একমের ।৯। ছন্দকে বস্তুতাল, ইত্যাদি বলা হয়।

পঞ্চগতিভেদ : এই ৩৫টি তালের পঞ্চগতিভেদানুসারে যেভাবে বিস্তারিত তার সম্পূর্ণ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন, কারণ যে কোন একটি তালের গতিভেদ আলোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন অঠতালের পঞ্চগতিভেদ হোল এইরূপ—

অঠতাল :	তিস্রজাতির পঞ্চগতিভেদ হোল		১০ × ৩ =	৩০	মাত্রা
	চতস্রজাতির	,, ,,	১২ × ৪ =	৪৮	,,
	খণ্ডজাতির	,,	১৪ × ৫ =	৭০	,,
	মিশ্রজাতির	,, ,,	১৮ × ৭ =	১২৬	,,
	সংকীর্ণজাতির	,, ,,	২২ × ৯ =	১৯৮	,,

তাল প্রদর্শন রীতি : কর্ণাটক সংগীতে ফাঁক ক্রিয়া নেই। তবে তালাঘাত অনাঘাত প্রভৃতি প্রদর্শনের রীতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তথা বিশেষ নিয়মাবদ্ধ। যেমন,

১। তালাঘাতকে বলা হয় আড়ি।

২। পাতকম = হাত উপরে ওঠানো।

৩। ক্বষ্যয় = হাত বাঁদিকে সরানো।

৪। সর্পিনী = হাত ডানদিকে সরানো।

৫। কাকপদম বলতে ১৬টি অক্ষর বোঝায়।

অনাঘাতকে বিসর্জিতম্ বা বিচ্‌চে বলে যা উপরোক্ত হস্তসঞ্চালন সহযোগে প্রদর্শিত হয়। সাধারণত তালাবর্তনের চারটি স্থান থেকে সংগীতক্রিয়া আরম্ভ হয়।

সম থেকে সংগীতক্রিয়া আরম্ভ হলে সমম্, দ্বিতীয় মাত্রা থেকে আরম্ভ হলে কালে এডম্ (১/৪), তৃতীয় মাত্রা থেকে আরম্ভ হলে আরেএডম্ (১/২), এবং চতুর্থ মাত্রা থেকে আরম্ভ হলে মুক্কালেএডম (৩/৪) বলা হয়। সংগীতক্রিয়ার সমাপ্তি স্থানকে বলা হয় মুক্তায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত চারপ্রকার রীতি কেবলমাত্র চতস্রজাতির তালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাশ্চাত্য সংগীতশাস্ত্র

গোড়ার কথা : গোড়ার দিকে বিশ্বের সকল দেশেরই রীতিনীতি ছিল প্রায় একই রকম এবং সংগীত ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিব সঙ্গে জড়িত। প্রাচীন ভারতে যেমন বেণু ও বীণা প্রভৃতির প্রচলন ছিল, পাশ্চাত্যের অনেক দেশেও তেমনি ওই ধরণের বাদ্যযন্ত্রাদির প্রচলন ছিল। তবে ঐতিহাসিক ভিত্তিতে আজ একথা স্বীকৃত যে, ভারতবর্ষ যেমন সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞান বিকাশের উৎস, ভারতীয় সামগান তেমনি বিশ্বসংগীতের মূল কারণ।

পাশ্চাত্যের প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রাদি সম্পর্কে লিখিত এবং অংকিত বর্ণনা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। গবেষকদের মতে তখন সংগীত ছিল খুবই অনুন্নত এবং বাদ্যযন্ত্রাদির বাদন প্রণালীর ছিল ফুঁ-দিয়ে, আঘাত করে বা ঘসে। ছড়ি সহযোগে বাদন প্রণালীর বিকাশ অনেক পরবর্তীকালে হয়েছিল।[১] অবশ্য সংগীতের সৃষ্টি এবং অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে সবদেশেই অসংখ্য কাহিনী প্রচলিত আছে। পণ্ডিত Crowest তো সময়কাল সহযোগে উল্লেখ করেছেন যে, ২৩৪৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে মহাপ্লাবনের পূর্বে Jubal নাকি সংগীত তথা বাদ্যযন্ত্রাদি সৃষ্টি করেছিলেন[২]

গ্রীক বৈজ্ঞানিক ও সংগীতজ্ঞ Pythagoras (582-479 B. C.) ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, সংগীত প্রভৃতির নানা উপাদান। তিনিই সম্ভবত সর্বপ্রথম The harmony of the fifth (ষড়্জপঞ্চমভাব) সূত্রানুসারে স্বরসপ্তক রচনা করেন এবং স্বরান্তরালাদি গণিতের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। যার সাহায্যে স্বরশাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন

১। Encyclopaedia Britannica. 1971. (Vol. 15) (p. 1056-1092.)
২। The Story of Music. 1902. London — F. J. Crowest.

রোমের Boethius (500 A. D.)।[১] স্বর ও গ্রাম সম্বন্ধে আলোচনাকালে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "...and the scale with seven notes and three octaves was known in India centuries before the Greek had it. Probably the Greek learnt it from the Hindus."[২] তখন গ্রীসে যে সাত-তন্ত্রীযুক্ত একপ্রকার বীণার (Lyre) প্রচলন ছিল, সেটি নাকি ভারতীয় চিত্রাবীণার অনুরূপ ছিল। এই সম্পর্কে পণ্ডিত De Lacy O'Leary বলেছেন: "The Pythagorean elements probably can be traced ultimately to an Indian source."[৩]

গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের (৩২৭ খৃঃ পূঃ) পরে গ্রীসের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়েছিল। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (২৭৪-২৩৭ খৃঃ পূঃ) ভারতীয় সন্ন্যাসীরা ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য চীন, জাপান, বর্মা, মালয়, সুমাত্রা, জাভা, গ্রীস, ইতালি, রোম, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি বহুদেশে গিয়েছিলেন।[৪]

পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে গোড়ার দিকে স্বরের কল্পনা ছিল সংখ্যাভিত্তিক। তবে চীনা (Chou dynesty, 1122-256 B. C.) ও গ্রীকদের স্বরতত্ত্ব ছিল জ্যামিতি-ভিত্তিক। তখন চীনা ও গ্রীকেরা পাঁচটি স্বরযুক্ত স্কেল স্বীকার করতো। পরবর্তীকালে সাত স্বরযুক্ত স্কেলের প্রচলন হয়। তবে ভারতবর্ষে বহু পূর্ব থেকেই স্বরাষ্টকের বিকাশ ছিল। বস্তুতঃ কয়েকটি দেশ ছাড়া সর্বত্রই কিছু-না-কিছু প্রাচীন সংগীতের তথ্যাদি পাওয়া যায়। অর্থাৎ সংগীতোৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটা ইতিহাস সকল দেশেই আছে।

সকল দেশেই প্রতিভাবান স্রষ্টারা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যুগে যুগে নব নব সৃষ্টির সাহায্যে সংগীত ও সংস্কৃতি তথা অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতিবিধান করেছেন। সেই সকল স্রষ্টাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য সেই দেশের মধ্যেই সর্বদা সীমিত থাকে নি। বাইরের দেশগুলিতেও তা ছড়িয়ে পড়েছে। সভ্যতা

১। The World of Music. 1957. London.—K. B. Sanoved. (Vol. 2)
২। India and her people. 1905—6.—Swami Abhedananda.
৩। Arabic thouht and its place in history: De Lacy O'Leary,
৪। Landmarks of the World's Art: 1971. (Vol. X).

বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই সংগীত অতি উচ্চ কলাবিদ্যারূপে স্বীকৃত হয়। প্রাচীন অনুন্নত বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বর রচনাদির তথা ভিন্ন ভিন্ন দেশের জলবায়ু, ভাষা, সমাজ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে বিচিত্রভাবে সংগীত বিকাশলাভ করেছে। তবে এর পিছনে ছিল বিশ্বপ্রকৃতির প্রভাব, তাই প্রাচীন (ক্লাসিকাল) সংগীতধারার মূল ভাবটি (প্রকৃতির প্রভাবযুক্ত) যুগ যুগ ধরে সবত্রই বিরাজিত।

পাশ্চাত্যের সংগীত তথা শাস্ত্রাদি বিকাশের উৎস হোল গ্রীস। গ্রীকেরা দর্শন, গণিত, সংগীত প্রভৃতি নানা বিদ্যায় খুব উন্নত ছিল। গ্রীসের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ার সুবিশাল গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কথা তো বিশ্বের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। যদিও তা বিধর্মীর অত্যাচারে ধ্বংস হয়েছিল। গ্রীক ধর্মযাজকেরা সংগীতকে শিল্প হিসাবে গ্রহণ করায় এবং নানা অনুষ্ঠানে সংগীত অপরিহার্য হওয়ায়, সংগীত সেখানে যথেষ্ট উৎকর্ষলাভ করেছিল। যার বহু নিদর্শন পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্যে ও নানাবিধ চিত্রাদি থেকে পাওয়া যায়। গ্রীক দার্শনিক Plato (429-347 B. C)'র মতে সংগীত মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ তথা চারিত্রিক গঠনে সহায়তা করে। তাঁর শিষ্য প্রসিদ্ধ দার্শনিক Aristotle (383-320 B. C) উক্ত অভিমত সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা করেন।

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশঃ প্রসিদ্ধ পিথাগোরাস এবং অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকেরা নিয়মিত স্বরান্তরাল নিয়ে যে স্বরসজ্জা নিশ্চিত করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি ছিল পিয়ানোর সাদা পর্দাগুলি নিয়ে রচিত। এগুলিকে গ্রীকেরা Dorian, Lydian, Phrygian প্রভৃতি সাতটি বিভিন্ন নামে নিশ্চিত করেছিলেন, যাকে Modes বলা হোত। অর্থাৎ বিশেষ স্বরান্তরাল নিয়ে গঠিত স্বরসপ্তক। ভারতীয় গ্রাম বা মূর্ছনার সঙ্গে Modes গুলির সাদৃশ্য প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে ইতালীর St. Ambrose of Milan উক্ত Modes থেকে চারটি মাত্র গ্রহণ করে চাচসঙ্গীতের সংস্কারসাধন করেন। এই ৪টিকে Authentic বা Principal Modes বলা হোত। যথা Dorian : D to d ; Phrygian ; E to e , Aeolian : F to f এবং Myxolydian : G to g ; এই পদ্ধতির নাম ছিল Centus Ambrosianus, যা প্রায় ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে Major, Minor প্রভৃতি স্কেলের বিকাশ হয়।

Milan খৃষ্টধর্ম প্রচারের কেন্দ্র এবং এমব্রোসিয়ান স্তোত্র সেখানে অনুসৃত হয় এইরূপ কথিত আছে। ভাষার কমনীয়তার জন্য ইতালীয় সঙ্গীত ছিল অত্যন্ত আকর্ষনীয় এবং সংগীতশাস্ত্রাদি রচনা, উপকরণাদি আবিষ্কার প্রভৃতির ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রাদির আবিষ্কার, স্বরলিখন পদ্ধতির সংস্কারসাধন তথা Doh, Rey, Me, Fah, Soh, Lah, Te প্রভৃতি স্বরাক্ষর উদ্ভাবন, সঙ্গীত শিক্ষার নবীন পদ্ধতির প্রবর্তন প্রভৃতির জন্য Guido of Arezzo (990-1050 A.D.) উল্লেখযোগ্য। নিজ প্রণালীর ব্যবহারিক নিযুক্তির প্রতি প্রাধান্য দিয়ে তিনি বলেছেন: "I have simplified my treatment for the sake of the young, in this not following Boethius whose treatment is useful to Philosophers but not to singers"[১] মুদ্রণের প্রথম প্রবর্তক ভেনিসের Ottaviano de Petrucci (1466-1539 A.D.); Arnault de Zwolle (d. 1440) রচিত 'De Invention et usu Musicae" (এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে নানা বাদ্যযন্ত্রের চিত্র তথা বাদন প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়), Sebastian Virdung (d. 1511) রচিত এবং প্রথম মুদ্রিত 'Musica Getutscht' গ্রন্থে নানাবিধ কার্ম নির্মিত বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া বহুবিচিত্র সঙ্গীত অপেরা প্রভৃতি রচনায়ও ইতালীয় স্রষ্টারা উল্লেখযোগ্য। ধর্মসঙ্গীত ছাড়াও তখন বিবিধ আঞ্চলিক সঙ্গীতের বিকাশ হয়। এই প্রসঙ্গে ফ্রান্সের Troubadour ও Trouvere সম্প্রদায় এবং Jonglur শ্রেণী, জার্মানীর Minne singer, Meister singer ও Gankler শ্রেণী এবং ইংল্যাণ্ডে Scop এর Ministrel শ্রেণীর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সাধারণ Church Mode এর পরিবর্তে Major ও Minor mode ব্যবহার করতেন। নানাবিধ যন্ত্রসংগীতেও এঁরা দক্ষ ছিলেন।

ফ্রান্সের সংগীত গোড়ার দিকে ছিল প্রায় আবৃত্তির মতো। ক্রমে সেখানে বিবিধ সংগীতের বিকাশ হয়। Pepin (৭৫১-৬৮ খৃঃ) Gallican নামক সাধারণ গানের প্রবর্তন করেন যা বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। তবে স্পেনের Mozarbic (খৃষ্টান মূরেরা Mosta'rib থেকে এই নামকরণ করেছিল) প্রায় ১১শ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। রোমানেরা গ্রীকদেরই অনুবর্তী এবং সমবেতভাবে সংগীতানুষ্ঠানের পক্ষপাতী ছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা

ক্রীতদাসের দ্বারা আমোদ প্রমোদের জন্য অনুষ্ঠিত হোত। রোমে ধর্মীয় স্তোত্র ও Plain song প্রবর্তন করেন Pope Gregory I (৫৪০-৬০৪ খৃঃ), যা আদর্শ চার্চ-গীতি হিসাবে সমাদৃত হয়েছিল এবং সুইজারল্যাণ্ডের St. Gall, দক্ষিণ ফ্রান্সের St. Martial প্রমুখ ধর্মযাজকদের প্রচারের মাধ্যমে তা বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল, এবং ১৬শ শতাব্দীতে লুথারের অনুষ্ঠিত য়ুরোপীয় ধর্মসমূহের পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত সবত্র স্বীকৃত ছিল। অবশ্য ইংল্যাণ্ডে এর নাম ছিল **'Sarum rite'**।

প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের সংগীত চচার প্রাচীনতম লিখিত সংবাদ পাওয়া যায় ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে। তখন মঠ, গীর্জা প্রভৃতিতে সংগীত তথা অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হোত। যার কিছু কিছু লিখিত নিদর্শন খৃষ্টান চার্চগুলিতে পাওয়া যায়। সেই সংগীত ছিল খুব সহজ যা মুখে মুখেই প্রচলিত ছিল তখন Milan খৃষ্টধম প্রচারের কেন্দ্র ছিল এবং এমব্রোসিযান স্তোত্র এখনো সেখানে অনুসৃত হয।

বস্তুতঃ সংগীতে খৃষ্টীয় যুগ বলতে ২য় থেকে ১৩শ শতাব্দী বোঝায়। তখন অধিকাংশ সংগীত ছিল খুব সহজ। Paslms এবং Hymns এই যুগের অবদান। অবশ্য ইতিমধ্যে Polyphony'র বিকাশ হযেছিল। Mass এর প্রবর্তন হয় পরে। Mass আবার Proper ও Ordinary এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। যে সকল সংগীত দিনের বিভিন্ন সমযে বা ঋতু অনুযায়ী গাওযা হোত তাদের Proper এবং সাধারণ গানকে Ordinary বলা হোত। এ'দুটির আবার নানা শ্রেণীবিভাগ ছিল। যেমন, Proper :—

Introit (for the entrance of the Priest)
Gradual (after the Epistle)
Offertory (during the offering of bread and wine)
Communion (after communion)

এবং Ordinary :—

Kyrie eleison (Lord have merey (গ্রীকদের জাতীয় সংগীত)
Gloria (Glory to God in the highest)

Credo (I believe in God—after the Gospel)
Sanctus (Holy, holy, holy.)
Agnus Dei (O Lamb of God)

এছাড়া জেরুজালেমের মন্দিরে (দুটি দলের প্রশ্নোত্তর সহ) একপ্রকার গান করা হোত যার নাম ছিল Alleluia। খৃষ্টধর্ম প্রচারের পরে গ্রীকদের জাতীয় সংগীত kyrie eleison খৃষ্টানদের প্রার্থনা সংগীত হিসাবে গৃহীত হয়। অন্যান্য ভাষার প্রভাব সত্ত্বেও, এমনকি ল্যাটিন ভাষা বিকাশের পরেও বহুকাল গ্রীকভাষাই ধর্ম বিষয়ে ব্যবহৃত হোত, যা ৩২৪ খৃষ্টাব্দে রোমের রাজধানী বাইজেন্টিয়ামের অধিবাসীরা প্রতিষ্ঠা করেছিল।

১০ম শতাব্দী পর্যন্ত যুরোপের সংগীত এককভাবেই সাধারণত অনুষ্ঠিত হোত। Polyphony'র বিকাশ পূর্বেই হয়েছিল যাকে জার্মানীর অবদান বলা যায়। তখন বিবিধ প্রকার harmony যুক্ত Melody'র বিকাশ হয়। এই শতকের শেষভাগে Organum-এর রীতিনীতি সম্পর্কে লিখিত তথ্যাদি পাওয়া যায়। ১১শ শতাব্দীতে স্বরলিখন প্রণালীর ব্যাকরণ ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না।

১২শ ও ১৩শ শতাব্দীর সংগীতকে Ars Antique আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তখন সুর ও ছন্দের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। বিবিধ সংগীতের মধ্যে Clausula, Paris Motet, Rondel প্রভৃতির বিকাশ উল্লেখযোগ্য। ওই সময়ে ইতালী ও ফ্রান্সের স্বরগ্রাম বিন্যাস নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়, তবে সেই সমস্যা সমাধানে Jacques de Leige (১২৭০-১৩৩০ খৃঃ) রচিত 'Speculum Musica' গ্রন্থখানি সহায়তা করেছিল। যা ১৪ শতাব্দীর একখানি উল্লেখযোগ্য এবং ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রামাণ্য সংগীতশাস্ত্রগ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত ছিল। তৎকালীন প্রসিদ্ধ একাধারে জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ, দৈবজ্ঞ ও সংগীতজ্ঞ Jean de Muris (১২৯০-১৩৫১ খৃঃ) রচিত 'Ars Novae Musicae' (New Art) গ্রন্থখানি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যা বিশেষ নবীনতার সন্ধান দেয়। তৎকালীন নতুন ছন্দ 'Duple', প্রচলিত Triple time এর স্থান গ্রহণ করে এবং Polyphony সংগীতের শ্রীবৃদ্ধি হয়। এছাড়া ইতালীয়

Mardrigal একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে কবি সংগীতজ্ঞ ও সংগীত-শাস্ত্রী Philippe de Vitry (১২৯১-১৩৬১ খৃঃ) রচিত 'Ars Nova' ও একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। যার শ্রেষ্ঠ ক্রিয়াত্মক রূপদান করেন Guilleaume de Machaut (১৩০০-৭৭ খৃঃ)।

১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত সংগীতের দ্রুত উন্নতি হয়। একে তাই সংগীতের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তৎকালীন সংগীতজ্ঞ ও সংগীতশাস্ত্রীদের মধ্যে Arnault de Zwolle d. 1440 , John Dunstable d. 1453 , Gilles do Binehois d. 1460 , Jakob Obrecht ১৪৫২-১৫০৫ খৃঃ), Jean d'Okeghem (১৪২৫-১৪৯৫ খৃঃ) Bass স্বর রচনা পদ্ধতির প্রবর্তক Josquin Desprcs (১৪৪০-১৫২১ খৃঃ) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ Petrucci ইতালীয় ভাষায় এগারোটি frottole প্রকাশ করেন (frottole একপ্রকার সাধারণ গান, যা একক বা সমবেতকণ্ঠে যন্ত্রসংগীত সহযোগে গাওয়া হোত) এর জনপ্রিয়তার জন্য নানা দেশে এর অনুকরণে নানাবিধ সংগীতের বিকাশ হয়। তৎকালীন Reformationএ Protestantদের প্রাধান্য সংগীত প্রগতির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যার প্রধান ভূমিকায় ছিলেন Martin Luther , যিনি চার্চে সমবেতসংগীতের পুনঃপ্রচার করেন, যা Lutherian Choral নামে খ্যাত। তখন সূক্ষ্ম স্বর সংযোগে সংগীত অত্যন্ত ঐশ্বর্যময় হয়ে ওঠে। তখন পাখির কূজন, যুদ্ধের গর্জন আদির কল্পনানুসারে তথা কাব্যের ভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে অথচ প্রাচীন রীতিকে সম্পূর্ণ ভঙ্গ না করে বহুবিচিত্র সংগীত সৃষ্টি হয়। কোমল পর্দা (Chromaticism) বিন্যাসের প্রচলন তখন থেকেই হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে Clement Jenequin (১৪৮০-১৫৬০ খৃঃ) , Lucca Marenzo (১৫৫৩-৯৯ খৃঃ) , Venosa'র রাজকুমার Carlo Gesualdo (১৫৬০-১৬১৩ খৃঃ) , Clandio Monteverdi (১৫৬৭-১৬৪৩ খৃঃ) প্রমুখ স্রষ্টারা উল্লেখযোগ্য। Orlandus Lassus (b. 1530, Mons, Belgium—d. 1594, Munich) ছিলেন Fremish সংগীতজ্ঞ। যিনি ইতালীতে Orlando di Lasso নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইতালী, ফ্রান্স ও জার্মানী ভাষায় বহু সংগীত রচনা করেন পরবর্তীকালে Hans Leo Hassler (১৫৬৪-১৬১২ খৃঃ), Heinrich Schutz (১৫৮৫-১৬৭২ খৃঃ) প্রমুখেরা ইতালীয় গীতিকবিতাগুলির আরো সুন্দর

রূপদান করেন। ইংল্যাণ্ডে তখন ছোট ছোট গানের খুব প্রচলন ছিল, যার প্রথম প্রকাশক ছিলেন ইংরাজ সংগীতবিজ্ঞান Thomas Morley (১৫৫৭-১৬০৩) ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে। ইংরেজরা তখন ইতালীয় সংগীতের অনুকরণে বহু সহজ ও সুন্দর একক ও দ্বৈত চার্চসংগীত রচনা করেন। এই সময়কালকে (The Renaissance) নবজন্মের যুগ বলা হয়। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে তখন সর্বপ্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানের তথা সাহিত্য দর্শন, রাজনীতি, কলাবিদ্যা প্রভৃতির ক্রমবিকাশ হয়। Opera এবং Ballet এর সৃষ্টিও এই সময়েই হয়েছিল।

১৭শ শতাব্দীকে বলা হয় Baroque period (অলংকার যুক্ত একটি বিশেষ রীতি)। তৎকালীন সৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যাদির মধ্যে Pompus Dimensions , Fondness for Coloratura , Chromatics and Disconnected Rhythms , Solo voices , Cantata, Fugue, Toccata, Major & minor seale , Opera (musical drama) , Instrumental Polyphony, Concerto grosso Baroque sonata, Ornamental facades, Light and shade effects, fency Ornamentation প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রোম ও ভেনিসে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম Opera ball তৈরী হয়। এই প্রসঙ্গে ইতালীয় Girolamo Frescobaldi (b. 1583, Ferrara – d. 1683, Rome) ও Domenico Scarlatti (b. 1685, Naples—d. 1757, Madrid) এবং জার্মানীর J. S. Bach (1685-1750) ও G F. Handel (1685-1759) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

১৮শ থেকে Rocco period আরম্ভ বলা হয়। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সের Bartomeo Cristofori পিয়ানো তৈরী করেন। অবশ্য অর্গানের সৃষ্টি হয় ২৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে, যার স্রষ্টা ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার Ctesibius। যার বায়ু-নিয়ন্ত্রণ গোড়ার দিকে জলধারার সাহায্যে হোত, তখন এর নাম ছিল জল-অর্গান (Hydraulus Organ) ফ্রান্স ও ইতালীতে তখন নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র, অপেরা, বিচিত্র তাল ও লয়যুক্ত অর্কেষ্ট্রা, কনসার্টো, সোনাটা, সিম্ফনী প্রভৃতি তথা Keyboard যন্ত্রের উন্নতিবিধান হয়। বিভিন্ন দেশের নৃত্যধারার মিশ্রণে তখন নৃত্যকলার এক নবীন ধারার বিকাশও হয়েছিল। এছাড়া Keyboard যন্ত্রীরা Preludes, Fugus, Toccato, Capriccios প্রভৃতি সংগীত এবং

সমবেত যন্ত্রসংগীতের কল্পনাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলেন। যন্ত্রসংগীত যে অপেরার মতো নাটকীয় হওয়া সম্ভব, তার পরিকল্পনা ও প্রমান করেন Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) এবং F. J. Hayden (1732-1809)। তখন অপেরার সঙ্গে হাস্যকৌতুক নাটকাদিরও বিকাশ হয়েছিল। Bach রচিত St. Matheus passion ও Handel রচিত Oratorio Massiah এবং Cuation প্রভৃতিকে অনবদ্য সৃষ্টি বলা যায়। Hayden রচিত সংগীত পরবর্তী Mozart ছাড়া বহু সংগীত স্রষ্টাদের প্রভাবিত করেছিল। Mozart প্রাচীন অর্কেষ্ট্রা রীতির পুনর্বিন্যাস করে এক নবীন রীতির Sonata এবং Symphony সৃষ্টি করেন। ফ্রান্সের C. Gluck (1714-1787) সৃষ্ট গাম্ভীর্যপূর্ণ অথচ সরল নাটক নাট্যজগতে নবজাগরনের সূচনা করেছিল। এই যুগের শ্রেষ্ঠ রচয়িতাদের মধ্যে Hayden, Mozart, ও Gluck উল্লেখযোগ্য। Hayden এর খ্যাতি হোল String quartret সৃষ্টি তথা Orchestra, Symphony, Oratorio প্রভৃতি রচনায়। Mozart ছিলেন Opera রচনায় সিদ্ধহস্ত, তাঁর The magic flute Requien Man প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। Symphony এবং Chember Music রচনায়ও তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর Jupiter Symphony উল্লেখযোগ্য। আর Gluck ছিলেন নবীন অপেরা সৃষ্টিতে দক্ষ।

বিশ্ববিখ্যাত Beethoven (1770-1827) এর সংগীতে Classical এবং Romantic যুগের সমন্বয় দেখা যায়। তার রচিত 1-9th Symphony, Opera Fedelio, শেষ পর্যায়ের String Quartrets প্রভৃতিকে অতুলনীয় সৃষ্টি বলা যায়। 1-9th Symphonyতে কণ্ঠসংগীত যুক্ত করে তিনি নতুন দিগ্দর্শন করেন। যা ১৯শ শতাব্দীর সংগীতজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য Wagner (1813-1888) রচিত Music drama'ও যথেষ্ট নবীনতার সন্ধান দিয়েছিল।

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে জার্মানীতে ১৮২১ সালে আর এক ধরনের নাটক প্রবর্তন করেন C. M. V. Weber (1786-1826), যার মধ্যে Sir Walter Scott রচিত উপন্যাসের অলৌকিকতা ও মধ্যযুগের গৌরব প্রভৃতির দৃশ্য সমন্বিত ছিল। সমসাময়িক Schubert (1797-1828) অপেরা রচনায়

অসফল হলেও ছয় শতাধিক গান রচনা করে কাল্পনিক অন্তর্দৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন।

জর্মানী ও অষ্ট্রিয়াতে Symphony সমাদৃত থাকলেও তখন পর্যন্ত তা নাটকে প্রযুক্ত হয় নি। J. Brahms (1833-97) ও Anton Bruckner (1824-96) প্রচলিত গীতিকবিতা ও সিম্ফনী সহযোগে ওইরূপ চেষ্টা করেন, কিন্তু আশানুরূপ সফলতা লাভ করতে পারেন নি। তবে ১৯শ-২০শ শতাব্দীতে জর্মানীরা সংগীতে অত্যন্ত অগ্রসর হন। তাঁদের Romanticism এর প্রতিক্রিয়া সমগ্র পাশ্চাত্যকে প্রভাবিত করেছিল। এই সময়ে বিদেশী শাসনের পীড়নের জন্য সর্বত্রই জাতীয় সংগীত রচনায় নবজাগরণের এবং সচেতনার তৎপরতা দেখা দেয়। বিশেষ করে রাশিয়া, বোহেমিয়া নরওয়ে প্রভৃতি দেশে। সবত্রই স্বদেশী সংগীত ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার হতে থাকে। Hugo Wolf (1860-1903) তখন কথা ও সুরের সমন্বয়ে উল্লেখযোগ্য সংগীত রচনা করেন। R. Struss (1864-1949 অতি অল্প বয়সেই অর্কেষ্ট্রা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যার রচনাগুলি Wagner এর সমসাময়িক এবং Liszt এর থেকে উন্নত ছিল। তখন রেডিও গ্রামোফোনের মাধ্যমে দ্রুত প্রচার ও প্রসারের ফলে সংগীতের ভাব, গঠন, অনুষ্ঠান, পরিবেশন প্রভৃতি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। যদিও পূর্ববর্তী সংগীতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল এবং সেটাই ছিল এই বিবর্তনের আদর্শ, কিন্তু যেহেতু জগৎ পরিবর্তনশীল এবং মানুষ বৈচিত্র্যপ্রিয় তথা স্বভাবতই সরলতা, সরসতা, সৌন্দর্য, মাধুর্য প্রভৃতির উপাসক, সেইহেতু যুগে যুগে এইরূপ পরিবর্তন সর্বদেশেই ছিল অনিবার্য। প্রসঙ্গত অষ্ট্রিয়ার Gustav Mahler (b. 1860, Kalist, Bohemia—d. 1911, Vienna) রচিত 8th Symphony (Chorus & Orchestra), Arnold Schonberg (b. 1874, Vienna—d. 1961, Los Angeles) রচিত Erwartung, Gurrelieder প্রভৃতি, ভাবসংগীতের অদ্বিতীয় রচয়িতা ইংলণ্ডের Sir Edward Elger (b. 1857, Broadheath—d. Worester), ইতালীর Giacomo Puccini (b 1858, Lucca—d. 1924, Brussels) রচিত অপেরার মতো রাশিয়ান সংগীতজ্ঞ Sergei Rachmaninov (b. 1873, Oneg, Novgorod—d. 1943, Colifornia) রচিত স্লাভদের বিরহাত্মক অপেরাও বিশ্বজয় করেছিল। যদিও

তখন পর্যন্ত রেডিও[১] ভালভাবে প্রচলিত হয় নি, এবং গ্রামোফোনের[২] ছিল শৈশবকাল। কিন্তু তবু ওই সকল রচনা শুধু শ্রেষ্ঠ হিসাবেই সমাদৃত হয় নি, সমসাময়িক স্রষ্টাদেরও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই প্রসঙ্গে আর একজন প্রসিদ্ধ রচয়িতা হোল Wagner প্রভাবিত Claude Debussy (b. 1862, St. Germain-en-Laye—d. 1918, Paris)। Romantic সংগীত রচনা তথা নবীন সংগীত পদ্ধতির আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অষ্ট্রিয়ার Arnold Schonberg (1874, Vienna—d. 1591, Los Angeles) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; যিনি 12 notes system প্রবর্তন করেন। সপ্তকের স্বরগুলিকে তিনি বিবিধ ক্রমানুসারে সাজিয়ে বহু রচনা করেছেন, সেই পদ্ধতি ছিল Equally Tempared scale এর উপরে নিভরশীল। রাশিয়া ও হাঙ্গেরী কিন্তু তখন পর্যন্ত গতানুগতিক Polyphonyকেই শ্রেষ্ঠ মনে করতো। এমনকি কোন পরিবর্তনের চেষ্টাও সেখানে প্রশ্রয় পেত না। তবে স্পেনের Manuel de Falla (b. 1876, Cadiz—d. 1946, Argentina) এবং ইংলণ্ডের Ralph Vaughen Williams (b 1872, Down Ampeny, Glos—d. 1958) লোকসংগীতের ভাব ও সুর অবলম্বনে এক নবীন তথা উন্নত জাতীয় সংগীতের প্রবর্তন করেন, যা এঁদের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেয়। এই সকল নবীন সৃষ্টির প্রতি যারা উদাসীন ছিলেন তাঁদের মধ্যে ডেনমার্কের Carl Nielsen (b 1865, North Lyndelse-d. 1931 Copenhagen), ফিন্‌ল্যাণ্ডের Jean Sibelius (b. 1865, Tavastenus—d. 1957) এবং ইতালীর Ildebrando izzetti (b. 1880, Parma--1961) উল্লেখযোগ্য। এঁরা ছিলেন স্বকীয়তাপূর্ণ শিল্পী। Sibelius রাশিয়ান সংগীত-প্রভাবিত হলেও এঁর রচনাগুলি স্বকীয়তায় একেবারে নিজস্ব ছিল। এঁদের মতে Beethoven এর সংগীতেই শুধু Classical ধারা বিরাজিত। যদিও স্বয়ং Beethoven তা মনে করতেন না। এই সময়ের আরো কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সংগীতজ্ঞ হোল হাঙ্গেরীর Bela Bartock (b. 1881, Nagyszentmiklos—d. 1945, New York), রাশিয়ার Igor Stravinsky (b. 1882, Oranienbaum, near

---

১। রেডিও ১৮৯৫ সালে ইতালীর Guglielmo Marconi আবিষ্কার করেন।

২। গ্রামোফোন 1877 সালে Thomas A. Edision আবিষ্কার করেন।

St. Petersburg), Benjamin Britten (b. 1913, Lowestoft) প্রভৃতি। Bartok-এর সংগীত ছিল বিভিন্ন লোকসংগীতের মিশ্রনে বৈচিত্রময়। তিনি Bach এবং Beethoven-এর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন কিন্তু তাঁদের অনুকরন করেন নি। Stravinsky প্রথমে Diaghilev নামক নৃত্যনাট্য রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন এবং পরে ইনি নিজস্ব একটি ধারার প্রবর্তন তথা 'L' Histoire du Soldat' ও 'Les Noces' প্রভৃতি সিম্ফনী সৃষ্টি করেন, যা রাশিয়ার প্রার্থনা সংগীত হিসাবে গৃহীত হয়। এছাড়া তিনি 'Apollon Musagete's, 'Oedipus Rex', 'The Rake's Progress' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাটকাদিও রচনা করেন। Britten এর পদ্ধতি ছিল স্বতন্ত্র। তাঁর অধিকাংশ সৃষ্টি হোল স্বরবিন্যাসের গবেষণামূলক।

Jazz হোল আমেরিকাবাসী নিগ্রোদের সৃষ্ট সংগীত-নৃত্যনাট্য। যার বিকাশ নাকি Spirituals songs থেকে হয়েছিল। Jazz শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নানা অভিমত প্রচলিত আছে। কেহ বলেন 'দ্রুততর করা' থেকে, কেহ বলেন ফ্রেঞ্চ 'jaser' (to chatter শব্দ থেকে, আবার কেহ বলেন যে, নিগ্রো সংগীতজ্ঞ 'Jasho' (1900) থেকে এই শব্দের উৎপত্তি। Jazz এর প্রাণময় সাবলীলতা অত্যন্ত দ্রুত সাদা সংগীতজ্ঞদের মধ্যে এবং সভ্যজগতে জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। এর সর্বাধিক প্রসার হয় ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। এই প্রসঙ্গে ফ্রেঞ্চ সংগীতজ্ঞ Darius Milhaud (b 1892, Aix-en-Provence) রচিত নৃত্যনাট্য 'La Creation du Monde' আমেরিকার Aaron Copland (b. 1900, Brooklyn) রচিত পিয়ানো সোনাটা The Rio Grande, ইংরাজ Constant Lambert (b 1905, London—d 1951, London) রচিত Chorus ও Orchestra, অষ্ট্রিয়ার Ernst Krenek (b. 1900, Vienna) রচিত অপেরা 'Johnny Spieltauf', আমেরিকার George Gershwin (b. 1898, Brooklyn, New York—d. 1937, Hollywood) রচিত Porgy and Bess অপেরা তথা 'Lady Be Good', 'Tip Toes' প্রভৃতি হাস্যকৌতুক নাটকাদি উল্লেখযোগ্য। ২০শ শতাব্দীতে অপেরা চরম বিকাশলাভ করেছে।

পাশ্চাত্যের কতিপয় সংগীতজ্ঞের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।[৩]

German : Johann Sebastian BACH : ২টি বিবাহ, ২০টি সন্তান।
b. 21 March; 1685 Eisenach—d, 28 July, 1750. Leipzig.
ইনি ছিলেন Toccatas ও ·Fugues-এর প্রসিদ্ধ রচয়িতা। এছাড়া তিনি Christmas Oratorio, Passion Music, Mass প্রভৃতিও রচনা করেছেন।

German : George Frideric HANDEL : (অবিবাহিত)
b. 23 Feb. 1685, Halle—d. 14 April. 1759, London.
ইনি বহু Opera, Orchestra, Chember Music, Oratorios, Harpsichord প্রভৃতি রচনা করেছেন।

German : Carl Phillipp Emanuel BACH : (J. S. Bach এর পুত্র)
b. 8 Mar, 1714. Weımar—d. 8 Dec. 1788. Hamburg.
ইনি হার্পসিকর্ড বাদক তথা সংগীত রচয়িতা হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন।

German : Christoph GLUCK. (নিঃসন্তান)
b. 2. July, ı714 Erasbach—d. 15 Nov. 1787 Vienna.
ইনি অপেরা রচয়িতা হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন।

Austrian : Franz Joseph HAYDEN (নিঃসন্তান)
b. 31 Mar. 1732 Rohrau—d. 31 May. Vienna.
ইনি বহু Symphony, Chember Music, Harpsıchord, Piano, Oratorios প্রভৃতি রচনা করেছেন।

Austrian : Wolfgang Amadeus MOZART : (২টি সন্তান)
b, 27 Jan. 1756, Salzburg—d. 5 Dec. 1791. Vienna.
বিশ্বখ্যিাত সংগীতজ্ঞ।
ইনি অসংখ্য Opera, Symphony, Piano Concertos, Violin Concertos, Rondos, Sonatas, Masses, Chember Music প্রভৃতি রচনা করেছেন।

German : Ludwig Van BEETHOVEN : (অবিবাহিত)
b. 16 Dec. 1770, Bonn—d. 26 Mar. 1827, Vienna.
ইনি শ্রেষ্ঠ সংগীত স্রষ্টা হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত।
ইনি Opera, Incidental music, Orchestra, Chember music, Piano & String (Quartets), Piano & Violin sonatas, Piano sonatas, Vocal songs প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ রচয়িতা ছিলেন।

German : Carl Maria Von WEBER. (দুটি সন্তান)
b. 18 Dec. 1786, Eutin, near Lubeek—d. 5 June, 1826, London
নবীন অপেরা রচনায় শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া ইনি বহু অর্কেষ্ট্রা, চেম্বার মিউসিক, পিয়ানো সোনাটা প্রভৃতিও রচনা করেছেন।

Austrian : Franz SCHUBERT. (অবিবাহিত)
b. 13 Jan. 1797, Vienna—d. 19 Nov. 1828, Vienna.
ইনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান সংগীত স্রষ্টা। ইনি অসংখ্য Songs, Masses, Sonata, Orchestra Chember music, Piano, Opera প্রভৃতি রচনা করেছেন। এঁর ইচ্ছানুসারে এঁকে Beethoven এর পাশেই সমাধিস্থ করা হয়।

German : Felix MENDELSSOHN. (৪টি সন্তান)
b. 3 Feb 1809, Hamburg—d. 4 Nov. 1847, Leipzig.
ইনি ছিলেন কবি ও সংগীত স্রষ্টা। ইনি অনেকগুলি Orchestra, Stage music, Chember music, Piano, Organ, Cantata, Oratories, Songs প্রভৃতি রচন করেছেন।

Norwegian : Ole Bornemann BULL.
b. 5 Feb. 1810 Bergen—d. 17 Aug. 1880, Bergen.
ইনি অত্যন্ত আদর্শবান এবং প্রাচীন সংগীতাদির আঙ্গিক সম্বন্ধে উচ্চস্তরের জ্ঞান সম্পন্ন তথা অতি সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন।

Norwegian : Edvard Hagerup GRIEG. (একটি সন্তান)

b. 15 June, 1843, Bergen—d. 4 Sept 1907, Bergen.
জাতীয় শ্রেষ্ঠ সংগীত স্রষ্টাদের অন্যতম তথা কবি ও শিল্পী। ইনি বহু Incidental music, Chember music, Orchestra, Piano, Songs প্রভৃতি রচনা করেছেন।

Russian : Nicholas RIMSKY—KORSAKOV.

b. 18 March, 1844, Tikhvin—d. 21 June, 1908, Lyubensk.
ইনি অত্যন্ত দেশভক্ত এবং রাশিয়ার সংগীত-প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃত ছিলেন। ইনি বহু Opera, Orchestra, Songs প্রভৃতি রচনা করেছেন।

English : Sir Edward ELGAR (একটি সন্তান)

b. 2 June, 1857, Broadheath—d. 23 Feb. 1934, Woreester.
ইনি বহু গীতিকবিতার স্রষ্টা এবং অতি উত্তম সংগীত-শিল্পী ছিলেন।

Italian : Giacomo PUCCINI.

b. 22 Dec. 1858, Lucca—d. 29 Nov. 1925, Brussels.
ইনি নাটক তথা নাটকীয় সংগীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

Spanish : Issac M.F. ALBENIZ.

b. 29 May, 1860, Camprodon—d. 18 May, 1909, Cambo.
এঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হোল ১২টি অংশে রচিত Iberia নামক Piano.

Polish : Ignace Jan PADEREWSKY.

b. 18 Nov. 1860, Kurylowka—d. 29 June, 1941, New York.
অসাধারণ প্রতিভার জন্য ইনি সমগ্র বিশ্বে পরিচিতিলাভ করেছিলেন।

French : Claude DEBUSSY.

b. 22 Aug. 1862, St. Germain-en-Laye—d. 25 March, 1918, Paris.

ইনি অসাধারণ প্রতিভাবান তথা নবীন সুর রচনায় অদ্বিতীয় ছিলেন। ইনি বহু Opera, Chember music, Piano, Songs প্রভৃতি রচনা করেছেন।

German : Richard STRAUSS. (একটি সন্তান)

b. 11 June, 1864, Munich—d. 8 Sept. 1949, Garanisch-Partenkirehen.

ইনি বহু Opera, Orchestra, Songs প্রভৃতি রচনা করেছেন।

Russian : Alexander GRETCHANINOV.

b. 25 Oct. 1864, Moscow—d. 1956.

রাশিয়ার ধর্মীয় সংগীতের শ্রেষ্ঠ রচয়িতাদের অন্যতম।

Danish : Carl NIELSEN.

b. 9 June, 1865, North Lyndelse—d. 2 Oct. 1931, Copenhagen.

ইনি উত্তম কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন এবং বহু গান রচনা করেছেন।

Finish : Jean SIBELIUS. (৩টি সন্তান)

b. 8 Dec. 1865, Tovastehus, Finland—

ইনি অতি উচ্চস্তরের সংগীত স্রষ্টা ছিলেন এবং বহু Orchestra, Chember music, Incidental music, Songs প্রভৃতি রচনা করেছেন।

Spanish : Y. Campina Enrique GRANADOS.

b. 29 July, 1865, Lerida—d. 24 March, 1916 (died at Atlantic)

ইনি অসাধারণ সংগীত প্রতিভার অধিকারী তথা স্রষ্টা ছিলেন, এঁকে স্পেনের সংগীতের আত্মা বলা হয়।

Swedish : Hugo ALFVEN.

b 1 May, 1872, Stockholm—

ইনি অনেক Orchestra, Songs প্রভৃতি রচনা করেছেন।

German : Max REGER

b 19 Mar. 1873, Brand - d. 11 May, 1916, Leipzig.

ইনি বহু Orchestra. Organ. Songs ইত্যাদি রচনা করেছেন।

Russian : Sergei RACHMANINOV.

b. 1 April, 1873, Oneg, Novgovorod—d. 28 March, 1943, Beverly Hills, California.

ইনি একজন সার্থক সংগীত স্রষ্টা ছিলেন।

French : Maurice RAVEL.

b. 7 Mar. 1875, Ciboure—d. 28 Dec 1937, Paris.

ইনি কয়েকটি সার্থক Piano Concerto রচনা করেছেন।

Spanish : Manuel de FALLA

b. 23 Nov. 1876, Cadiz—d. 14 Nov. 1946, Argentina

ইনি বহু Opera, Ballets, Piano, Songs প্রভৃতি রচনা করেছেন।

Finish : Selim PALMGREN.

b. 16 Feb 1878, Bjorneborg—d. 1951.

ইনি বহু Piano Concerto রচনা করেছেন।

Italian : Ottorino RESPIGHI.

b. 9 July 1879, Bologna—d 18 April, 1936. Rome.

ইনি কতগুলি গীতিকবিতা, অর্কেষ্ট্রা তথা নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন।

Italian : Gian Francesco MALIPIERO.
b. 18 Mar. 1882, Venice—
ইনি একজন প্রতিভাবান শিল্পী এবং স্রষ্টা ছিলেন।

Russian : Igor STRAVINSKY.
b. 17 June, 1882, Oranienbaum. near St. Petersburg.
ইনি একজন উত্তম সংগীতবিদ্বান, এঁর সংগীত ছিল ছন্দবৈচিত্র্যময়।

Hungarian : Emmerich KALMAN.
b. 24 Sept. 1882, Siofok—d. 30 Oct. 1953, Paris.
ইনি কতগুলি সংগীতপ্রধান নাটক রচনা করেছেন।

Italian : Alfredo CASELLA.
b. 25 July, 1883, Turin—d. 5. Mar. 1947, Rome.
ইনি একজন প্রতিভাবান সংগীতজ্ঞ ছিলেন, যিনি ইতালীয় সংগীতে যথেষ্ট নবীনতা প্রদর্শন করেছেন।

Polish : Karol SZYMANOWSKI.
b. 21 Sept. 1883, Tymoszowka—d 28 March, 1937, Lausanne.
ইনি Chopin এর পরে শ্রেষ্ঠ সংগীতস্রষ্টা হিসাবে স্বীকৃত।

Swedish : Kurt ATTERBERG
b. 12 Dec 1887, Gothenburg—
ইনি একাধারে প্রতিভাবান সংগীতজ্ঞ ও ইঞ্জিনিয়র ছিলেন।

Russian . Sergei Sergeievich PROKOFIEV.
b. 23 April, 1891, Sontzovka, Ukraine—d. 18 March, 1953, Moscow.
ইনি অর্কেষ্ট্রা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

Finish : Yrjo KILPINEN.
b. 4 Feb. 1892, Helsinki—
একজন শ্রেষ্ঠ গীত রচয়িতাদের অন্যতম।

French : Darius MILHAUD.

b. 4 Sept. 1892, Aix-en-Provence—

ইনি বহু চটকদার সংগীত রচনা করেছেন।

German : Paul HINDEMITH.

b. 16 Nov. 1895, Hanau—

অতিগুণী যন্ত্রী ও সংগীত স্রষ্টা। বহুবিধ যন্ত্র বাজাতে পারতেন।

American : Paul ROBESON.

b. 1898, Princeton, New Jersey—

আমেরিকার প্রসিদ্ধ মধুকণ্ঠী গায়ক।

Austrian : Ernst KRENEK.

b. 23 Aug. 1900, Vienna—

বহু বিচিত্র আধুনিক সংগীত রচয়িতা।

British : Sir William WALTON.

b. 29 March, 1902, Oldham—

অতি উত্তম অর্কেষ্ট্রা রচয়িতা।

American : Richard RODGERS.

b. 28 June, 1902, New York—

অসাধারণ প্রতিভাবান সংগীতজ্ঞ, যিনি বহু বিচিত্র নাটকাদি রচনা করে আমেরিকার সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছেন।

American : Harry Lillis BING CROSBY.

b. 1904, Tacoma, Washington—

আমেরিকা ও য়ুরোপের একজন অতি মধুকণ্ঠী গায়ক শিল্পী।

Russian : Dmitri Dmitrievich SHOSTAKOVICH.

b. 25 Sept. 1906, St. Petersburg—

সোভিয়েতের একজন শক্তিশালী সংগীত স্রষ্টা।

American : Samuel BARBER.

b. 9 March, 1910, West Chester, Pa.—

আমেরিকার একজন প্রথম শ্রেণীর সংগীত স্রষ্টা।

British : Benjamin BRITTEN.

b. 22 Nov. 1913, Lowestoft, Suffolk—

ইনি অনেক Opera, Orchestra প্রভৃতি রচনা করেছেন।

American : Yehudi MENUHIN.

b. 1916, New York—

একজন জগৎ প্রসিদ্ধ বেহালাবাদক। বহু রেকর্ড আছে।

American · Leonard BERNSTEIN.

b. 25 Aug. 1918, Lawrence, Mass.

একাধারে চিত্রকার, সংগীত স্রষ্টা তথা সংগীত পরিচালক।

ইজিপ্ট : পাশ্চাত্যের অন্যান্য অনেক দেশের মতো ইজিপ্টবাসীরাও নাকি গ্রীকদের থেকেই প্রথমে সাংগীতিক উপাদানাদি গ্রহণ করেছিলো। তবে ইজিপ্টে প্রাপ্ত পাথরে উৎকীর্ণ এক নৃত্যশীলা নারীমূর্তি (গবেষকদের মতে যা ১১৮০ খৃষ্টপূর্বাব্দে অংকিত বলে অনুমিত)` থেকে মনে হয় যে সেখানকার সংগীতের বিকাশ খৃষ্টপূর্বকাল থেকেই হয়েছিল।

কথিত আছে খৃষ্টপূর্ব ১৮শ শতাব্দীতে ইজিপ্ট যখন দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া আক্রমণ করে, তখন স্থানীয় নৃপতিরা নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রাদির সঙ্গে বহু সংগীতজ্ঞা নারীশিল্পী তাঁদের উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই ইজিপ্টের সংগীতে বিবিধ পরিবর্তনসহ উন্নতি সাধন ঘটে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ইজিপ্টের বাদ্যযন্ত্রাদির সঙ্গে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রাদির অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন Ancient Egyptian Drum ভারতীয় বড় ঢোলের মতো, Hand Drum মাদলের মতো, Castanets এবং Tinkling Rings খঞ্জনী বা করতালের মতো।[১]

ইজিপ্টে ধর্মানুষ্ঠান, শোভাযাত্রা ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসবে সংগীতানুষ্ঠানের প্রথা প্রচলিত। সেখানে বিবিধ স্বর রচনা (রাগ), স্বর সঙ্গতি (Harmony) প্রভৃতির বিকাশ দেখা যায়।

আরব : ইতিহাসের ভিত্তিতে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে যেমন বিভিন্ন সুরে লীলায়িত গাথা, গান প্রভৃতির প্রচলন ছিল, প্রাচীন আরবেও তেমনি

১। The World of Music, 1957 London, (Vol. II) K. B. Sandved.

বিভিন্ন স্বরের মাধ্যমে আবৃত্তির প্রথা ছিল। অতএব পৌরাণিক আখ্যায়িকাতে মুসাকে সংগীত প্রবর্তক বলে উল্লেখ করলেও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের (৫৭০-৬৩২) বহু পূর্বেই আরবে সংগীতের বিকাশ হয়েছিল।

মুসলমান ধর্ম প্রচারের পরে, সংগীত ক্রমে অতি উচ্চ কলাবিদ্যারূপে স্বীকৃত হয়। এবিষয়ে নৃপতিরাও যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা হারুণ-অল-রসিদ তো (৭৮৬-৮০৯) সংগীতের পরম-পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাগদাদ তখন সংগীতানুশীলনের একটি বিখ্যাত কেন্দ্ররূপে পরিগণিত ছিল। সেখানে গীত, বাদ্য ও নৃত্যের জন্য বিচিত্র পোষাকেরও ব্যবহার ছিল। আরবেরা যন্ত্রের চেয়ে কণ্ঠসংগীতেরই বেশী পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা হালকা ধরনের গান ও গৎ অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁদের স্বরনাম, স্বরসংখ্যা শ্রুতিবিভাজন রীতি, মোকাম প্রভৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। বৈদিক প্রথম, দ্বিতীয় প্রভৃতির মতোই ছিল তাঁদের স্বরনাম ও শ্রুতিবিভাজন। যেমন,

Jek			Du			Si	Tschar			Pen			Schesh	Helf			Jek
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১
C			D			E	F			G			A	B-flat			C

অর্থাৎ তাঁদের সাতটি স্বর সতেরটি শ্রুতিতে বিভক্ত ছিল। তাঁদের ৪টি প্রধান এবং তার থেকে উৎপন্ন ৮টি, মোট ১২টি মোকাম আছে। এই ১২টির মিশ্রণে উৎপন্ন আরও ৬টি থাকায় মোট মোকামের সংখ্যা হোল ১৮টি। তবে কাহারো কাহারো মতে আরবীয় সংগীতে ২২টি প্রধান থাট বা মোকাম, ২৪টি শোভা ও ৪৮টি গুম্বা প্রচলিত। সংগীতশাস্ত্রবিদ Curt Sachs তাঁর The Rise of Music in the Ancient World গ্রন্থের The Greek Heritage in Islam অধ্যায়ে আরবীয় মোকামকে ভারতীয় রাগেরই অভিন্ন রূপ বলে উল্লেখ করেছেন : "···the exact counterpart of the Indian rāga : a pattern of melody ···", তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন : "Maquam is like rāga in India, the essential quality of a melody······ On the other hand, the Arabs, like the Hindus, have connected certain Maquamat with the hours of the day and the sings of the

Zodiac…".[১] আরবীয় সংগীতে স্বর-মূলক (Melodic mode—asba) এবং সংগতি-মূলক (Rhythmic mode—iqa) এই দুই প্রকার ঠাট প্রচলিত। তবে য়ুরোপীয় সংগীতে যেভাবে Harmony'র ব্যবহার আছে আরবে তেমন নেই।

সেখানে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রাদিতে বিচিত্র সংগীতের আয়োজন থাকত। গানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রাদির সহগমনও প্রচলিত ছিল। তাঁদের প্রিয় বাদ্যযন্ত্রাদির মধ্যে অল্-উদ্ (al-ud—lute), তান্বুর (tanbur—pandore), কোয়ানুন (qanun—plastery), কিউসব বা নে (qusaba or nay—flute), তবল (tabl—drum), ডাফ্ (duff—tambourine), কোয়াদিব (qadib—wind), কুইটারা (qitara), জমর্ (zamr—reed pipe) বুক (buq—horn or clorion), নফির (nafir—trumpher), নক্কারা (naqqara—kettle drum), কসা (kasa—cymbal), প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে যে, পাশ্চাত্যের লিউট, রেবেক, গীটার, নেকের প্রভৃতির নাম নাকি আরবীয় অল উদ্ রবাব, কুইটারা, নক্কারা প্রভৃতি নামানুসারে হয়েছে। অবশ্য এবিষয়ে মতভেদও আছে।

বাংলাদেশের বাউলদের সঙ্গে আরবীয় সুফী সম্প্রদায়ের দরবেশদের অদ্ভুত সাদৃশ্য, প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

পারস্যঃ কথিত আছে যে, পারস্য-সংগীতের প্রবর্তন করেন জেমশিদ্ বা জীয়ামচিদ্ (Gjemshid or Gimschid)। তবে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত পারস্যের সংগীত অনুন্নত ছিল। আরবীয় শিল্পীরাই নাকি তাঁদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনুশীলনের তথা ঔপপাত্তিক জ্ঞানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু Dr. H G. Farmar এর মতে পারস্যবাসীরাই আরবকে সাংগীতিক তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এবং আরবীয় সংগীতে বাইজেন্টিয়াম ও পারস্যের প্রভাব থাকলেও আসলে গ্রীকদের কাছেই তা ঋণী ছিল।[২] পণ্ডিত Fetis-এর মতে প্রাচীন পারস্য সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের ঐক্য ছিল এবং তা থাকাই স্বাভাবিক, কারণ বাণিজ্যিক ব্যাপারে পারস্য ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। পারস্য সংগীতের মোকাম, শোভা, গুম্বা প্রভৃতির শ্রেণীভাগ ভারতীয় রাগ-

১। Curt Sachs: The Rise of Music in the Ancient World. 1944. London.

২। A History of Arabian Music: 1922, London, Dr. H. G. Farmar.

রাগিণীর অনুকরণেই হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। স্যার উইলিয়াম জোন্সের মতে, পারস্যের সংগীত প্রাণস্পর্শী ছিল বটে, কিন্তু ঔপপত্তিক বিষয়ে তাঁদের বিশেষ জ্ঞান ছিল না। রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতে, পারস্য সংগীতের সপ্তক আগে ১৭টি ভাগে (শ্রুতি) বিভক্ত ছিল। ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্যের কোমল স্বর (Chromatic Scale) বিকাশের পরে পারস্য-সপ্তক নাকি ১২টি অংশে বিভক্ত হয়। স্যার উইলিয়ম জোন্স ৮৪টি পারসিক মোকামের উল্লেখ করেছেন, যেগুলি ১২টি ঘর, ২৪টি বিশ্রামস্থান এবং ৪৮টি কোন্ বা সন্ধিস্থানের সংখ্যানুসারে বিভক্ত ছিল।

পারস্যে হার্পের বিশেষ আদর ছিল। প্রসিদ্ধ আমীর খসরু তাঁর মীরাহ-ই-ইসকিন্দর (Mirah-i-Iskhindir) কবিতায় হার্প এবং তার সুর ঝংকারকে স্বর্গের সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। পারস্য ভাষায় হার্পকে 'চাঙ' (Chang) ও আরবে জাংক (Junk) বলে। এছাড়া বীণা শ্রেণীর উদ (Oud--Lute), 'স্থারে' (Schtareh—guitar) ও তম্বুরা শ্রেণীর তার (Tar), রেবাব বা রবাব প্রভৃতি পারসিকদের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও তাজিয়ার সময়ে সংগীত অপরিহার্য ছিল। ইমান হাসান-হোসেনের উদ্দেশ্যেই সেই সংগীত অনুষ্ঠিত হোত। এছাড়া বিবাহাদি অন্যান্য উৎসবেও সংগীতানুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। মৌলবীরা ছিলেন সংগীতের পরম ভক্ত, তাঁরা চক্রাকারে নৃত্য করে গান করতেন। তুরস্কেও ওই ধরনের সংগীতের প্রচলন ছিল। পারস্য-সংগীতে তম্বুরার ব্যবহার ভারতের মতোই হয়ে থাকে। তাঁরা প্রেম সংগীতের খুব ভক্ত। গজল গানের সৃষ্টি তাঁদেরই সুন্দর রুচির অবদান।

রাশিয়াঃ রাশিয়ার প্রাচীন সংগীত হিসাবে বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় শতাব্দীর সূচনায় সেখানে সামান্য লোকসংগীত ছাড়া সম্ভবত আর কিছুই ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ১০ম শতাব্দীর পূর্বে রাশিয়ার সংগীত সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ঐতিহাসিক ভিত্তিতে শুধু জানা যায় যে, ১০ম শতকে বুলগেরিয়া ও ভল্গানদীর দক্ষিণ তীরবর্তী শ্লাভেরা সংগীতে খুব উন্নত ছিল। রাশিয়ার সংগীত গড়ে উঠতে গ্রীস, রোম, ইতালী, আরব, বাইজেন্টিয়াম, ইংল্যাণ্ড, জার্মান প্রভৃতি দেশ সাহায্য করেছিল। তবে তাদের সংগীত ও সংস্কৃতির প্রেরণা যে মূলতঃ ভারতবর্ষই জুগিয়েছিল তার প্রমাণ

সেখানকার সূর্যপূজা, বৃক্ষপূজা প্রভৃতি এবং বাদ্যযন্ত্রাদি থেকে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক M. D. Calvocoressi বলেছেন : "No actual example of primitive Russian music is known....Countless references to the old mythological deities occur, and also much that would be meaningless except in connection with sun worship, tree-worship and so on".[১] কালভোকোরেশী ভাস্কর্য, ওই ধরনের স্মৃতিপ্রস্তর প্রভৃতি এবং বিভিন্ন গ্রন্থকারদের তথ্যাদির উল্লেখ সহযোগে খৃষ্টীয় ১০ম শতকের সাংগীতিক নিদর্শণাদির বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

১২শ শতকের গোড়ার দিকে সেখানে চার্চসংগীত, স্বরলিখন পদ্ধতি প্রভৃতির প্রচলন হয়। ১৫শ শতকের শেষের দিকে মস্কো রাশিয়ান সভ্যতার কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। ১৭শ শতকে কোর্ট থিয়েটার তথা শ্লাভ ও ককেশিয়ান সংগীতের সঙ্গে পোলিশ নৃত্যের প্রচলন হয়। ১৮শ-১৯শ শতকে অপেরা সংগীতের প্রবর্তন হওয়ায় সেখানকার সংগীত আরও উন্নত হয়ে ওঠে। ১৯শ-২০শ শতকে সংগীতের নবীনতম রূপায়ণ দেখা দেয়। বর্তমানে সেখানে ভারতীয় রাগ সংগীতও কিছু কিছু প্রচলিত হয়েছে।

কোরিয়া : Han রাজত্বকালে (খৃষ্টপূর্ব ৭৫ অব্দ) কোরিয়া ছিল চীনের দখলে এবং Lo-lang প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। ৩৩১ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম তাঁরা চীনের দখল থেকে Lo-langকে মুক্ত করেন, কিন্তু চীন ও জাপানের কবল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং সুষ্ঠু ও স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ৬৬৪-৮৯২ খৃষ্টাব্দে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কোরিয়াবাসীদের পূর্ণ বিকাশ হয় ৮ম-৯ম শতাব্দীতে। ১৩শ-১৪শ শতকে আবার এই দেশকে মঙ্গোলীয়ানরা আক্রমন করে এবং ১২১৫-১৩৫৬ খৃঃ পর্যন্ত দখলে রাখে। মঙ্গোলদের কবল থেকে মুক্ত করার পরে Yi-dynesty পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। কোরিয়ার বর্ণমালার বিকাশ হয় ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে যা আজও প্রচলিত।[২]

১। M. D. Calvocoressi : A Survey of Russian Music. 1944.
২। The Oriental World : Roger Goepper. 1971.
(Landmarks of the world's Art. 1971. London. Vol. X.)

কোরিয়াবাসীরা চীনাদের মতোই সংগীতপ্রিয়। শিল্প ও ললিতকলার কোন কোন শাখায় এঁরা চীনাদের থেকেও উন্নত। তবে ক্ষমতালোভী দেশগুলির অত্যাচার ও উৎপীড়ণে তাঁদের স্বাভাবিক প্রতিভার বিকাশ হতে পারে নি।

কোরিয়ার সংগীতে মাত্র পাঁচটি স্বরের বিকাশ দেখা যায়। তাঁরা খুব রক্ষণশীল জাতি। সেখানে কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের প্রচলন আছে, তবে নারী-শিল্পীরা যন্ত্র সংগীতে অংশ গ্রহণ করে না এবং সহ-নৃত্যেরও প্রচলন নেই। তাঁদের অধিকাংশ বাদ্যযন্ত্রাদি চীনা ও জাপানীদের মতো। তাঁদের সবচেয়ে প্রিয় বাদ্যযন্ত্র হোল কোমোউন্কো (Komounko)।

বর্মা : বর্মার সংগীতে ভারতীয় সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাব আছে। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীগুলিই সেখানকার নাটকাদির প্রধান অবলম্বন। সেখানকার প্রিয় বাদ্যযন্ত্র হোল সোউম (Soum/Soung), থ্রো (Thro), গঙ্ (Gong) প্রভৃতি।

শ্যাম : শ্যামবাসীরা তাদের সংগীতের জন্য বর্মা, চীন, পেগু ও ভারতবর্ষের কাছে ঋণী। গোড়ার দিকে সেখানে মাত্র পাঁচটি স্বরের বিকাশ ছিল। ক্রমে সাতটি স্বরের বিকাশ হয়। বিভিন্ন সুরে (রাগে) লীলায়িত ছোট ছোট সরল ও স্নিগ্ধ গানই সেখানকার সংগীত সম্পদ। হারমনিকা জাতীয় কাঠের তৈরী রেনট (Ranat) এবং গঙ্ (Gong) তাঁদের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র।

চীন : চীনা সংগীত বিকাশ সম্পর্কে জার্মান সংগীতশাস্ত্রবিদ Curt Sachs বলেছেন : "Chinese music can be traced back to the Shang Dynesty between the fourteenth and twelfth centuries B. C., Japanese music began only in the fifth century A. D., when Korean Court music adopted."[১] ডঃ বোকে (Dr. A.C. Bouquet) চীন, ইরাণ, সিরিয়া, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশের মধ্যে একটি সুপ্রাচীন অখণ্ড সভ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন, যার বয়স অন্তত খৃষ্টপূর্ব চার'শ বছর। চীন যে

১। Curt Sachs: The Rise of Music in the Ancient World. (1944. London).

তার সংগীত ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষের কাছে ঋণী সে বিষয়ে অধ্যাপক লিয়াং-চি-চাও তাঁর 'Kinship between Chinese and Indian Culture' নিবন্ধে বলেছেন : "সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষ চীনকে যে সকল বিদ্যা শিখতে বা তাহাতে উন্নতিলাভ করিতে সাহায্য করিযাছিল—তাহা সংগীত, স্থাপত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, তরুণ নাটক রচনা ও অভিনয় কবিতা ও উপন্যাস-কাহিনী আদি রচনা, জ্যোতিষ ও মাস বর্ষাদি গণনা, চিকিৎসা, বর্ণমালা ও লিপি-উদ্ভাবন, গদ্য লিখিবার উৎকৃষ্ট রীতি, হেতুবিদ্যা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, সামাজিক নানা প্রতিষ্ঠান রচনা ইত্যাদি"[১] চীনের জাতীয় গ্রন্থাগারে এখনও ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ ও মূল নিয়ে সত্তর হাজার পুঁথি আছে।

চীনে সংগীতানুরাগ ও সংগীতানুশীলন যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। চীন সম্রাট-গণ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিল্পীদের আমন্ত্রণ করতেন। মধ্য এশিয়ার কুচি/কছ (Kutch) প্রদেশের অধিবাসীরা সংগীতের অত্যন্ত ভক্ত ও সাধক ছিলেন। চীন সম্রাটেরা ইন্দো-কুচীয় সংগীত খুব ভালবাসতেন। চীনা সংগীতে এখনও কুচীয় সংগীতের একুশটি স্বর রচনা (রাগ) সযত্নে রক্ষিত আছে। Ts'ao ব্রাহ্মণবংশেই বিশেষভাবে সংগীতের অনুশীলন ছিল, যা বংশ-পরম্পরায় প্রসারলাভ করেছিল। এই বংশের উল্লেখ-যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন Miao-ta। ডঃ কালিদাস নাগ বলেছেন যে, রাজা Fu-Hsi-র রাজত্বকালে (2855-2738 B. C.) বীণার বিশেষ প্রচলন ছিল। রাজা Huang-ti (2704-2595 B. C.) নাকি সাংগীতিক স্বর, রিড, অর্গান, ঘণ্টা প্রভৃতির প্রবর্তন করেন। এবং রাজা Yao (2357-2258 B. C.) নাকি চর্ম নির্মিত বাদ্য-যন্ত্রাদির প্রবর্তন করেন।

প্রাচীন পাঁচটি চীনা স্বর সম্পর্কে Curt Sachs বলেছেন : "The scale usually presented in the form Kung (Doh), Shang (Rey) Chiao (me), Chih (Sol), Yu (Lah), Kung (Doh)"—এ্যালেন ডানিয়েলু উক্ত স্বরগুলির সঙ্গে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় স্বরের তুলনা করেছেন।[২]

১। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : 'বৃহত্তর ভারত' প্রবন্ধ। (প্রবাসী পত্রিকা। ১ম সংখ্যা ১৩৩২ সাল)।

২। Alian Daniellou :—Introduction to the Study of Musical scale 1943, P. 74

I	Kung	C	Sa	1	81/81
II	Chi	G	Pa	3/2	81/54
III	Shang	D	Re	9/8	81/72
IV	Yu	A+	Dha+	27/16	81/48
V	Kyo	E+	Ga+		81/64

ডানিয়েলু বলেছেন, Seu-Ma-Thien-এর মতে এই পাঁচটি স্বরের নাম হোল যথাক্রমে হোয়াঙ-চঙ, থাই-চিউ, কু-সেন, লিন-চঙ ও নান-লিউ (Hwang-Chong, Thai-Cheu, Ku-Syen, Lin-Chong and Nan-lyu)। পরবর্তীকালে ক্রমে সাত স্বরের বিকাশ হয়। বর্তমানে প্রচলিত স্বর সপ্তকের নাম ও আন্দোলন সংখ্যা এবং পাশ্চাত্যের স্বরাক্ষর ও আন্দোলন সংখ্যা হোল এইরূপ —

পাশ্চাত্য আঃ সং	240	270	300	320	360	400	450	480	540
পাশ্চাত্য স্বরাক্ষর	C	D	E	F	G	A	B	C′	D′
চীনা স্বরনাম	Haf	Chi	Ye	Shang	Tse	Fung	Fun	Len	Yu
চীনা আঃ সং	256	288	320	341	384	427	480	512	576

চীনা ভাষার একখানি 'পদার্থবিজ্ঞান' (Physics) গ্রন্থ থেকে উপরোক্ত তালিকা সংগৃহীত হয়েছে। এখানে চীনা স্বর-নামগুলির সপ্তকান্তরে পরিবর্তন লক্ষণীয়।

ভারতীয় সংগীত যেমন ষড়্‌জকে আশ্রয় করে লীলায়িত, ভাব, রস, বর্ণ প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত তথা পুরুষ ও প্রকৃতি-মতবাদ নিয়ে বিকশিত, চীনা সংগীতও তাই। ভারতীয় বাদী সমবাদী প্রভৃতির মতো চীনা সংগীতেও E/F বা গান্ধার/মধ্যমকে রাজা, G বা পঞ্চমকে মন্ত্রী, A বা ধৈবতকে রাজভক্ত প্রজা, C বা ষড়্‌জকে রাজকার্যের ব্যবস্থাপক এবং D বা ঋষভকে পৃথিবীরূপী দর্পণ ইত্যাদি রূপে অভিহিত করা হয়েছে। তবে ভারতীয় স্বর সপ্তক যেমন সাতটি স্বর নিয়ে গঠিত, চীন কিন্তু বহুকাল মাত্র পাঁচটি স্বরেই নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে। তারা স্বর সংগতিকে (Harmony) তেমন প্রাধান্য দেয় নি। তারা স্বরেরও

আট রকম প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছে। যেমন, ১। চামড়ার, ২। পাথরের, ৩। ধাতব দ্রব্যের, ৪। পশমী সুতার, ৫। কাঠের, ৬। বাঁশের, ৭। লাউ-কুমড়া প্রভৃতি ফলের এবং ৮। পোড়ামাটির শব্দ। সংগীত যে মানুষের অধ্যাত্ম-সম্পদ এবং সুদীর্ঘ সাধনার জিনিষ সে বিষয়ে চীনে বহু কাহিনীও প্রচলিত আছে। তাদের যাবতীয় বিষয় বিকাশের পিছনে ভারতীয় ভাবধারার প্রেরণা থাকলেও সকল বিষয়েই তাদের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈশিষ্ট্য আছে।

জাপান: প্রাচীনকালে জাপান নাকি এশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। কিছু ভূখণ্ড সমুদ্রে ডুবে যাওয়ায় জাপান এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমান ভৌগোলিক রূপ গ্রহণ করে। জাপানে দুটি প্রধান প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রস্তর যুগের Jōmon সভ্যতা, যা প্রায় দু-হাজার বছর নিরুপদ্রবে বিকশিত ছিল এবং খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীর পরে Yayoi সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে লোপ পায়। Yayoi-রা নাকি Kyūshū-র মধ্য দিয়ে দক্ষিণ থেকে (সম্ভবত কোরিয়া) নানা উন্নত উপাদান সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। তারা চীনের কাছে লোহার ব্যবহার শিক্ষা করে এবং সম-ঐতিহাসিক Old Tomb যুগের বিকাশ হয়। জাপানে ব্রোঞ্জ যুগের আরম্ভ হয় ৩য় শতাব্দীর পরে। Yamato-রা ছিল খুব উন্নত। প্রাচীন রীতিনীতির পুনর্বিন্যাস করে তারাই প্রথম জাপানী সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। দেব-দেবীর উপাসনা-প্রথা তখন থেকেই প্রচলিত হয়। সেই ধর্মের নাম ছিল Shinto (স্বর্গের পথ)। আরাধ্য দেবতা Tenno (স্বর্গের রাজা) ছিল সাক্ষাৎ সূর্য-দেবী Amaterasu Omikami-র বংশধর। Shinto ধর্ম পরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। জাপানে বৌদ্ধধর্মের গোড়াপত্তন হয় ৫৫২ খৃষ্টাব্দে।[১]

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পরে ৮ম শতাব্দী থেকে প্রকৃতপক্ষে জাপানের ইতিহাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সংগীতকলারও সেখানে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। অবশ্য জাপান তার সংগীতের উপাদান ও প্রেরণা পেয়েছিল চীন ও কোরিয়ার মাধ্যমে ভারতবর্ষ থেকে। সম্রাট Shōmu-র রাজত্বকালে (৭২৪-৭৪৮) চন্দনকাঠ নির্মিত 'বিওয়া' (Biwa) প্রচলিত ছিল। বিওয়া পাঁচ তন্ত্রীযুক্ত বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র এবং ঝিনুকের বিচিত্র কারুকার্য সমন্বিত। এর আয়তন 1.3 ft, 8½ in. (113 c.m.)[১]

১। The Oriental World: Roger Goepper, 1971, London (Landmarks of the Worlds Art, 1971, London, (Vol: X.)

জাপানী সংগীতের সৃষ্টিকথাতেও ভারতীয় সংগীতের মতো পৌরাণিক কাহিনীর যোগাযোগ আছে। স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বলেছেন, জাপানে প্রবাদ আছে যে, সূর্যপত্নী Amaterasu অন্যান্য দেবতাদের কাছে অপমানিতা হয়ে এক পর্বতগুহায় আত্মগোপন করেন। অনেক অনুনয়েও তিনি আত্ম-প্রকাশে অসম্মত হওয়ায় তাঁকে মোহিত করার জন্যই নাকি দেবতারা সংগীতের সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ জাপানী সংগীতও অধ্যাত্মসাধনা-মূলক। জাপানীদের জীবনে সংগীতানুশীলন একটি অপরিহার্য বিষয়। সেখানে দেশী ও মার্গ সংগীত তথা নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত আছে। তাদের স্কেল মাত্র পাঁচটি স্বর নিয়ে গঠিত। সংগীত শিল্পীরা সেখানে চার শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন, ১। প্রার্থনা ও ধর্মসম্বন্ধীয় সংগীতজ্ঞদের বলে গক্কুনাই (Gakkunin), ২। পেশাদার নানারকম সংগীতজ্ঞদের বলে গুইনিন (Guenin), ৩। ধর্ম ও সামাজিক উভয় রকম সংগীতজ্ঞদের বলে ফেকি ব্লাইণ্ড (Feki Blind) এবং ৪। নারী শিল্পীদের (যারা শুধু আধুনিক গান গায়) বলা হয় ঘেকোস (Ghckhos)। বাদ্যযন্ত্রগুলি সেখানে সম্পূর্ণ (Perfect) বা পরিণত এবং অসম্পূর্ণ (imperfcct) বা অপরিণত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সম্পূর্ণ যন্ত্রগুলি শুধু ধর্ম ও উৎসব সংগীতে ব্যবহৃত হয়। আর অসম্পূর্ণ যন্ত্রগুলি হাল্কা সংগীতে ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রগুলির মধ্যে Biwa, Koto, Kokiu ও Samisen প্রধান। এছাড়া নারী শিল্পীদের প্রিয় যন্ত্র Gheko এবং Fuye বা Teki, Riyu eki, Phakuhachi প্রভৃতি বাঁশি জাতীয় ও W-Tzudzumi, Ko-Tzudzumi, Kagura-Taika প্রভৃতি চামড়ার যন্ত্রের নামও উল্লেখযোগ্য। চীনাদের মতো জাপানীরা ডানদিক থেকে বাঁদিকে সোজাসুজি দাঁড়ানো রেখা দিয়ে স্বর রচনা লিপিবদ্ধ করে। কণ্ঠসংগীতের লিপিতে স্বরনামগুলি দাঁড়ানো রেখার বাঁদিকে লেখা হয়।

ইংল্যাণ্ড: ইংল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসী ব্রিটনেরা অত্যন্ত সংগীত-প্রিয় ছিল। খৃষ্টধর্ম প্রচারের পরে নানা উৎসব ও ধর্মানুষ্ঠানে সংগীতের প্রচলন হয়। যদিও গোড়ার দিকে তারা যন্ত্রসংগীতের বেশী পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু গীর্জাদিতে উপাসনার জন্য কণ্ঠসংগীতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, ফলে সেখানে সংগীতজ্ঞ ধর্মযাজকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ক্রমে সংগীত প্রচার তথা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার এবং নানাবিধ সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রাদির আবিষ্কার তথা স্বরলিখন পদ্ধতির

বিকাশ হয়। তবে সংগীত প্রগতির ক্ষেত্রে ইংরেজরা ইতালী ও ফ্রান্সের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

ব্রিটেনেরা কবি, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ এবং প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র হার্পকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখত। হার্প ছিল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১। রাজ পরিবারের জন্য, ২। সংগীত শিক্ষা ও স্পেনসার্ডদের জন্য এবং ৩। গণ্যমান্য সম্প্রদায়ের জন্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দাস শিল্পীরা হার্প বাজানোর অধিকার পেত না।

কথিত আছে যে ১২শ শতাব্দীর মাঝামাঝি দ্বিতীয় হেনরী, D. Mus. উপাধি-দানের প্রথার প্রবর্তন করেন। প্রথম রিচার্ড (১১৫৭—১১৯৯) সংগীত ও সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং উত্তম বীণা (Lyre) বাজাতে পারতেন। পাশ্চাত্যে কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের উপকরণাদি সংরক্ষণের বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা আরম্ভ হয় ১৭শ শতাব্দী থেকে, এবং সংগীতের ইতিহাস প্রকাশিত হয় ১৮শ শতাব্দীতে। তৎকালীন সংগীত শাস্ত্রাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল G. B. Martini রচিত 'Storia della Musica (1757—81) ও Antonio Eximeno রচিত 'Dell'origine e delle' (1774)। Eximeno সংগীতকে কোন নিয়মাবদ্ধ রূপ দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে সংগীতশাস্ত্রের রচনা অনুভব শক্তির ভিত্তিতে হওয়া উচিত। Romantic সংগীত বিকাশের গোড়াপত্তন তিনিই করেছিলেন। সংগীতশাস্ত্রী হিসাবে তিনি ছিলেন সার্থক ও সুপ্রতিষ্ঠিত। এছাড়া ১৮শ শতকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হোল, Charles Burney রচিত 'General History of Music'(1776—89) ও Sir Hawkins রচিত 'General History of the Science and practice of Music'।

পাশ্চাত্য সংগীতে ষড়্জাদি স্বরগুলিকে যথাক্রমে Doh, Rey, Me, Fah, Soh, Lah ও Te বলে। প্রতিটি স্বরকে আবার ইংরাজি বর্ণমালার অক্ষর সহযোগেও ক্রমানুসারে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন, "A B C D E F G", এর যেকোন স্বরাক্ষর থেকেই সপ্তক নির্ধারণ করা যেতে পারে, তবে প্রতিটি অষ্টম স্বর সর্বদা একই স্বরাক্ষর হবে। যেমন আরম্ভিক স্বরটি যদি C হয় তাহলে সপ্তকের স্বরক্রম হবে 'C D E F G A B'। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উক্ত স্বরাক্ষরগুলির মূল্য (আন্দোলন সংখ্যা) নিশ্চিত করায় যেকোন স্বরকে নিশ্চিত-রূপে নির্দেশ করা সম্ভব। যেমন, C=২৪০, D=২৭০, E=৩০০ ইত্যাদি।

বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে বাদ্যযন্ত্রাদি নির্মাণ, স্বরস্থান, সপ্তক প্রভৃতি নির্দেশ করার জন্য এই স্বরাক্ষরগুলি ব্যবহৃত হয়। মনে রাখতে হবে যে, সা রে গ ম প্রভৃতির মতো Doh, Rey, Me, Fah প্রভৃতি যেকোন স্বর (স্থান) থেকে আরম্ভ করা যায়, কিন্তু স্বরাক্ষরগুলি তা নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় সংগীতে কোন বিশেষ স্বর বা সপ্তক নির্দেশ করার কোনরূপ নিশ্চিত প্রক্রিয়া নেই। শিল্পীর ব্যবহৃত সপ্তকই সেখানে মধ্যসপ্তক। কিন্তু পাশ্চাত্য সংগীতে স্বরাক্ষরগুলির সাহায্যে আরম্ভিক স্বর তথা সপ্তক দুই-ই নির্দেশ করা যায়।

Music : 'Music' গ্রীক Mousike শব্দ থেকে এসেছে, যাকে ল্যাটিন Musica শব্দের বিবর্তিত রূপ বলা যায়। Music বলতে সংগীত বোঝায়।[১]

Rhythm : 'Rhythm' গ্রীক Rhythmos (যার অর্থ নিয়মিত গতি) শব্দ থেকে এসেছে। Rhythm বলতে তাল বোঝায়।

Melody : ক্রমিক ধ্বনি রচনাকে Melody বলে। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক ও সংগীতশাস্ত্রী Aristotle (384-322 B.C.) দার্শনিক ভিত্তিতে Melody-কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যেমন ১। Ethical melodies ২। Melodies of action এবং ৩। Passionate melodies। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীর Pseudo Euclid, 'Melody' রচনার ৪টি বিভাগের উল্লেখ করেছেন। যেমন, ১। Agoge (গতিযুক্ত), ২। Ploke (গতিহীন), ৩। Petteia (একক স্বরের বারবার উচ্চারণ সহ) এবং ৪। Tone (একক স্বরোচ্চারণের দীর্ঘতা বা স্থায়িত্ব অনুসারে)। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর ক্লুনির মঠাধ্যক্ষ ওডো'র (Odo abbot of Cluny) মতে একতারার সাহায্যেও Melody'র সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। খৃষ্টীয় ১২শ-১৩শ শতাব্দী থেকেই ইতালী ও ফ্রান্সে Melody অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করেছিল। বস্তুতঃ Melody বলতে সুর রচনা বোঝায়।[১]

Mode : ল্যাটিন Modus শব্দ থেকে Mode শব্দের উৎপত্তি। Mode বলতে তখন প্রাচীন গ্রীক সুর রচনা বোঝাত, এখনো প্রায় তাই আছে। তবে বর্তমানে Scale পদ্ধতিকেই Mode বলা হয়। Mode শব্দের অর্থ আসলে থাট। অনেকে রাগও বলেন। তবে Mode বলতে ভারতীয় 'থাট'-ই বুঝতে হবে।

Motet : গোড়ার দিকে এর গঠন ছিল কিছুটা সুর ও কিছুটা কথা নিয়ে, তখন এর নাম ছিল Motetus। দুটি বা তিনটি অংশ নিয়েও এটি রচিত হোত।

১। ... Britannica, 1971. (Vol. 15. P. 1056).

১৩শ শতাব্দী থেকে এটি Motet নাম গ্রহণ করে। যদিও প্রথমে শুধু ল্যাটিন ভাষাতেই এর বিকাশ ছিল, তবে ক্রমে French-Latin, English-Latin প্রভৃতি অনেক মিশ্র ভাষার রচনারও সৃষ্টি হয়।

মূল Motetগুলির সঙ্গে যন্ত্রের সহযোগিতাও থাকতো তবে কণ্ঠের প্রাধান্যই ছিল বেশী। এগুলি Polyphonic বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, পূজার উপকরণ ও পদ্ধতি সহযোগে মহোৎসবাদিতে সাধারণ গান হিসাবেও ব্যবহৃত হোত। বর্তমানে Motet বলতে চার্চ-সংগীত বোঝায়।[১]

Polyphony : গ্রীক Polys (অনেক) এবং Phonos (ধ্বনি) সংযোগে এই শব্দের উৎপত্তি। গোড়ার দিকে অনুন্নত ধর্মীয় সংগীতাদিকেও নাকি Polyphony বলা হোত। তবে ১৬শ শতাব্দী থেকে Polyphony'র (একপ্রকার ধর্মীয় সংগীত) বিকাশ সুষ্ঠু রূপ গ্রহণ করে, যার বিভিন্ন অংশের স্বর রচনা যদিও স্বতন্ত্র, কিন্তু স্বর-সংগতির (Harmony) মতো একত্রে অনুষ্ঠিত হোত। লক্ষান্তরে ওই অংশগুলিকে Counterpoint বলা যায়। যদিও Counterpoint সংজ্ঞাটি Polyphonic সংগীতেরই অঙ্গ তথা গঠন কৌশল মাত্র, তবে তার অন্য অর্থও আছে।

Counterpoint : সংগীতে এর তিন প্রকার অর্থ স্বীকৃত। যেমন ১। একটি প্রধান স্বর-রচনাকে অন্য একটি স্বর-রচনা সহযোগে অনুসরণ করা, ২। সম্পূর্ণ সংযুক্ত স্বর রচনাকে অন্য কোন স্বর রচনা সহযোগে অনুসরণ করা এবং ৩। শিক্ষা বা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কতগুলি স্বর রচনার একত্রিত Style কে ব্যাখ্যা করা। এর দ্বিতীয় অর্থটিকেই য়ুরোপীয় সংগীতে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। তবে এর গঠন কৌশলের সঙ্গে Harmony'র যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।[২]

Harmony : সাধারণভাবে Harmony অর্থে ধ্বনি সংমিশ্রণের বিজ্ঞান বোঝায়। তবে Melody থেকে ভিন্ন, কারণ Harmony'র কোন নিজস্ব স্বর-সত্তার প্রয়োজন নেই, তবে এতে অন্ততপক্ষে দুটি অংশে স্বর-রচনা তথা ছন্দ থাকা চাই। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে Melody, Rhythm, Counterpoint প্রভৃতি প্রতিটিই

১। E. B. 1971. London.
Motet—Vol. 15. P. 894.
Polyphony—Vol. 18. P. 209.

২। E. B. 1971. London.
Counterpoint—Vol. 6. P. 640.
Harmony—Vol. II. P. 109.

Harmony'র সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। সংগীতলিপিতে সাধারণত সংখ্যা-সহযোগে Harmony'র ব্যাখ্যা করা হয়, যার প্রবর্তন ১৭শ-১৮শ শতকে হয়েছিল।

Melodrama : Melodrama বলতে নাটক, অর্থাৎ কোন বক্তব্য সংগীত সহযোগে বলা বোঝায়। এর প্রথম প্রবর্তক হোল Georg Benda, এঁর রচিত 'Ariadne auf Naxos' ও 'Medea' যা ১৭৭৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অবশ্য ইতিপূর্বের Jean Jacques Rousseau'র Pygmalion (যা ১৭৬২ সালে রচিত এবং ১৭৭০ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল) ছিল ভিন্ন ধরনের। ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত Melodrama বলতে এক ধরনের সাধারণ নাটক বোঝাত। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে য়ুরোপ ও আমেরিকার সর্বত্র এর যথেষ্ট উন্নতিবিধান হয় এবং জনপ্রিয়তা বাড়ে। ইতালীতে Melodrama অর্থ অপেক্ষাকৃত কঠিন অপেরা, যা পূর্বের 'Drama in Musica'র স্থান গ্রহণ করেছিল। যার সঙ্গে ইংরাজি Melodrama শব্দের বিশেষ সম্বন্ধ নেই। ফ্রান্স ও জার্মানীতে এর বিকাশের পিছনে ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক বিপ্লব এবং অবলম্বন ছিল নানা উপন্যাস। Melodrama'র শ্রেষ্ঠ রচয়িতা হিসাবে ফ্রান্সের Guilbert de Pixerecourt উল্লেখযোগ্য। যাঁর রচিত 'Coelina ou l'enfant (1800), ১৮০২ সালে Thomas Holcroft 'A Tale of Mystery' নামে ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। যার অনুষ্ঠান ইংলণ্ডে এক নবচেতনার সঞ্চার করে। অবশ্য ইংলণ্ডে Meledrama'র প্রচলন ইতিপূর্বেও ছিল। যেমন, গান, বাদ্য ও নৃত্য সহযোগে রচিত Blackbeard the Pirate' (১৭৯৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়), সন্ন্যাসী Lewis রচিত এবং ১৭৯৭ সালে অনুষ্ঠিত 'The castle spectere' প্রভৃতি।

জার্মানীর August Kotzebue (যিনি স্বদেশে ফ্রান্সের de Pixerecourt এর মতো সম্মানলাভ করেছিলেন) নাটকে এক নবীন ধারার প্রবর্তন করেন। এঁর রচিত 'Menschenhass und Reue' ১৭৮৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়, যা ইংলণ্ডে 'The Stranger' নামে অনুবাদিত এবং ১৭৯৮ সালে অনুষ্ঠিত হয় ও অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে।

১৯শ শতকের প্রথমার্ধে ওই সকল অনুবাদিত নাটকের বহুল প্রচলন ছিল এবং ওইগুলির অনুকরণেও বহু নাটক রচিত হয়েছিল যার ঢেউ রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত

হয়। ক্রমে মৌলিক নাটকাদির বিকাশ হয়। ইংলণ্ড ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে উল্লেখযোগ্য হোল, Dion Boucicault রচিত 'The Octoroon' (১৮৫৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়) ও 'The Colleen Bown' (১৮৬০ সালে অনুষ্ঠিত হয়), আরো বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করে 'The poor of New York' (১৮৫৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়), 'London by Night' (1844) ও 'Under the Gaslight (১৮৬৭ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়)। Edward Fitzball রচিত 'Uncle Tom's Cabin' (১৮৫৩ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয়) ছিল সামাজিক নাটক। ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নাটকে সমাজ জীবনের নানা সমস্যা-মূলক বিষয়-বস্তুর সমাবেশ বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে Victorien Sardou রচিত 'The Silver King' (১৮৮২ সালে অনুষ্ঠিত হয়) এবং তাঁর অনুবর্তী Henry Herman এর Henry Arthur Jonse এর রচনা উল্লেখযোগ্য।[১]

অপেরার (OPERA) উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঃ প্রকৃতপক্ষে অপেরা ১৬শ শতাব্দীতে বিকাশলাভ করে এবং Jacopo Peri রচিত Euridice অপেরাটি ফ্লোরেন্সে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য ইতিপূর্বেও সংগীত ও নাটকীয় আবেগপূর্ণ কথোপকথনযুক্ত অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল যাকে অপেরার পূর্ববর্তী পদক্ষেপ বলা যায়। যেমন, 'Secular Singspiel', 'Masked plays', 'Pastoral plays', 'Miracle', 'Mystery plays' প্রভৃতি। গোড়ার দিকে অপেরাতে কথার প্রাধান্য ছিল বেশী, সংগীত তখন ছিল শব্দের দাস মাত্র। কালক্রমে সংগীত তার নিজস্ব স্থান অধিকার করে। যার জন্য গায়ক শিল্পীদের অবদান অবিস্মরণীয়। প্রসঙ্গত ইতালীর Monteverdi ও Scarlatti এবং ফ্রান্সের Lully উল্লেখযোগ্য। সংগীতের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অপেরাও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

সর্বপ্রথম ভিয়েনাতে, ১৬৩৭ সালে অপেরা ব্যবসায়ীক ভিত্তিতে চালু হয়। এবং ক্রমে ইতালীয় অপেরা প্যারিস, অস্ট্রিয়া তথা ইংলণ্ডে অনুসৃত হয় যার প্রথম পথ প্রদর্শক ছিলেন Purcell, এবং পরে Handel, যিনি ৪০টি সুন্দর অপেরা রচনা করেছিলেন। ১৮শ শতাব্দীতে অপেরায় দুটি ধারা লক্ষিত হয়। যেমন, গম্ভীর, সুখঃদুখ প্রভৃতি সমন্বিত 'Opera Seria' এবং হাস্যকৌতুকাদিপূর্ণ 'Opera buffa', 'Seria' আবেগ প্রবণতার বাহুল্যের জন্য ক্রমে জনপ্রিয়তা

১। Encyclopaedia Britannica, 1971. (Vol. 15. P. 130—131).

হারাতে থাকে। তখন Gluck এর সংস্কার সাধন করে যথেষ্ট উন্নতিবিধান করেন। Mozart অপেরা Seria-তে Gulck কে অনুসরণ করলেও তাঁর রচনাগুলি আরো অনেক উন্নত ছিল। Opera buffa থেকেই পরবর্তীকালে ফ্রান্সে কমিক অপেরার বিকাশ হয়।

Romantic Opera রচনাতে প্রথম পদক্ষেপ হোল Beethoven-এর এবং তারপরে Weber, Mozart ও Gluck অপেরাতে যে নাটকীয়তার আভাস দিয়েছিলেন, Romantic Opera তারই সুষ্ঠু পরিণতি। ফ্রান্সে Grand Opera এবং Comique Opera পাশাপাশি বিকাশ লাভ করে, যার শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা হিসাবে জার্মানীর Meyerbeer স্বীকৃত, এবং তাঁর বর্ণিত বিধি-বিধানগুলি প্রামাণ্য হিসাবে স্বীকৃত।

১৯শ শতাব্দীতে Operaতে যথেষ্ট নবীনতা প্রদর্শন করেন জার্মানীর Wagner এবং ইতালীর Verdi। তখন থেকে অপেরাতে বাস্তবতার (Realism) যুগ আসে। তখন জনজীবনের বাস্তব চিত্র প্রকাশেই অধিক আগ্রহ লক্ষিত হয়। ফ্রান্সের Debussy রচিত Pelices et Mlisande'তে আরো নবীনতা লক্ষিত হয়। কারণ ইতিপূর্বে অপেরাতে কথোপকথন স্বরে উচ্চারিত হোত, কিন্তু অপেরাতে তেমন ছিলনা। সেখানে আবৃত্তিতে যথাযথ উত্থান-পতন থাকতো মাত্র, ফলে তা আরো প্রাণস্পর্শী হয় যাকে Impressionismএর যুগ বলা হয়।

২০শ শতাব্দীতে Stravinsky, Hindemith, Honegger, Milhaud, Prokofiev, Shostakovitch, Schonberg প্রমুখ অতিউচ্চ সংগীত স্রষ্টাদের বহু বিচিত্র সৃষ্টির সাহায্যে অপেরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং ক্রমে চরম জনপ্রিয়তালাভ করে।

Oratorio : Oratorio বলতে প্রার্থনা সংগীতানুষ্ঠান বোঝায়। ১৬শ শতাব্দীতে রোমে এর প্রথম প্রবর্তন হয়, যখন St. Philip Neri (1515-95) ধর্মোপাসনার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। আসলে Opera এবং Oratorio পাশাপাশি বিকাশলাভ করেছিল। Oratorio'র প্রধান তিনটি ঘরানা হোল ইতালী, জার্মানী এবং ইংলণ্ড। Bach এবং Handel-এর যুগে এর চরম উৎকর্ষ হয়। ১৮শ-২০শ শতাব্দীর মধ্যে মাত্র ৩-৪টি ছাড়া এর সার্থক রচনা লক্ষিত হয় না।[১]

Cantata (**Sonata**) **:** ১৭শ শতাব্দীতে ইতালীতে Cantata'র বিকাশ হয়। Cantata একটি ইতালীয় শব্দ, যার অর্থ To sing, এর নামকরণের সম্ভবত এইটুকুই কারণ। Cantata বলতে গীতিকবিতা বা গাইবার উপযোগী রচনা বোঝায়। সাধারণত Church তথা Jubilee উৎসবাদিতে প্রযুক্ত এবং একক, দ্বৈত বা সমবেত সংগীত হিসাবে রচিত হয়। এর প্রকৃতি যদিও Oratorio'র মতো কিন্তু অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। Cantata এবং Sonata'র পার্থক্য হোল এই যে প্রথমটি গাইবার জন্য এবং দ্বিতীয়টি হোল গৎ বিশেষ, একটি বা একাধিক যন্ত্রসংগীতের জন্য রচিত। Bartok, Stravinsky, Schonberg প্রমুখরা Cantata রচনায় প্রসিদ্ধ ছিলেন।

স্বরসীমা : পাশ্চাত্য সংগীতবিদ্‌রা পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ শ্রবণযোগ্য ধ্বনির যে সীমা নির্ধারণ করেছেন, তার কম্পনসংখ্যা হোল যথাক্রমে ২৭·৫ এবং ৪১৮৬। বৃহত্তম পিয়ানোফোর্ট যন্ত্র এই স্বরসীমা অনুসারে সাতটি সপ্তকের কিছু বেশী স্বরসজ্জা নিয়ে নির্মিত হয়ে থাকে যার সর্বনিম্ন 'C' স্বরাক্ষর থেকে সপ্ত-সপ্তকের মোট আন্দোলন সংখ্যা হোল এইরূপ। (পাশে দ্রষ্টব্য)

১	সা—নি	32·7—61·7	C_3—B_3
২	সা—নি	65·4—123·4	C_2—B_2
৩	সা—নি	130·8—246·9	C_1—B_1
৪	সা নি	261·6—493·8	C—B
৫	সা—নি	523·2—987·7	c^1—b^1
৬	সা—নি	1046·4—1975	c^2—b^2
৭	সা—নি	2093—3950	c^3—b^3

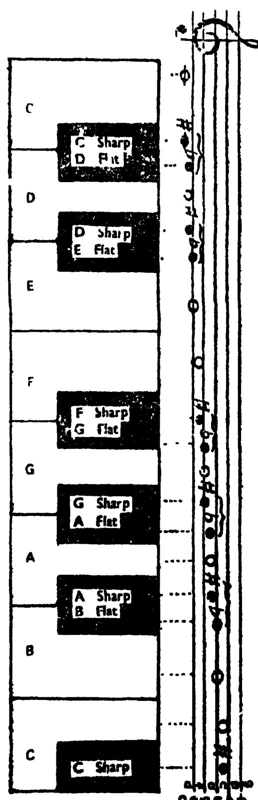
Helmholz Notation : স্বরাক্ষরগুলিকে বিভিন্ন সপ্তকের জন্য নির্দেশকালে সাধারণ একটি নিয়ম পালিত হয়। যেমন 'CDEFGAB' এগুলিকে Natural বলে। অর্থাৎ মধ্য সপ্তকের স্বরাক্ষর, যাতে কোন চিহ্নাদি থাকে না। কিন্তু অন্যান্য সপ্তকগুলিতে সংখ্যা এবং ছোট ও বড় হাতের অক্ষরের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন মন্দ্র সপ্তকের প্রথমটিতে B_1, A_1, G, ইত্যাদি, দ্বিতীয়টিতে B_2, A_2, G_2 ইত্যাদি এবং তার সপ্তকের প্রথমটিতে c^1, d^1, e^1 ইত্যাদি, দ্বিতীয়টিতে c^2, d^2, e^2 ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে যে সর্বদা মন্দ্র সপ্তকে বড়হাতের এবং তার সপ্তকে ছোট হাতের অক্ষর ব্যবহৃত হবে।

Interval : "An interval is the difference in pitch between any two notes" ।[১] দুটি স্বরের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে Interval বলে। তবে পাশ্চাত্য সংগীতে এর মহত্ব যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়।

এখানে একটি সপ্তকের অন্তর্বর্তী স্বরসমূহের আনুপাতিক সম্বন্ধ, ব্যবধানাদি এবং পিয়ানোর পর্দাগুলির staff line এর উপরে অবস্থান প্রভৃতি নিম্নোক্ত তালিকায় দেখানো হ'ল।

INTERVALS WITHIN THE OCTAVE[১]

From the tonic C to:		Relative frequencies: Just intonation		Tempered scale
C	Unison	1	1 000	1·000
C#	Semitone	25/24	1·042	1·059
D b	Minor Second	27/25	1·080	1·059
D	Major Second	9/8	1·125	1·122
D#	Augmented Second	75/64	1 172	1·189
E b	Minor third	6/5	1·200	1·189
E	Major third	5/4	1·250	1·260
F b	Diminished fourth	32/25	1·280	1·260
E #	Augmented third	125/96	1·302	1·335
F	Perfect fourth	4/3	1·333	1·335
F#	Augmented fourth	25/18	1·389	1·414
G b	Diminished fifth	36/25	1·440	1·414
G	Perfect fifth	3/2	1·500	1·498
G#	Augmented fifth	25/16	1·562	1·587
A b	Minor Sixth	8/5	1·600	1·587
A	Major Sixth	5/3	1·667	1·682
A#	Augmented Sixth	125/72	1·736	1·782
B b	Minor Seventh	9/5	1·800	1·782
B	Major Seventh	15/8	1·875	1·883
C b	Diminished Octave	48/25	1·920	1·883
B#	Augmented Seventh	125/64	1·953	2·000
C	Perfect Octave	2	2·000	2·000



১। The World of Music (Vol-II, P 1405) : 1957 London : K. B. Sandved.

প্রাচীন স্কেল ঃ আগেই বলা হয়েছে যে পাশ্চাত্যজগতে সংগীত ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে গ্রীকেরা প্রাচীনতম। তাদের সভ্যতা বিকাশের সময়কালকে এইরূপে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন—

১। Heroic Age : (2000-1100 B.C.)

২। Dark Age : (1100-850 B.C.)

৩। Early Classical Period : (850-600 B.C.)

৪। Classical Period : (600-400 B. C.)

গ্রীসে সংগীতের অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠ বিকাশ হয় Classical যুগে যার প্রধান হোতা ছিলেন Pythagoras (581-479 B.C.)। তখন বিভিন্ন স্বরান্তরালযুক্ত সাতটি স্কেল (অবরোহণগতিতে) প্রচলিত ছিল (Piano'র সাদা পর্দাগুলি কল্পনা করলে এগুলি বুঝতে সুবিধা হবে)। যেমন, ১। a to A : Hypodorian (Aeolian); ২। g to G : Hypophrygia (Ionian); ৩। f to F : Hypolydian; ৪। e to E : Dorian; ৫। d to D : Phrygian ৬। c to C ; Lydian ; এবং ৭। b to B : Hyperdorian। এগুলিকে বর্তমানে Modes বলা হয়। ভারতীয় গ্রাম (রাগ) বা আরবীয় মোকামের সঙ্গে এগুলির সাদৃশ্য লক্ষণীয় এবং উল্লেখযোগ্য।[১]

Pentatonic Scale : অতি প্রাচীনকাল থেকেই Pentatonic বা Gapped Scale প্রচলিত। এই স্কেল পাঁচটি স্বর সমন্বিত হয়। এর কোন কোন স্বরান্তরাল একটি Tone এর বেশী হয়ে থাকে। বস্তুতঃ Piano আদি যন্ত্রে ক্রমানুসারে পাঁচটি কালো পর্দা বাজালেই সর্বাধিক Pentatonic Scale উৎপন্ন হয়।[১]

Notation সংগীতলিপি ঃ "Strictly speaking it is a false analogy to talk of the language of music."[২] কেননা Notation কখনও সংগীতের হুবহু প্রতিচ্ছবি হতে পারে না। যেমন, কোন বক্তার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা গেলেও তাঁর বিশেষ বাচন-ভঙ্গিটি লিপিবদ্ধ করা যায় না, শিল্পী বিশেষের সংগীতও তেমনি। তবে সংগীত সংরক্ষণ, প্রচার, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতির জন্য সংগীতলিপির উপযোগীতা অনস্বীকার্য। সংগীতকে স্বর, তাল প্রভৃতির যথোপযুক্ত চিহ্নাদি সহযোগে লিপিবদ্ধ করার নাম Notation (সংগীতলিপি।

১। E. B, 1971. London. (Vol. X. P. 884) -do- (Vol. XIX. P. 1132)
২। -do- (Vol. 15. P. 1061).

ক্রমবিকাশ : পাশ্চাত্য সংগীত ও সংগীতলিপির প্রথম বিকাশ গ্রীসে হয়েছিল। গোড়ার দিকে সংগীত ছিল আবৃত্তি-মূলক এবং স্বর-লিখন পদ্ধতি ছিল ধ্বনি-বিষয়ক বর্ণমালার অক্ষর-ভিত্তিক। এই প্রসঙ্গে Miss M.A. Glober এবং John Corben উদ্ভাবিত সোল্‌ফা (Solfa) পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন সংগীত Solfa ছিল ইহুদিদের উপাসনা এবং গ্রীক-ব্যাকরণ সিদ্ধ উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত। খৃষ্টধর্ম প্রচারের পরে খৃষ্টানদের উপাসনার জন্যও সেই সংগীত গৃহীত হয়েছিল। সেই সংগীতই ছিল যাবতীয় লোক-সংগীত বিকাশের উৎস। গীর্জাগুলিতে প্রার্থনার জন্য সংগীত শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। ধর্মযাজকেরা মূল বা প্রামাণ্য ক্ষেত্রগুলির শুদ্ধতা রক্ষার জন্য সুর সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ফল স্বরূপ, ক্রমে, স্বরলিখন পদ্ধতির উত্তরোত্তর উন্নতি-বিধান হতে থাকে।

Cheve : ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ সংগীত পণ্ডিত E. Cheve সংখ্যার সাহায্যে একপ্রকার স্বরলিখন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তাঁর নামানুসারে সেই পদ্ধতির নাম হয় Cheve Notation. প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই পদ্ধতি-গুলিতে ভারতীয় সামলিপির স্বর-সংকেত চিহ্নাদি অনুসৃত হয়েছে।

তৃতীয় হেনরীর রাজত্বকালে (১১৮০-১২৫০) ইভস্‌হামের ওয়াল্টার ওডিংটন স্বরগুলিকে ছোট, বড়, দ্বিগুণ প্রভৃতি নানাভাবে সাজিয়ে আর একপ্রকার স্বরলিখন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন।

Neumes : পরবর্তীকালে 'Neumes' স্বরলিখন পদ্ধতির বিকাশ হয়। রোমের চার্চে এর উৎপত্তি এবং ধর্মসংগীত সংরক্ষণ ও প্রচার এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই পদ্ধতিতেও গোড়ার দিকে ভারতীয় সামলিপির মতো কথার উপরে / \ Λ V এইরূপ সংকেত সহযোগে সংগীতলিপি রচিত হোত। পরে / · ⁀ ‿ প্রভৃতি চিহ্ন সংযুক্ত হয়। কিন্তু এতে স্বরের বা স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে কোন নির্দেশ ছিল না। তবে ৮ম শতাব্দীর পরে মোটামুটি সুষ্ঠু উচ্চতা রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু তখন পর্যন্ত তাল (স্থায়ীত্ব) সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা ছিল না। ১১৯০ খৃষ্টাব্দের পরে সংগীতলিপি আরো সুষ্ঠু রূপ গ্রহণ করে, এবং ১৩৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অনেক উন্নতি বিধান হয়।

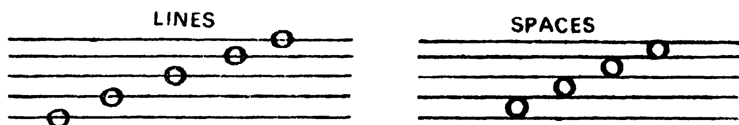
১১৯০ থেকে ১২২৫ খৃষ্টাব্দ ♦ ■ ◆ ▬ প্রভৃতি চিহ্ন সহযোগে তীব্র ও কোমল প্রভৃতি স্বর নির্দেশের ব্যবস্থা হয়। ১৪শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে Philippe de Vitry (1291—1361) তাঁর Ars nova গ্রন্থে তালচিহ্ন সহ উন্নততর স্বরলিখন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। ১৫শ শতাব্দীর পরে এতে আরো পরিবর্তন হয়। (নিম্নোক্ত তালিকা দ্রষ্টব্য)।

১৩শ-২০শ শতকের ক্রমবিবর্তিত স্বর-চিহ্নাদির তালিকা। ১

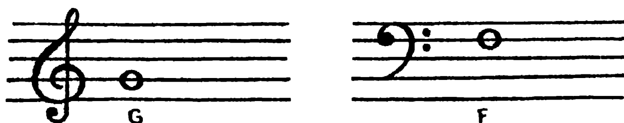
সময়কাল প্রাচীন সংকেত পদ্ধতি	Long	Breve	Semibreve	Minim	Semiminim	Fusa	Semifusa
১২২৫ ১৩৭০ খৃষ্টাব্দ							
১৩০০ ১৪৫০ খৃষ্টাব্দ							
১৪৫০ - ১৬০০ খৃষ্টাব্দ							
১৬০০ ২০শে শতাব্দী		gradually disused					
আধুনিক সংকেত পদ্ধতি	not used	Breve (rarely used)	Semibreve or whole note	Minim or half note	Crotchet or 1/4 note	Quaver or 1/8 note	Semiquaver or 1/16 note
বিরাম চিহ্ন							
প্রাচীন	or						
বর্তমান	not used				or		

Staff or stave : পূর্বোক্ত যাবতীয় পদ্ধতির উন্নততম বিকাশ হিসাবে 'ষ্টাফ' পদ্ধতি স্বীকৃত। ১৭শ শতাব্দীর পরবর্তীকালকে পাশ্চাত্য সংগীতের আধুনিক কাল বলা হয়। এই সময়ে ষ্টাফ পদ্ধতির বিকাশ হয়। আড়াআড়ি তথা সমান্তরাল পাঁচটি রেখা নিয়ে Staff রচিত। রেখাগুলির বিশেষ বিশেষ স্থানে 'O' ডিম্বাকৃতি চিহ্নের সাহায্যে একই সঙ্গে স্বর, তাল, মাত্রা প্রভৃতি ব্যাখ্যা করা হয়। পাশ্চাত্য সংগীতে অনুসঙ্গ (Accompaniment) সংগীতের প্রভাব ও তার প্রতিক্রিয়াই (General effect) হোল প্রধান উপাদান। ষ্টাফ নোটেসনে ওইগুলি সমাবেশের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমে, তাই, আরো একটি রেখা যোগ করে ছয়টি রেখাযুক্ত ষ্টাফ রচিত হয়। কিন্তু সাম্ভব্য বৈচিত্র্যের দিগ্‌দর্শন তবু সম্ভব হয় না। তখন সংগীত পণ্ডিতেরা এগারোটি রেখাযুক্ত এক বিশাল স্বর-লিখন পদ্ধতির পরিকল্পনা করেন, যার নাম Grand (Great) Staff, কিন্তু এতে জটিলতা যতটা বৃদ্ধি পায়, ততটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তাই মাঝের ৬ষ্ঠ রেখাটি বর্জন করে বর্তমান পদ্ধতি স্বীকৃত হয়েছে। এই পদ্ধতিকে যথাসম্ভব বিজ্ঞানসম্মত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে।

Lines Spaces : Staff সংগীতলিপিতে রেখাগুলির উপরে অথবা মধ্যে (Lines or spaces) স্থাপিত চিহ্ন সহযোগে স্বর সমূহের স্থান (উচ্চতা) বর্ণিত হয়। যেমন.

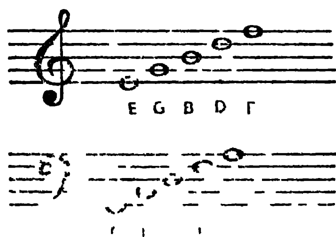


Clef : Staff এর উপরে স্থাপিত স্বর সমূহের স্থান নির্দিষ্টরূপে নির্দেশ করার জন্য Clef চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। উঁচু পর্দার জন্য Treble= 𝄞 =G এবং নীচু পর্দার জন্য Bass= 𝄢 =F ; সাধারণত এই দুই প্রকার চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা—

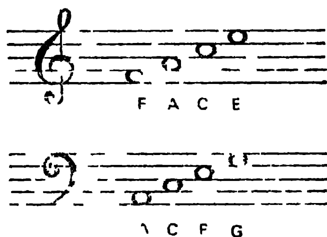


সাধারণত একটি মাত্র Clefকে স্বরলিখনের সময়ে ব্যবহার করা হয় বটে, কিন্তু যন্ত্র-সংগীত তথা accompaniment এর জন্য দুটি clef-এরই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

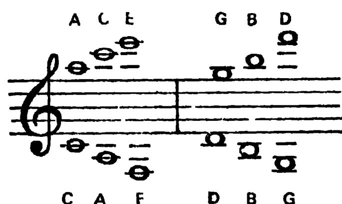
Notes on Lines

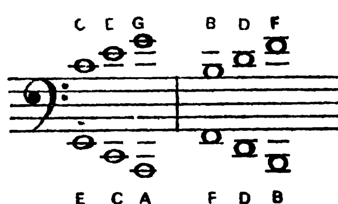


Notes on Spaces

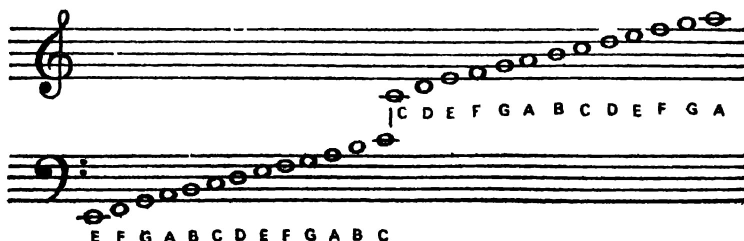


Leger Lines : যখন কোন স্বর staff-এ প্রযুক্ত clef-সীমার বাইরে দেখানোর প্রয়োজন হয়, তখন সেই স্বর বা স্বরসমূহকে উপরে বা নীচে ছোট ছোট লাইন টেনে দেখানো হয়। সেই ছোট ছোট লাইনগুলিকে Leger line বলে। Treble ও Bass Clef-এর উপরে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হোল। যেমন,

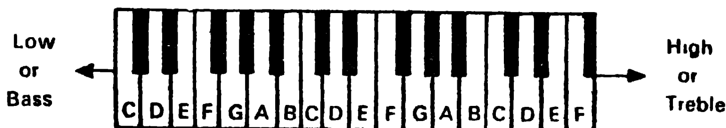




The Great (Grand) Staff : Treble ও Bass cleff এর সম্মিলিত স্বরসমূহ নিয়ে Great (Grand) Staff গঠিত।



Pitch : Pitch বলতে আসলে স্বরগ্রাম বোঝায়। পাশ্চাত্য সংগীতে স্বরগ্রাম দুইভাগে বিভক্ত। Low এবং high অথবা Treble এবং Bass। পিয়ানোর সামনে বসলে, নিজের বাঁদিকের পর্দাগুলিকে Low এবং ডানদিকের পর্দাগুলিকে High ধরে নিতে হবে। যেমন,



Octave : Octave বলতে স্বরাষ্টক বোঝায়। একই স্বরাক্ষরযুক্ত দুটি পর্দার মধ্যবর্তী স্বরসমষ্টিকে Octave বলে। পাশ্চাত্য সংগীতে স্বরাক্ষর নামগুলি যথাক্রমে A থেকে G পর্যন্ত নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব CDEFGABC একটি Octave বা স্বরাষ্টক।

Tone semitone : Tone বলতে স্বর বোঝায়। স্বর দুই প্রকার; Tone (পূর্ণ স্বর) এবং Semitone (অর্ধস্বর)। যেমন,

সা – রে = পূর্ণ স্বর।

গ – ম = অর্ধ স্বর। ইত্যাদি।

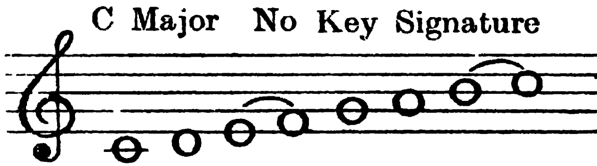
Tonic Tonality : Tonic বলতে আরম্ভিক স্বর বোঝায়, এবং কোন স্বরকে কেন্দ্র করে যে স্বরসজ্জা বিশেষ রীতিতে নিশ্চিত করা হয় তাকে Tonality বলে।

Scale : বর্ণানুক্রমিক স্বর রচনাকে Scale বলে। বর্তমান ভারতীয় সংগীতে Scale শব্দটি যদিও সপ্তক অর্থেই প্রযুক্ত, কিন্তু পাশ্চাত্য সংগীতে এই সংজ্ঞাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ সেখানে Scale-এর নাম বৈচিত্র্যানুসারে বিভিন্ন স্বররূপ যুক্ত আরোহাবরোহণ নির্দেশ করা হয়; পক্ষান্তরে কোন Scale-নাম থেকেই তার স্বর-সজ্জা উপলব্ধি করা যায়।

Scale প্রধানত: দুই প্রকার। Diatonic ও Chromatic Scale; এই দুটির আবার দুটি করে প্রকারভেদ আছে; যেমন; Major Diatonic ও Minor Diatonic এবং Harmonic Chromatic ও Melodic Chromatic. Minor Diatonic আবার দু'রকম: Melodic Minor ও

Harmonic Minor. এগুলি আবার A Major, B Major, A Minor, B Minor, Harmonic form, Melodic form প্রভৃতি বহুবিচিত্র নামে বিস্তৃত।

পিয়ানো আদি যন্ত্রের C স্বর থেকে ক্রমানুসারে সাতটি সাদা পর্দা বাজানো হলে, তাকে বলা হবে C Major Scale। যার রূপ অনেকটা ভারতীয় বিলাবল থাটের মতো। এর সংগীতলিপির রূপ হোল এইরূপ—



Slur চিহ্নের সাহায্যে Semitone নির্দেশ করা হয়েছে। Major Scale এর অনুপাত হোল, যথাক্রমে ১, $\frac{৯}{৮}$, $\frac{৫}{৪}$, $\frac{৪}{৩}$, $\frac{৩}{২}$, $\frac{৫}{৩}$ এবং $\frac{১৫}{৮}$। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই স্বর রচনা প্রাচীন ভারতীয় মধ্যম গ্রামের নিষাদ মূর্ছনা 'মার্গী'র সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত।

Major Scale এর গঠন প্রণালী হোল :—

সা রে গ ম | প ধ নি সাঁ
T T S | T T S .

[Tone Tone Semi] [Tone Tone Semitone]

Key note : সপ্তকের আরম্ভিক স্বরকে key note বলে। শিল্পীর সুবিধানুযায়ী, যে কোন অক্ষরই key note রূপে নিশ্চিত হতে পারে। যে কোন key noteকে Tonic বলা যায়। এছাড়া অন্যান্য স্বরগুলিকে বিভিন্ন নামেও উল্লেখ করা হয়। যেমন, C Major Scale-এর স্বর নামগুলি হোল—

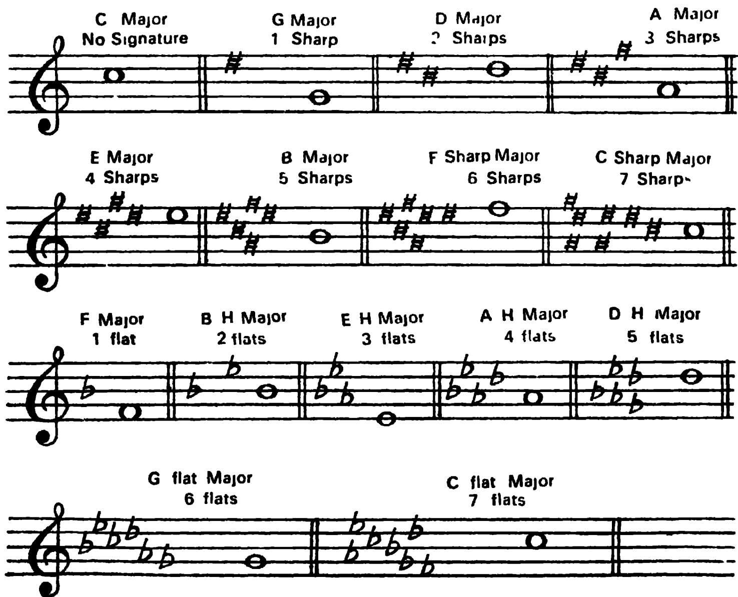
C—Tonic—Doh.
D—Supertonic—Ray.
E—Mediant—Me.
F—Subdominant—Fah.
G—Dominant—Soh.
A—Submediant—Lah.
B—Leading note—Te.
C—Tonic—Doh.

যে কোন Scale-এর স্বর সমূহকেই Doh, Ray, Me প্রভৃতি বলা যায়। কিন্তু অন্যান্য স্বর নামগুলি ব্যবধান অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে।

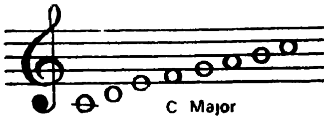
মনে রাখতে হবে যে, Domniant সর্বদা Tonic-এর পাঁচটি পর্দা (স্বর) উঁচুতে এবং Subdominant পাঁচটি পর্দা নীচুতে অবস্থিত।

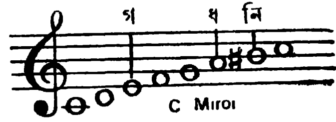
এইরূপে G Major Scaleএ G Tonic , A Supertonic ; B Mediant প্রভৃতি হবে।

Key Signature : Sharp= # (তীব্র), Flat=*b* (কোমল) প্রভৃতি চিহ্নকে Key Signature বলে। সংগীত রচনায় ব্যবহৃত স্বর-বিশেষের রূপ উক্ত চিহ্নাদির সাহায্যে বর্ণিত হয়। Clef চিহ্নের পরে Key Signature স্থাপিত হয়। অর্থাৎ এই চিহ্নদ্বয়ের সাহায্যে সংগীতে প্রযুক্ত স্বর সমূহের রূপ, উচ্চতা, ক্রম, স্থায়িত্ব প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। এখানে Major Scale-এর Key Signature দেখানো হোল।
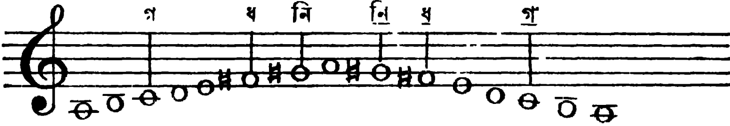


প্রতিটি Major scale-এর আবার Relative Minor ও Tonic Minor আছে। যেমন,





Tonic Minor Harmonic

মনে রাখতে হবে যে, Harmonic Scale-এ সর্বদা আরোহাবরোহণ সমান হয়ে থাকে, কিন্তু Melodic Scale-এ তা হয় না। যেমন,



Relative Minor—A Minor Melodic.

অর্থাৎ এখানে Melodic scale-এর ধ, নি আরোহণে শুদ্ধ কিন্তু অবরোহণে কোমল ; অবশ্য গ আরোহাবরোহণে কোমল-ই আছে।

সাধারণ নিয়ম।

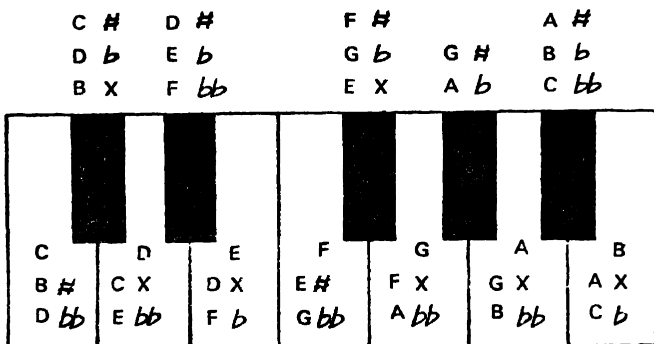
Tonic Minor-এর আরম্ভিক স্বর Major Scale-এর সমান হয়। Relative Minor-এর আরম্ভির স্বরটি Major Sale-এর তিন Semitone নীচু থেকে আরম্ভ হয়।

Tonic Minor-এ Key Signature বদল হয়, কিন্তু Relative Minor-এ Key Signature বদল হয় না।

Accidental note :—সংগীত রচনাতে ব্যবহৃত স্বরের রূপগুলির নির্দেশ সংগীতলিপির প্রারম্ভেই দেওয়া থাকে। কিন্তু যখন কোথাও বিপরীত স্বর প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তখন Sharp বা Flat চিহ্ন দিয়ে পূর্বোক্ত স্বররূপের পরিবর্তন করা হয়। এইরূপ স্বরকে Accidental note বলে। ওইরূপ স্বরের স্থায়িত্ব সর্বদা সেই তাল-চিহ্নের (Bar) সীমার মধ্যেই সীমিত থাকে, কিন্তু যদি সেই Bar-এর মধ্যেই আবার নিয়মিত স্বরে ফিরে আসার প্রয়োজন হয় তখন Natural চিহ্ন, '4' ব্যবহার করা হয়।

Natural : সংগীত রচনায় প্রযুক্ত স্বর বিশেষের রূপের পরিবর্তনের জন্য Natural চিহ্নটি '4' ব্যবহৃত হয়। এই চিহ্নের সাহায্যে সর্বদা স্বর বিশেষের তীব্রত্ব বা কোমলত্ব লোপ করা হয়। সাধারণত Accidental স্বর প্রয়োগের জন্যই এই চিহ্নটির ব্যবহার হয়ে থাকে।

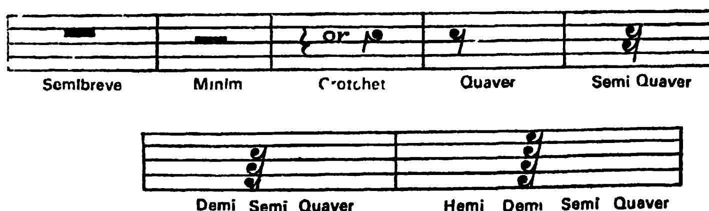
স্বর-নাম-বৈচিত্র্য : একই স্বরকে যে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করার রীতি আছে, তা নীচে আঁকা Keyboard চিত্রে বর্ণনা করা হোল—



মনে রাখতে হবে যে, A flat-এর শুধু দুটি নাম, কিন্তু অন্যান্য সব স্বরের তিনটি করে নাম আছে।

Double Sharp Double Flat : কোন স্বরের উচ্চতা দুই Semitone বাড়ানোর জন্য Double Sharp = × এই চিহ্ন এবং দুই Semitone কমানোর জন্য Double Flat = *bb* এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

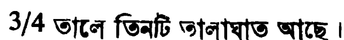
Note এবং Rest এর মূল্য : Note বলতে স্বর এবং Rest বলতে নীরবতাকাল বোঝায়। আগেই বলা হয়েছে যে, একটি মাত্র 'O' চিহ্নের সাহায্যে স্বর, তাল, মাত্রা প্রভৃতি ব্যাখ্যা করা staff পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, এই চিহ্নটিকে Semibreve বা 1 Whole note বলে। এই চিহ্নকে নানাভাবে পরিবর্তন করে মাত্রাকাল প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা হয়। একই প্রণালীতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন আকৃতির চিহ্নের সাহায্যে বিরামকালও (Rest) বর্ণিত হয়ে থাকে। যেমন,



N. B. স্বর লিখনের সুবিধার্থে একটি Semibreve Rest চিহ্নের সাহায্যে

যে কোন মাত্রাসংখ্যাযুক্ত Bar-এর মধ্যবর্তী সময়কাল নির্দেশ করার রীতি আছে। অর্থাৎ তখন এই Rest চিহ্নটি চার মাত্রার কম বা বেশীও হতে পারে।

Time Signature : তাল সংকেতকে Time Signature বলে। Clef Signature-এর পরে এই চিহ্ন থাকে এবং এর সাহায্যে সংগীত রচনায় প্রযুক্ত তাল নির্দেশিত হয়। যেমন,



3/4 তালে তিনটি তালাঘাত আছে।

6/8 তালে দুটি তালাঘাত, প্রতিটি ৩ মাত্রায় বিভক্ত।

পাশ্চাত্য তাল : বিশ্বের সর্বত্রই তাল বা ছন্দ অভিন্ন অর্থবোধক। Staff পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল স্বর ও তাল একই সংকেত চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। কারণ স্বর সংকেতগুলিই মাত্রাদির স্থায়িত্ব প্রকাশ করে। গোড়ার দিকে অবশ্য সমান কাল-বিধির (Uniform duration) প্রচলন ছিল, কিন্তু তাতে জড়তা ও যান্ত্রিকতার জন্য ছন্দ বৈচিত্র্যের সুষ্ঠু বিকাশ হোত না। স্বর ও ছন্দ সম্পর্কে গবেষণা করে ফ্রান্সের সংগীত বিজ্ঞানেরা স্বরের বিভিন্ন কালান্তর পরিকল্পনা করেন। অতঃপর semibreve = o = ৪ মাত্রা প্রামাণিক কালান্তর (Standard time Interval) স্বীকার করে তাল বিভাগের মাত্রা সংখ্যা এবং লয়-বৈচিত্র্য প্রকাশের জন্য Minim, Crotchet, Quaver প্রভৃতি নানাবিধ মূল্যযুক্ত স্বর সংকেতের প্রচলন হয়। অর্থাৎ তালবিভাগের মাত্রা সংখ্যা, তালাঘাত বৈচিত্র্য প্রভৃতি বিভিন্ন মূল্যের স্বর সংকেতের সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং তালবিভাগের স্বর সংকেতগুলির মূল্য এবং প্রতি বিভাগে কয়টি ও কেমন লয়যুক্ত সংকেত দেওয়া আছে, তার ভিত্তিতেই তালের গতিবেগ নিরূপিত হয়।

তাল বিভাগ Bar Line : Staff রেখাগুলির উপরে আড়াআড়িভাবে একটি রেখা (Bar Line) টেনে তালাবর্তন নির্দেশ করা হয়। প্রতি তালাবর্তনে একটি (Single) এবং প্রত্যেক সংগীতাংশের শেষে দুটি (Double Barlines) করে রেখা থাকে।

Beat ও Pulse : Bar Line-এর অন্তর্গত তালের ক্ষুদ্রাংশগুলিকে (মাত্রা) Pulse এবং তালাঘাতগুলিকে Beat বলে। যেমন—

6/8 তালের এই [staff notation] আবর্তনে ছয়টি মাত্রা (Pulse) এবং দুটি তালাঘাত (Beat) আছে।

Strong & Weak Accent (Principal or Main Beat) : Strong (–) প্রধান এবং Weak (U) দুর্বল ভেদে দুই প্রকার তালাঘাত প্রচলিত, যা দুই প্রকার সংকেতের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়। (অনেকটা ভারতীয় 'সম' এবং ফাক ক্রিয়ার মতো)। প্রধান তালাঘাতকে Principal অথবা Main Beat বলে।

Simple Time—সমমাত্রিক তাল : Simple Time বলতে সমমাত্রিক তাল বোঝায়। পাশ্চাত্য সংগীতে মুখ্য তাল মাত্র তিনটি। যথা, ১। দুই মাত্রাযুক্ত Simple Duple, এটি নাকি দ্রুত ছন্দের (Quick March) চলা থেকে উদ্ভাসিত ; ২। তিন মাত্রাযুক্ত (Simple Triple), এর গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর তথা ভারতীয় দাদরা তালের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত ; ৩। চার মাত্রা যুক্ত Simple Quadruple, সহজ ও স্বাভাবিক গতিযুক্ত তথা ভারতীয় কাহারবা তালের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। পাশ্চাত্য সংগীতে এটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হওয়ায়, একে Comon time-ও বলা হয়, এবং Time Signature স্থানে 4/4 অথবা C অক্ষর সহযোগে বর্ণিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পাশ্চাত্য সংগীতে ফাঁক ক্রিয়ার প্রচলন নেই এবং তালাঘাত (সম) সর্বদা প্রথম মাত্রাতে হয়ে থাকে।

Compound Time—বিসমমাত্রিক ছন্দ : মুখ্য তাল-ত্রয়ের সংমিশ্রণে আরো অনেক তাল সৃষ্টি হয়েছে যেগুলিকে Compound Time বলা হয়।

ছন্দের আবর্তন, লয় তথা তালাঘাত বৈচিত্র্য নিয়েই তালগুলি পরিকল্পিত। তালচিহ্নগুলি সর্বদা অপূর্ণাঙ্ক সংখ্যায় দেওয়া থাকে। যেমন, 2/4, 3/4, 4/4 প্রভৃতি। পাশ্চাত্য সংগীতে যে সকল তাল প্রচলিত তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হোল—

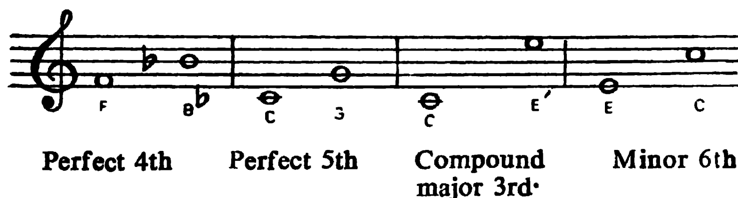
	DUPLE	TRIPLE	QUADRUPLE
SIMPLE	C or 2/2 𝅗𝅥 𝅗𝅥	3/2 𝅗𝅥 𝅗𝅥 𝅗𝅥	C or 4/2 𝅗𝅥 𝅗𝅥 𝅗𝅥 𝅗𝅥
	2/4 ♩ ♩	3/4 ♩ ♩ ♩	C or 4/4 ♩ ♩ ♩ ♩
	2/8 ♪ ♪	3/8 ♪ ♪ ♪	4/8 ♪ ♪ ♪ ♪
COMPOUND	6/4 𝅗𝅥. 𝅗𝅥.	9/4 𝅗𝅥. 𝅗𝅥. 𝅗𝅥.	12/4 𝅗𝅥. 𝅗𝅥. 𝅗𝅥. 𝅗𝅥.
	6/8 ♩. ♩.	9/8 ♩. ♩. ♩.	12/8 ♩. ♩. ♩. ♩.
	6/16 ♪. ♪.	9/16 ♪. ♪. ♪.	12/16 ♪. ♪. ♪. ♪.

উপরোক্ত তাল সংকেতগুলির উপরের সংখ্যাকে তিন দিয়ে এবং নীচের সংখ্যাকে দুই দিয়ে গুণ করলে Simple Time গুলি সব Compound Time হয়ে যায়। বিষয়টি মহত্বপূর্ণ এবং শিক্ষার্থীর মনে রাখা কর্তব্য।

Denominator Numerator : তাল চিহ্নের উপরের সংখ্যাকে Denominator (লব/ছেদ) এবং নীচের সংখ্যাকে Numerator (অংশ/হর) বলে। স্বর সংকেতগুলির কেমন মূল্য তাল প্রকাশে প্রধান Numerator তাই নির্দেশ করে এবং সেই প্রধান স্বর সংকেত তাল-বিভাগে কতবার আছে তা নির্দেশ করে Denominator। যেমন, 2/4=Simple Duple তালে প্রতি বিভাগে (Bar Line) দুটি করে Crotchet থাকে। এইরূপে 3/4 Simple Triple তালে তিনটি এবং 4/4 বা C=Simple Quadruple তালে চারটি করে Crotchet ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু একটি মহত্বপূর্ণ তথা উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল এই যে, সংগীত রচনায় মিনিম্, ক্রোচেট, ক্যোয়েভর প্রভৃতি বিভিন্ন মূল্যের স্বর সংকেত ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এবং রচনার সুবিধার্থে ওই সকল স্বর মূল্য সংযোগেও নানাবিধ মাত্রাসংখ্যা প্রকাশিত হয়। সুতরাং সেই সকল ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রমও ঘটে থাকে। বিষয়টি 'সংক্ষিপ্ত রূপ' ও 'পরিবেশন রূপ' প্রসঙ্গে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Interval (Simple & Compound) : কোন দুটি স্বরের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে Interval (স্বরান্তর) বলে। Interval দুই প্রকার : Simple এবং Compound। যখন কোন দুটি স্বর-ব্যবধান পাঁচটি Staff Line এর মধ্যে (অর্থাৎ Octave-এর মধ্যে) দেখানো যায় তাকে Simple, এবং তার বাইরে হলে Compound Interval বলে। যেমন,

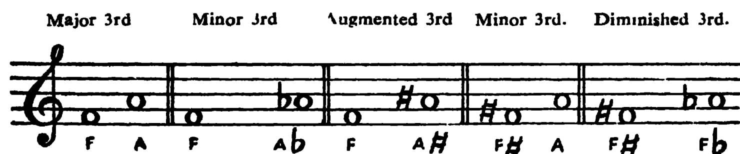


Perfect 4th	Perfect 5th	Compound major 3rd·	Minor 6th

Semitone এর সাহায্যে Note Value (স্বর মূল্য) এবং স্বর বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়। পক্ষান্তরে স্বরমূল্য বা ব্যবধানবৈচিত্র্য Semitone-এর সংখ্যানুসারে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়। যেমন,

F — A	=	Major 3rd	=	4	Semitones.
F — Ab	=	Minor 3rd	=	3	,,
F — A♯	=	Augmented 3rd	=	5	,,
F♯— A	=	Minor 3rd	=	3	,,
F♯— Ab	=	Diminished 3rd	=	2	,,

উপরোক্ত স্বর-ব্যবধানগুলি Staffএর উপরে নিম্নোক্তরূপে লেখা হয়। (অবশ্য সংগীতলিপিতে Staffএর বাইরে কিছু লেখা থাকে না, তবে শিক্ষার্থীর সুবিধার্থে এখানে নাম তথা স্বরাক্ষরগুলিও দেওয়া হয়েছে)।
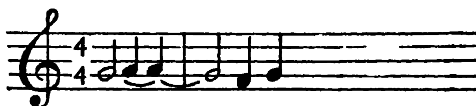


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, যেকোন Scale-এ 2nd, 3rd, 6th ও 7th note এর Major ও Minor দুই-ই হতে পারে।

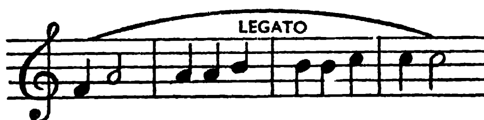
উপরোক্ত ব্যবধানগুলি ছাড়াও নানাপ্রকার স্বর ব্যবধান আছে যার কয়েকটি হোল—

C—E	=	Major 3rd	=	4	Semitones	
C—E*b*	=	Minor 3rd	=	3	,,	
C—F	=	Perfect 4th	=	5	,,	
C—F#	=	Augmented 4th	=	6	,,	
C—G	=	Perfect 5th	=	7	,,	
C—G*b*	=	Diminished 5th	=	6	,,	ইত্যাদি।

Tie/Bind : যখন কোন স্বরকে দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজন হয় তখন Tie/Bind চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন,



Slur/Legato : Tie এর সঙ্গে Slur (Italian নাম Legato) এর পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, Tie চিহ্ন একাধিক সমান উচ্চতার স্বর সমূহের জন্য ব্যবহৃত হয় কিন্তু Slur-এ বিভিন্ন উচ্চতার স্বর থাকে এবং তখন গতি হয় সহজ। যেমন,



i. e., to play smoothly.

N. B. : Rest চিহ্নে কখনও Tie বা Slur হয় না।

Pause : 𝄐 = Pause ; এই চিহ্ন কোন Note, Rest বা Chord এর উপরে থাকলে, তার সময়কালকে চিহ্নমূল্যের থেকে সামান্য বেশী বুঝতে হবে।

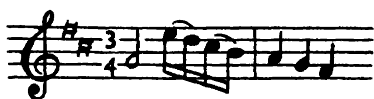
Appoggiatura, Grace Note বা Leaning Note : এই তিনটি একই অর্থবোধক। স্পর্শস্বরকেই Appoggiatura, Grace Note বা Leaning

Note বলা হয়। সাধারণত মূল স্বরের পাশে ছোট আকারের স্বর সহযোগে প্রদর্শিত হয়। যেমন,

সংক্ষিপ্ত রূপ



পরিবেশন রূপ
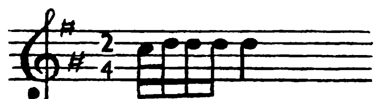


Acciaccatura ও Crushing Note : ঐ দুটি পূর্বোক্ত Grace Note আদির মতোই দেখানো হয়, তবে এর উপরের অংশ একটি রেখা দিয়ে কাটা থাকে। যেমন,

সংক্ষিপ্ত রূপ
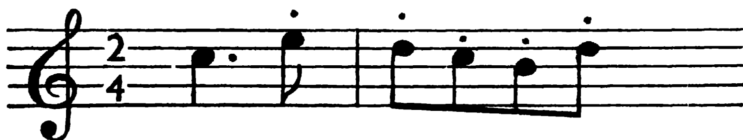


পরিবেশন রূপ

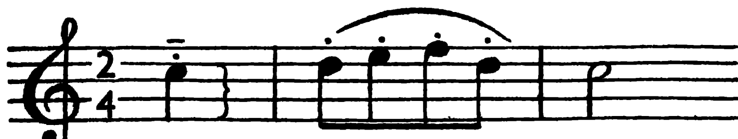


সংগীতলিপিকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য Staff পদ্ধতিতে কতগুলি সংকেত চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে, অতঃপর তার কিছু পরিচয় দেওয়া হোল। যেমন তিন প্রকার Staccato চিহ্ন :—

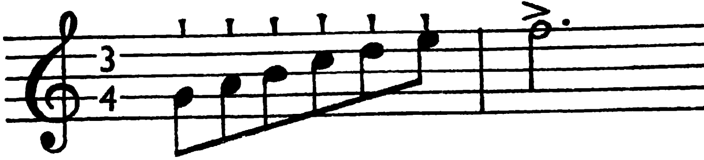
Dot Staccato : স্বরের উপরে বা নীচে বিন্দু স্থাপন করে এই চিহ্নের সাহায্যে পূর্ববর্তী স্বরের অর্ধমূল্য বৃদ্ধি করা হয়। যেমন,



Mezzo Staccato : এই চিহ্নেও বিন্দু থাকে, কিন্তু বিন্দুর সঙ্গে, একটি স্বর হলে রেখা এবং একাধিক স্বর হলে Slur চিহ্ন সহযোগে প্রদর্শিত হয় এবং এর সাহায্যে পূর্ববর্তী স্বরের তিন-চতুর্থাংশ মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। যেমন,



Dash Staccatissimo : —Dash সহযোগে এই চিহ্ন স্বরের উপরে বা নীচে প্রদর্শিত হয় এবং পূর্ববর্তী স্বরের একচতুর্থাংশ মূল্য বৃদ্ধি করে। যেমন,



The Turn : ∼=Turn, এই চিহ্নের অর্থ একসঙ্গে চারটি স্বরোচ্চারণ। যেমন প̃=পধপম ম̃ =মপমগ ইত্যাদি।

Inverted Turn : ≀ =Inverted Turn ; এই চিহ্নের অর্থও একসঙ্গে চারটি স্বরোচ্চারণ, কিন্তু বিপরীত দিক দিয়ে। যেমন, প≀ =মপধপ ; ম≀ =গমপম ইত্যাদি।

Mordent/Pratriller : Mordent দুই প্রকার, যথা **Upper** এবং **Lower Mordent** । ∿ =**Upper** ; অর্থাৎ পরবর্তী স্বরসহ উচ্চারণ, যেমন, প∿ =পধপ, ম∿ =মপম ইত্যাদি এবং ∿| =**Lower** ; অর্থাৎ পূর্ববর্তী স্বর সহ উচ্চারণ, যেমন, প =পমপ ; ম =মগম ইত্যাদি।

Shake/Trill : *tr∼∼* =**Trill** ; এই চিহ্নের অর্থ কম্পন, **Turn** এর সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য আছে। তবে কিঞ্চিত ব্যাপক অর্থে এই চিহ্ন প্রযুক্ত হয়ে থাকে। যেমন, প =পধপধ ; অথবা পধপধপমপধ ইত্যাদি। তবে এই ক্রিয়া সংগীত রচনার তাল এবং সময়কালের উপরে নির্ভরশীল। অর্থাৎ স্বর-মূল্যানুসারে কম্পনের সময়কাল নিশ্চিত হবে।
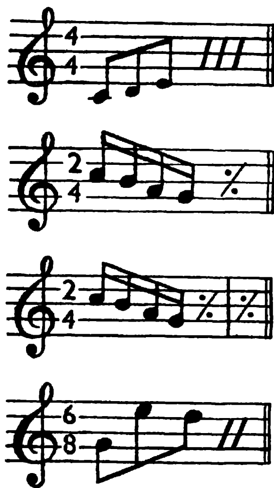
8 : 8 (৮) সংখ্যাটি কোন স্বরের নীচে বা উপরে থাকলে সেই স্বরটি এক সপ্তক নীচের বা উপরের স্বরসহ উচ্চারিত হয়ে থাকে।
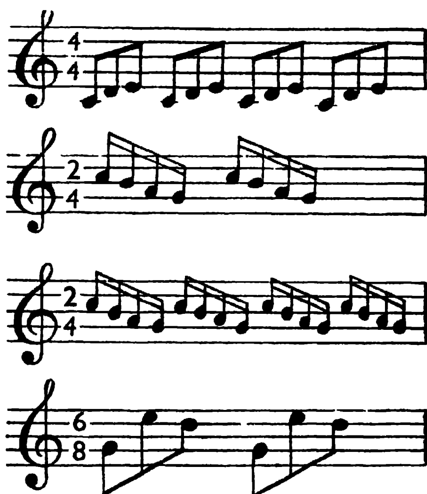
8va : 8 (৮) সংখ্যার মতোই অভিন্ন অর্থবোধক চিহ্ন।

J : কোন স্বর একটি রেখা দিয়ে কাটা থাকলে, তাকে ৮ স্বর, দুটি রেখা দিয়ে কাটা থাকলে ১৬ ; তিনটি রেখা দিয়ে কাটা থাকলে ৩২ প্রভৃতি স্বর বুঝাতে হবে।

/, ·/., // **Simili :** পুনরাবৃত্তির চিহ্নকে Simili বলে। এই চিহ্নত্রয় যথাক্রমে তাল ; তালাবর্তন অথবা তালাবর্তনের কিছু অংশের পুনরাবৃত্তি বোঝায়। যেমন,

সংক্ষিপ্ত রূপ পরিবেশণ রূপ





bis : *bis* এবং Simili একই অর্থবোধক, তবে Simili কেবলমাত্র অল্প স্বর রচনার (সাধারণ একটি কি দুটি Bar-এর) জন্য ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু কোন স্বর রচনার উপরে bis লেখা থাকলে সম্পূর্ণ রচনাটিরই পুনরাবৃত্তি বুঝতে হবে।

সংগীত পরিবেশণের নির্দেশ : সংগীত পরিবেশণের জন্য কতগুলি সাংকেতিক অক্ষর / চিহ্ন স্বর সমূহের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য তথা স্থায়িত্ব সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়, যার কয়েকটি এখানে দেওয়া হোল।

p=Piano : মৃদু।

pp=Pianissimo : মৃদুতর।

f=Forte : উচ্চ।

ff=Fortissimo : উচ্চতম।

<=Crescendo : ক্রমশঃ উচ্চ।

>=Decrescendo : ক্রমশঃ মৃদু, একে Diminuend-ও বলা হয়।

ʔ=Breath : ক্ষণিক স্তব্ধতা।

Grave : অতি বিলম্বিত লয় (Solemn)।

Lento : বিলম্বিত লয়।

Andantino : মধ্যলয় (Moderato)।

Allegretto : অপেক্ষাকৃত দ্রুত লয়।

Allegro : দ্রুত লয়।

Presto : অতি দ্রুত লয়।

Syncopation : অতীত, অনাগতাদির মতো লয়বৈচিত্র্যেরও পাশ্চাত্য সংগীতে প্রচলন আছে, যা Curb চিহ্ন তথা সবল ও দুর্বল স্বর-সংকেত সহযোগে বর্ণিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে Syncopation বলে

সাধারণ নিয়মাবলী ঃ

১। স্বরাক্ষরগুলি নির্দিষ্ট আন্দোলন সংখ্যাযুক্ত স্বর নির্দেশ করে।

২। Key Note আরম্ভিক স্বর নির্দেশ করে।

৩। Key Signature এর সাহায্যে স্বরূপ নির্দেশ করা হয়।

৪। Clef Signature এর সাহায্যে স্বরসপ্তক (স্থান) নির্দেশ করা হয়।

৫। Time Signature এর সাহায্যে তাল নির্দেশ করা হয়।

৬। Scale নাম-বৈচিত্রের সাহায্যে বিবিধ স্বরক্রম বোঝান হয়।

৭। স্বর চিহ্নগুলি সর্বদা তালের মাত্রাসংখ্যানুযায়ী ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৮। Semibreve চিহ্নের মূল্য একটি পূর্ণ স্বর (Whole note) অথবা ৪ মাত্রা, যাকে পাশ্চাত্য সংগীতে প্রামাণ্য স্বর ব্যবধান (Standard time Interval) বলা হয়।

৯। Rest ও Breath চিহ্নের সাহায্যে নীরবতা প্রদর্শিত হয়।

১০। Dot ও Pause চিহ্নের সাহায্যে স্বর-স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা হয়।

১১। Semitone কে ক্ষুদ্রতম স্বর মানা হয়।

১২। Semitone সংখ্যার সাহায্যে স্বরমূল্য নিরূপণ করা হয়।

১৩। Semibreve Rest চিহ্ন যেকোন মাত্রাযুক্ত Bar-এর জন্য ব্যবহার করা হয়।

১৪। Tie একই উচ্চতার দুটি স্বরকে যুক্ত করে।

১৫। Slur বিভিন্ন উচ্চতার স্বরকে যুক্ত করে।

নবম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ

মুখবন্ধ : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুমুখী প্রতিভা পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, তিনি অনেকগুলি বিষয়ে এমন পারদর্শী ছিলেন যে তার যে কোন একটিতে কেহ তেমন পারদর্শী হলে জগদ্বিখ্যাত হতে পারতেন। কবি স্বয়ং তেমন ষোলটি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। বিষয়টি যে অতিশয়োক্তি নয় সেকথা আজ অনেকেই জানেন।

কবির বহু বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে তাঁর বহু কক্ষবিশিষ্ট সংগীত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশাল ভাণ্ডার। তাঁর অন্তরে যে সুর-দেবীর আসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাঁর প্রেরণায় তিনি বহু বিচিত্র সংগীত রচনা করেছেন। সারা জীবনব্যাপী কথা ও সুরের মালাবদল তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেই সাধনার ফসল তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্য। এই ফসলে শুধু যে বিশুদ্ধ রাগসংগীত কিংবা অবিশুদ্ধ লোকসংগীত মিলেমিশে একাকার হয়েছে তাই নয়, বিভিন্ন প্রদেশের এবং বিদেশের সুর ও ভাবের সমন্বয়েও তা বিচিত্র রসে সমৃদ্ধিলাভ করেছে। তাঁর সৃষ্টির এই বিপুলতা, কাব্য সুর ও ছন্দের অজস্রতা অতুলনীয়। বিশ্বের কোন একজনের দ্বারা এমনটি সম্ভব হয় নি। এই বিরাট প্রতিভা বিকাশের উৎস সম্বন্ধে আজ আমাদের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। স্বভাবতই তাঁর ছেলেবেলার পারিবারিক পরিবেশ প্রভৃতি নানা বিষয় সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল হয়। তবে কবি বলেছেন : "আরম্ভেরও আরম্ভ আছে," তাই আমাদের আলোচনা যথাসম্ভব গোড়া থেকে সুরু করাই যুক্তিসঙ্গত।

আদি পরিচয় (ঠাকুর পদবীর উৎপত্তি) : ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে যশোর-খুলনার কোন এক গ্রাম থেকে গৃহবিবাদে উত্যক্ত হয়ে জগন্নাথ কুশারি নামে এক ব্রাহ্মণ সপরিবারে গোবিন্দপুরে চলে আসেন। তিনি জেলে মালো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পল্লীতে এসে বাসা করেন। সেখানে কোন ব্রাহ্মণ না থাকায় সকলেই ঠাকুরমশাই এসেছেন বলে খুব খুশি। সেই দিনে ব্রাহ্মণেরা প্রায় ঠাকুর-দেবতার মতোই আদর সম্মান পেতেন। ক্রমে 'ঠাকুর-মশাই' কথাটি মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে পড়ে। জগন্নাথ ইংরেজ জাহাজে মালপত্র সরোবরাহ করতেন। ইংরেজরাও তাঁকে ঠাকুর বলে চললেন। ইংরাজিতে এর উচ্চারণ হোল 'টেগোর' (Tagore)। এইভাবে এই অভিনব পদবীর উৎপত্তি হয়।

এই বংশের নীলমণি ঠাকুর কোম্পানির দেওয়ানি পাওয়ায় উড়িষ্যার কালেক্‌টারিতে ভাল চাকুরী পান এবং প্রচুর ধনোপার্জন করেন। কালে তিনি পাথুরিয়াঘাটায় বাড়ি তৈরী করে বসবাস শুরু করেন, কিন্তু তাঁর সহোদর দর্পনারায়ণের সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায় তিনি জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বাড়ি তৈরী করে পৃথক বসবাস করেন। নীলমণির পুত্র রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ।

প্রিন্স দ্বারকানাথ : রামমণির পুত্র এবং রামলোচনের দত্তক পুত্র প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্ম হয় ১৭৯৪ সালে। সেই সময় থেকে ঠাকুর পরিবারে ধন-মান, প্রভাব-প্রতিপত্তির প্লাবন আসে। ছেলেবেলায় ইনি সেরবোর্ন সাহেবের স্কুলে পড়াশুনা করেন। পরে ইনি ল-এজেন্ট এবং বাণিজ্য-বিষয়ক এজেন্টের কাজ করেন। ছয় বৎসর কলিকাতার কালেকটর ও সল্ট এজেন্সীর সেরেস্তাদারী করার পরে তিনি ঐ এজেন্সীর দেওয়ান হন। তারপরে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবার জন্য ঐ পদ ছেড়ে দিয়ে 'কার ঠাকুর কোং' নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু করেন এবং ক্রমে প্রচুর ধনোপার্জন করেন। 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট' পদ, 'ইউনিয়ন ব্যাংক' এবং 'জমিদার সভা' প্রধানতঃ এঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হিন্দু কলেজ স্থাপনে ইনি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কালক্রমে ইনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীদের অন্যতম বলে স্বীকৃত হন। এঁর দান-ধ্যান ছিল অতি অসাধারণ। বিলাতে থাকাকালীন এঁর দান-খয়রাত দেখে সকলে এঁকে প্রিন্স বলতো। সেই থেকে ইনি প্রিন্স দ্বারকানাথ নামে বিখ্যাত হন। ইনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় 'জাস্টিস অব দি পীস' পদ অলংকৃত করেন।

তখন বাংলাদেশে ছিল, ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের যুগ। তিনি দ্বারকানাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, কিন্তু দ্বারকানাথ স্বধর্মে ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। রামমোহনের প্রভাবে পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এই ধর্মান্তরে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হন এবং দেশ ত্যাগ করেন। ১৮৪৬ সালের ১লা আগষ্ট বিলাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ : প্রিন্স দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮১৭ সালের ১৫ই মে। পিতামহীর কাছে পালিত হওয়ায় তাঁর মৃত্যুর পরে এঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। সেই সময়ে ঈশোপনিষদের একটি ছেঁড়া পাতা থেকে জানতে পারেন যে, "ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজিত, তিনি যা দেবেন তাই খুশি হয়ে

নেবে, অন্যের ধনে লোভ করা অনুচিত।" পরবর্তীকালে একেই তিনি জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেন।

পিতার মৃত্যুর পরে খুব অশান্তির মধ্যে তাঁর দিন কাটে, কিন্তু কিছুতেই তিনি আর পুরানো বিশ্বাসের মধ্যে ফিরে আসতে পারলেন না। এদিকে ব্যবসা ও জমিদারির সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়লো যুবক দেবেন্দ্রনাথের উপরে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও আদর্শবান। পিতার দান-ধ্যানের বাহুল্যতায় প্রচুর ঋণ ছিল, তাছাড়াও ছিল প্রতিশ্রুত নানাবিধ চাঁদা। সব মিলিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা তিনি পিতৃঋণ হিসাবে বহুদিন ধরে পরিশোধ করেন। এজন্য তাঁকে বহু সম্পত্তি ও আসবাবপত্র বিক্রয় করতে হয়। তাঁর পিতৃঋণ স্বীকারের এই মহত্ত্ব পরবর্তীকালে প্রবাদে পরিণত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্গত ব্রহ্মপ্রতিপাদক তত্ত্বসমূহের বহুল প্রচারের জন্য ১৮৩৯ সালে ইনি 'তত্ত্ববোধিনী' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ নামে একটি মুখপত্রও প্রকাশিত হয়, যার প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত। ব্রাহ্ম সমাজে আগে শুধু উপনিষদের শ্লোকপাঠ এবং ব্যাখ্যা করা হোত। ইনি সেখানে উপাসনা পদ্ধতির প্রচলন করলেন এবং উপাসনার জন্য একটি প্রার্থনা সংগীতও রচনা করেন। ইনি বহু ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থাদি রচনা করেছেন যেমন. 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান', 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস', 'বিবিধ সংগীত', 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি', 'পরলোক ও মুক্তি', 'উপহার', আত্মজীবনী' প্রভৃতি। এঁর ধর্মপ্রাণতায় মুগ্ধ হয়ে ব্রাহ্মগণ এঁকে 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করেন। সমাজের উন্নতির জন্য ইনি 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন। নির্জনে উপাসনার জন্য ইনি বোলপুরে ভুবনডাঙ্গার বিস্তীর্ণ প্রান্তর ক্রয় করেন, যা পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে।

মহর্ষি তাঁর অন্যান্য নানাগুণের সঙ্গে ছিলেন পরম সংগীতানুরাগী তিনি নিজেও মোটামুটি গাইতে পারতেন। সংগীতের ভালমন্দ বোধ তাঁর অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। তিনি অনেকগুলি উপাসনা সংগীত রচনা করেছেন। তাঁর প্রভাবে ঠাকুর বাড়িতে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই সংগীত চর্চা করতে হোত। নানা উৎসবে নৃত্য, গীত, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি ছিল অপরিহার্য। উৎসবের আগে তিনি স্বয়ং সকলকে তালিম দিতেন এবং যতক্ষণ না সুর-তাল প্রভৃতি নির্ভুল হয়,

ছাড়তেন না। কোন বিষয়ে অভ্যাস পাকা না হলে উৎসবের দিন সেটিকে বাদ দিযে দিতেন। কবি তাই বলেছেন : " আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানের চর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি, কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না মনে পড়ে না..."।

মহর্ষির চৌদ্দটি সন্তান, যাঁরা প্রত্যেকেই জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে কীর্তি অর্জন করেছেন। ১৯০৫ সালের ১৯শে জানুয়ারী এঁর তিরোধান হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ : মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৪০ সালের ১১ই মার্চ। দুই বছর সেণ্ট পলস স্কুলে পড়ার পরে ইনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু পড়াশুনা তাঁর বেশীদূর চলেনি। মাতৃভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি এর অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। ইনি সাহিত্য, দর্শন, গনিতাদি শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন এবং বাঁশি, এসরাজ ও অর্গান বাদনে সুনিপুন ছিলেন।

১৮৬০ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ (মেঘদূতের কাব্যানুবাদ) প্রকাশিত হয়। এঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'স্বপ্নপ্রয়াণ,' 'তত্ত্ববিদ্যা,' 'অদ্বৈত মতের সমালোচনা,' 'হারামণির অন্বেষণ', 'গীতাপাঠের ভূমিকা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এঁর পরামর্শে এবং নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে ১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাসে 'হিন্দুমেলা' অনুষ্ঠিত হয়। যাকে কংগ্রেসের অগ্রদূত বলা যায়। ১৮৭৭ সালে এঁর সম্পাদনায় 'ভারতী' মাসিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়া 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকারও ইনি সম্পাদনা করেন। ১৮৯১ সালে প্রকাশিত 'হিতবাদী' পত্রিকার ইনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বাংলার রেখাক্ষর বর্ণমালা (Short hand) বা সংকেত লিপির ইনিই প্রথম উদ্ভাবক। ইনি সংগীতের স্বর-প্রস্তার নিয়ে গাণিতিক গবেষণা করেছেন এবং বাংলা স্বরলিপির প্রবর্তন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন :—"বাংলাভাষাতে প্রথম স্বরলিপি যে আমার রচিত তাহা একেবারে নিঃসন্দেহ।" (অবশ্য বাংলা স্বরলিপি ইতিপূর্বেই আবিস্কৃত হয়েছিল)। কবির সংগীত ও সাহিত্যিক জীবন গঠন ও বিকাশে পিতা ও বড়দাদার উৎসাহ এবং জ্যোতিদাদার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিভাবকত্ব সর্ব বিষয়ে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথের শেষ জীবন কাটে শান্তিনিকেতনে। ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে এঁর মৃত্যু হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ : মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৪২ সালের ১লা জুন। ইনি ছিলেন সর্বপ্রথম ভারতীয় আই. সি. এস.। ১৮৬৪ সালে ইনি বম্বেতে কার্যভার গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পরে দেশে ফিরে এসে ইনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইনি ছিলেন প্রথম সভাপতি। ইনি খুব ভালো আবৃত্তি করতে পারতেন। স্ত্রীস্বাধীনতার ইনি বিশেষভাবে পক্ষপাতী ছিলেন। 'আমার বোম্বাই প্রবাস', 'বৌদ্ধধর্ম', 'নবরত্নমালা', স্ত্রীস্বাধীনতা' প্রভৃতি এঁর রচিত গ্রন্থ। ১৯২৩ সালের ৯ই জানুয়ারী এঁর মৃত্যু হয়।

হেমেন্দ্রনাথ : মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৪৪ সালে। ইনি ছিলেন আত্মভোলা প্রকৃতির। এঁর সংগীতচর্চা সম্পর্কে কবি বলেছেন : "…সেজদাদা শিখতেন বটে, তিনি সুর ভাজছেন তো ভাজছেনই, গলা সাধছেন তো সাধছেনই, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত…।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : মহর্ষির পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৪৯ সালের ৪ঠা মে। ইনি একাধারে শিল্পী, সংগীতরচয়িতা, সংগীতশাস্ত্রবিদ, সেতার ও পিয়ানো বাদনে নিপুন এবং সর্বোপরি অত্যন্ত সংস্কারমুক্ত উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি। কোন একজনের মধ্যে এমন অজস্র গুণের সমাবেশ কদাচিৎ দেখা যায়। ইনি বাড়িতে নিয়মিত সংগীত চর্চা করতেন। বম্বে থাকাকালীন ইনি এক বিখ্যাত সেতারীর কাছে সেতার বাদন শিক্ষা করেন।

স্কুলের শিক্ষা শেষ করে ইনি কিছুকাল প্রেসিডেন্সীতে পড়াশুনা করেন। ফরাসী ভাষা আয়ত্ব করে ইনি বহু ফরাসী গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সমস্ত নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন। 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতি' প্রভৃতি এঁর রচিত গ্রন্থাবলীর অন্যতম। ইনি স্বরবিজ্ঞান (Phonology) ও করোটি (Phrenology) বিজ্ঞানেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অকৃতকার্য হলেও ইনি বাংলাদেশের নদীতে দেশী ষ্টীমার চালাবার চেষ্টা করেন। ইনি দ্বিজেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপির সংস্কার সাধন করে 'আকারমাত্রিক' স্বরলিপি পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। ১৯০১ সালে 'সংগীত প্রকাশিকা' নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেন এবং কিছুকাল 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকারও সম্পাদনা করেন। কবির সঙ্গে এঁর অদ্ভুত প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য ছিল। কবির জন্য নানা বিষয়ে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে এঁর আত্মত্যাগ

অতুলনীয়। দাদাদের মধ্যে ইনিই ছিলেন কবির যাবতীয় গুণাবলী বিকাশের প্রধান পথপ্রদর্শক ও উৎসাহদাতা। ১৯২৫ সালের ৪ঠা মার্চ এঁর মৃত্যু হয়।

স্বর্ণকুমারী : মহর্ষির একাদশ সন্তান স্বর্ণকুমারীর জন্ম হয় ১৮৫৭ সালে। বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম উপন্যাস রচনা করেন। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় এঁর উত্তম জ্ঞান ছিল। 'ভারতী' পত্রিকা দীর্ঘকাল এঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপ নির্বাণ' ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। ইনি বহু কবিতা ও নাটকও লিখেছেন। 'স্নেহলতা,' 'কাহাকে ?' 'ছিন্নমুকুল', 'বিচিত্রা', 'মিলনরাত্রি', 'স্বপ্নাবলী' প্রভৃতি এঁর রচিত। এঁর বাংলা গ্রন্থের স্বরচিত ইংরাজি অনুবাদ 'Fatal Garland' পাঠ্য পুস্তক হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইনি 'জগত্তারিণী' পদক দ্বারা সম্মানিত হন। ১৯৩২ সালের ৩রা জুলাই এঁর মৃত্যু হয়।

সোমেন্দ্রনাথ : মহর্ষির সপ্তম পুত্র সোমেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৫৯ সালে। ইনি ছিলেন কবির কাব্যচর্চার প্রধান উৎসাহদাতা। এঁর সংগীতচর্চা শেষ জীবন পর্যন্ত ছিল। ইনি নিধুবাবু রচিত বহু টপ্পা গান জানতেন এবং খুব ভাল গাইতে পারতেন। ১৯২২ সালে চিরকুমার সোমেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

লেডি প্রতিভা চৌধুরী : মহর্ষির পৌত্রী ও হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা দেবীর জন্ম হয় ১৮৬৫ সালে। ইনি উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় সংগীতেই পারদর্শী ছিলেন। ইনি বিদগ্ধ সমাজে রাগসংগীতের প্রচলন ও প্রসারকল্পে ১৯১১ সালের ১০ই আগষ্ট 'সংগীত সংঘ' নামক সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১৩ সালে ইন্দিরা দেবীর সহযোগিতায় ইনি 'আনন্দ সংগীত' পত্রিকার স্থাপনা ও সম্পাদনা করেন। স্যার আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। ১৯২২ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

অবনীন্দ্রনাথ : মহর্ষির সহোদর গিরীন্দ্রনাথের পৌত্র অবনীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৭১ সালের ৭ই আগষ্ট। পিতার নাম গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি কানাইলাল ঢেঁড়ির শিষ্য এবং উত্তম সেতার বাদক ছিলেন। তবে ছবি আঁকা ও নানারকম হাতের কাজেই এঁর বেশী আগ্রহ ছিল। কিছুদিন সংস্কৃত কলেজে পড়ার পরে ইনি Signor Gilhardi (ইতালীয় শিল্পী) ও Palmer (ইংরেজ চিত্রশিল্পী) প্রমুখের কাছে ছবি আঁকা শেখেন। পরবর্তীকালে ইনি হিন্দুশিল্প-কলা ও মুঘল চিত্রকলা চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। 'নির্বাসিত যক্ষ', 'ভারত-

মাতা' ও 'সাহজাহানের মৃত্যু' এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প কীর্তি। চিত্রশিল্পী হিসাবে ইনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত। কথাশিল্পী হিসাবেও এঁর কৃতিত্ব ছিল অতুলনীয়। 'শকুন্তলা', 'রাজকাহিনী', 'ক্ষীরের পুতুল', 'বুড়ো আংলা', 'আপন কথা', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'ঘরোয়া' প্রভৃতি গ্রন্থ তার প্রমাণ। শিল্প-বিষয়ে এঁর কয়েকখানি বিখ্যাত গ্রন্থ আছে। যথা, 'ভারত শিল্প', 'বাংলার ব্রত', 'বাগেশ্বরীশিল্প প্রবন্ধাবলী', ভারতশিল্পে ষডঙ্গ', 'ভারত শিল্পে মূর্তি' প্রভৃতি।

১৮৯৮ সালে ইনি কলিকাতা আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। ১৯০৫ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত ইনি সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে সহাধ্যক্ষ এবং অধ্যক্ষ হিসাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯১২ সালে ইনি সি আই. ই. উপাধি লাভ করেন। 'Indian Society of Oriental Art' এঁরই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সালে ইনি স্যার আশুতোষের সনিবন্ধ অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাগেশ্বরী অধ্যাপক' পদ গ্রহণ করেন। কবির তিরোধানের পরে ইনি কয়েক বছর বিশ্বভারতী বিশ্বিদ্যালয়েও আচার্য রূপে কাজ করেন। নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার প্রমুখ বিখ্যাত চিত্রশিল্পীরা এঁরই ছাত্র ছিলেন। ১৯৫১ সালের ৫ই ডিসেম্বর এঁর মৃত্যু হয়।

সরলাদেবী ঃ মহর্ষির একাদশ সন্তান স্বর্ণকুমারীর দ্বিতীয় কন্যা সরলাদেবীর জন্ম হয় ১৮৭২ সালে। ইনি হিন্দুস্থানী ও পাশ্চাত্য উভয় সংগীতেই পারদর্শিনী ছিলেন। গায়িকা এবং গীতরচয়িতা হিসাবে ইনি বাংলাদেশে সুপরিচিতা। ১৯৪৫ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

ইন্দিরা দেবী ঃ মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরার জন্ম হয় ১৮৭৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর। ১৮৯২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাশ করার জন্য ইনি 'পদ্মাবতী' পদক লাভ করেন। ইনি সংগীতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। পাশ্চাত্য, হিন্দুস্থানী ও রবীন্দ্রসংগীতে এবং ফরাসী ভাষায় এঁর অপরিসীম জ্ঞান ছিল। সংগীতলিপিকার হিসাবেও ইনি ছিলেন সুপরিচিতা। ১৯৪৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে 'ভুবন মোহিনী' পদক দ্বারা সম্মানিত করেন। কিছুকালের জন্য ইনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলংকৃত করেন। সেখান থেকে ১৯৫৭ সালে তিনি 'দেশিকোত্তমা' উপাধি লাভ করেন।

১৮৯৯ সালে এঁর বিবাহ হয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে। এঁর বহু রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'নারীর উক্তি', 'রবীন্দ্র-সংগীতে ত্রিবেনী সঙ্গম' প্রভৃতি এঁর রচিত গ্রন্থ। ১৯৬০ সালের ১২ই আগষ্ট এঁর মৃত্যু হয়।

সারদাপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়ঃ কবির বড় ভগ্নিপতি সারদাপ্রসন্ন পাকা সেতারী ছিলেন। ইনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ সেতারী জালাপ্রসাদের শিষ্য ছিলেন।

ডঃ বাণী চ্যাটার্জীঃ হেমেন্দ্রনাথের পৌত্রী এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথের কন্যা ডঃ বাণী চ্যাটার্জী পাশ্চাত্য সংগীতে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

ডঃ কল্যাণী মল্লিকঃ স্বর্ণকুমারীর পৌত্রী এবং হিরন্ময়ী দেবীর কন্যা ডঃ কল্যাণী মল্লিক ইমদাদ খাঁ ও তাঁর পুত্র ইনায়ত খাঁর কাছে সেতার শিক্ষা করেন।

দিনেন্দ্রনাথঃ দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র এবং দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র দিনেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৮২ সালে। ইনি ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের সুযোগ্য ধারক ও বাহক। সংগীতলিপিকার হিসাবেও ইনি সুপরিচিত। ইনি উত্তম এস্রাজ বাদক ছিলেন। ১৯৩৫ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

ঠাকুর বাড়ির সংগীত চর্চা সম্পর্কে তাই কবি উল্লেখ করেছেনঃ "…ছেলেবেলায় যে সব গান সর্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল সে শখের দলের গান নয়। তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনি জমে উঠেছিল। কালোয়াতি সংগীতের রূপ ও রস সম্বন্ধে একটা সাধারণ সংস্কার ভিতরে ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল। ছেলেবেলা থেকে ভাল হিন্দুস্থানী গান আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করে।…বিষয়বস্তুহীন ছবির নিছক বিশুদ্ধরূপ আমার ভালই লাগে, যেমন ভাল লাগে বাক্যহারা সংগীতের আলাপ। বস্তুত আমার ঝোঁক ঐ দিকে…"।

ঠাকুর বাড়ির সংগীত চর্চার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। সেই দিনে ধনী ও মানী পরিবারেও মেয়েদের গানবাজনা করার প্রথা ছিল না। মহর্ষি কিন্তু এই কুসংস্কার মানেন নি। ফলে ঠাকুর বাড়ির মেয়েরাও গান বাজনা করে নিজেরা আনন্দ পেয়েছেন এবং অপরকেও আনন্দ দিয়েছেন। এই পরিবারের স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী প্রভৃতি

গায়িকা এবং গীত-রচয়িতা হিসাবে বাংলাদেশে সুপরিচিতা। ঠাকুর বাড়ির সংগীতানুষ্ঠান সম্পর্কে প্রশংসা করে তৎকালীন প্রচলিত 'বিদ্বজ্জন সমাগম' পত্রিকাতে প্রকাশিত কয়েকটি লাইন তথ্য হিসাবে এখানে উল্লেখযোগ্য—"...হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রতিভা নামে অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা ও তদপেক্ষা অল্পবয়স্ক একটি বালক উভয় মিলিয়া সেতার বাজাইলেন। পরে এই দুটি শিশু ৩/৪টি হিন্দি গান গাইলেন। সে গানে হারমনিয়ম, বেহালা ও তবলার সঙ্গে সঙ্গত হইয়াছিল। তারপর প্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুবাবুর একটি গানে ঐ বালকটি তবলা সঙ্গত করিল, পরে আরো ৪/৫টি গানে প্রতিভা তবলা সংগত করিলেন..."।

পারিবারিক পরিচয়ঃ সেই দিনে দূর-দূরান্তর থেকে ওস্তাদদের আমন্ত্রণ করে সংগীতের আসর রচনা করা ধনী ও সম্মানী পরিবারের আত্মসম্মান রক্ষার অঙ্গ ছিল। ঠাকুর বাড়িতে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ওস্তাদরা কোন না কোন সময়ে স্থান পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ঠাকুর বাড়ির প্রায় সকলেই ছিলেন উচ্চাঙ্গ সংগীতের ভক্ত ও বিশেষজ্ঞ। তৎকালীন ধনী সমাজ সংগীতকে কেবলমাত্র সৌখিন আমোদের বিষয় বলে মনে করতেন না। ভাল সমঝদার হওয়া গুণীজনের যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া ইত্যাদির জন্য তাঁরা নিজেদের যথাসম্ভব শিক্ষিত করে তুলতেন। বর্তমানের মতো কেবলমাত্র ইংরাজি শিক্ষা বা ধনবত্তার জোরেই নিজেদের সমঝদার বলে জাহির করতে লজ্জাবোধ করতেন। এই প্রসঙ্গে প্রবাসী পত্রিকাতে কবির লেখা একটি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়—

"বাংলাদেশের আধুনিক যুগের যখন সবে আরম্ভকাল তখন আমি জন্মেছি, দেখেছি তখনকার বিশিষ্ট পরিবারে সংগীতবিদ্যার অধিকার বৈদগ্ধের প্রমাণ বলে গণ্য হোত। বর্তমান সমাজে ইংরাজি রচনায় বানান বা ব্যাকরণের স্খলনকে যেমন আমরা অশিক্ষার লজ্জাকর পরিচয় বলে চমকে উঠি, তেমনি হোত, যদি দেখা যেত, সম্মানী পরিবারের কেউ গান শোনবার সময় সমে মাথা নাড়ায় ভুল করেছে কিংবা ওস্তাদকে রাগরাগিণী ফরমাসের বেলা রীতি রক্ষা করে নি। তাতে যেন বংশমর্যাদায় দাগ পড়তো। সৌভাগ্যক্রমে তখনো আমাদের সংগীতরাজ্যে বকস্ হারমনিয়ামের মহামারী কলুষিত করেনি হাওয়াকে। তম্বুরার তারে নিজের হাতে সুর বেঁধে, সেটাকে কাঁধে হেলিয়ে, আলাপের

ভূমিকা দিয়ে বড়ো বড়ো গীতরচয়িতার ধ্রুপদ গানে গায়ক নিস্তব্ধ সভা মুখরিত করতেন। সেই ছবির সুগম্ভীর রূপ আজো আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে…"।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গায়ন পদ্ধতি ধ্রুপদের বাংলা ভাষায় রচনা করার জন্ত ঠাকুর পরিবার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। এঁদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ আবার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলি প্রায়ই কোন না কোন পূর্ববর্তী হিন্দি গানের অনুকরণে বা অনুসরণে রচিত। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন :— "…ইহাদের (যদুভট্ট প্রমুখ) গান ভাঙিয়া তখন আমি ও বড়দাদা অনেক ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়াছিলাম, কি সৌখিন কি পেশাদার, কোন গায়কের কোন গান ভাল লাগিলেই অমনি সেটি টুকিয়া লইয়া ব্রহ্মসংগীত রচনা করিতে বসিতাম। এইরূপে ব্রহ্মসংগীতে অনেক বড বড ওস্তাদী সুর ও তাল প্রবেশ করিয়াছে…"।

তখন নব ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মসংগীত রচনার প্লাবন এসেছিল। রাগসংগীতের ভিত্তিতে রাজা রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন এবং ঠাকুর পরিবারের মধ্যে রচনা করেন কবির মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ।

সংগীতগুরুদের পরিচয় : কবির সংগীতগুরুরা সকলেই ছিলেন উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাধক। এঁদের মধ্যে যাঁরা কবির জীবনে বিশেষভাবে সংগীতের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, এক অজানা গায়ক (সম্ভবত মৌলাবক্স) এবং বিখ্যাত যদুনাথ ভট্টাচার্য উল্লেখযোগ্য।

বিষ্ণু ছিলেন কবির প্রথম সংগীত গুরু। সা রে গ ম ইত্যাদির নীরস অভ্যাসে শিশুদের মন যাতে সংগীত বিমুখ না হয় সেইজন্য তিনি গ্রাম্য ছড়াতে রাগসংগীতের সুর বসিয়ে সহজ তালে শেখাতেন। একজন প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ গায়কের পক্ষে এমন কাজ কী করে সম্ভব হয়েছিল তা এক বিস্ময়ের বিষয়। জীবনের প্রারম্ভেই এমন একজন উদারচেতা সংগীতগুরু পেয়েছিলেন বলেই কোন প্রকার সংকীর্ণতা কবির মনকে সংকুচিত করে নি। বিষ্ণু ছিলেন উচ্চস্তরের খেয়াল ও ধ্রুপদ গায়ক। ওস্তাদেরা যেমন তান বিস্তারের প্রাধান্য দিয়ে থাকেন তিনি তেমন দিতেন না, অল্প-সল্প তান-অলংকার প্রয়োগ করলেও কখনো গানকে আচ্ছন্ন করে ফেলতেন না। সংগীতে ভাষার যে একটা মূল্য আছে সেটা তাঁর

গানে পূর্ণমাত্রায় রক্ষা পেত। বস্তুত সংগীতে ভাষার মূল্য সর্বপ্রথম বাঙালীই হৃদয়ঙ্গম করে। জয়দেব থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেই সে কথা প্রমাণ করেছেন।

শ্রীকণ্ঠ সিংহ সম্বন্ধে কবি লিখেছেন: "...আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। ...তিনি তো গান শেখাতেন না, গান দিতেন, কখন যে তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। স্ফুর্তি যখন রাখতে পারতেন না, তখন দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতারে, হাসিতে বড় বড় চোখ জ্বলজ্বল করত, গান ধরতেন 'ময় ছোঁড়া ব্রজকি বাঁশরি' সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না..."।

অজানা গায়ক সম্বন্ধে কবি লিখেছেন:—"ভোরবেলা মশারি থেকে টেনে বার করে তাঁর গান শুনতেম। নিয়মের শেখা যাদের ধাতে নেই, তাদের শখ অনিয়মের শেখায়। সকালবেলার সুরে চলত—'বংশি হমারি রে'।"

যদুভট্টের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা ছিল। স্রষ্টা হিসাবে তাঁর প্রতিভায় তিনি ছিলেন মুগ্ধ। এঁর সম্বন্ধে কবি লিখেছেন: "...ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালি গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজমর্যাদায় ছিল, কাষ্ঠের দেউরিতে ভোজপুরী দারোয়ানের মতো তাল ঠোকাঠুকি করত না। তাঁর নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই। তিনি বিখ্যাত যদুভট্ট।...যখন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকতেন নানাবিধ লোক আসত তাঁর কাছে শিখতে, কেউ শিখত মৃদঙ্গের বোল, কেউ শিখত রাগরাগিণীর আলাপ।...বাংলাদেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায় নি। তাঁর প্রত্যেক গানে একটি Originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা।"

এঁর সম্বন্ধে অন্যত্র বলেছেন: "...তিনি ওস্তাদজাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়ো। তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সংগীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোন হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না। ...যদুভট্টের মতো সংগীত ভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছেন কিনা সন্দেহ।"

ঠাকুর বাড়িতে ছেলেমেয়েদের জন্য বিলাতি সংগীত, বেহালা, পিয়ানো প্রভৃতি শেখারও ব্যবস্থা ছিল। কবির শেষ শিক্ষক ছিলেন রাধিকা গোস্বামী ও শ্যামসুন্দর মিশ্র। রাধিকা গোস্বামীর সংগীত প্রশস্তিতে কবি লিখেছেন:

"...রাধিকা গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগরাগিণীর রূপজ্ঞান ছিল তা নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশিষ্ট একটি রসসঞ্চার করতে পারতেন। সেটা ছিল ওস্তাদির চেয়ে বেশী।"

রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃতি : শিক্ষা বা সাধনার সাহায্যে লব্ধ উৎকর্ষতাকে সংস্কৃতি বলে। অর্থাৎ আত্মার পূর্ণতাকেই আমরা সংস্কৃতি বলি। কবি স্বয়ং ছিলেন সংস্কৃতির একটি পূর্ণ মূর্তি। তাঁর কার্যপ্রণালী এবং চিন্তাধারা কিছুটা আলোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

একথা অনেকেই জানেন যে কবি শৈশবে কিছুদিন এক বিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন, কিন্তু সেখানকার নিরানন্দময় পরিবেশের জন্য পরে আর সেখানে যান নি। পরিণত বয়সে তাই তিনি পুত্রের শিক্ষার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে ওঠেন। শিলাইদহতে থাকাকালীন যখন তিনি এক নবীন শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কারের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন প্রাচীন তপোবন শিক্ষাপদ্ধতিকেই তার শ্রেষ্ঠ মনে হয়। এই শিক্ষাপদ্ধতি কার্যকর করার ব্যাপারে তাঁর মনে হয় যে, এই কাজের গণ্ডি কি কেবলমাত্র তাঁর পরিবারের মধ্যেই সীমিত থাকবে?—ফলস্বরূপ সৃষ্টি হোল বিশ্ববিখ্যাত বোলপুরের শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী বিদ্যাশ্রম।

শান্তিনিকেতন : প্রায় সত্তর-আশী বছর আগে যখন ভারতের কোন বিদ্যায়তনে কেহ কল্পনাও করতে পারে নি, তখন বিশ্বভারতী বিদ্যাশ্রমে সংগীত, নৃত্য নাটকাভিনয় এবং অন্যান্য ললিতকলাকে প্রতিদিনের শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। বিদ্যায়তন স্থাপনকালে কবি এই প্রসঙ্গে তাঁর ভাষণে বলেন : '. সংগীত এবং ললিতকলাই যে জাতীয় আত্মবিকাশের প্রকৃষ্ট উপায় একথার পুনরুল্লেখ করাই বাহুল্য। যে জাত এ দুটি বিদ্যা থেকে বঞ্চিত তারা চিরমৌন থেকে যায়। ...শিক্ষার এইরূপ সংকীর্ণতার মধ্যে আমাদের জীবন ক্রমে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছে। অতঃপর একে প্রশ্রয় দেওয়া কোন মতেই আর উচিত হবে না। আমরা এই যে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করেছি সেখানে সংগীত এবং ললিতকলাকে সম্মানের আসন দিতে হবে।... এইরূপে আমাদের রসবোধ এবং রুচির আদর্শ যথার্থ রূপে গঠিত হয়ে উঠবে। তা হলেই আমাদের সংগীত এবং শিল্পকলা সৌন্দর্যে এবং সম্পদে বিকশিত হয়ে উঠবে। তখন আমরা বিদেশী কলাকে সত্য এবং সংযত ভাবে বিচার করবার

ক্ষমতা লাভ করব এবং তখন তা থেকে ভাব এবং রূপ গ্রহণ করলেও আমরা পরস্বাপহরণের অপবাদভাজন হব না।"

তাঁর নির্দেশ ঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিনা সেদিকে যে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল সেকথা সংগীত অধ্যাপককে লেখা একখানা চিঠিতে জানা যায় :

"...আমাদের বিদ্যালয়ে আজকাল গানের চর্চাটা বোধ হয় কমে এসেছে, সেটা ঠিক হবে না, ওটাকে জাগিয়ে রেখো। আমাদের বিদ্যালয়ের সাধনার নিঃসন্দেহ ওটা একটা প্রধান অঙ্গ। শান্তিনিকেতনের বাইরের প্রান্তরশ্রী যেমন অগোচরে ছেলেদের মনকে তৈরী করে তোলে তেমনি গানও জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার একটা প্রধান উপাদান। ...ওরা যে সকলে গাইয়ে হয়ে উঠবে তা নয় কিন্তু ওদের আনন্দের একটি শক্তি বেড়ে যাবে, সেটাতে মানুষের কম লাভ হয় না।"

সংস্কৃতি মানব মনের আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে সংস্কার সাধন করে। সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় কবির যে সকল বিধিবিধানাদি পাওয়া যায়, সেগুলি বর্ত্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে অনুসৃত তথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। সংস্কৃতির ব্যাখায় তিনি বলেছেন :—

"সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাবে মানুষ অন্তর থেকে স্বতই সর্বাঙ্গীন সার্থকতা লাভ করে। তার প্রভাবে নিষ্কাম জ্ঞানার্জনের অনুরাগ এবং নিঃস্বার্থ কর্মানুষ্ঠানের উৎসাহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যথার্থ সংস্কৃতি জড়ভাবে প্রথাপালনের চেয়ে অকৃত্রিম সৌজন্যকে বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে কাজ উদ্ধার করবার উপযোগী বিনয়কৌশল তার অনুশাসন নয়। সংস্কৃতিবান মানুষ নিজের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু নিজেকে হেয় করতে পারে না। সে আড়ম্বরপূর্বক প্রচার করতে বা স্বার্থপরভাবে সবাইকে ঠেলে নিজেকে অগ্রসর করতে লজ্জাবোধ করে। যা কিছু ইতর বা কপট তার গ্লানি তাকে বেদনা দেয়। শিল্পে সাহিত্যে মানুষের ইতিহাসে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় থাকাতে সকল প্রকার শ্রেষ্ঠতাকে সম্মান করতে সে আনন্দ পায়। সে বিচার করতে পারে, মতবিরোধের বাধা ভেদ করেও যেখানে যেটুকু ভালো আছে সে তা দেখতে পায়। অন্যের সফলতাকে ঈর্ষা করাকে সে নিজের লাঘব বলেই জানে...।"

এই উক্তিকে শাশ্বতবাণী বলা যায়। সংস্কৃতির এমন অপরূপ বর্ণনা আর কোথাও নেই। আর্টের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন :—

"...যেখানে আর্টের উৎকর্ষ, সেখানে গুণী ও গুণজ্ঞদের ভাবের উচ্চশিখর। সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌঁছাবে এমন আশা করা যায় না। সেখানে নানা রঙের রসের মেঘ জমে ওঠে। সেই দুর্গম উচ্চতায় মেঘ জমে বলেই তার বর্ষনের দ্বারা নিচের মাটি উর্বর হয়ে ওঠে। অসাধারণের সঙ্গে সাধারণের যোগ এমনি করেই হয়। উপরকে নিচে বেঁধে রেখে দিলে হয় না। যারা সৃষ্টিকর্তা তাদের উপর যদি হাটের ফরমাস চালানো যায় তাহলেই সর্ব্বনাশ ঘটে। ফরমাস তাদের অন্তর্যামীর কাছ থেকে, সেই ফরমাস অনুসারে যদি তারা চিরকালের জিনিষ তৈরী করতে পারে তাহলে আপনিই তার উপরে সর্বলোকের অধিকার হবে। কিন্তু সকলের অধিকার হলেই যে হাতে হাতে সকলে অধিকার লাভ করতে পারবে, ভালো জিনিষ এত সস্তা নয়। বসন্তে যে ফুল ফোটে সে ফুল তো সকলেরই জন্যে, কিন্তু সকলেই তার সমান মর্যাদা বোঝে, একথা কেমন করে বলব? বসন্তে আমের মুকুলে অনেকেরই মন সায় দিলেনা বলেই কি তাকে দোষ দেব? বলব, তুমি কুমড়ো হলে না কেন? বলব কি গরিবের দেশে বকুল ফোটানো বিড়ম্বনা। সব ফুলেরই বেগুনের ক্ষেত হয়ে ওঠা নৈতিক কর্ত্তব্য? বকুল ফুলের দিকে যে অরসিক দেখে না, তার জন্য যুগ যুগান্তর ধরেই বকুল ফুল যেন অপেক্ষা করে থাকে, মনের খেদে এবং লোকহিতৈষীদের তাড়নায় সে যেন কচুবন হয়ে ওঠবার চেষ্টা না করে। গ্রীসে সবসাধারণের জন্যেই 'সফোক্লিস এ স্কিলাসে'র নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল, কেবল বিশিষ্ট কতিপয়র জন্য নয়। সেখানকার সাধারণের ভাগ্য ভালো যে, তারা কোনো গ্রীসীয় দাশুরায়ের শরণাপন্ন হয় নি। সাধারণকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভালো জিনিষ দিতে থাকলে ক্রমশই তার মন ভালো জিনিষ গ্রহণ করবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। কবিকে আমরা যেন বলি—তোমার যা সর্বশ্রেষ্ঠ তাই যেন তুমি নির্বিচারে রচনা করতে পারো; কবি যদি সফল হয়, তবে সাধারণকে বলব—যে জিনিষ শ্রেষ্ঠ তুমি যেন সেটি গ্রহণ করতে পারো।... কৃত্রিমতা সকল কবি সকল আর্টিষ্টের পক্ষেই দূষনীয়, কিন্তু যা সকলেই অনায়াসে বোঝে সেটাই অকৃত্রিম, আর যা বুঝতে চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের দরকার সেটাই কৃত্রিম এ ধরণের কথা অশ্রদ্ধেয় .. ।"

সাধারণত প্রতিভাবান স্রষ্টারা নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকেন এবং উচ্চ আশা পোষণ করেন। রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তবে তাঁর রচিত সংগীত সম্বন্ধে যে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, সেকথা তাঁর উক্তিতে স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি বলেছেন—"..যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুই তো বদলায়, তবে সব চেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান, এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালীর শোকে দুঃখে, সুখে আনন্দে আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এই গান তাদের গাইতে হবেই..."।

পরিবর্ত্তনশীল জগতে আমাদের সংগীত ও সংস্কৃতি প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে বলে আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু যখন দেখা যায় যে, কোথাও সংগীত কেবলমাত্র সৌখিন আমোদের বিষয় সেখানে সংস্কৃতির কোন বালাই নেই, আবার কোথাও সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে যা অনুষ্ঠিত হয় তাকে অত্যাচার বললেও কম বলা হয়। কেহ কেহ ইংরাজি শিক্ষা বা ধনবত্তার জোরেই নিজেদের সমঝদার বলে জাহির করে খুশি হন। অনেকেই যে এতে বিরক্ত বা বেদনাবোধ করেন সেকথা বলাই বাহুল্য।

গায়কী : রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞ মহলে 'গায়কী' শব্দটি খুব শোনা যায়। রাগসংগীতের পরিভাষায় কিঞ্চিত ভিন্ন মনে হলেও, এর মূলগত অর্থ একই। সংগীত সাহিত্য বা যে কোন বিষয়ে যেমন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গি দেখা যায়, তাকে প্রত্যেকের নিজস্ব Style বলা হয়, গায়কীও তেমনি। শ্যামাসংগীতে সাধক রামপ্রসাদ সেন যেমন একটি বিশিষ্ট গায়ন রীতির প্রবর্ত্তন করেছেন, রবীন্দ্রসংগীতেও তেমনি একটি বিশিষ্ট গায়ন রীতি প্রচলিত। তবে রবীন্দ্রসংগীতে এই রীতিটি যথেষ্ট ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কারণ স্বর, রাগরূপ, তাল ও লয়ের রূপ ও প্রয়োগের জ্ঞানের সঙ্গে ভাব সহযোগে কাব্যের উচ্চারণ ও প্রয়োগভঙ্গির জ্ঞানার্জন করাও আবশ্যক। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ শুধু যে রাগসংগীত ও লোক-সংগীতের আদর্শেই সংগীত রচনা করেছেন, তা নয়, তিনি দেশ-বিদেশের বহু বিচিত্র সংগীত ধারাকেও সাদরে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থীর সেই সকল সংগীত ধারার সঙ্গেও কিছু পরিচয় থাকা আবশ্যক। যার জন্য চাই সুমার্জিত কণ্ঠস্বর ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানলাভের সাধনা। অবশ্য পল্লী বালক-বালিকা ও বধুগনের নানাবিধ গানে এমন অসংখ্য কণ্ঠস্বর শোনা যায়, যা সুমার্জিত না হলেও, স্বভাব সুন্দর সুমিষ্ট ও সতেজ কণ্ঠস্বর হিসাবে অপূর্ব। কিন্তু

পরম্পরাগত শিক্ষাসাপেক্ষ অভিজাত বা দেশীসংগীতের ক্ষেত্রে ঐ নিদর্শনকে প্রামাণ্য বলা যায় না, কারণ সকল শ্রেণীর জ্ঞানের জন্যই সাধনা অপরিহার্য, সাধনা-বিহীনতা কোন শ্রেণীর জ্ঞানেরই আদর্শ হওয়া উচিত নয়।

রবীন্দ্রসংগীতের মূলকথা বা মূলবস্তু হোল তার কথা ও সুরের অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ। প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় অভিজাত বা উচ্চাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে এই বিষয়েই তার পার্থক্য। কারণ সেই সকল গানে সুরের প্রাধান্যই বেশী, কথা সেখানে সুরের দাস বা অনুসঙ্গীমাত্র। রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও সংগীতকে "যমজ ভাই" বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে উভয়ের মধ্যেই ভাব প্রকাশের সমান শক্তি বিদ্যমান। তিনি বলেছেন—"·· কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে।···এমনকি, সুরের উপরেই কথার ভার নির্ভর করে, একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। ····অতএব ভাব প্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে। সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষা মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে।"

অন্যত্র তিনি বলেছেন—"···তাঁহারা (ওস্তাদেরা) গানের কথার উপরে সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপরে দাঁড় করাইতে চাই, তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।"

রবীন্দ্রসংগীত আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ গান। স্বভাবতই এর গায়কীতে স্বতন্ত্রতা থাকা স্বাভাবিক। সেই স্বতন্ত্রতা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। কারণ 'লাল' শব্দটি বাদ দিয়ে যেমন লাল রংটিকে বোঝানো কঠিন, তেমনি গায়কীর সম্যক ব্যাখ্যাও ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বিষয়টি কানে শুনে উপলব্ধি এবং নিয়মিত সাধনার দ্বারা প্রকাশ করা কর্তব্য। আমাদের শাস্ত্রে তাই সংগীতকে 'গুরুমুখীবিদ্যা' বলা হয়েছে।

সংগীত রচনার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রভৃতি আলোচনার পূর্বে কবির সংগীত সৃষ্টির মুখ্য তালিকাটি দেওয়া হোল।

বিভিন্ন পর্য্যায়ের গান : কবি স্বয়ংই তাঁর গানগুলিকে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে, বিভিন্ন পর্য্যায়ে প্রকাশ করেছিলেন। যার অপরিবর্ত্তনীয় রূপ ও গান সংখ্যা হোল এইরূপ :—

গীতবিতান ঃ ১ম খণ্ড

পূজা পর্য্যায়ের গান—		৬১৬ টি
স্বদেশ	,,	৪৬ টি।

গীতবিতান ঃ ২য় খণ্ড

প্রেম পর্য্যায়ের গান		৩৯৫ টি।
প্রকৃতি	,,	৯ টি।
গ্রীষ্ম	,,	১৬ টি।
বর্ষা	,,	১১৫ টি।
শরৎ	,,	৩০ টি।
হেমন্ত	,,	৫ টি।
শীত	,,	১২ টি।
বসন্ত	,,	৯৬ টি।
বিচিত্র	,,	১৪০ টি।
আনুষ্ঠানিক	,,	২১ টি।

গীতবিতান ঃ ৩য় খণ্ড

কালমৃগয়া	(গীতিনাট্য)	
বাল্মীকি প্রতিভা	(ঐ)	
মায়ার খেলা	(ঐ)	
চিত্রাঙ্গদা	(নৃত্যনাট্য)	
চণ্ডালিকা	,,	
শ্যামা	,,	
ভানুসিংহের পদাবলী—		২০ টি।
নাট্য গীতি—		১০০ টি।
জাতীয় সংগীত—		১৬ টি।
পূজা ও প্রার্থনা—		৮০ টি।
আনুষ্ঠানিক সংগীত—		১৪ টি।
প্রেম ও প্রকৃতি	-	১০৭ টি।

পরিশিষ্ট ১ : মায়ার খেলা (পাঠান্তর সহযোগে)
,, ২ : পরিশোধ (শ্যামা) (,,)
,, ৩ : ... ... ১০ টি।
(এই গানগুলি প্রধানতঃ পাঠান্তর)
,, ৪ : ... ... ১২ টি।
,, ৫ : ... ... ৮ টি।

গ্রন্থ পরিচয় : পরিশিষ্ট তথা অন্যান্য নানা বিবরণ এই অংশে বিস্তারিত-রূপে আলোচনা করা হয়েছে। [১]

গান রচনার বিভিন্ন পদ্ধতি : জীবনস্মৃতিতে জানা যায় যে, কবি প্রথম জীবনে তাঁর জ্যোতিদাদার পিয়ানোর সুরে কথা বসিয়ে গান রচনা আরম্ভ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাব্যপ্রতিভা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই গান রচনাও আরম্ভ হয়।

সংগীত রচনায় তিনি বাংলার সকল শ্রেণীর, ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের এবং বিদেশের নানা সংগীত বৈশিষ্ট্যের মিলন সাধন করেছেন। চার থেকে আঠারো মাত্রার ছন্দ ও তাল এবং শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণী নিয়েই তাঁর অধিকাংশ গান লীলায়িত। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তীয় এবং নানাবিধ পাশ্চাত্য সুর, ছন্দ ও ভাবকেও তিনি বাদ দেননি এবং তাঁর স্বকিয়তা-গুণে সম্পূর্ণ নিজস্ব করে নিয়েছেন। এগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল এই যে, দেশী কিম্বা বিদেশী যে কোন গানের অনুকরণে বা অনুসরণে রচিত গানগুলির প্রত্যেকটিতেই Origin এবং Originality স্পষ্ট। তাঁর গানগুলি ছোটখাট সংযত ও সীমায়িত তান, অলংকার, মীড় প্রভৃতি নিয়ে রূপায়িত। অর্থাৎ সীমিত তান-অলংকারাদি তিনি প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু তা হিন্দুস্থানী গানের মতো স্বচ্ছন্দবিহারী নয়। হিন্দিভাঙা গানগুলিতে তিনি সামান্য পরিমাণে সুর বিস্তারেরও পক্ষপাতী ছিলেন, তবে জটিল তান বা বাট প্রভৃতির মোটেই পক্ষপাতি ছিলেন না। হিন্দুস্থানী গানে পুনরুক্তিকালে যেমন কথা ও সুরের অদল বদল করা হয়, সেই রীতি তিনি অনুমোদন করেননি। সীমার মাঝেই তিনি অসীমকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কারণ অন্তরের আবেদন সৃষ্টি করাই গানের উদ্দেশ্য, যা মানবচিত্তে আনে জাগরণ; এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি উল্লেখযোগ্য যা তাঁর

[১] গীতবিতান : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৌষ ১৩৫২

সম্পর্কেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য : "·· যে মানুষ গান বাঁধবে আর যে মানুষ গান গাইবে দুজনেই যদি সৃষ্টিকর্তা হয়, তবে তো রসের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম···"।

বলা বাহুল্য যে, তিনি নানাবিধ অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে যেমন অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন, তেমনি সংগীত শিল্পী হিসাবেও ছিলেন ক্ষমতাবান।

শ্রদ্ধেয় ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন রবীন্দ্রসংগীতে কতগুলি স্তরের বিকাশ পাওয়া যায়, যেমন :—১। খানদানী ঘরানার বন্দীশের আশ্রয়ে রচিত গান, ২। খানদানী কাঠামোতে সুর ও ছন্দের কিছুটা নতুনত্ব, ৩। লোক-সংগীতের (বাউল, ভাটিয়ালী, কীর্তন প্রভৃতি) উপকরণ অনুসরণে রচিত গান, ৪। চতুর্থ স্তরের গানগুলি সুসংগত নিয়মকানুন ও উদারতার ভাব সম্পন্ন। এছাড়াও নানাবিধ সুর ও ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা-মূলক বহু গান আছে যেগুলিকে বিবিধ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

সাধারণত গান রচনায় তিন রকম পদ্ধতি প্রচলিত, যেমন :—১। অন্যের কথায় সুরারোপ করা, ২। অন্যের সুরে কথা বসানো এবং ৩। কথা ও সুর দুই-ই রচনা করা। প্রথম পদ্ধতির গান খুব অল্পই পাওয়া যায়, যেমন বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদর', মন্ত্রে সুর যোজনা প্রভৃতি। তবে অপর দুটি পদ্ধতিতে তিনি অজস্র গান রচনা করেছেন। তৃতীয় পদ্ধতির গানগুলি আপনিই তার পরিচয় বহন করছে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে গান রচনাকালে তিনি মূল গানের কাব্য সম্পদের দীনতা, অসামঞ্জস্যতা বা অন্যান্য কারণে কোথাও মূল গানের আমূল পরিবর্তন করেছেন আবার কোথাও সম্পূর্ণ ভাবটিকে বজায় রেখেছেন। এই সৃষ্টির প্লাবনে তিনি ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, কীর্তন, লোকসংগীত এবং দেশী বিদেশী যেখানে যতরকম নতুন ও সুন্দর সুর শুনেছেন, তাকে বাংলা ভাষায় বেঁধে রেখেছেন। তবে এই কার্যে তিনি হিন্দি গানেই সর্বাধিক ব্যবহার করেছেন। কোন গানটি কোন হিন্দি গান থেকে রচিত সে বিষয়ে কিছু তথ্য এখানে সংকলন করা হোল :—

রবীন্দ্রসংগীত	মূলগান	রাগ	তাল
অশ্রুভরা বেদনা	তনমন ধন ভুয়	মিশ্র কাফী	ত্রিতাল
আঁখিজল মুছাইলে	জিন ছুঁযে মোরি	রামকলী	,,
আজি এ আনন্দসন্ধ্যা	বহুর বজাও বাঁশি	পূরবী	তেওরা
আজি বহিছে বসন্তপবন	আজু বহত বসন্ত পবন	বহার	,,
আজি মম জীবনে	অব পায়েল বাজেনু	আড়াণা	ত্রিতাল
আজি রাজ আসনে	প্যারী তোরে প'য়েল	বেহাগ	ধামার
আজি মোর দ্বারে	হোহো মোরে দ্বার	দেশ	পঞ্চমসওয়ারী
আনন্দ তুমি স্বামী	ওঁকার মহাদেব	ভৈরবী	সুরফাঁক
আনন্দ ধারা বহিছে	লাগি মোরী ঠুমক	মালকোষ	ত্রিতাল
আনন্দ রয়েছে জাগি	আজু রচো করতার	হমীর	চৌতাল
আমারে করো জীবনদান	ইয়া জগ ঝুটা	শংকরা	,,
আয়লো সজনী সবে মিলে	আজু মোরন বন	মল্লার	কাওয়ালী
একি সুন্দর শোভা	বাজোরে মন্দর বাজু	ইমনভূপালী	ত্রিতাল
এসো শরতের অমল	বাজে ঝনন ঝনন	জৌনপুরী	,,
এসেছে সকলে কত	বুঁদ পবন পুরবাই	হমীর	চৌতাল
ও কেন ভালবাসা	কৌন পরদেশী	পিলু	খেমটা
ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে	এরিমা সব অমুয়া	পরজবহার	ত্রিতাল
কামনা করি একান্তে	প্রথম কর সিঙ্গার	দেশকার	চৌতাল
কার মিলন চাও বিরহী	তনু মিলন দে পরবর	শ্রী	তেওরা
কে বসিলে আজি	বে পড়িয়া তাঁড়ে	সিন্ধু	মধ্যমান
কে রে ওই ডাকিছে	তারি ডফ বাজত	অড়ৈহা	ধামার
কোথা যে উধাও	বোলরে পপীহা	মিশ্রমল্লার	ত্রিতাল
কোথা হতে বাজে প্রেম	বাজরহি সখিয়ারে	সুরঠ	,,
গহন ঘন ছাইল	ইন্দ্র হুঁ কে অসবরী	গৌড়মল্লার	চৌতাল
ঘোর রজনী এ	বাজে ঝনমন মোরে	কানাড়া	ত্রিতাল
চিরদিবস নব মাধুরী	নবভুবন নব রাঘব	নটমল্লার	চৌতাল
জয় তব বিচিত্র আনন্দ	জয় প্রবল বেগবতী	বৃন্দাবনী সারং	তেওরা

রবীন্দ্রসংগীত	মূলগান	রাগ	তাল
ডাকি তোমারে কাতরে	তুহি ভজ ভজ রে	ইমনকল্যাণ	চৌতাল
ডাকে বার বার	মোহে কৈসে নিকি	কেদারা	ত্রিতাল
তব অমল পরশরস	তুয়া চরণকমল পর	আশাবরী	,,
তব প্রেম সুধারসে	কারি কারি কমরিয়া	পরজ	,,
তাঁহারে আরতি করে	জগজন ধ্যান করত	বড়হংসসারং	চৌতাল
তিমিরময় নিবিড় নিশা	প্রবলদল মেঘ	মেঘ	ঝাঁপতাল
তুমি আপনি জাগাও	জাগো মোহন প্যারে	ভৈরব	ত্রিতাল
তুমি জাগিছ কে	তুম নয়ন মে	গৌড়	চৌতাল
তোমাহীন কাটে দিবস	তুমবিন কৈসে	বাগেশ্রী	আড়াঠেকা
তোমারি মধুর রূপে	তোরা হি নৈন বান	ঝিঁঝিট	চৌতাল
দাঁড়াও মন অনন্ত	এরি অব আনন্দ	ভীমপলশ্রী	সুরফাঁক
দুখরাতে হে নাথ	রঙ্গ রাতি মাতিয়া	সরফর্দা	আড়াঠেকা
দেবাদিদেব মহাদেব	দেবনদেব মহাদেব	দেওগিরী	সুরফাঁক
নব আনন্দে জাগো	অধর ধর বনবাঁশরী	টোড়ী	ত্রিতাল
নয়নে ভাসিল জলে	পপীহা বোলরে	শ্যাম	একতাল
নাথ হে প্রেমপথে	বালমুরে চুনরিয়া	সুহাকানাড়া	ত্রিতাল
প্রচণ্ড গর্জনে আসিল	প্রচণ্ড গর্জন	ভূপালী	সুরফাঁক
প্রথম আদি তব শক্তি	প্রথম আদ শিবশক্তি	সোহনী	,,
প্রভাতে বিমল আনন্দে	নাদ নগর বসায়ে	গুর্জরীতোড়ী	চৌতাল
শূন্যহাতে ফিরি হে নাথ	ঝুমঝুম্ বরখে	কাফী	সুরফাঁক
সুমধুর শুনি আজি	কৌন পপৈন জগাও	শংকরাভরন	আড়াঠেকা
হৃদয় নন্দন বনে	উড়ত নন্দন নব	ললিতাগৌরী	ঝাঁপতাল

এইরূপ অনুকরণ ও অনুসরণাত্মক রীতিতে অজস্র গান রচনা করলেও দরবারী উচ্চাঙ্গ সংগীতকে তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, 'অলংকারের চাপে প্রাণের প্রতিমা সুর সরস্বতীর মূর্তিও ম্লান হয়'। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য :—

"...দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের পর সংগীতাচার্য সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গৃহে জলসার আয়োজন। সুলেখক সুপণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। সুগায়ক হিসাবে তখন তাঁর খ্যাতি ভারতবিদিত। সমস্ত অভ্যাগতগণ জলসায় নিমন্ত্রিত হয়েছেন। তান-বাট সরগম সহকারে রবীন্দ্রনাথের গান সাবেকি খেয়ালি চালে গাওয়া চলে না—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের মত। সেই মতের অভ্রান্ততার বিষয়ে পরীক্ষা হবে সেদিনের বৈঠকে। উৎসুক শ্রোতার আসর পরিপূর্ণ। প্রায় এক ঘণ্টাকাল ধরে সুরেন্দ্রনাথ দস্তুরমাফিক খেয়ালি চালে দুটি রবীন্দ্রসংগীত গাইলেন। 'আমার পরান যাহা চায়' এবং 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই'। সমগ্র জনতা আত্মহারা হয়ে সে দুটি গানের অপূর্ব সুরবিন্যাস শুনলেন।

গান শেষ হলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন: কেমন লাগল এখন? আনন্দোজ্জল মুখে রবীন্দ্রনাথ বললেন 'চমৎকার'। হাসিমুখে সুরেন্দ্রনাথ বললেন 'তবে'? রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন: 'প্রত্যেক গানের মজালিসে আপনি যদি খেয়ালি চালে আমার গান করেন, আমি খুশি হব সুরেন বাবু। কিন্তু সুরের তানের সঙ্গে গানের কল্পনার মিলন বজায় রেখে মাধুর্যের অবতারণা করতে পারে—আপনার মতো এমন সুর রসিক কজন আছে বলুন? সুরের অসুরদের হাতে পড়ে তানের চাপে আমার গান প্রাণ হারাবে এই আমার দুশ্চিন্তা "।

একথা আমরা অনেকে বুঝলেও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি না যে, রাগ-রাগিণীই সংগীতের প্রাণ হলেও কেবলমাত্র স্বর সমাবেশ নিয়েই রাগ-রাগিণী সার্থক নয়, তার পিছনে থাকা চাই একটা নির্দিষ্ট ভাব বা উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্পষ্ট :—"...রাগ-রাগিণীর উদ্দেশ্য কি ছিল? ভাব প্রকাশ ব্যতীত আর ত কিছু নয়। আমরা যখন কথা কহি তখনই সুরের উচ্চ-নীচতা ও কণ্ঠস্বরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা থাকে। কিন্তু তাহাতে ভাব প্রকাশ অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ...সুতরাং সংগীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র...।" অর্থাৎ মনোভাব প্রকাশ এবং রসোৎপাদনই সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, তাই তিনি আবার বলেছেন :—

"...সংগীত কৌশল প্রকাশের স্থান নহে, ভাব প্রকাশের স্থান। যতখানি ভাবপ্রকাশে সাহায্য করে ততখানিই সংগীতের অন্তর্গত, যাহা কিছু কৌশল

প্রকাশ করে তাহা সংগীত নহে, তাহার অন্য নাম…"। যাবতীয় রবীন্দ্র-সংগীতে যে এই মনোভাবের স্পষ্ট প্রতিফলন আছে সেকথা বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথ রচিত ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি অঙ্গের কয়েকটি করে গান অতঃপর উল্লেখ করা হোল ঃ—

ধ্রুপদ অঙ্গের গান ঃ

আজি হেরি সংসার অমৃতময়	…	বিলাবল	চৌতাল
এখনো আধার রয়েছে হে নাথ	…	আশাবরী	,,
কেমনে ফিরিয়া যাও	…	ভৈরবী	,,
ডুবি অমৃত পাথারে	…	ললিত	,,
আনন্দ তুমি স্বামী	…	ভৈরবী	সুরফাঁক
প্রথম আদি তব শক্তি	…	সোহনী	,,
প্রচণ্ড গর্জনে আসিল	…	ভূপালী	,,
দাড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড	…	ভীমপল্লশ্রী	,,
দেবাদিদেব মহাদেব	…	দেবগিরি	,,
শুভ্র আসনে বিরাজো	…	ভৈরব	আড়াচৌতাল
সব আনন্দ করো	…	দেবগিরি	,,
মহারাজ একি সাজে	…	বেহাগ	ঝাঁপতাল
হৃদয় নন্দন বনে	…	ললিতাগৌরী	,,
দাঁড়াও আমার আঁখির আগে	…	বেহাগ	তেওরা
বিপুল তরঙ্গ রে	…	ভীমপলশ্রী	,,

ধামার অঙ্গের গান ঃ

আজি রাজ আসনে তোমারে	…	বেহাগ	ধামার
গরব মম হরেছ প্রভু	…	দেশ	,,
হৃদি মন্দির দ্বারে বাজে	…	কেদারা	,,
মম অঙ্গনে স্বামী	…	বেহাগ	,,
কে রে ওই ডাকিছে	…	অলৈহাবিলাবল	,,

খেয়াল অঙ্গের গান ঃ

ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে	…	পরজবহার	ত্রিতাল

কার বাঁশি নিশিভোরে	...	গান্ধারী	ত্রিতাল
কোথা হতে বাজে	...	সুরট	,,
তারো তারো হরি, দীনজনে	...	কাফী	,,
মন্দিরে মম কে	...	আড়াণা	একতাল
মোরে বারে বারে	...	নটমল্লার	
শীতল তব পদছায়া	...	ইমনকল্যাণ	

টপ্পা অঙ্গের গান ঃ

এ পরবাসে রবে কে	...	সিন্ধু	মধ্যমান
কে বসিলে আজি	...	সিন্ধু	,,
পিপাসা হায় নাহি	..	ভৈরবী	ত্রিতাল

ঠুংরী অঙ্গের গান ঃ রবীন্দ্রসংগীতে ঠুংরী গানের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভেদ অনাবশ্যক মনে হয়, কারণ ঠুংরীগানের অনুসরণে কিছু গান রচনা করলেও, তেমন চটুল ও শৃঙ্গার রসাত্মক গান তিনি রচনা করেন নি। তবু ঠুংরীর মেজাজে রচিত কয়েকটি গানের উল্লেখ এখানে করা হোল :—

কি সুর বাজে আমার প্রাণে	...	পিলুবরবা	ত্রিতাল
তুমি কিছু দিয়ে যাও	...	মিশ্র	,,
আমার একটি কথা	...	ভৈরবী	দাদরা
এরা পরকে আপন করে	...	পিলুবরবা	খেমটা

বাংলার লোকসংগীত ও কীর্তন গানের প্রভাব ঃ রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানেই যে বাংলার লোকসংগীতের প্রভাব অত্যন্ত বেশী, সেকথা আজ অনেকেই জানেন। যাবতীয় লোকসংগীতের মধ্যে আবার কীর্তন ও বাউলের প্রভাবই সর্বাধিক। কবি যে কীর্তন গান অত্যন্ত ভালবাসতেন, সেকথা তাঁর উক্তিতে স্পষ্ট বোঝা যায় :— "...কীর্তন গান আমি অনেককাল থেকেই ভালবাসি। ওর মধ্যে ভাব প্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে, সে আর কোন সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানি নে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফুলে ফলে পল্লবে সংগীতের আকাশে স্বকিয় মহিমা অধিকার করেছে। কীর্তন সংগীতে বাঙালির এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি। ...কখনো কখনো কীর্তনে ভৈরো প্রভৃতি ভোরের সুরেরও আভাস লাগে, কিন্তু তার মেজাজ গেছে বদলে।

রাগ-রাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক। আমি কল্পনা করতে পারিনে, হিন্দুস্থানী গাইয়ে কীর্তন গাইছে। এখানে বাঙালির কণ্ঠ ও ভাবাদ্রতার দরকার করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কি বলা যায় না যে, এতে সুর সমবায়ের পদ্ধতি হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সীমা লঙ্ঘন করে না? অর্থাৎ য়ুরোপীয় সংগীতের সুর পর্যায় যেরকম একান্ত বিদেশী, কীর্তন তো তা নয়। ওর রাগ-রাগিণীগুলিকে বিশেষ নাম দিয়ে হিন্দুস্থানী সংগীতের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে উপদ্রব করা হয় না, কিন্তু ওর প্রাণ, ওর গতি, ওর ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র··"।

শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমারের সঙ্গে আলোচনাকালে কবি কীর্তন সম্পর্কে আরো বলেছেন: "···বাঙলায় রাধাকৃষ্ণের লীলাগান হিন্দুস্থানী গানের প্রবল অভিযানকে ঠেকিয়ে দিলে। এই লীলারসের আশ্রয় একটি উপাখ্যান। সেই উপাখ্যানের ধারাটিকে নিয়ে কীতন গান হয়ে উঠল পালাগান···"।

"···কীর্তন হচ্ছে রত্নমালা রূপসীর গলায়। যে জন রসিক, প্রত্যেক রত্নটিকে প্রিয়কণ্ঠে স্বতন্ত্র করে সে দেখতে পায় না দেখতে চায় না। রত্নগুলিকে আত্মসাৎ করে যে সমগ্র রূপটি নানাভাবে হিল্লোলিত সেইটি তার দেখবার বিষয়··"।

"···বাঙলাদেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যবার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না। সে বন্ধন হোক না সোনার, বাদশাহি হাটে তার দাম যত উঁচুই হোক। অথচ হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীর উপাদান সে বর্জন করে নি। সে সমস্ত নিয়েই সে আপন নূতন সংগীতলোক সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করতে হলে চিত্তের বেগ এমনিই প্রলয়রূপে সত্য হওয়া চাই···"।

কবিগুরুর কাছে কীর্তন গান পেলো অসীম মর্যাদা। প্রথম দিকে তিনি আখরযুক্ত কীর্তন গান রচনা করেছেন। কীর্তনগানে তাঁর প্রাণের আবেগ ও সুরের করুণ আবেদন কেমন ছিল, যাঁরা তাঁর নিজকণ্ঠে গান শুনেছেন তাঁরাই জানেন। তিনি তাঁর কোকিল বিনিন্দিত কণ্ঠে 'ওহে জীবন বল্লভ' গানখানি গাইবার সময়ে এইরূপে আখর যোজনা করেছেন—

ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধন দুর্লভ,
আমি মর্মের কথা, অন্তর-ব্যথা কিছু নাহি কব
শুধু জীবন মন চরণে দিনু, বুঝিয়া লহ সব॥

আখর :—(ক) দিনু চরণ তলে—
(খ) কথা যা ছিল, দিনু চরণ তলে—
(গ) প্রাণের বোঝা বুঝে লও, দিনু চরণ তলে।

এইরূপ আখরযুক্ত কয়েকটি গান হোল :—

ক) আমি জেনেশুনে তবু ভুলে আছি
খ) কে জানিত তুমি ডাকিবে আমায়
গ) তুমি কাছে নাই বলে
ঘ) মাঝে মাঝে তব দেখা পাই

কীর্তন সুরের প্রভাব তাঁর বহু গানে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে তিনি আখরহীন গানই বেশী রচনা করেছেন, কিন্তু এই আখরের ভাবটিকে তিনি নানা ভাবে প্রয়োগ করেছেন। যেমন, "জয় হে, জয় হে জয় হে," "এসো হে, এসো হে, এসো হে," "না না না" ইত্যাদি।

তাঁর আখরহীন গানগুলিতে চারটি অংশ এবং তদনুযায়ী সুরের ভাগ দেখা যায়। এগুলি কীর্তন ভাবাপন্ন হলেও সম্পূর্ণ নতুন রূপে রূপায়িত :—

ক) আজি প্রণমি তোমারে
খ) আমার না বলা বাণীর
গ) আমি যখন ছিলেন অন্ধ
ঘ) এই তো তোমার প্রেম ওগো
ঙ) আমার মন মানে না
চ) তোমরা যা বলো তাই বলো
ছ) না চাহিলে যারে পাওয়া যায়
জ) আমার নাই বা হোল পারে যাওয়া
ঝ) আমার মন যখন জাগলি না রে
ঞ) তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া
ট) ভেঙে মোর ঘরের চাবি
ঠ) ছি ছি চোখের জলে

রবীন্দ্রনাথ খুব অল্প সংখ্যক গানে ভাটিয়ালি, সারি প্রভৃতি গানের সুর প্রয়োগ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করা হোল :—

ভাটিয়ালি : ক) গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ

সারি গান : ক) এবার তোর মরা গাঙে

খ) তোমার খোলা হাওয়া

বাউল গানের প্রভাব : পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, আনুষ্ঠানিক এবং বিশেষ করে স্বদেশ পর্যায়ের গানে বাউল সুরের প্রভাব অত্যন্ত বেশী পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহতে থাকাকালীন, পদ্মানদী ও গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ও হৃদ্যতা ঘটে। সেইখানে তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত বাউল লালন ফকিরের সখ্যতা হয়। যার সুফল তাঁর নানা কাব্য সাহিত্য ও সংগীতে প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কবির উক্তি উল্লেখযোগ্য : "...আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাত ও আলাপ আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীর সঙ্গে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হ'য়ে মিশে গেছে। এমন বাউল গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলেনা। তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি কাব্য রচনা, তেমনি ভক্তি রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে..."।

লালন ফকিরের গাওয়া "আমি কোথায় পাব তারে", "হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে" প্রভৃতি গানের অনুকরণ ও অনুসরণে তিনি বহু গান রচনা করেছেন, যার কয়েকটি এখানে দেওয়া হোল :—

(ক) আমার সোনার বাংলা= মূল: আমি কোথায় পাব তারে

(খ) যদি তোর ডাক শুনে কেউ= মূল: হরিনাম দিয়ে জগত মাতায়

(গ) যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক= মূল: মন-মাঝি সামলে সামলে

রামপ্রসাদী সুরের প্রভাব : সাধক রামপ্রসাদ সেন যে বিশেষ ঢঙে সুর সৃষ্টি করে অজস্র গান রচনা করেছেন, সেই গায়ন রীতিতে আকৃষ্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই সুরেও কিছু গান রচনা করেছেন, যেমন :—

ক) আমরা মিলেছি আজ

খ) আমিই শুধু রইনু বাকি

গ) এবার তোরা মা বলিয়া ডাক

ঘ) শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা

বিভিন্ন প্রাদেশিক সুরের প্রভাব: ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের আঞ্চলিক সুরের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ যে সকল গান রচনা করেছেন তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হোল :—

বম্বে থাকাকালীন কারওয়ার বন্দরের কানাড়ি ভাষার গান ভেঙে কয়েকটি গান রচনা করেন। যেমন :—

ক) সখি বা বা—বড়ো আশা করে এসেছি

খ) পূর্ণ চন্দ্রাসনে—আজি শুভদিনে

গ) চারিবর্ষা পর্যন্ত—সকাতরে ওই কাঁদিছে

গুজরাটি ভাষার গান ভেঙে রচনা করেছেন :—

ক) একি অন্ধকার এ ভারত ভূমি

খ) নমি নমি ভারতী

গ) যাও রে অনন্ত ধামে

পাঞ্জাবী শিখভজন ভেঙে রচনা করেছেন :—

ক) বাদৈ বাদৈ রম্যবীণা—বাজে বাজে রম্য বীণা

খ) গগনমে থাল বণি—গগনের থালে রবি

শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ ভারতীয় ছাত্রী, সুগায়িকা সাবিত্রী দেবীর গাওয়া কয়েকটি কর্ণাটক গান শুনে সেই সুরের অনুসরণে কয়েকখানি গান রচনা করেন—

ক) নীলাঞ্জন ছায়া

খ) বাজে করুণ সুরে

গ) বাসন্তী হে ভুবন মোহিনী

ঘ) বেদনা কি ভাষায় রে

সিংহলের ক্যাণ্ডি-নাচের তাল ও বোলের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে রচনা করেছেন—

ক) যে আমারে এনেছে এই

বিদেশী সুরের প্রভাবঃ প্রথম জীবনে শিক্ষা-দীক্ষার জন্য যখন বিলাতে ছিলেন, তখন অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীত সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর প্রথম দিককার সংগীত রচনায় তাই বিলাতী সুরের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। বিশেষ করে 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' প্রভৃতি গীতিনাট্যে। মূল গান সহ এখানে তার কয়েকটির পরিচয় দেওয়া হোল—

ক) **Nancy Lee**···কালী কালী বলো রে আজ

খ) **Ye banks and braes** · ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে

গ) **Robin Adair**......সকলি ফুরালো স্বপন প্রায়

ঘ) **Go where glory waits thee** · *i)* মানা না মানিলি
ii) মরি ও কাহার বাছা
iii) ওহে দয়াময়, নিখিল-আশ্রয়
iv) আহা আজি এ বসন্তে

ঙ) **The British Grenadiers**·· ...ও ভাই দেখে যা

চ) **The Vicar of Bray**............ও দেখবি রে ভাই

ছ) **Auld Lang Syne**...............পুরানো সেই দিনের কথা

জ) **Drink to me only**............কতবার ভেবেছিনু[1]

Nancy Lee একটি ইংরাজি গান, এতে একজন নাবিক তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর গুণগান করেছেন। বিখ্যাত Thomas Moore রচিত Go where glory breas গানখানি আইরিশ এবং Ye banks and braes গানখানি স্কচ দেশীয়।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে আরো বহু গানে পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব লক্ষিত হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো পাশ্চাত্য সুরে গা-ভাসিয়ে দেননি। তাঁর স্বকিয়তার গুণে এগুলিকে একেবারে আপন করে নিয়েছেন। বলা বাহুল্য, তাঁর যাবতীয় সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যই হোল স্বদেশী ভিত্তির উপরে মৌলিকতা স্থাপন করা। বিলাতি কোরাস গানের কলির শেষে যেমন ধুয়া ধরার রীতি আছে তাকেও তিনি নানাগানে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। তবে পাশ্চাত্য হার্মনি'কে তিনি তাঁর আত্মীয়দের ব্যবহার করায় উৎসাহ দিলেও নিজে কোথাও প্রয়োগ করেন নি।

১। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী : রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগম। ১০ পৌষ, ১৩৬১।

দেশাত্মবোধক বা স্বদেশী গানঃ স্বদেশী বা দেশাত্মবোধক গানের প্রধান উদ্দেশ্য জনসাধারণের অন্তরে দেশাত্মবোধ, নির্ভিকতা, আত্মনির্ভরতা, পৌরুষের তেজ ইত্যাদি উদবুদ্ধ করা। কারণ আত্মশক্তির উপরে অবিশ্বাস করে নিজেকে অসহায় ভাবাই সবচেয়ে বড়ো পরাধীনতা। তাই এই গানগুলি উদ্দীপক এবং উল্লাসের ভাবাপন্ন হয়।

স্বদেশী গান রচনা করার প্রচেষ্টা সবপ্রথম ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে হয়। সেই সময় দেশবাসীর মনে আপন শক্তি ও সংস্কৃতির প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাব তৎকালীন অনেক মনীষীকে চিন্তিত করে তোলে, এবং ফলস্বরূপ হিন্দু-মেলার উৎপত্তি হয়। হিন্দুমেলার আন্দোলনের যুগে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'জয় ভারতের জয়' গানখানিই সম্ভবত সর্বপ্রথম জোরালো বা স্বদেশী গান। বিখ্যাত গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তী খমাজ রাগে গানখানিতে স্বরারোপ করেন। তেজ বা উত্তেজনার ভাব ফোটানোর জন্য কাটাকাটা পদ্ধতিতে স্বরারোপ করা হয়। এই হিন্দুমেলার উদ্যোগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'জাতীয় সংগীত' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়, যাতে কবির দাদাদের এবং আরো অনেকের রচিত দেশাত্মবোধক গান প্রকাশিত হয়। হিন্দুমেলার প্রভাব এবং সঞ্জীবনী সভার আবহাওয়ায় অল্পবয়সেই রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গান ও কবিতা রচনা করেন। তখন থেকেই তাঁর রচনায় পৌরুষের তেজ, আত্মনির্ভরতা, জীবনপণের দৃঢ়তা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। সেই সময়ে, তৎ-কালীন বিখ্যাত 'একই সূত্রে বাঁধা আছি' গানখানির রচনা, কবির জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বাংলাদেশে দেশাত্মবোধক গান রচনার প্লাবন আসে। স্বদেশীগান রচনার সেটি একটি প্রধান অধ্যায়। সেই সময়ে কবি বহু গান রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গানগুলিতে স্বাদেশীকতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখা যায়। দেশ বন্দনার অজস্রতা, তাঁর মতো আর কারো পক্ষে প্রদর্শন করা সম্ভব হয় নি। এই গানগুলির আর একটি বৈশিষ্ট হোল, এগুলি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে রচিত হলেও, সর্বকালের জন-জাগ-রনের গান হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

শ্রেণীভাগঃ রবীন্দ্রনাথ রচিত দেশাত্মবোধক গানগুলিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে, পরে এবং আন্দোলনের সময়ে এই তিন শ্রেণীভাগ

করা যায়। প্রথম শ্রেণীর গানগুলি প্রায়ই রাগ সংগীতের ভিত্তিতে রচিত, যেমন :—

ক) ভারত রে তোর কলংকিত

খ) একই সূত্রে বাঁধা আছি

গ) অয়ি বিষাদিনী বীণা

ঘ) তোমারি তরে মা সঁপিনু

ঙ) একি অন্ধকার এ ভারতভূমি

চ) তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ

দ্বিতীয় শ্রেণীর গানগুলি প্রায় সবই কীর্তন ও বাউল সুরের প্রভাবে প্রভাবিত। যেমন :—

ক) আমার সোনার বাংলা

খ) এবার তোর মরা গাঙে

গ) আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে

ঘ) বাংলার মাটি বাংলার জল

ঙ) যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক

চ) যদি তোর ডাক শুনে কেউ

তৃতীয় শ্রেণীর গানগুলির কথা ও সুরে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, যেমন—

ক) জনগনমন অধিনায়ক জয় হে

খ) দেশ দেশ নন্দিত করি

গ) হে মোর চিত্ত পূন্য তীর্থে

ঘ) আমাদের যাত্রা হোল সুরু

ঙ) সংকোচের বিহ্বলতা

চ) আমরা সবাই রাজা

রবীন্দ্রনাথ রচিত দেশাত্মবোধক গানগুলির ৪৬টি 'গীতবিতান' ১ম খণ্ডে এবং অবশিষ্ট গানগুলি ৩য় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

অনেকের ধারণা, স্বদেশী গান মাত্রেই March Song এর মতো জোরালো ভাবাপন্ন হওয়া উচিত। অবশ্য রবীন্দ্র রচনায়, তেমন গানের অভাব নেই, কিন্তু এইরূপ মনোভাব নিয়ে তাঁর গান বিচার করা অনুচিত। কারণ দেশাত্মবোধক গানের প্রধান উপকরণগুলি তাঁর গানে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।

সর্বোপরি, এই গানগুলির কথা, সুর ও ছন্দ এমন সহজ সরল হওয়া উচিত যে, অধিকাংশ জনসাধারণের কাছে তা গ্রহণীয় হয়। সেদিক থেকে যে কবির গানগুলি সম্পূর্ণ সার্থক, তা আজ সর্বজন সমর্থিত।

জোরালো গান ঃ অনেকের মতো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও নাকি মনে করতেন যে, গান জোরালো ভাবটি আমরা বিলাতি সুর থেকে পেয়েছি। যদিও পরবর্তীকালে তিনি মত-বদল করেছিলেন। কারণ ভারতীয় সংগীতে এমন সম্পদ আছে যা চিরকালের সংগীত প্রেমীদের তৃপ্ত করতে পারে। আমাদের ধ্রুপদ গানে যে 'চার-বাণী' অর্থাৎ চার প্রকার গীত রীতির প্রচলন ছিল, তার খন্ডার ও নওহারবাণীর গায়ন পদ্ধতি পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় যে, সেখানে বীর রসাত্মক সংগীতের অভাব নেই। রবীন্দ্রনাথ রচিত দেশাত্মবোধক বা জোরালো গানগুলি বিশ্লেষণ করলে প্রাচীন সেই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষিত হয়, যা স্রষ্টা হিসাবে তাঁর অসাধারণত্ব প্রমাণ করে। তবে একথা হয়তো বা মিথ্যা নয় যে, গানের মাধ্যমে উল্লাস বা উদ্দীপনা প্রকাশ বা সৃষ্টি করবার ভাবটি আমরা বিলাতী গান শুনেই জেনেছি।

যদিও ধ্রুপদ গায়কেরা স্বীকার করেন যে, গানের মর্যাদা কথা ও সুরের মিলিত রূপের প্রাপ্য, কিন্তু হিন্দি জোরালো গানে কথার মর্যাদা তো দেওয়া হয়ই না, এমনকি স্বর-সংগতিরও যথেষ্ট অভাব লক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য জোরালো গানেও ভাষার মর্যাদার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে কথার মর্যাদাকে কখনোই খর্ব করেন নি। প্রাচীন সংগীতে তেজ ও বলিষ্ঠতা রক্ষার্থে সর্বদা বিষম মাত্রার ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ত্রিতাল, দাদরা প্রভৃতি তালে কোন জোরালো গান পাওয়া যায় না। কবি এই বিষয়েও তাঁর সৃষ্টি শক্তির অসাধারণত্ব প্রদর্শন করেছেন। তিনি অনেক জোরালো গান দাদরা, কাহারবা, ত্রিতাল প্রভৃতি ছন্দে রচনা করেছেন। যদিও এই সকল গানের নানা বৈচিত্র্য অল্পকথায় প্রকাশ করা অসম্ভব, তবু কয়েকটি জোরালো গানের উল্লেখ রাগ ও তালসহ করা হোল :—

ক) ওই মহামানব আসে—ভৈরব—কাহারবা

খ) ওই বুঝি কালবৈশাখী—ভূপালী— ,,

গ) আমরা নূতন যৌবনেরি দূত—খম্বাজ—দাদরা

ঘ) আয়রে তবে মাতরে সবে—বহার—কাহারবা

ঙ) থরবায়ু বয় বেগে—কল্যাণ ,,

হাসির গান ঃ বাংলার লোকসংগীতে হাসির গানের প্রচলন প্রাচীনকাল থেকেই আছে। তবে সেই সকল গান অধিকাংশই ছিল কুরুচিপূর্ণ। প্রাচীন তর্জাগান, কবিগান প্রভৃতিকে হাসির গান বলা যায়। যাতে রসিকতা, গাল-মন্দ প্রভৃতির আধিক্য ছিল, কিন্তু তা সত্যেও সেই গানের জন্য শ্রোতারা খুব উৎসাহী ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে আর একপ্রকার হাসির গানের উদ্ভব হয়। সেই সকল গানে নানা সামাজিক কুপ্রথা বা কুসংস্কার, নতুন শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতির প্রতি কটাক্ষ ও বিদ্রুপ প্রকাশ পেত। রূপচাঁদ, ধীরাজ, প্যারী মোহন প্রভৃতি সেই গানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। পরবর্তীকালে সুকুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ হাসির গান রচনায় যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হাসির গান রচনায় বিলাতি সুর গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ হাসির গান রচনায়ও অতীতের সকলকে ছাড়িয়ে তার অসাধারণ ও অভূতপূর্ব সৃজনীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ছোটবেলায় রচিত 'বাল্মীকি প্রতিভা'র দস্যুদের হাসির 'হঃ হাঃ হাঃ হাঃ', কান্নার 'উঃ উঃ' প্রভৃতি গানের সুর এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে তাঁর রচিত হাসির গানগুলি আরো উচ্চস্তরের হয়। শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "...সমালোচকের ভাষায় বলা চলে এ সুমার্জিত রুচিসম্পন্ন, এর উপভোগ বুদ্ধিগম্য ও শিক্ষা-দীক্ষা সাপেক্ষ। সে কৌতুকে মুখ হাসে না মন হাসে। শব্দ বিন্যাসের কৌশলে ভাবের অসংগতি অবলম্বনে শাণিত হয়েছে অথচ পূত-রঙ্গে ও ব্যঞ্জনার দ্বারা হাস্য রসের সৃষ্টি করেছেন।"...

রবীন্দ্রনাথ রচিত কয়েকটি হাসির গানের উল্লেখ এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ করা হোল :—

ক) আমরা লক্ষীছাড়ার দল

খ) আমাদের পাকবে না চুল

গ) আমরা না গান গাওয়ার দল

ঘ) কাঁটাবন বিহারিণী সুরকানা দেবী

ঙ) পায়ে পড়ি শোন ভাই গাইয়ে

চ) ভালো মানুষ নইরে মোরা

অধিকাংশ হাসির গানেই কবি লোকসংগীতের সুর ব্যবহার করেছেন। এবিষয়ে তিনি বিলাতি সুরের পক্ষপাতি ছিলেন না।

ভানুসিংহের পদাবলী : ভাষার যাদুকর রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে কেমনভাবে মধ্যযুগ প্রভাবিত আধুনিককাল অতিক্রম করে প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের প্রতি তার অগাধ অনুরাগ প্রদর্শন করেছেন, তা এক বিস্ময়ের বিষয়। প্রাচীন ভারতের সেই ভাবধারা যেন কল্পলোকের সম্পদ, যা মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর সৃষ্টি 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কালমৃগয়া', 'কর্ণকুন্তীসংবাদ', 'উর্বশী', 'কুমার সম্ভবের গান', 'পূজারিণী', 'অভিসার' প্রভৃতিতে। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতিও যে তাঁর নিবিড় আকর্ষণ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্ট 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে।

মাত্র ষোল বছর বয়সে কবি এটি রচনা করেন। এর ছদ্মনামটি নির্বাচনেও তিনি তাঁর অসাধারণত্ব প্রদর্শন করেছেন। কারণ নামটি তার নিজের নামেরই অর্থবোধক প্রতিশব্দ। এটির রচনা সম্পর্কিত ঘটনাবলী কবির ভাষাতেই বর্ণনা করা হোল :—

"...শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়িতাম। তাহার মৈথিলী-মিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল, কিন্তু সেইজন্যই এত অধ্যাবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিলাম। গাছের বীজের মধ্যে যে অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতুহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল; আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি-আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

ইতিপূর্বে অক্ষয়বাবুর কাছে ইংরাজ বালক কবি চ্যাটার্টনের বিবরণ

শুনিয়াছিলাম। তাঁহার কাব্য যে কিরূপ তাহা জানিতাম না, বোধকরি অক্ষয়-বাবুও বিশেষ কিছু জানিতেন না, এবং জানিলে বোধ হয় রসভঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহার গল্পটার মধ্যে যে একটা নাটকিয়ানা ছিল সে আমার কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল। চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে, অনেকেই তাহা ধরিতে পারে নাই। অবশেষে ষোল বছর বয়সে এই হতভাগ্য বালক আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিলেন। আপাতত ওই আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম। একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে, সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে'। লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম। তখনই এমন লোককে পড়িয় শুনাইলাম বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল 'বেশ তো, এতো বেশ হইয়াছে।'

পূর্বলিখিত আমার বন্ধুটিকে একদিন বলিলাম 'সমাজের লাইব্রেরী খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ নামক কোন প্রাচীন কবির পদ কপি করিয়া আনিয়াছি।' এই বলিয়া তাঁহাকে কবিতাগুলি শুনাইলাম। শুনিয়া তিনি বিষম বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন 'এ পুঁথি আমার নিতান্তই চাই, এমন কবিতা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না, আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ছাপিবার জন্ত ইহা অক্ষয়বাবুকে দিব'। তখন আমার খাতা দেখাইয়া প্রমাণ করিয়া দিলাম, এ লেখা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়া নিশ্চয় বাহির হইতে পারে না; কারণ এ আমার লেখা। বন্ধু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, 'নিতান্ত মন্দ হয় নাই'।

ভানুসিংহ যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল, ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন জার্মানীতে ছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ভানুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্তারূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন কোন আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন . ...।"

ভানুসিংহের পদাবলীতে মোট বাইশটি পদ আছে, এগুলি গীতবিতান ৩য় খণ্ডে সংকলিত। এর মধ্যে নয়টি পদের সংগীতলিপি স্বরবিতান একবিংশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট পদগুলির অধিকাংশের সুর সম্ভবত আর কোন কালে পাওয়া যাবে না।

'ভানুসিংহের পদাবলী'র রচনাকাল সম্বন্ধে গীতবিতানে'র গ্রন্থপরিচয়ে উল্লেখ আছে: "বাংলা ১২৯১ সালে প্রথম প্রকাশকালে একুশটি রচনা ছিল। আর একটি ভানুসিংহের পদ (কোতুঁহুঁ বোলিবি মোয়) ১২৯২ সালের 'প্রচার' মাসিকপত্রে এবং পরে 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়। বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের অনুসরণে প্রাচীন ব্রজবুলিতে এই গান বা কবিতাগুলির রচনা পুরাতন হইলেও, ইহার মধ্যে অনেকগুলি কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতী'তেও প্রকাশ পায়।

বলা বাহুল্য, এই পদগুলি খণ্ড খণ্ড রূপে এই পদাবলীতে সংকলিত, একে একটি নাট্যরূপ দেবার অথবা একে একটি অখণ্ড নাট্যের মালা হিসাবে মনে করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই।

মন্ত্রগান: আর্য ঋষিগণ বলেছেন যে, 'নাদই পরমব্রহ্ম', কারণ পৃথিবীর জল-স্থল-নভতলের যাবতীয় নির্জীব ও সজীবের উৎপত্তি 'নাদ' থেকেই হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির অনাদিকালের রাগিণীতে চন্দ্র সূর্য, গ্রহ তারা, আকাশ বাতাস, পাখির কাকলি, ঝর্ণার কলরোল, সমুদ্রের গর্জন প্রভৃতি সকলেই একটা না একটা সুর যোগ করে চলেছে। বেদ উপনিষদের উচ্চারণরীতিও তাই ছিল সুর সহযোগে। প্রাচীনকালে এগুলি কেমন সুরে আবৃত্তি করা হোত তা আজ আর জানা সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন তীর্থ ক্ষেত্রের পরম্পরাগত পূজারীদের কণ্ঠে এগুলি উচ্চারণের অপভ্রংশ রূপের আভাস এখনও পাওয়া যায়।

সুরের রাজ্যে বিচরণের ক্ষমতা যে, কবির কত সহজ সরল ও অসাধারণ ছিল, সংস্কৃত শ্লোকগুলিতে সুর সংযোজনায় তার আর একটি প্রমান পাওয়া যায়। বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রের পূজারীরা যেমন কয়েকটি মাত্র স্বর সহযোগে নানা শ্লোক আবৃত্তি করে থাকেন। প্রথমে রবীন্দ্রনাথও সেই প্রথা অনুসরণ করেন। তবে তাঁর মন্ত্রগানগুলি অনেকটা রাগালাপের মতো। তালের প্রাধান্য না দিয়ে, হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরোচ্চারনের নিয়মে ছন্দ বজায় রেখেই সাধারণত এগুলির

স্বরারোপ করা হয়েছে। কোন কোন শ্লোকে বিলাতি চার্চ সংগীতের আভাসও পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এগুলিতে নানা সুর-বৈচিত্র্যের প্রকাশ পায়।

সামাজিক উপাসনার প্রয়োজনেই প্রথমে তিনি বেদমন্ত্রে সুরারোপ করেন। তবে সংস্কৃত শ্লোক সম্পর্কে তাঁর আকর্ষণ উপনয়নের পর থেকেই বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে তিনি জীবনস্মৃতিতে বলেছেন: "...নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে ওই মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে-বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা-বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া।..."

সুর সংযোজনায় তিনি সর্বদাই রাগসংগীতের সাহায্য নিয়েছেন, কিন্তু তাই বলে এগুলির নিজস্ব গতির স্বাধীনতা কখনো খর্ব করেন নি। প্রথমে যে বেদমন্ত্রগুলিতে সুরারোপ করেন সেগুলি হোল :—

ক) তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ)
খ) শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ (ঋগ্বেদ)
গ) যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ণ ,,
ঘ) য আত্মদা বলদা ,,
ঙ) অচ্ছা বদ তবসং ,,
চ) সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বম্ ,,
ছ) উষো বাজেণ বাজিনি ,,

'তপতী' রচনাকালে, নাটকের অন্তর্ভুক্ত চারটি বেদমন্ত্রে তিনি সুরারোপ করেন :—

ক) উদুত্যং জাতবেদসম্ (ঋগ্বেদ)
খ) বায়ুরনিলমমৃত মথেদম্ ,,
গ) অত্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য ,,
ঘ) পৃথিবীঃ শান্তিরন্তরিক্ষম্ ,,

এছাড়া 'চণ্ডালিকা' ও 'নটীর পূজা' নৃত্য নাট্যের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বৌদ্ধ মন্ত্রেও তিনি সুরারোপ করেছেন :—

ক) ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে (নটীর পূজা)

খ) উত্তমঙ্গেন বন্দেহং ,,

গ) নত্থিমে শবনং ,,

ঘ) নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায় (নটীরপূজা ও চণ্ডালিকা)

ঙ) বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণা মহান্নবো (চণ্ডালিকা)

শেষোক্ত মন্ত্রগানগুলিতে আগেরগুলির মতো ধীর ও গাম্ভীর্যভাবের চেয়ে আবেগময় কোমল ও করুণতাই বেশী ফুটে উঠেছে। বুদ্ধের বন্দনা হিসাবে এগুলির সুর অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী হয়েছে। বেদের বিখ্যাত উষার স্তবটিতে তিনি সর্বশেষ সুরারোপ করেছেন।

রাগসংগীতের প্রভাব : রবীন্দ্রসংগীতে রাগসংগীত প্রভাবের তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত। ভারতীয় রাগসংগীতের সঙ্গে বিশ্ব প্রকৃতির যে একটা ঘনিষ্ট যোগ আছে, সেকথা তিনি নানা স্থানে উল্লেখ করেছেন। এই উপলব্ধির উৎস জানতে হলে কিছুটা অতীতের পুনরাবৃত্তি আবশ্যক।

মুঘল বাদশাহের দরবারী সংগীতগুণীদের বংশধরেরা মধ্যযুগের শেষভাগে নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েন। এঁদের মধ্যে তানসেন বংশীয় ধ্রুপদীয়া বাহাদুর খাঁ এবং পাখোয়াজী পীরবক্স বিষ্ণুপুরে আসেন। বাহাদুর খাঁ'র শিষ্য গদাধর চক্রবর্তী এবং তাঁর শিষ্য ছিলেন রামশংকর ভট্টাচার্য। রামশংকরের শিষ্য ছিলেন অনন্তলাল বন্দোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং যদুনাথ ভট্টাচার্য।

ঠাকুর পরিবারে যদিও তৎকালীন বহু সংগীতগুণীরাই স্থান পেয়েছিলেন, কিন্তু কবির অন্তরে রাগ সংগীতের প্রভাব, গায়ক বিষ্ণু এবং যদুভট্ট-ই সর্বাধিক বিস্তার করেছিলেন।

যাবতীয় রবীন্দ্রসংগীতকে মূলতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি রাগ সংগীতের অনুকরণে বা অনুসরণে রচিত গানগুলিকে প্রথম শ্রেণীর এবং তাছাড়া অন্যান্য গানগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বলা যায়। এই দুটির আবার বহু শ্রেণীবিভাগ আছে। এখানে খেয়ালাঙ্গ, ধ্রুপদাঙ্গ প্রভৃতি শব্দগুলির কিছু ব্যাখ্যা আবশ্যক। এই শব্দগুলির তাৎপর্য হোল এই যে, ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতির

অনুসরণে রচিত রবীন্দ্রসংগীতে রাগসংগীত হুবহু অনুসৃত হয় নি তাই 'অঙ্গ' শব্দটি যোগ করে আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হয়েছে।

প্রথম জীবনে গীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রায় আশীটি রাগ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু পরিণত বয়সে রচিত গানগুলিতে তিনি, কমবেশী মাত্র কুড়িটি রাগ ব্যবহার করেছেন। রাগ প্রয়োগের এই ধারাকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর গানে সর্বদা শুদ্ধ রাগ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গানে মিশ্ররাগ ব্যবহৃত হয়েছে। (মিশ্র রাগ বলতে ছায়ালগ ও সংকীর্ণ উভয়ই বুঝতে হবে)। এবং তৃতীয় শ্রেণীর সুর রচনা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই গানগুলিতে তিনি আগন্তুক স্বর প্রয়োগ করেছেন, যা বাংলা গানে এক অভিনব সৃষ্টি। ওস্তাদ মহলে যেমন স্বরের অদল-বদল করে নতুন রাগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা যায়, প্রাচীনকালেও এই-রূপ বহু মিশ্র সুর সৃষ্ট হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে রাগসংগীতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেই সকল মিশ্র সুরে, পরস্পর যে সামঞ্জস্য ছিল, রবীন্দ্রসংগীতেও তেমন সামঞ্জস্য প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান আছে। ব্যাকরণগত নিয়মে বাঁধা হলে, রবীন্দ্র-রচিত সুর থেকেও অনেকগুলি নতুন রাগ উৎপন্ন হতে পারে।

অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীত যে ধ্রুপদের অনুকরণে রচিত একথা অনেকেই জানেন। এগুলির বৈশিষ্ট্য হোল এই যে, হিন্দুস্থানী গানের সুর, তাল, ছন্দ বা ভাব কখনোই হুবহু অনুসৃত হয় নি। তবে তিনি রাগ-সংগীতের কতগুলি আদর্শ সর্বদা মেনে চলেছেন। যেমন দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়েব ভাববাচক গানগুলিতে তিনি সর্বদা সময়ানুযায়ী রাগ ব্যবহার করেছেন। এইরূপে ঋতুব বর্ণনামূলক গানে তদনুযায়ী রাগ ব্যবহার করেছেন। এমনকি জীবনের সর্বশেষ গানদুটি—'ওই মহামানব আসে' এবং 'হে নূতন' সকালের ভাববাচক বলে সকালের রাগই ব্যবহার করেছেন। ধ্রুপদের অনুসরণে অধিকাংশ গান রচনা করলেও তিনি দুগুণ, চৌগুণ প্রভৃতি রীতি-নীতি অনুমোদন করেন নি। কারণ কথা ও সুর তাঁর গানে ছিল তুল্য-মূল্য, ওই ক্রিয়াতে কাব্যের ভাব খর্ব হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন— "…যে মানুষ গান বাঁধবে আর যে মানুষ গান গাইবে দুজনেই যদি সৃস্টিকর্তা হয় তবে তো রসের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম। যে গান গাওয়া হচ্ছে সেটা যে কেবল আবৃত্তি নয়, সে যে তখন-তখনই জীবন উৎস হতে তাজা উঠছে এটা অনুভব করলে শ্রোতার আনন্দ অক্লান্ত অম্লান হয়ে থাকে। কিন্তু মুস্কিল এই যে সৃষ্টি করবার ক্ষমতা জগতে বিরল। যাদের শক্তি আছে তারা গান বাঁধে, আর

যাদের শিক্ষা আছে তারা গান গায়। সাধারণত এরা দুই জাতের মানুষ, দৈবাৎ এদের জোড় মেলে, কিন্তু সর্বদা মেলে না। ফলে দাঁড়ায় এই যে, কলাকৌশলের কলা অংশটা থাকে গানকর্তার ভাগে, আর ওস্তাদের ভাগে কৌশল অংশটা। কৌশল জিনিষটা খাদ হিসাবেই চলে, সোনা হিসাবে নয়। কিন্তু ওস্তাদের হাতে খাদের মিশল বাডতেই থাকে। কেননা ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি, এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সবচেয়ে বড়ো দুর্ঘটনা। এইজন্য ভারতের বৈঠকী সংগীত কালক্রমে সুর সভা থেকে অসুরের কুস্তির আখড়ায় নেমেছে। সেখানে তান-মান-লয়ে তাণ্ডবটাই প্রবল হয়ে ওঠে আসল গানটা ঝাপসা হয়ে থাকে…।"

রাগ সংগীতের রীতি সম্পর্কে তাঁর প্রধান মতভেদ ছিল আর্টের সংযম নিয়ে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :—

"…আর্টের প্রধান তত্ত্ব তার পরিমিতি। কেননা রূপকে সুব্যক্ত করাই তার কাজ। বিহিত সীমার দ্বারা রূপ সত্য হয়। সেই সীমা ছাডিয়ে অতিকৃতিই বিকৃতি। মানুষের নাক যদি আপন মর্যাদা পেরিয়ে হাতির শুঁড় হওয়ার দিকে এগোতে থাকে, তার ঘারটা যদি জিরাফের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য মরিয়া হয়ে যেতে ওঠে, তা হলে এই আতিশয্যে বস্তুগৌরব বাড়ে, রূপগৌরব বাড়ে না। সাধারণত আমাদের সংগীতের আসরে এই অতিকায় আতিশয্য মত্তকরীর মতো নামে পদ্মবনে। তার তানগুলো অনেক স্থলে সামান্য একটু-আধটু হেরফের করা পুনঃপুন পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাতে স্তূপ বাড়ে, রূপ নষ্ট হয়, তন্বী রূপসীকে হাজার পাকে জডিয়ে ঘাঘরা এবং ওডনা পরানোর মতো। সেই ওডনা বহুমূল্য হতে পারে, তবু রূপকে অতিক্রম করবার স্পর্ধা তাকে মানায় না। …গান যে বানায় আর গান যে করে, উভয়ের মধ্যে যদি বা দরদের যোগ থাকে তবু সৃষ্টিশক্তির সাম্য থাকা সচরাচর সম্ভবপর নয়। বিধাতা তার জীব সৃষ্টিতে নিজে যদি কঙ্কালের কাঠামোটুকু খাড়া করেই ছুটি নিতেন, যার তার উপর ভার থাকতো সেই কঙ্কালে যতখুশি মেদমাংস চডাবার, নিশ্চয়ই তাতে অনাসৃষ্টি ঘটত। অথচ আমাদের দেশে গায়ক কথায় কথায় রচয়িতার অধিকার নিয়ে থাকে, তখন সে সৃষ্টিকর্তার কাঁধের উপর চড়ে ব্যায়ামকর্তার বাহাদুরি প্রচার করে। উত্তরে কেউ বলতে পারেন ভালো তো লাগে। কিন্তু পেটুকের ভালোলাগা আর রসিকের ভালো-লাগা এক নয়। কী ভালো লাগে তাই নিয়ে তর্ক। যে ময়রা রসগোল্লা তৈরী করে, মিষ্টান্নের সঙ্গে যথাপরিমিত রস সে জুগিয়ে দেয়। পরিবেশনকর্তা মিষ্টান্ন

গড়তে পারে না, কিন্তু দেদার চিনির রস ঢেলে দেওয়া তার পক্ষে সহজ। সেই চিনির রস ভালো লাগে অনেকের, তা হোক গে, তবুও সেই ভালো লাগাতেই আর্টের যথার্থ যাচাই নয়।"

ভারতীয় সংগীতের মূল ধ্যানরূপ সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি যে কত গভীর ছিল, কেমন করে মধ্যযুগ প্রভাবিত আধুনিক কালের প্রভাব উপেক্ষা করে তিনি প্রাচীন সংগীতের মৌলিকত্ব হৃদয়ঙ্গম ও প্রতিষ্ঠা করেছেন তা বিস্ময়ের বিষয়। তাঁর মতে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংগীত হোল ধ্রুপদ, তাই তিনি ধ্রুপদ সম্বন্ধে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদকে লিখিত একটি চিঠিতে সেকথার উল্লেখ আছে—

"...আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করা। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিষ পেয়েছি, একদিকে তার বিপুল গভীরতা আর একদিকে তাঁর আত্মদান, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা, এই ধ্রুপদের সৃষ্টি আগেকার চেয়ে আরো বিস্তীর্ণ হোক, আরো বহুকক্ষবিশিষ্ট হোক, তার ভিত্তিসীমার মধ্যে বহু বৈচিত্র্য ঘটুক, তাহলে সংগীতে আমাদের প্রতিভা বিশ্বজয়ী হবে"...।

এই বিস্তীর্ণ, বহুকক্ষবিশিষ্ট, বহু-বৈচিত্র্যতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা যায় রবীন্দ্র-সংগীতে। প্রাচীন সংগীতে 'আলাপগান' ও 'ধ্রুপদগান' এই দুটি মাত্র গায়ন পদ্ধতিই প্রধান ছিল, আলাপগান রাগরূপের একটি চলমান প্রকাশ, একে সীমাহীন বলা যায়, এর থেমে যাবার কোন অনিবার্য কারণ নেই, আলাপ গানে শিল্পী আপন ক্ষমতা ও রুচি অনুসারে রাগরূপ প্রকাশ করে। একে নিয়মাবদ্ধ করলেই তখন গান বা গতের সৃষ্টি হয়। আলাপগানে নানাবিধ তান অলংকারের প্রয়োগ ধ্রুপদগানে হোল অত্যন্ত সীমিত এবং প্রকৃতি গম্ভীর ও সংযত। এই দুটি থেকেই পরবর্তীকালের যাবতীয় গীতরীতি উদ্ভাবিত হয়েছে। রবীন্দ্র-সংগীতে কাব্য, সুর ও ছন্দের ত্রিবেনীসঙ্গমে যে অভিনব পরিণতি লাভ করেছে তা আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ সংগীত রূপে স্বীকৃত। যার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের সম্যক জ্ঞানলাভ করতে হলে এবং কণ্ঠস্বর, কাব্য রচয়িতার মেজাজ প্রভৃতির সামঞ্জস্য করতে হলে কেবলমাত্র সংগীত ও সাহিত্যই নয়, দর্শনাদি বিষয়েও কিছু উপলব্ধি ও সচেতনতা থাকা আবশ্যক। ললিতকলা সম্বন্ধে কবির উপলব্ধি তাঁর উক্তিতেই বর্ণিত হোল :—

"…সকল প্রকৃত আর্টেই একটা বাইরের উপকরণ আর একটা চিত্তের উপকরণ থাকা চাই,.অর্থাৎ একটা রূপ আর একটা ভাব। সেই উপকরণকে সংযমের দ্বারা বাঁধিয়া গড়িতে হয়। বাহিরের বাঁধন প্রমাণ এবং ভিতরের বাঁধন লাবণ্য। তারপরে সেই ভিতরবাহিরের উপকরণকে মিলাইতে হইবে, কিসের জন্য, সাদৃশ্যের জন্য, কিসের সঙ্গে সাদৃশ্য, না ধ্যানরূপের সঙ্গে কল্পরূপের সঙ্গে সাদৃশ্য। বাহিরে রূপের সঙ্গে সাদৃশ্যই যদি মুখ্য লক্ষ্য হয় তবে ভাব ও লাবণ্য কেবল যে আবশ্যক হয় না, তাহা, নহে, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়… ।"

যাবতীয় সংগীত রীতিকে দুই ভাবে পরিবেশন করা হয়। যেমন, আসরের গান এবং মন্দিরের গান। আসরের গানে বহুজনের মনস্তুষ্টির জন্য ভাবের চটুলতা এবং সুরের কারসাজির আবশ্যক। কিন্তু মন্দিরের গানে আপন আরাধ্য দেবতার কাছে আবশ্যক কেবলমাত্র অন্তরের সহজ ও সরল অভিব্যক্তি। কবি মন্দিরের গানেরই পক্ষপাতি ছিলেন। সংগীত রচনা এবং পরিবেশনা সম্বন্ধে কবি বলেছেন :—"…সংগীত যেখানে আপন স্বাতন্ত্রে বিরাজ করে সেখানে তার নিয়ম সংযমের যে শুচিতা প্রকাশ পায়, বাণীর সহযোগে গানরূপে তার সেই শুচিতা তেমন করে বাঁচিয়ে চলা যায় না বটে, কিন্তু পরম্পরাগত সংগীত রীতিকে আয়ত্ব করলে তবেই নিয়মের ব্যত্যয়-সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে। কবিতাতেও ছন্দের রীতি আছে, যে রীতি কোন বড়ো কবি নিখুঁত ভাবে সাবধানে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করেন না। অর্থাৎ তাঁরা নিয়মের উপরেও কর্তৃত্ব করেন। কিন্তু সেই কর্তৃত্ব করতে গেলেও নিয়মকে স্বীকার করা চাই। স্বাতন্ত্র্য যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা সেখানে কলাবিদ্যার স্থান নেই এইজন্য নিজের সৃজনী শক্তিকে ছাড়া দিতে গেলেই শিক্ষা ও সংযম শক্তির বেশী দরকার…"।

রাগসংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি যে কত গভীর ছিল, তাঁর উক্তিতে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।—

১। "…আমাদের দেশে প্রভাত, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন, অর্ধরাত্রি, বর্ষা, বসন্তের রাগিণী রচিত হয়েছে। সে রাগিণীর সবগুলো সকলের কাছে ঠিক লাগবে কিনা জানিনা, অন্তত আমি 'সারং' রাগকে মধ্যাহ্নকালের সুর বলে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি না। তা হউক কিন্তু বিশ্বেশ্বরের খাসমহলের নহবৎ-খানায় যে কালে কালে ঋতুতে ঋতুতে নবনব রাগিনী বাজছে আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তা প্রবেশ করেছে। বাইরের প্রকাশের অন্তরালে যে একটি

গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে আমাদের দেশের টোড়ী কানাড়া তাই জানাচ্ছে··· ।”

২। “···কোন বিশেষ বিশেষ এক এক রাগিনীতে বিশেষ বিশেষ এক একটা ভাবের উৎপত্তি হয়, ‘সংগীতবেত্তারা তাহার কারণ বাহির করুন। এই মনে করুন পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে, আর ভৈরোঁতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে? পূরবীতেও কোমল সুরের বাহুল্য, আর ভৈরোঁতেও কোমল সুরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন? তাহা কি কেবলমাত্র প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়? তাহা নহে। তাহার গূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথমত প্রভাতের রাগিনী ও সন্ধ্যার রাগিনী উভয়েতেই কোমল সুরের আবশ্যক। প্রভাত যেমন অতি ধীরে ধীরে অতিক্রমশ নয়ন উন্মীলিত করে, সন্ধ্যা তেমনি অতি ধীরে ধীরে অতিক্রমশ নয়ন নিমীলিত করে। অতএব কোমল সুরগুলির, অর্থাৎ যে সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, যে সুরগুলি অতি ধীরে ধীরে অতি অলক্ষিতভাবে পরস্পর পরস্পরের উপর মিলাইয়া যায়, সন্ধ্যা ও প্রভাতের রাগিনীতে সেই সুরের অধিক আবশ্যক। তবে প্রভাত ও সন্ধ্যায় কী কী বিষয়ে প্রভেদ থাকা উচিত? না, একটাতে সুরের ক্রমশ উত্তরোত্তর বিকাশ, আর একটাতে অতি ধীরে ধীরে ক্রমশ নিমীলন হইয়া আসা আবশ্যক। ভৈরোঁতে ও পূরবীতে সেই বিভিন্নতা রক্ষিত হইয়াছে। এইজন্য প্রভাত ও সন্ধ্যা উক্ত দুই রাগিনীতে মূর্তিমান।”

৩। “ভারতবর্ষের যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমি আছে, এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এই জন্য আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম বৈরাগ্য আবিষ্কার করতে পেরেছে। এইজন্য আমাদের পূরবীতে কিম্বা টোড়ীতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হাহা-ধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটা অংশ আছে যেটা কর্মপটু, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ; তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায় নি। পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মীড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে।

৪। “···ভৈরবী সুরে মোচড়গুলো কানে এলে মনে হয় ঘর্ষণ-বেদনায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। ···ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চির বিরহ বেদনা।”

৫। "...রামকেলী প্রভৃতি সকাল বেলাকার সুরের একটু আভাস লাগবামাত্র এমন একটা বিশ্বব্যাপী করুণা বিগলিত হয়ে চারিদিককে বাষ্পাকুল করেছে যে এই সমস্ত রাগিণীকে সমস্ত আকাশের সমস্ত পৃথিবীর নিজের গান বলে মনে হচ্ছে।"

৬। "...মেঘমল্লারে যখন বর্ষার গান চলে তখন তার মধ্যে না থাকে ঝরঝর বৃষ্টির অনুকরণ, না থাকে ঘরঘর বজ্রের ডাক। তবু কোনো বাস্তব-বিলাসী তাকে অবাস্তব বলে নিন্দা করে না।"

"—মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্ত নিশ্বাস।"

"—পূরবী যেন শূন্য গৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।"

"পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা।"

"সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর যাতে আমোদ-আহ্লাদের উল্লাস নেই তাই আমাদের বিবাহ উৎসবের রাগিনী।"

"খাম্বাজের করুণ তান শহরের আকাশে আঁচল বিছিয়ে দিল।"

"কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি।"

গভীর সংগীতানুরাগের গুণে কবি রাগসংগীতের মর্মস্থানে পৌঁছতে পেরে-ছিলেন এবং অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী হওয়ায় যে কোন রকম গান তিনি রচনা করতে পেরেছেন। বিষয় বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে তাই রবীন্দ্র সংগীত অতুলনীয়। মানব মনের প্রায় সব রকম অবস্থার গানই তিনি রচনা করেছেন। কোথাও তিনি রাগ সংগীতকে ভাঙেননি, বরং তাঁর গানকে প্রাচীনের ভিত্তিতে এযুগের নবতম প্রকাশ বলা যায়। অর্থাৎ সুর ও ভাব অথবা কাব্য ও রাগের অপূর্ব তথা অতুলনীয় সমন্বয় হোল রবীন্দ্রসংগীত।

ছন্দ ও তাল : বাংলাদেশে যখন হিন্দি গানের অনুসরণ বা অনুকরণে গান রচনা আরম্ভ হয়; তখন হিন্দুস্থানী রচয়িতাগণ যেমন সংগীতে নানাবিধ তাল প্রয়োগ করেছেন, বাঙালি রচয়িতাগণ তেমন করেননি। সমমাত্রিক ছন্দগুলিই তাঁরা বেশী ব্যবহার করেছেন। বিষমমাত্রিক দুরূহ তালগুলি তাঁদের তেমন আকর্ষণ করেনি। সেদিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতকে তাল বৈচিত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যায়। অবশ্য প্রথম জীবনে অধিকাংশ গানই তিনি হিন্দুস্থানী গানের সুর ও ছন্দের অনুকরণ অথবা অনুসরণে রচনা করেছেন। কিন্তু ক্রমে তাঁর গানের সুর ও ছন্দের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। গানগুলি কাব্য প্রধান হওয়ায়,

কাব্যের ব্যঞ্জনা ও উচ্চারণ স্পষ্টতা যাতে সঠিকভাবে প্রকাশ পায়, সেই অনুসারেই তাতে সুর ও তাল প্রয়োগ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :—

"…সে (সুর) আপনার মধ্যে আপনি স্পন্দিত হচ্ছে, কথা যেমন অর্থের মোক্তারি করবার জন্য, সুর তেমন নয়, সে আপনাকে আপনিই প্রকাশ করে। বিশেষ সুরের (স্বর) সঙ্গে বিশেষ সুরের সংযোগে ধ্বনিবেগের একটা সমবায় উৎপন্ন হয়। তাল সেই সমবেত বেগটাকে গতিদান করে… ।"

ছন্দকে তিনি বলেছেন বেগ, গতি, স্পন্দন বা প্রাণকম্পন। তাই তিনি বলেছেন :—

…কবিতায় যেটা ছন্দ সংগীতে সেইটাই লয়। এই লয় জিনিষটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে। আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কি গানেই কি এই লয়কে যদি মানি তবে তাদের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই ।"

কাব্যে যেমন ছন্দ সংগীতে তেমনি তাল অপরিহার্য। শাস্ত্রে 'সতাল' ও 'অতাল' ভেদে দুইপ্রকার সংগীতের উল্লেখ আছে। কিন্তু তালহীন সংগীতেরও একটা ছন্দ বা লয় আছে। প্রকৃতপক্ষে ছন্দ, তাল বা লয় প্রভৃতি শব্দের মূলগত অর্থ একই, কিন্তু কাব্য যখন সুর ও তাল সহযোগে সংগীতে রূপায়িত হয়, তখন সেই কাব্যের ছন্দ তেমন প্রাধান্য পায় না। কারণ তখন সুর তার মূল ভাবটিকে প্রকাশ করে এবং তাল সেই কাব্যের অভিব্যক্তির নতুন জগৎ সৃষ্টি করে। সেইজন্য সংগীত জগতের অধিকাংশ কাব্যই ছন্দ মিলিয়ে দেখলে ছন্দপতন দোষে তা পূর্ণ মনে হতে পারে। এর কারণ অতীতে একে কেহ দোষ বলে মনে করেন নি, বা এবিষয়ে তেমন গুরুত্ব অনাবশ্যক মনে করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতে এই ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে।

বিভিন্ন ছন্দের কাব্য যেমন মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও রসের সঞ্চার করে, সংগীতে রূপায়িত হওয়ার পরেও তাতে সেই রস ও ভাবের প্রকাশ থাকা উচিত। তাল কাব্যের ছন্দকে অগ্রাহ্য করলেও ভাবকে উপেক্ষা করতে পারে না। অনেক হিন্দুস্থানী গানে যেমন কাব্যের বিষয়, ছন্দ এবং রাগরূপ পরস্পর বিরোধী, এমন আর কোথাও নেই। প্রথম জীবনে রচিত রবীন্দ্রসংগীতের কোন

কোনটিতে তেমন অসংগতি কিছু পরিমাণে আছে বলে মনে হতে পারে, তাই সে সম্পর্কে কবি বলেছেন :— "...গোড়াতেই বলে রাখা দরকার গীতাঞ্জলিতে এমন অনেক কবিতা আছে যার ছন্দ রক্ষার বরাত দেওয়া হয়েছে গানের সুরের পরে। অতএব যে পাঠকের ছন্দের কান আছে তিনি গানের খাতিরে এর মাত্রা কমবেশী নিজেই দুরস্ত করে নিয়ে পড়তে পারেন। যাঁর নেই তাঁকে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে...।" উদাহরণ স্বরূপ তিনি 'বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্য সম্পর্কে বলেছেন : 'এই গীতিনাট্যখানি ছন্দ ইত্যাদির অভাবে অপাঠ্য হইয়াছে, ইহা স্বর-লয়ে নাট্যমঞ্চে শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য···।" চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে বলেছেন : "···একথা মনে রাখা কর্তব্য যে এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয...।" 'পরিশোধ' কবিতার নাট্যরূপ 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন : " প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো। বলা বাহুল্য ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব বলে কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য .।" ১৩৪৩ সালে (১৯৩৬ খৃঃ) বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত 'আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু', 'ঐ মালতীলতা দোলে', 'চলে ছলছল নদীধারা' প্রভৃতি গান সম্পর্কে কবি বলেছেন : " এই গানগুলি কবিতা নয়, এগুলি গান, পাঠ সভায় এদের স্থান নয়, গীত সভায় এদের আহ্বান। সঙ্গে সুর না থাকলে এরা আলো নেভা প্রদীপের মতো... ।"

রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় প্রায় সব তালে গান রচনা করেও তৃপ্ত হন নি। প্রথম দিকে রাগী সংগীতের গাম্ভীর্যের প্রতিই তিনি বেশী আকৃষ্ট ছিলেন, কিন্তু ক্রমে কাব্যের ভাব ও ছন্দের জন্য বহু বিচিত্র ছন্দ ও তাল সৃষ্টি করেন। সম্ভবত বাউল গানের প্রভাবই এর অন্যতম কারণ। এই সৃষ্টির আবেগে তিনি কয়েকটি নতুন ছন্দেরও প্রবর্তন করেন। যেমন : ১। ঝম্পক বা অর্দ্ধ ঝাঁপতাল, ২। ষষ্ঠীতাল ৩। রূপকড়া তাল, ৪। নবতাল, ৫। একদশী তাল এবং ৬। নবপঞ্চ তাল। এই তালগুলির সব কয়টিই প্রাচীন অথবা কর্নাটক তাল পদ্ধতির কোন না কোন তালের সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত। যেমন ৩।২।২।২ ছন্দ বিশিষ্ট নবতালের সঙ্গে প্রাচীন 'গারুগী' তালের সাদৃশ্য আছে। তবে তার ছন্দবিভাগ ২।২।২।৩ এইরূপ ছিল। আবার নবতালের ৪।৫ ছন্দবিভাগ প্রাচীন 'হংস' তালের সঙ্গে মিলে যায়।

এইরূপে ষষ্ঠী তালের সঙ্গে প্রাচীন 'যতিলগ্ন' তালের এবং ৫।৫ ছন্দের ঝম্পক তালের সঙ্গে প্রাচীন 'হংসলীল', 'নিঃসারুক' ও 'ডোম্বলী' তালের সাদৃশ্য আছে। এছাড়া কর্নাটক তাল পদ্ধতির বিবিধ জাতি-বৈচিত্র্যানুসারে সব তালগুলিই কোন না কোন তালের সঙ্গে মিলে যায়। তাই বলে রবীন্দ্রনাথ উদ্ভাবিত তালগুলি প্রাচীন অথবা কর্নাটক তাল থেকে সংগৃহীত এইরূপ ধারণা ভ্রান্তিমূলক। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, তিনি ছন্দ, লয় বা তাল বৈচিত্র্যকে বিশেষভাবে তাঁর সংগীতে স্থান দিয়েছেন।

কবি স্বযং গাইবার সময়ে দ্রুত তালের গান অপছন্দ করতেন। অভিনয়কালে কোথাও কোথাও তিনি তালের বন্ধনও স্বীকাব করতেন না। সেই গায়ন ভঙ্গিটি ছিল সুরে কথা বলার মতো। নাটকে এইরূপ গায়ন পদ্ধতির প্রতিক্রিয়া খুবই সুন্দর হয়। তবে এই রীতি খুব সহজ নয়, এর কারণ এর জন্য শিল্পীর কাব্য ও সংগীত সম্বন্ধে গভীর রসবোধ থাকা আবশ্যক।

তাল ছাড়াও তিনি অনেক গান রচনা করেছেন। যেমন 'সখি আঁধারে একেলা ঘরে', 'অশ্রুভরা বেদনা', 'কার বাঁশি নিশি ভোরে', 'এসো শরতের অমল মহিমা', বেদনা কী ভাষায় রে', 'বাজে করুণ সুরে', 'বন্ধু রহো রহো সাথে', 'কখন দিলে পরায়ে' প্রভৃতি। এগুলি ছন্দমুক্ত হলেও সংরক্ষণ তথা প্রকাশের জন্য সুনিয়ন্ত্রিতরূপে সংগীতলিপি সহযোগে প্রকাশ করা হয়েছে। তাই এগুলি সংগীত-লিপির সাহায্যে অনুশীলন করা কঠিন। এগুলির যে বিশেষ গায়নরীতি তা শুনে শেখাই বাঞ্ছনীয়।

প্রথম জীবনে রচিত সংগীতে তিনি যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট পদ বর্জন করেছেন, কিন্তু পরবর্তীকালে ছন্দ ও ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য নানাবিধ যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট পদ প্রয়োগ করে সংগীত রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ 'আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু', 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল এ কী দুর্দিন', 'নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়', 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী', 'মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন', 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু' প্রভৃতি গান উল্লেখযোগ্য।

কবি উদ্ভাবিত তালসমূহ এবং সেই তালে রচিত কয়েকটি গানের সামান্য আলোচনা এখানে করা আবশ্যক। ২।৩।২।৩ ছন্দের ঝাঁপতালকে উল্টে ৩।২, ।৫। ইত্যাদি ছন্দ রচনা করেছেন। যার নামকরণ হয়েছে ঝম্পক বা অর্ধঝাঁপ তাল। এই তালে তিনি রচনা করেছেন—'আজি শ্রাবণঘন গহন মোহে',

'এই তো তোমার আলোকধেনু', 'এই লভিনু সঙ্গ তব', 'কোথা বাইরে দূরে', 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা', 'বাহির পথে বিবাগি হিয়া', 'যেতে যেতে একলা পথে' প্রভৃতি গান। দাদরা তালের ৩।৩ ছন্দকে পরিবর্তন করে ২।৪ বা ৪।২ ছন্দবিভাগ করে সৃষ্ট হয়েছে ষষ্ঠীতাল। এই তালে রচনা করেছেন—'নিদ্রাহারা রাতের এ গান', 'শ্যামল ছায়া নাইবা গেলে', 'হৃদয় আমার প্রকাশ হোল' প্রভৃতি গান।

তেওরা তালের সঙ্গে একমাত্রা যোগ করে রচিত হয়েছে রূপকড়া তাল, যার ছন্দ ৩।২।৩। একটি মাত্রা যোগ করার ফলে তেওরা তালের চঞ্চলতা গভীর করুণতায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই তালে রচনা করেছেন—'আজি যে রজনী যায়', 'কেন সারাদিন ধীরে ধীরে', 'জীবনে যত পূজা', 'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে', 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে' প্রভৃতি গান।

নয় মাত্রা বিশিষ্ট নবতাল আবার নানা ছন্দে বিলম্বিত। যেমন ৩।২।২।২, ৪।৫, ৫।৪, ৩।৬, ৬।৩ ইত্যাদি। এই তালে রচনা করেছেন—'দুয়ার মোর পথপাশে', 'ব্যাকুল বকুলের ফুলে', 'নিবিড় ঘন আঁধারে', 'যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে' প্রভৃতি গান।

এগারো মাত্রা বিশিষ্ট একাদশী তালেরও ছন্দ বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন ৩।২।২।৪, ৩।৪।৪ প্রভৃতি। এই তালে রচনা করেছেন—'কাঁপিছে দেহলতা থরথর', 'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া' প্রভৃতি গান। এই তালের ছন্দকে তেওরা ও কাহারবা'র মিশ্রণে সৃষ্ট বলা যায়।

আঠেরো মাত্রার নবপঞ্চতালে 'মাত্র একটি গানই তিনি রচনা করেছেন— 'জননী তোমার করুণ চরণখানি'।

রাবীন্দ্রিক ঠেকা: রবীন্দ্রসংগীতে সংগত সম্পর্কে বাদক মহলে যথেষ্ট রুচি-পার্থক্য দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে গীতরচয়িতা, সুরকার, গায়ক প্রভৃতির মতো বাদকেরও গভীর কলাজ্ঞান এবং রসবোধ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ বাদকের মধ্যেই গানের সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেয়ে নিজের গুণপনা জাহির করার আকুলতাই অধিক দেখা যায়। অথচ বাদকের সর্বদা মনে রাখা কর্তব্য যে সংগীতের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য বিধানই সংগতের প্রধান উদ্দেশ্য। এই কারণে কোন কোন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র একেবারে বর্জন করে থাকেন। ফলস্বরূপ অনেকে মনে করেন যে, রবীন্দ্রসংগীতে হয়তো বা সংগত বর্জনীয়। বস্তুতঃ সকল প্রকার সংগীতেই সংগত সংযত এবং রুচি সম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রবীন্দ্রনাথ উদ্ভাবিত তালের ঠেকাগুলির কোন প্রকার ঠেকা বা নিশ্চিত বাণী তিনি স্থির করেন নি। সুতরাং বাদক তাঁর সাধনা, ক্ষমতা এবং রুচি অনুসারে এগুলি কিছু অদল-বদল করেও বাজাতে পারেন। কিন্তু প্রতিটি গানের ভাব, ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে বাদকের সযত্ন-লক্ষ্য থাকা একান্ত কর্তব্য।

রবীন্দ্র-সৃষ্ট তাল সমূহের ঠেকা :

১] ঝম্পকতাল। ৫ মাত্রা। ৩।২ ছন্দ বিভাগ। বিষমমাত্রিক।

I ধা ধি না | ধি না I
+ ২

২] ষষ্ঠী তাল। ৬ মাত্রা। ২।৪ ছন্দ বিভাগ। বিষমমাত্রিক।

I ধি না | ধি ধি নাগে তেটে I
+ ২

৩] রূপকড়া তাল। ৮ মাত্রা। ৩।২।৩ ছন্দ বিভাগ। বিষমমাত্রিক।

I ধা দেন্ তা | তিট কতা | গদি ঘেনে নাক I
+ ২ ৩

৪] নবতাল। ৯ মাত্রা। ৩।২।২।২ ছন্দ বিভাগ। বিষমমাত্রিক।

I ধা দেন্ তা | তিট কতা | গদি ঘেনে | ধাগে তেটে I
+ ২ ৩ ৪

৫] একাদশী তাল। ১১ মাত্রা। ৩।২।২।৪ ছন্দ বিভাগ। বিষমমাত্রিক।

I ধা দেন্ তা | তিট কতা | গদি ঘেনে |
+ ২ ৩

ধাগে তেটে তাগে তেটে I
৪

৬] নব পঞ্চতাল। ১৮ মাত্রা। ২।৪।৪।৪।৪ ছন্দ বিভাগ। বিষমমাত্রিক।

I ধা গে | ধা গে দেন তা কতা | ধাগে দেন্ তা |
+ ২ ৩

তিট ধা দেন্ তা | তিট কতা গদি ঘেনে I
৪ ৫

রবীন্দ্রসংগীতে কথা সুর ভাব ও ছন্দের অপূর্ব সঙ্গম আজ সুবিদিত। এ ছাড়া কাব্যের ভাব ও ছন্দ বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য সুর এবং তাল প্রয়োগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি শেষ বয়সেও করেছেন কবিতার ছন্দকে হুবহু রক্ষা করে তিনি যে সকল গান রচনা করেছেন। তার কয়েকটি উল্লেখ এখানে করা হোল।

ক) ।খর বায়ু। বয় বেগে। চারি দিক্। ছায় মেঘে।

খ) ।হৃদয়ে। মন্। দ্রিল। ডমরু। গুরু। গুরু।

গ) ।জনগন। মন অধি। না-য়ক। জয় হে-।

ঘ) ।মা-তৃ। মন্। দির। পূ-ণ্য। অঙ্। গন।

সাধারণত শব্দের প্রারম্ভেই ছন্দের ঝোঁক দেখতে আমরা অভ্যস্ত, এর ব্যতিক্রমও আছে বটে, কিন্তু আগাগোড়া শব্দ সমূহের কোন বিশেষ অক্ষরের উপরে ঝোঁক রাখার দৃষ্টান্ত বিরল। কবি তেমন কিছু গানও রচনা করেছেন—

ক) তু। মি-তো। সেই যা। বেই চ। লে

খ) উ। তল ধা-। রা--রা। দল ব-। রে

গ) দি-। নে-র বে। লা-য় বাঁ। শি--তো। মার

ঘ) দ। খিন হাও। য়া--জা। গো-জা-। গো

ঙ) এ। কী-গ। ভীর বা। নী-এ। লো

চ) ভ। রা থা-।-কুম্ভ। রা থা-।--কৃ

রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দ-বৈচিত্র্য এইরূপ অজস্র ধারায় পল্লবিত। এই অজস্রতা বিচিত্ররূপে শ্রোতাদের প্রভাবিত করে। কেউ এর কাব্যরসে মগ্ন, সুর ও তালের প্রতি তাঁদের মন নেই। কেউ হিন্দীভাঙ্গা গানগুলি বেশী পছন্দ করেন কারণ সেখানে তাঁদের সংস্কারগত সুর ও তালের পরিচয় পেয়ে তাঁরা খুশি হন। আবার কেউ এর মধ্যে মানব মনের বিচিত্র অভিব্যক্তিমূলক গান শুনে মুগ্ধ হন। এ ছাড়া প্রেম, পূজা, প্রকৃতি, দেশাত্মবোধক প্রভৃতি বিবিধ পর্যায়ের গানগুলি নানাভাবে রসিক সাধারণের মনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বর্তমানে তাই সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের নানাস্থানে এর প্রভাব বিস্তৃত।

নাট্যপ্রসঙ্গ ঃ ভারতীয় সংগীতের আদিগ্রন্থ মহর্ষি ভরত রচিত 'নাট্যশাস্ত্রে' উল্লিখিত ছত্রিশটি অধ্যায়ের মধ্যে ত্রিশটিই নাট্য সম্পর্কিত। এই গ্রন্থে উল্লিখিত সংগীত ও নাট্য বিষয়ক বিধিবিধানাদির অধিকাংশই এখনো প্রচলিত। সুতরাং ভারতীয় নাটকের ঐতিহ্য অতিপ্রাচীন, মহিমাময় এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মহাকবি

বাল্মীকি, কালিদাস থেকে গিরিশচন্দ্র প্রমুখ যাবতীয় নাট্যসাহিত্য রচয়িতারা সামাজিক গঠন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রভৃতি নানাবিধ শিক্ষণীয় বিষয় নাটকের মাধ্যমে রূপায়িত করে, একে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। রামায়ণ, যাত্রাগান, কথকতা, প্রাচীন বাংলা নাটক, আসামী অংকীয়ানাটক, দক্ষিণ ভারতীয় তামিল-নাদের নৃত্যাভিনয় প্রভৃতি নানা প্রকার নাটক এদেশে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। বিলাতে এক ধরনের নাটক প্রচলিত যার আগাগোড়া সমস্ত সংলাপ সুরে রচিত। তার উৎস যে ভারতবর্ষ সেকথা বলাই বাহুল্য।

ঐতিহ্যময় ভারতীয় সংগীত জগতের নানাবিধ গীতরীতি মানব মনের ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে মূল্যবান। এটি এর নিজস্ব সম্পদ। অন্য কোন দেশে রাগ-রাগিণী-জাতীয় কোন ব্যবস্থা নেই। পাশ্চাত্য সংগীতে, স্বরগুলিকে নানাভাবে এবং নানাছন্দে সাজিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সুরে নাটিকাগুলি রচনার জন্য দেশ বিদেশের সুর ও নাট্যরীতিতে অনুপ্রাণিত হলেও, রচনার সময় সর্বদা নিজস্ব পথ গ্রহণ করেছেন। বলা বাহুল্য তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিতেই এই স্বকিয়তা বিদ্যমান। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিবিধপ্রকার নাট্য সম্পর্কে সজ্ঞান ছিলেন। তবে নাট্যাদি রচনায় সম্ভবত তিনি স্পেন্সরের লেখা পড়েই প্রথমে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কারণ তিনি বলেছেন:

"হার্বার্ট স্পেন্সরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয়, সেখানে আপনিই কিছু-না-কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার আনুসঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল··· ।"

তাই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বৈচিত্র্যময় গীতরীতিকে যথাযথভাবে তাঁর নাটকাদিতে ব্যবহার করেছেন। য়ুরোপীয় সংগীতের কাছে তিনি কতখানি ঋণী তা বুঝতে হলে, সেই সংগীত প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সংগীত প্রকৃতির পার্থক্য বোঝা দরকার। ভারতীয় সংগীতের মূল ব্যঞ্জনা হোল বিশ্বপ্রকৃতির কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়। তার বৈরাগ্য, গাম্ভীর্য ও শান্তি যেন যাবতীয় ভাবাবেশকে উত্তীর্ণ করে যায়। কিন্তু য়ুরোপীয় সংগীত মানব জীবনের

বাস্তবতার সঙ্গেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জড়িত। সে সংগীতে মানব-জীবন-বৈচিত্র্য সুরে প্রকাশ পায়। সে সংগীত বিষয় বৈচিত্র্য বহুল। এইরূপ পার্থক্য অবশ্য সকল প্রকার শিল্পকলার ক্ষেত্রেই লক্ষিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সুরে নাটিকা'গুলিতে (গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি) মানব মনের বিভিন্ন ভাব বৈচিত্র্য যে অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন, সেকথা আজ অনেকেই জানেন। সুখ, দুঃখ, আনন্দ, ক্রোধ, বিস্ময় প্রভৃতি তিনি নিজের মনে কেমনভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, সেকথা তিনি নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর চিন্তাধারা এবং অভিমত সম্পর্কে আলোকপাতের জন্য, এখানে তেমন কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করা হোল :—১। "বিলাতির সঙ্গে এই দিশি গানের ছাঁদের তফাৎটা কোনখানে? প্রধান তফাৎ সেই অতি সূক্ষ্মস্বরগুলি নিয়ে যাকে বলি শ্রুতি।...এরই যোগে এক সুর কেবল যে পাশাপাশি থাকে তা নয় তাদের মধ্যে নাড়ির সম্বন্ধ ঘটে। এই নাড়ির সম্বন্ধ ছিন্ন করলে রাগ রাগিণী যদি বা টেঁকে তাদের ছাঁদটা বদল হয়ে যায়। কিছুকাল পূর্বে যে কনসর্টের প্রচলন ছিল তার গৎগুলি তার প্রমাণ। এই গতের সুরগুলি কাটাকাটা নৃত্য করতে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে সেই বেদনার সম্বন্ধ থাকে না, যা নিয়ে সংগীতের গভীরতা। এইসব কাটা সুরগুলিকে নিয়ে নানাপ্রকার খেলানো যায়, উত্তেজনা বলো, উল্লাস বলো, পরিহাস বলো, মানুষের বিশেষ বিশেষ হৃদয়াবেগ বলো নানাভাবে তাদের ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু যেখানে রাগ-রাগিণী সুসম্পূর্ণতার গাম্ভীর্য নির্বিকারভাবে বিরাজ করছে সেখানে এরা লজ্জিত...।"

২। "বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর-কিছু লিখি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে রাগরাগিণীগুলির এক একটি অপূর্ব-মূর্তি ও ভাব-ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দ-গতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথা বিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবা-মাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানাপ্রকার কথা কহিতেছে, এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম।"

৩। "গীতিনাট্যে যাহা অন্তোপান্তসুরে অভিনয় করিতে হয় তাহাতে স্থান বিশেষে তাল না থাকা বিশেষ আবশ্যক। নহিলে অভিনয়ের স্ফূর্তি হওয়া অসম্ভব।"

৪। "দ্রুত তাল সুখের ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ বটে। তবে ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে তালও দ্রুত ও বিলম্বিত করা আবশ্যক। সর্বত্রই যে তাল সমান রাখিতেই হইবে তাহা নহে।"

৫। "আমরা যখন রোদন করি তখন দুইটি পাশাপাশি সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্পই থাকে, রোদনে স্বর প্রত্যেক কোমল সুরের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, সুর অত্যন্ত টানা হয়। আমরা যখন হাসি 'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ' কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা সুর একটিও নাই, পাশাপাশি সুরের মধ্যে দূর ব্যবধান। আর তালের ঝোঁকে ঝোঁকে সুর লাগে। দুঃখের রাগিণী দুঃখের রজণীর ন্যায় অতি ধীরে ধীরে চলে, তাহাকে প্রতি কোমল সুরের উপর দিয়া যাইতে হয়। আর সুখের রাগিণী সুখের দিবসের ন্যায় অতি দ্রুত পদক্ষেপে চলে, দুই তিনটা করিয়া সুর ডিঙাইয়া যায়।...উচ্ছাসময় উল্লাসের সুরই অত্যন্ত সহসা ওঠে, আমরা হাসিয়া উঠি, কোথা হইতে আরম্ভ করি, কোথায় শেষ করি তাহার ঠিকানা নাই। রোদনের ন্যায় তাহা ক্রমশ মিলাইয়া আসে না।"

রবীন্দ্রনাট্য : রবীন্দ্রনাট্যের বহুবিচিত্র শাখায় আমরা পাই কাব্যনাট্য, গদ্যনাট্য, ব্যঙ্গ ও হাস্য-কৌতুকনাট্য, রূপকনাট্য, ঋতুনাট্য, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি। এগুলির বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। এগুলির রচনাকাল, রচনাগত বৈশিষ্ট্য এবং সংগীত সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য সংকলন করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এগুলির রচনাকাল এইরূপ :—

বাল্মীকি প্রতিভা, ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড-১৮৮১ ; কালমৃগয়া-১৮৮২ ; প্রকৃতির প্রতিশোধ, নলিণী, ভানুসিংহের পদাবলী-১৮৮৪ ; মায়ার খেলা-১৮৮৮ ; রাজা ও রাণী-১৮৮৯ ; বিসর্জন-১৮৯০ ; চিত্রাঙ্গদা, গোড়ায় গলদ, মুক্তির উপায়-১৮৯২ ; বৈকুণ্ঠের খাতা-১৮৯৭ ; হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক-১৯০৭ ; মুকুট, শারদোৎসব-১৯০৮ ; প্রায়শ্চিত্ত-১৯০৯ ; গীতাঞ্জলি, রাজা-১৯১০ ; ডাকঘর, মালিনী, বিদায় অভিশাপ, অচলায়তন-১৯১২ ; গীতিমাল্য, গীতালি-১৯১৪ ; ফাল্গুনী-১৯১৬ ; গুরু-১৯১৮ ; অরূপরতন (রাজা নাটকের অভিনয়যোগ্য রূপ)

১৯২০ ; ঋণশোধ (শারদোৎসব নাটকের অভিনয়যোগ্য রূপ)-১৯২১ ; মুক্তধারা-১৯২২ ; বসন্ত-১৯২৩ ; গৃহপ্রবেশ-(শেষরাত্রি গল্পের নাট্যরূপ)-১৯২৫ ; চিরকুমার সভা (প্রজাপতির নির্বন্ধ উপন্যাসের নাট্যরূপ), নটীর পূজা, রক্তকরবী-১৯২৬ ; ঋতুরঙ্গ-১৯২৭ ; শেষরক্ষা (গোড়ায় গলদ নাটকের পরিবর্তিত রূপ)-১৯২৮ ; পরিত্রাণ (প্রায়শ্চিত্ত নাটকের পরিবর্তিত রূপ), তপতী (রাজা ও রাণী গল্প অবলম্বনে রচিত নাটক)-১৯২৯ ; নবীন, শাপমোচন-১৯৩১ ; কালের যাত্রা-১৯৩২ ; চণ্ডালিকা, তাসের দেশ (একটি আষাঢ়ে গল্প নামক গল্প অবলম্বনে রচিত নাটক), বাঁশরী-১৯৩৩ ; শ্রাবণগাথা-১৯৩৪ ; চিত্রাঙ্গদা-১৯৩৬ ; চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য-১৯৩৮ ; শ্যামা (পরিশোধ কাব্যের নাট্যরূপ)-১৯৩৯ ; মুক্তির উপায়-১৯৪০ (১৮৯২ সালে রচিত গল্পের নাট্যরূপ) ।

কাব্যনাট্য : কাব্যনাট্য বলতে 'বিদায় অভিশাপ', 'চিত্রাঙ্গদা' 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'নরকবাস', 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' প্রভৃতি বোঝায় । চিত্রাঙ্গদা, সতী, লক্ষ্মীর পরীক্ষা প্রভৃতিতে অতি সামান্য নাটকীয় গুণ থাকার জন্যই এগুলিকে কাব্যনাট্যের পর্যায় ফেলা হয়েছে ।

গদ্যনাট্য, ব্যঙ্গনাট্য এবং হাস্য-কৌতুকনাট্য : গদ্যনাট্য, ব্যঙ্গনাট্য এবং হাস্য-কৌতুকনাট্য প্রভৃতির শব্দগত অর্থই এগুলিকে স্পষ্টরূপে চিনতে সাহায্য করে । গদ্যনাট্য হিসাবে 'রাজা', 'নলিনী', 'ডাকঘর' প্রভৃতি এবং ব্যঙ্গ ও হাস্য-কৌতুকনাট্য হিসাবে 'ছাত্রের পরীক্ষা', 'পেটে ও পিঠে', 'চিন্তাশীল' 'রোগের চিকিৎসা', 'রসিকতার ফলাফল', 'বিনি পয়সার ভোজ', 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' প্রভৃতি গদ্যে রচিত নাট্যগুলি উল্লেখযোগ্য ।

ঋতুনাট্য : ঋতুনাট্য হিসাবে 'বসন্ত', 'ফাল্গুনী', 'শেষবর্ষণ' 'শারদোৎসব', 'সুন্দর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এগুলির উদ্দেশ্য ঋতু-বন্দনা ও ঋতু-বর্ণনা । রবীন্দ্রনাথ রচিত ঋতুনাট্যগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন—

ক) প্রথম শ্রেণীর ঋতুনাট্যে মানুষ অভিনয় করে মাত্র, কিন্তু প্রকৃতিই সেখানে সজীব ও সংকেতময় ।

খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটকে মানব অভিনেতাই শুধু বিরাজিত প্রকৃতির সেখানে কোন স্থান নেই ।

গ) তৃতীয় শ্রেণীর নাটকে প্রকৃতিই অভিনেতা, মানুষ সেখানে অভিনয়ের পটভূমিতে থাকে মাত্র, কখনো ব্যাখ্যাদাতারূপে আবার কখনো কেবলমাত্র দর্শকরূপে। এই তৃতীয় শ্রেণীর নাটককেই শুধু ঋতুনাট্য বলা উচিত।

রূপকনাট্য : রূপকনাট্যে দৃশ্যত যে আখ্যানভাগ থাকে সেটিই তার আসল বক্তব্য নয়। আসল বক্তব্য বিষয়টি থাকে অন্তরালে, কিঞ্চিৎ রহস্যময় রূপে, যা সহজবোধ্য নয়। অর্থাৎ কোন গূঢ় তত্ত্ব, নীতিকথা প্রভৃতিকে রূপক-নাট্যে সরস ও চিত্তাকর্ষকরূপে প্রকাশ করা হয়। 'রাজা', 'শারদোৎসব' 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'তাসের দেশ' প্রভৃতি রূপকনাট্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য। কেহ কেহ এগুলিকে প্রতীকী, সাংকেতিক, সমস্যামূলক, তত্ত্বনাট্য প্রভৃতি বলে থাকেন।

রূপকনাট্য যে সহজবোধ্য নয় তা উপলব্ধি করে, এবং হিংসাত্মক প্রবৃত্তিযুক্ত সমালোচনাপ্রিয় তৎকালীন বাঙালিদের প্রতি কটাক্ষ করে, কবি তাঁর রক্তকরবী (এটি প্রথমে 'যক্ষপুরী' নামে রচিত হয়, এবং পাণ্ডুলিপি আকারেই পরে এর নামকরণ হয় 'নন্দিনী'। ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে বর্তমান আকারে নাটকটি রক্তকরবী নামে মুদ্রিত হয়) নাটক সম্বন্ধে, প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনায় বলেছেন :—

"আজ আপনাদের বারোয়ারি-সভায় আমার 'নন্দিনী'র পালা অভিনয়। প্রায় কখনো ডাক পড়ে না, এবারে কৌতূহল হয়েছে। ভয় হচ্ছে, পালা সাঙ্গ হলে ভিখ মিলবে না, কুত্তা লেলিয়ে দেবেন। তারা পালাটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করবার চেষ্টা করবে। এক ভরসা, কোথাও দন্তস্ফুট করতে পারবে না।

আপনারা প্রবীণ। চশমা বাগিয়ে পালাটার ভিতর থেকে একটা গূঢ় অর্থ খুঁটিয়ে বের করবার চেষ্টা করবেন। আমার নিবেদন, যেটা গূঢ় তাকে প্রাকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায়। হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের আড়ালে থেকেই কাজ করে। তাকে বের করে তার কার্যপ্রণালী তদারক করতে গেলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে ...।"

নাটক মঞ্চস্থ করার অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি অর্থাৎ, অভিনয়, অঙ্গসজ্জা, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি সম্পর্কে কবির কয়েকটি অভিমত বা অনুশাসন এখানে উদ্ধৃত করা হোল :—

১। "অভিনয়কে কাব্যের অধীনতা করিতেই হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সকল কলাবিদ্যারই গোলামি তাহাকে করিতে হইবে, এমন কী কথা আছে। যদি সে আপনার গৌরব রাখিতে চায়, তবে যেটুকু অধীনতা তাহার আত্ম-প্রকাশের জন্য নিতান্তই না হইলে নয়, সেইটুকুই সে যেন গ্রহণ করে, তাহার বেশী সে যাহা-কিছু অবলম্বন করে তাহাতে তাহার নিজের অবমাননা হয়।"

২। "আর্ট জিনিসটাতে সংযমের প্রযোজন সকলের চেয়ে বেশী। কারণ সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার। · ব্যবসায়ী আর্টিষ্ট বাস্তবের সাক্ষী। আর গুণী আর্টিষ্ট সত্যের সাক্ষী।"

৩। "স্ত্রৈণ স্বামী যেমন লোকের কাছে উপহাস পায, নাটক তেমনি যদি অভিনয়ের অপেক্ষা করিয়া আপনাকে নানাদিকে খর্ব করে তবে সেও সেইরূপ উপহাসের যোগ্য হইয়া উঠে। নাটকের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে, 'আমার যদি অভিনয় হয় তো হউক, না হয় তো অভিনয়ের পোড়াকপাল —আমার কোনই ক্ষতি নাই।"

৪। "ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে, তাতে দৃশ্যপটের কোন উল্লেখ দেখতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল এইরূপ আমি বোধ করি না।"

৫। 'ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে যাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল, কেননা কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।"

৬। "আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রব রূপে প্রবেশ করেছে, ওটা ছেলেমানুষী। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। কালিদাস মেঘদূত লিখে গেছেন, ঐ কাব্যটি ছন্দোময় কাব্যের চিত্রশালা। রেখা চিত্রকর তুলি হাতে এর পাশে পাশে তাঁর রেখাঙ্ক ব্যাখ্যা যদি চালনা করেন, তাহলে কবির প্রতি যেমন অবিচার, পাঠকের প্রতিও তেমনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। নিজের কবিত্বই কবির পক্ষে যথেষ্ট, বাইরের সাহায্য তাঁর পক্ষে সাহায্যই নয়, সে ব্যাঘাত, এবং অনেক স্থলে স্পর্ধা।"

৭। "শকুন্তলার তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে, সেই পর্যাপ্ত, আঁকা ছবির দ্বারা অত্যন্ত বেশী নির্দিষ্ট না হওয়াতেই দর্শকের মনে অবাধে সে আপন কাজ করতে পারে। নাট্যকার দর্শকের কল্পনার উপরে দাবী রাখে, চিত্র সেই দাবীকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল। দৃশ্যপটটা তার বিপরীত, অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু, দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে যায়গায় আপন আসন নেবে, সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চির প্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোন হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষীকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ বাস্তব সত্যকেও বিদ্রুপ করে, ভাব সত্যকেও বাধা দেয়।"

৮। "বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নাড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য, তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। তাহাতে কবি ও গুণীর প্রতিভার চেয়ে ধনীর মূলধন ঢের বেশী থাকা চাই। দর্শক যদি বিলাতি ছেলেমানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দুসন্তানের মতো কাজ হয়। বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রী চরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।"

গীতিনাট্যঃ নাটকের বিষয়বস্তু গান ও অভিনয় সহযোগে প্রকাশ করার মঞ্চরূপকে গীতিনাট্য বলে। রবীন্দ্রনাথ রচিত গীতিনাট্য বলতে 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা', 'শাপমোচন' প্রভৃতি বোঝায়। তবে এগুলি সম্পর্কে গীতিনাট্য শব্দের তাৎপর্য কিঞ্চিৎ ভিন্ন। কারণ এগুলির

কোনটিতে নাটকের বিষয়বস্তুই প্রধান, আবার কোনটিতে গানগুলিই মুখ্য, সেখানে যেন গানের মালা গাঁথার জন্যই নাট্যকে অবলম্বন করা হয়েছে। সাধারণত আমরা ঋতু-উৎসবের জন্য যেমন কতগুলি গান নির্বাচন করে সেই অনুসারে সংলাপ সংযোজন করে গীতি-আলেখ্য রচনা করি, অনেকটা তেমনি। কবি স্বয়ং এই প্রসঙ্গে বলেছেন: "বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা।" বাল্মীকি প্রতিভা সম্বন্ধে কবি আরো বলেছেন: "বস্তুত, বাল্মীকি প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা; অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোন স্বাদ গ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি প্রতিভা তাহা নহে। ইহা 'সুরে নাটিকা'; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্য বিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র, স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।"

"ইহার অনেককাল পরে 'মায়ার খেলা' বলিয়া একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য।...ঘটনাস্রোতের' পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, 'মায়ার খেলা' যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল।"

নৃত্যনাট্য: নৃত্যনাট্যে পাত্র-পাত্রীগণ দৃশ্যত নাচের মাধ্যমে মূকাভিনয়ে এবং নেপথ্যে গানের দল সুর সহযোগে নাটকের বিষয়বস্তু প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের শাস্ত্রোল্লিখিত 'সংগীত' শব্দের পরিভাষা (সংজ্ঞা) নৃত্যনাট্যেই পূর্ণরূপে ব্যক্ত।

নৃত্যনাট্য বলতে 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', শ্যামা প্রভৃতি বোঝায়। পরবর্তীকালে 'মায়ার খেলা' নাটিকাটিকেও কবি নৃত্যনাট্য-রূপ দিয়েছিলেন, কিন্তু জীবিতকালে তা মঞ্চস্থ করতে পারেন নি। এছাড়া যে সকল নাটককে পরবর্তীকালে নৃত্যনাট্য রূপ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে 'শিশুতীর্থ', 'শাপমোচন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে প্রতিভাবান শিল্পীর অভাবে গীতিনাট্যগুলিও নৃত্যনাট্যের রীতিতে মঞ্চস্থ হতে দেখা যায়। অবশ্য এই রীতি অবলম্বনের জন্য নাটকের রসগ্রহণে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

চতুরঙ্গ রীতি : গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতিতে গীত, কাব্য, নৃত্য ও চিত্র এই চারটি কলার সমাবেশ দেখা যায়। এগুলির মধ্যে কাব্যের স্বাদ অধ্যয়নে স্বরের স্বাদ সংগীতলিপি অনুশীলনে পাওয়া যায়। কিন্তু অপর দুটির স্বাদ মঞ্চস্থ অভিনয় না দেখলে পাওয়া সম্ভব নয়। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতিকে কবিসৃষ্ট চতুরঙ্গ-রীতি বলা যায়।

নৃত্য সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত উন্নত ও উদার। তিনি স্বয়ং নর্তক না হলেও, নৃত্য সংযোজনায় তাঁর রুচিবোধ ও কলাজ্ঞান ছিল অতুলনীয়। নৃত্য সংযোজনায় তিনি ভারতীয় চারটি ক্লাসিক নৃত্যধারা ছাড়াও দেশ-বিদেশের নানাবিধ নৃত্যধারা গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বীরত্ব ভাব-ব্যঞ্জক জাভা নৃত্য, সিংহলের ক্যাণ্ডি নৃত্য প্রভৃতি যথাযথ রূপে তিনি তাঁর নাটকে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলিকে তাই এক একটি নৃত্য-মালা বলা যায়। এগুলির বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য রক্ষা করা পরিচালক, দর্শক, সমালোচক প্রভৃতি সকলেরই কর্তব্য। অন্যান্য বিষয়ের মতো কবির নৃত্য-বিষয়ক অভিমতগুলিও অনুধাবনযোগ্য এবং শিক্ষণীয়। এখানে তাই কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করা হোল—

১। "আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালনা করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবেগ; এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পর মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গিতে বিচিত্র করে, জীবিকার প্রয়োজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে, দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকেই বলি নৃত্য…।"

২। "আমাদের দেশে একদিন নাট্য-অভিনয়ের সর্বপ্রধান অঙ্গই ছিল নাচ। নাটক দেখতে যারা আসে, পশ্চিম মহাদেশে তাদের বলে অডিয়েন্স্ অর্থাৎ শ্রোতা। কিন্তু ভারতবর্ষে নাটককে বলেছে দৃশ্যকাব্য; অর্থাৎ, তাতে কাব্যকে আশ্রয় করে চোখে দেখার রস দেবার জন্যই অভিনয়…।"

৩। "মানুষের সহজ চলায় অব্যক্ত থাকে নৃত্য, ছন্দ যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে গদ্য ভাষায়। কোন মানুষের চলাকে বলি সুন্দর। কোনটাকে বলি তার উল্টো। তফাতটা কিসে। সে কেবল একটা সমস্যা সমাধান নিয়ে। দেহের ভার সামলিয়ে দেহের চলা একটা সমস্যা। ভারটাই যদি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়,

তা হলেই অসাধিত সমস্যা প্রমাণ করে অপটুতা। যে চলায় সমস্যা সমুৎকৃষ্ট মীমাংসা সেই চলাই সুন্দর।"

পরিচালকের কর্তব্য: সুরুচিপূর্ণ নাটকাদি মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রে পরিচালকের দায়িত্ব যে অপরিসীম সেকথার (পুনরুল্লেখ করাই বাহুল্য। সুরুচি এবং সংস্কৃতির) প্রতি লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্যাদি মঞ্চস্থ করার জন্য স্বভাবতই পরিচালকের কতগুলি বিষয়ে সচেতন থাকা আবশ্যক। যেমন,

নাটকের মূল বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা। গানগুলির সুর, তাল, ভাব প্রভৃতি যথাযথরূপে আয়ত্ত করা। অভিনয়, নৃত্য-রচনা প্রভৃতি নাটকের ভাবানুগ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। গীতিগুলির অভিনয় বা নৃত্যের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য উপযুক্ত মহাড়াদির ব্যবস্থা করা। সুপরিকল্পিতরূপে আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্রাদির নির্বাচন এবং মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত, অঙ্গসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে রুচিপূর্ণ ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা। সর্বোপরি, যাবতীয় বিষয়ে আতিশয্য ও লঘু দৃষ্টি-ভঙ্গি বর্জন এবং সুরুচির অভিব্যক্তি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অঙ্গসজ্জা, রূপসজ্জা, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ রুচি ও শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছেন। এই সকল ব্যাপারে তিনি শিল্পাচার্য অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রসিদ্ধ চিত্রকর নন্দলাল বসু'র অকৃত্রিম সহযোগিতা পেয়েছিলেন। যাঁরা অতি সাধারণ উপকরণাদির সাহায্যে, কত সুন্দর রূপে এই সাজ-সজ্জার ব্যাপার সুষ্ঠু হওয়া সম্ভব, তা অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে প্রমাণ করেছেন। সেই ধারাই যে সর্বত্র অনুসৃত হয়ে চলেছে এবং হওয়া কর্তব্যও সেকথা পরিচালকের স্মরণ রাখা উচিত।

গান রচনার তথ্য: কোন্ গানটি কোন্ উপলক্ষে বা কী মনে করে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন, সে সম্পর্কে অনেকেই উৎসুক। এই প্রসঙ্গে নানা কাহিনী লোকপরম্পরায় এবং গ্রন্থাদিতে জানা যায়। অন্তরের তাগিদ ছাড়াও তিনি নানা প্রয়োজনে অনেক গান রচনা করেছেন। যেমন নাট্যাভিনয়ে পাত্র-পাত্রীর মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য, ঋতু-রূপ ব্যক্ত করার জন্য, কখনো মহড়ার সময়ে কোথাও কিছুটা সময়ের জন্য ইত্যাদি। নটরাজের প্রণামের সবগুলি গানই পরবর্তী দৃশ্যাবলীর প্রস্তুতির জন্য রচিত। এইরূপ বিবিধ

উপলক্ষে, সাময়িক প্রয়োজনে রচিত হলেও সব গানগুলিই প্রায় সর্বকালের উপযোগিরূপে রচিত হয়েছে, ফলে এগুলির রস গ্রহণে কোন অসুবিধা হয় না। তবে এমন অনেক গান আছে, রচনার ইতিহাস জানা থাকলে, যা আরো সত্য ও সার্থক মনে হবে।

১৩৩৬ সালে যতীনদাস লাহোর জেলে বিদেশী সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদে আমৃত্যু অনশন গ্রহণ করেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয়। এই সংবাদে কবি অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। তখন শান্তিনিকেতনে 'তপতী' নাটকের মহড়া চলছিল, কবি কোন মতেই আর মনঃসংযোগ করতে পারেন না, মহড়া বন্ধ হয়ে যায়। সেই রাত্রেই তিনি 'সর্বখর্বতারে দহে' গানখানি রচনা করেন। গানখানি যে তাঁর অন্তরের কী তীব্র বেদনার প্রকাশ সেকথা এই ঘটনা না জানা থাকলে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

'আজি কাঁদে কারা' গানখানি বর্দ্ধমানের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রচিত হয়।

'মরণ সাগর পারে তোমরা অমর' গানখানি বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত হয়।

'কে যায় অমৃতধাম যাত্রী' গানখানি রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত হয়।

'জয় হোক তব জয়' গানখানি আচার্য জগদীশচন্দ্র বোসের সম্বর্দ্ধনা-সভার জন্য রচিত হয়।

'বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণে' গানখানি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে ডক্টরেট্ উপাধি দান উপলক্ষে রচিত হয়।

'একদিন যারা মেরেছিল' গানখানি ১৯৩৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর, খৃষ্টদিবস উপলক্ষে রচিত হয়।

'ওই মহামানব আসে' গানখানি, সৌমেন্দ্রনাথের অনুরোধে, মানব অভ্যুত্থান উপলক্ষে রচিত হয়।

'আলোকের পথে প্রভু' গানখানি অন্ধদের দুঃখ লাঘব শিবির প্রতিষ্টা উপলক্ষে ১৯৪০ সালে রচিত হয়।

চিত্রশিল্পী অসিত ঘোষালের আঁকা ছবি দেখে কবি 'তুমি যে সুরের আগুন' এবং 'একলা বসে একে অন্তমনে' গান দুখানি রচনা করেন।

'হে নূতন' গানখানি পূরবী কাব্যের 'পচিশে বৈশাখ' কবিতার শেষাংশের কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ। এটি কবি তাঁর নিজের জন্মদিনের কথা স্মরণ করে রচনা করেছেন।

'সম্মুখে শান্তি পারাবার' গানখানি 'ডাকঘর' নাটকের শেষ দৃশ্যে অমলের শিয়রে ঠাকুর্দার গান ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাটকটি মঞ্চস্থ হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পরে যেন গানখানি গাওয়া হয়, কবি এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন।

কুমুদিনী দেবী, বাসন্তী দেবী ও নন্দিনী দেবীর বিবাহ উপলক্ষে 'জগতের পুরোহিত তুমি', 'তুমি হে প্রেমের রবি,' 'শুভদিনে শুভক্ষণে', 'দুজনে এক হয়ে যাও', 'নবজীবনের যাত্রাপথে', 'অসীম মঙ্গলালোকে', 'প্রেমের মিলন দিনে', 'সুমঙ্গলী বধূ' প্রভৃতি গানগুলি রচিত হয়।

রথীন্দ্রনাথের কন্যা নন্দিনীর শিশুসুলভ অনর্গল অর্থহীন কথা শুনে রচনা করেন 'অনেক কথা যাও যে বলে' গানখানি।

দেশের ও জাতির প্রাণের উদ্বোধনের জন্য রচনা করেন 'অয়ি ভুবনমন-মোহিনী' 'আজি এ ভারত লজ্জিত হে', 'হে ভারত আজি নবীন বর্ষে' প্রভৃতি গান।

একবার ট্রেনে চলাকালীন, তার গতিবেগে কবির মনে অদ্ভুত আবেগের সৃষ্টি হয়, সেই উপলক্ষে রচনা করেন 'চলি গো চলি', ও ওগো নদী আপন বেগে' গান দু'খানি।

একবার কথিয়াবাড় থেকে এক কৃষক পরিবারকে কবি শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। সেই পরিবারের কিশোরী মেয়েটি দুইহাতে দু'জোড়া মন্দিরা নিয়ে খুব সুন্দর ছন্দে নাচতে পারতো, সেই নাচ দেখে কবি 'দুই হাতে কালের মন্দিরা' গানখানি রচনা করেন।

১৯২২ সালে বর্ষামঙ্গলের মহড়ার সময়ে, গলায় ঠাণ্ডা লাগার দরুণ কবি গান গাইতে অক্ষম হয়ে পড়েন, সেই উপলক্ষে তিনি 'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে' গানখানি রচনা করেন।

১৯৩৭ সালে কবি শেষ 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠান করেন। এই উপলক্ষে অনেকগুলি বর্ষার গান রচিত হয়েছিল। প্রথম রাত্রের অনুষ্ঠানের একক গানগুলি ঢিমালয়ে ও টানা সুরে হওয়ায় প্রেক্ষাগৃহের শেষ পর্যন্ত শোনা গেল না। কবি এর জন্য বিষম দুঃখিত হলেন এবং বললেন, 'সব খাটুনি ব্যর্থ হোল'।

গাইয়েদের অক্ষমতাই এর জন্য দায়ী, একথা তাঁকে কিছুতেই বোঝান গেল না। গানের সুর ও ছন্দই এর জন্য দায়ী মনে করে, সেই রাত্রেই 'থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষণ' গানখানি রচনা করেন এবং সবাইকে ডেকে শিখিয়ে, তবে তিনি বিশ্রাম করতে যান।

১৯২০ সালে জাপানী যুযুৎসু-পালোয়ান টাকাগাকীকে শান্তিনিকেতনে আনিয়ে কবি যুযুৎসু-শিক্ষার প্রবর্তন করেন। এ বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য নানা স্থানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। সেই সব প্রদর্শনীর উদ্বোধন সংগীত হিসাবে 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান' গানখানি রচনা করেন।

পিতার মৃত্যু উপলক্ষে 'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ' গানখানি এবং বড়ো মেয়ের মৃত্যুর সময়ে 'কেন রে এই দুয়ারটুকু' গানখানি রচনা করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে রচনা করেন 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' গানখানি।

'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল' গানখানি নলকূপ খনন উপলক্ষে রচিত হয়। খননকার্যের সফলতা উপলক্ষে রচিত হয় 'হে আকাশ-বিহারী' গানখানি।

নববর্ষ এবং জন্মোৎসব উপলক্ষে 'হে চিরনূতন', 'শুভ্রনব শঙ্খ তব', 'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে', 'যা পেয়েছি প্রথম দিনে', 'জগতে-আনন্দ যজ্ঞে' প্রভৃতি গান রচনা করেন। শ্রাদ্ধবাসর উপলক্ষে রচিত হয় 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে' 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে', 'শেষ নাহি যে শেষকথা কে বলবে', 'দুঃখের বেশে এসেছ বলে', 'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়' প্রভৃতি গানগুলি।

জাতীয় সংগীত: রবীন্দ্রনাথ রচিত 'জনগনমন অধিনায়ক জয় হে' গানখানি স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীতরূপে নির্বাচিত হওয়াতে কোন কোন মহল থেকে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশের শিক্ষিত ও বিজ্ঞ বলে স্বীকৃত কিছু সংখ্যক ব্যক্তিও এর বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিনব অভিযোগ করেছিলেন। যেমন: ক) গানখানি ব্রহ্ম সমাজের মাঘোৎসব উপলক্ষে গীত হয়েছিল, অতএব এটি একটি ধর্মসংগীত, খ) গানখানি ভারত সম্রাট ৫ম জর্জকে লক্ষ্য করে রচিত একটি রাজ-বন্দনা-গীতি, গ) গানখানি সর্বভারতীয় নয় কারণ এতে অনেক প্রদেশের নাম নেই, ঘ) গানখানির কোন ঐতিহ্য গৌরব নেই, সুতরাং এই সকল কারণে এটি এই সম্মানের অযোগ্য। অবশ্য বর্তমানে সেই বিতর্কের অবসান হয়েছে বলে আশা করা যায়। কারণ এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত'

পুস্তিকাতে তৎকালীন নানা পত্র-পত্রিকা থেকে বহু তথ্য সংকলন সহযোগে বিস্তৃত আলোচনা করে, সেই বিতর্কের অসারতা প্রমাণ করেছেন।

অবশ্য গানখানির অর্থ অনুধাবন করলেই এই অভিযোগগুলির ভিত্তিহীনতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু তবুও এ সম্পর্কে তৎকালীন পত্র-পত্রিকার, তথ্যাদির কিছু কিছু সংকলন করা হোল।

এই গানটি রচনা সম্পর্কে কবি (ইং ২০।১১।৩৭) শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী সেন মহাশয়কে লিখেছিলেন :

"রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোন বন্ধু[১] সম্রাটের জয়গান রচনার জন্য আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, এই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন-অধিনায়ক গানে সেই ভারত ভাগ্যবিধাতার জয়ঘোষণা করেছি, পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চির সারথি, যিনি জনগনের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক। সেই যুগ যুগান্তরের মানবভাগ্য রথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোন জর্জই কোনো ক্রমেই হতে পারে না সেকথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক, বুদ্ধির অভাব ছিল না।

—বিচিত্রা, ১৩৪৪ পৌষ।

এই প্রসঙ্গে শ্রীসুধারাণী দেবীকে (ইং ২৯।৩।৩৯) কবি একখানি পত্রে বলেছেন :

শাশ্বত মানব-ইতিহাসের যুগযুগধাবিত পথিকদের রথযাত্রায় চিরসারথি বলে আমি চতুর্থ বা পঞ্চম জর্জের স্তব করতে পারি, এরকম অপরিমিত মূঢ়তা আমার সম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহ করতে পারেন তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আত্মাবমাননা।

—পূর্বাশা, ১৩৫৪ ফাল্গুন।

উপরোক্ত দুটি অংশে কবির মনোভাব স্পষ্ট। কবির রাজভক্ত বন্ধুটি গানখানি সেই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করতে না পারায় কবির উক্তির সত্যতা প্রমাণিত

১। সম্ভবত শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী (Calcutta Municipal Gazette, Tagore Memorial Special Supplement, P. XVIII) তাঁর সাহিত্য বুদ্ধির উল্লেখ আছে জীবনস্মৃতি গ্রন্থে।

হয়। তাছাড়া একথা আজ ঐতিহাসিক ভিত্তিতে স্বীকৃত যে, গানখানি সর্বপ্রথম ১৯১১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর (বুধবার) কলকাতা কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে গাওয়া হয়। অবশ্য কেহ কেহ মনে করতেন যে গানখানি দিল্লীতে সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক দরবারে গীত হয়। কিন্তু শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন :—"A 'National Anthem' was indeed sung at the Delhi Durbar to the accompaniment of guns ; and it was 'God Save the King' as I find from my copy 'The Historical Record of the Imperial Visit to India' 1911 ; Published by Jhon Murray, London, in 1944 under the authority and order of the Viceroy of India..."

The Orient, 7 Dec. 1947, P. 15.

ঐ সরকারি গ্রন্থে দিল্লীর অভিষেক দরবার এবং কলকাতা প্রভৃতি সর্বস্থানের রাজসংবর্ধনা উৎসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে। সেখানে এই গানটির কোথাও উল্লেখ নেই।

রবীন্দ্রনাথ যে ইংরাজের স্তাবকের ভূমিকায় কখনও নামেন নি তার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, মাঘোৎসবের পরের দিন 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের গোপন সারকুলারটি প্রকাশিত হয় :—It has come to my knowledge that an institution known as 'Santiniketan' or Brahmacharyasram at Bolpur in the Birbhum district of Bengal is a place altogether unsuitable for the education of the sons of Government servants. As I have information that some Government servants in this province have sent their children there, I think it necessary to ask you to warn any welldisposed Government servant whom you may know or believe to have sons at this institution or to be about to send sons to it, to withdraw them or refrain from sending them, as the case may be ; any connection with the institution in question is likely to prejudice the future of the

boys who remain pupils of it after the issue of the present warning.

—Bengalee, 1912, Jan. 26, p. 4.

এই সার্কুলারের ফলে বহু ছাত্র আশ্রম ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং স্বভাবতই শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ক্ষতি হয়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানখানি ডিসেম্বর মাসে গাওয়া হয় এবং জানুয়ারী মাসে (যখন ছাত্র ভর্তি হবার সময়) এই সার্কুলারটি প্রচারিত হয়। এতে রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনকে যে সরকার প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন না সেকথাও প্রমাণিত হয়। সরকারের এইরূপ মনোভাবের কারণ হোল রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদ ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব থেকেই তিনি আত্মশক্তির বাণী প্রচার করেছিলেন। বঙ্গবিভাগের সময়ে যে আন্দোলন দেশকে উদ্‌বেল করে তোলে, তিনি তার পুরোভাগেই বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি শিবাজী উৎসবের অন্যতম পুরোধা, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রণী, রাজবন্দী অরবিন্দের নির্ভীক বন্দনাকার ছিলেন। আলোচ্য গানটির রচনাকালেও তিনি দেশবাসীর দৃষ্টিতে কোন্ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে সম্পর্কে তৎকালীন সংবাদপত্রের মারফৎ জানা যায় :—"He has been not only a lifelong devotee of the Bengali Language and literature, but has rendered conspicuous service, by means of his writings, to the cause of the new movement in the country, the movement of national self-help and self-reliance of which he was undoubtedly one of the pioneers.

Bengalee, 1912, Jan. 31, p. 4.

তাঁর স্বাদেশিকতার প্রসঙ্গে রমানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :—'His patriotic songs are characteristic. Some of them enthrone the Motherland as the Adored in the shrines of our souls, some sound as a clarion call to our drooping spirits, filling us with hope and the will to do and dare and suffer.

Modern Review, 1912, Feb, p. 229

তাঁর দেশপ্রীতির কবিতা সম্বন্ধে লিখেছেন যে, সেগুলি '.. make the

heart beat thick and fast, and the blood tingle and leap and course in our vain,"

প্রসঙ্গক্রমে, ১৯২৭ সালের ৩১শে আগষ্ট জাভা থেকে লিখিত একখানি পত্রে এই গানখানি সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য :—

"আমাদের ইতিহাসে একদিন ভারতবর্ষ আপন ভৌগলিক সত্তাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিল ; তখন সে আপনার নদী পর্বতের ধ্যানের দ্বারা আপন ভূমূর্তিকে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল।...আমি কয়েক বছর আগে ভারত বিধাতার যে জয়গান রচনা করেছি তাতে ভারতের প্রদেশগুলির নাম গেঁথেছি—বিন্ধ্যহিমাচল-যমুনাগঙ্গার নামও আছে। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের ও সমুদ্রপর্বতের নামগুলি ছন্দে গেঁথে কেবলমাত্র একটি দেশ পরিচয় গান আমাদের লোকের মনে গেঁথে দেওয়া ভালো। দেশাত্মবোধ বলে একটা শব্দ আজকাল আমরা কথায় কথায় ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু দেশাত্মজ্ঞান নেই যার দেশাত্মবোধ হবে কেমন করে ?"

যাত্রী, জাভা যাত্রীর পত্র।

মাঘোৎসব সভাতে রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মের নবযুগ' নামে যে ভাষণ দেন তার শেষাংশে আছে :—

"আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই পণ করিয়া ভূমার পথে নিখিল মানবের বিজয় যাত্রায় যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যোগ দিতে পারি—

জয় জয় জয় হে জয় বিশ্বেশ্বর
মানবভাগ্যবিধাতা।"

এই ভাষণের পূর্বে ভারতী পত্রিকায় কংগ্রেসের বর্ণনা প্রসঙ্গে 'জনগনমন অধিনায়ক জয় হে' গানের উদ্দিষ্ট পাত্রকে মানবজাতির অদৃষ্ট বিধাতা বলে বর্ণনা করেছেন।

এই যে তিনটি বিভিন্ন সময়ে মানব ভাগ্যনিয়ন্তাকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতবিধাতা বলে বর্ণনা করেছেন সেটা কখনোই আকস্মিক হতে পারে না। তাছাড়া ছাব্বিশ বছর পরেও তিনি যে একই ভাষায় গানটির মর্মকথা প্রকাশ করেছেন তাতে একথা অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, এই গানটির উৎপত্তি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতি সম্পূর্ণ অবিকৃতই ছিল। সুতরাং এই গানটি সম্পর্কে উল্লিখিত গুজব একেবারেই ভিত্তিহীন।

রবীন্দ্র-জীবনের মুখ্য ঘটনাবলী: ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ (ইং ৭ মে ১৮৬১) রাত্রি আড়াইটার পরে কলকাতার জোড়াসাঁকোর পৈত্রিক বাড়িতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সারদা দেবীর চতুর্দশ সন্তান এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র।

৭-১১ বছর। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল ও বেঙ্গল একাডেমিতে অনিয়মিত অধ্যয়ন। বাড়িতে হেমেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে নানাবিধ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষালাভ এবং ব্যায়ামচর্চা। ৮ বছর বয়স থেকেই কাব্য প্রতিভার বিকাশ।

১২ বছর। উপনয়ন ও পিতার সঙ্গে হিমালয়ে গমন। মহর্ষির প্রত্যক্ষ প্রভাব লাভ। ৮ মার্চ, ১৮৭৫, ১৪ বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ।

১৬ বছর। ভারতী পত্রিকায় করুণা, ভিখারিণী, কবিকাহিনী, ভানুসিংহের পদাবলী প্রভৃতির প্রকাশ। বিলাত ভ্রমণ।

২০-২২ বছর। 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনা এবং স্বয়ং বাল্মীকি-রূপে অভিনয়। ৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩ সালে মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ। ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড, সন্ধ্যাসংগীত, কালমৃগয়া, বৌঠাকুরাণীর হাট, প্রভাত সংগীত বিবিধ প্রসঙ্গ, য়ুরোপবাসীর পত্র প্রভৃতি রচনা।

২৩ বছর। বৌদি, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু, (১৯ এপ্রিল ১৮৮৪)। ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রভৃতি রচনা।

২৪-৩০ বছর। রামমোহন রায়, রবিচ্ছায়া, কড়ি ও কোমল, রাজর্ষি, মায়ার খেলা, চিঠিপত্র, মানসী, পোষ্টমাষ্টার, আলোচনা, সমালোচনা প্রভৃতি রচনা এবং শান্তিনিকেতনের উদ্বোধন।

৩১ বছর। চিত্রাঙ্গদা, গোড়ায় গলদ, শিক্ষার হেরফের প্রভৃতি রচনা এবং সোনার তরী'র সূচনা।

৩২-৩৭ বছর। সাধনায় মেয়েলি ছড়া, পঞ্চভূতের ডায়েরী, য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী, বিচিত্র গল্প, কথাচতুষ্টয়, বিদায় অভিশাপ প্রভৃতি রচনা। শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু। ক্ষুধিত পাষাণ রচনা। ভারতীর সম্পাদনা। লক্ষীর পরীক্ষা, সিডিসন এ্যাক্টের প্রতিবাদে 'টাউন হলে' 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধ পাঠ এবং ঢাকা প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান।

৩৮-৪০ বছর। কলিকাতায় প্লেগ, সেবাকার্যে ভগ্নী নিবেদিতার সঙ্গে যোগাযোগ। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু। কণিকা, কথা ও কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা, গল্পগুচ্ছ (১ম ভাগ) প্রভৃতি রচনা। বঙ্গদর্শনে চোখের বালির সূচনা মাধুরীলতা ও রেণুকার বিবাহ।

৪১-৪৩ বছর। ২৩ নভেম্বর ১৯০২ মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু। রেণুকার মৃত্যু। বঙ্গদর্শনে নৌকাডুবির ক্রমিক মুদ্রণ।

৪৪ বছর। পিতার মৃত্যু ১৯ জানুয়ারী ১৯০৫। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতৃত্ব। রাখীবন্ধন, আত্মশক্তি, বাউল, স্বদেশ প্রভৃতি রচনা।

৪৫ বছর। কৃষিবিদ্যা শিখতে রথীন্দ্রনাথ এবং সন্তোষচন্দ্রকে আমেরিকা প্রেরণ। ভারতবর্ষ, খেয়া, নৌকাডুবি প্রভৃতি রচনা।

৪৬-৪৭ বছর। মীরার বিবাহ। শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু। ব্যাধি ও প্রতিকার গোরা, রাজাপ্রজা, প্রজাপতির নির্বন্ধ, সমাজ, শারদোৎসব, শিক্ষা প্রভৃতি রচনা।

৪৮ বছর। গীতাঞ্জলি, রাজা, প্রবাসী পত্রিকায় জীবনস্মৃতি প্রভৃতি রচনা। জাতীয় সংগীত রচনা।

৪৯-৫২ বছর। ১২ জানুয়ারী ১৯১২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কবি-সম্বর্ধনা। তৃতীয়বার বিদেশ ভ্রমণ। ডাকঘর, ছিন্নপত্র, অচলায়তন প্রভৃতি রচনা। গীতাঞ্জলির অনুবাদ ইংলণ্ডের রোটেনষ্টাইনকে প্রদর্শন এবং ঘরোয়া সভায় বিদ্বজ্জন সমক্ষে কবি ইয়েটস কর্তৃক তাহা পাঠ। ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক Gitanjali'র প্রকাশ। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক ডি, লিট্ উপাধি দান।

৫৩-৫৭ বছর। এন্ড্রুজ ও নন্দলালের আশ্রম পরিদর্শন। পিয়ার্সনের আশ্রমে বাস গ্রহণ। ফিনিক্স স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের আশ্রমে আগমন। ফাল্গুনী, সবুজপত্র, বলাকা, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, গীতিমাল্য, গীতালী প্রভৃতি রচনা। গান্ধীজী ও কস্তুরবার আগমন। নাইট উপাধি লাভ। চতুর্থবার বিদেশ যাত্রা। জাপান ও আমেরিকায় নানা বিষয়ে বক্তৃতা। স্যাডলার কমিশন ও ভারত সচীব মণ্টেগুর সঙ্গে সাক্ষাত। তোতাকাহিনী রচনা। মাধুরীলতার মৃত্যু। সঞ্চয়, পরিচয়, বলাকা, গল্পসপ্তক, পলাতকা প্রভৃতি রচনা।

৫৮ বছর। দক্ষিণ ভারত পর্যটন। আদেয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলর-রূপে ভাষণ। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি ত্যাগ, ৩০ মে ১৯১৯। জাপানযাত্রী ও লিপিকা রচনা।

৫৯-৬০ বছর। পশ্চিম ভারত পর্যটন। পঞ্চমবার বিদেশযাত্রা। ফ্রান্সের নানা মনীষীর সঙ্গে সাক্ষাতকার। হল্যাণ্ডে বিপুল সম্বর্ধনা। আমেরিকায় ভাষণদান। ইংল্যাণ্ড হয়ে জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ এবং রোঁমারোলা, কাউণ্ট কেসাবলিং, টমাস মান প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা। দেশে ফিরে, ২৩ ডিসেম্বর ১৯২১ শান্তিনিকেতনের সমুদয় সম্পত্তি বিশ্বভারতীকে দান।

৬১ বছর। দক্ষিণ ভারত ও সিংহল পর্যটন। মুক্তধারা, লিপিকা, শিশু ভোলানাথ প্রভৃতির প্রকাশ।

৬৩ বছর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা। চীনে আমন্ত্রণ। চীন, জাপান, পেরু প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ। বসন্ত ও রক্তকরবী রচনা। ৪ মার্চ ১৯২৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৃত্যু। ১৮ জানুয়ারী ১৯২৬ দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু।

৬৪-৬৫ বছর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা, আগরতলায় ত্রিপুরার মহারাজা কর্তৃক সম্বর্ধনা। ইতালির আমন্ত্রণে অষ্টমবার বিদেশ ভ্রমণ। মুসোলিনী কর্তৃক রাজকীয় সম্বর্ধনা। ইতালীয় ভাষায় 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়। রোঁমারোঁলার আমন্ত্রণে সুইজারল্যাণ্ড গমন এবং জর্জ দুহামেল প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। নরওয়ের রাজার আমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনা। সুইডেন, ডেনমার্ক হয়ে জার্মানিতে আগমন। বার্লিনে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা। চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস ও মিশর পরিভ্রমণান্তে সাত মাস পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। চিরকুমার সভা, শোধবোধ, নটীর পূজা প্রভৃতি রচনা।

৬৬ বছর। জয়পুর, আগ্রা, ভরতপুর ও আমেদাবাদ ভ্রমণ। শিলঙে অবস্থান, নটরাজ ও ঋতুরঙ্গ রচনা এবং যোগাযোগ ও শেষের কবিতা উপন্যাসের সূচনা। নবমবার বিদেশ যাত্রা। মালয়, বালী, জাভা প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ এবং শ্যামদেশ হয়ে প্রত্যাবর্তন। জাভাযাত্রীর পত্র ও 'শেষরক্ষা'র রচনা।

৬৭ বছর। পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ব্যাঙ্গালোর ও সিংহলে গমন। শেষের কবিতা রচনা।

৬৮ বছর। কানাডার আমন্ত্রণে দশমবার বিদেশ যাত্রা। জাপান ও ভ্যাংকুবারে গমন ও বক্তৃতা। যুক্তরাষ্ট্রের নানাস্থানে ভ্রমণ ও বক্তৃতা। জাপান ও ইন্দোচীন হয়ে প্রত্যাবর্তন। যাত্রী, তপতী, মহুয়া'র রচনা।

৬৯ বছর। একাদশবার বিদেশ ভ্রমণ। ফ্রান্‌স হয়ে ইংলণ্ডে গমন। অক্‌সফোর্ডে হিবারট লেকচার, পরে Religion of Man নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। জার্মানিতে আইনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ডেন্‌মারক্‌ হয়ে রাশিয়ায় গমন। সেখানে বিপুল সম্বর্ধনা। ভানুসিংহের পত্রাবলী ও The Child রচনা।

৭০ বছর। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণ কর্তৃক কবি সার্বভৌম উপাধি দান। ১ অক্টোবর, হিজলি বন্দীশিবিরে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে জনসভায় বক্তৃতা। The Golden Book of Tagore প্রকাশিত। রাশিয়ার চিঠি, বনবাণী, প্রশ্ন, সহজ পাঠ, গীতবিতান, সঞ্চয়িতা, শাপমোচন প্রভৃতির প্রকাশ।

৭১ বছর। গান্ধীজীর কারাবরোধ। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। আমন্ত্রিত হয়ে দ্বাদশবার বিদেশ ভ্রমণ। পারস্যের রেজা শা পহলবী ও পারস্যবাসীদের সর্বত্র বিপুল সম্বর্ধনা। ইরাক হয়ে প্রত্যাবর্তন। পরিশেষ, কালের যাত্রা, পুনশ্চ প্রভৃতি রচনা। গান্ধীজীর অনশনে উদ্‌বেগ ও পুনা গমন।

৭২ বছর। বোম্বাই যাত্রা। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য স্থানে বক্তৃতা। মদনমোহন মালব্যের শান্তিনিকেতনে আগমন। কলিকাতায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকিতে সভাপতিত্ব। ভারত পথিক রামমোহন, Man, দুইবোন, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, বাঁশরী প্রভৃতি রচনা।

৭৩ বছর। জওহরলালের শান্তিনিকেতনে আগমন। মালঞ্চ, শ্রাবণগাথা, চার-অধ্যায় রচনা। ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে দক্ষিণভারত পরিক্রমা।

৭৪ বছর। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে অভিভাষণ ও ডি. লিট্‌ উপাধি লাভ। নানাস্থানে ভাষণ দান। দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যু। জাপানী কবি নোগুচির শান্তিনিকেতনে আগমন। শেষ সপ্তক, বীথিকা রচনা।

৭৫ বছর। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে বক্তৃতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট উপাধি লাভ। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, পত্রপুট, ছন্দ, শ্যামলী, সাহিত্যের পথে, জাপানে, পারস্যে, পাশ্চাত্য-ভ্রমণ, প্রভৃতি রচনা।

৭৬-৭৭ বছর। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট উপাধি লাভ। চণ্ডালিকা, মুক্তির উপায়, সেঁজুতি, Poet to poet (নোগুচির পত্র ও উত্তর) প্রভৃতির প্রকাশ।

৭৮ বছর। ২১ জানুয়ারী ১৯৩৯ কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রের শান্তিনিকেতনে আগমন। ৩১ জানুয়ারী হিন্দী ভবনের উদ্বোধন। ১৯ আগষ্ট 'মহাজাতি সদনের' ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন। ১৬ ডিসেম্বর মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরের উদ্বোধন। প্রহাসিনী, আকাশ প্রদীপ, শ্যামা নৃত্যনাট্য, পথের সঞ্চয় প্রভৃতি রচনা।

৭৯-৮০ বছর। ১৭ ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী ও কস্তুরবার আশ্রমে আগমন। ৭ আগষ্ট অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট উপাধি লাভ। নবজাতক, সানাই, ছেলেবেলা, তিন সঙ্গী, রোগশয্যায়, চিত্রলিপি, কবি অঙ্কিত চিত্রাবলি। অশীতিবর্ষপূর্তি-উৎসব উপলক্ষে ভাষণ সভ্যতার সংকট। আরোগ্য, জন্মদিনে, গল্পসল্প, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। ত্রিপুরার মহারাজা কর্তৃক 'ভারত ভাস্কর' উপাধি দান। ৩০ জুলাই ১৯৪১ পীড়ার জন্য অস্ত্রোপচারের পূর্বে মুখে মুখে সর্বশেষ রচনা: "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি"। ৭ আগষ্ট ১৯৪১ (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) রাখী-পূর্ণিমার দিনে বেলা ১২ টার সময়ে জোড়াসাঁকোর পৈত্রিক বাড়িতে দেহত্যাগ।

ঐতিহাসিক নির্ঘণ্ট

বিভিন্ন সাংগীতিক গ্রন্থাদিতে সংগীতজ্ঞদের জীবন-কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত রাজা-মহারাজাদের রাজত্বের সময়কালগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্ত লক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত সময়কালগুলিও পরস্পর মত-পার্থক্যযুক্ত হতে দেখা যায়। তার উপরে আছে বিভিন্ন রাজা-মহারাজার নামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সময়কাল। এই সকল জটিলতার সুষ্ঠু সমাধানের দায়িত্ব অবশ্যই অন্য মহলের। এখানে শুধু মাত্র সাধারণ শিক্ষার্থীর সুবিধার্থে সামান্য দিগ্‌দর্শনের প্রচেষ্টা করা হোল।

অতীতে সময়কাল সহযোগে ইতিহাস রচনার প্রথা ছিল না, তবে রাজা-বাদশাহদের বংশ তালিকার সংকলন রচনার সংস্কার ছিল। কিন্তু সেই সকল রাজত্বের সময়কালগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'বিক্রম', 'শক', 'গুপ্ত', 'হর্ষ' প্রমুখ নৃপতিদের রাজত্বকালের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। ফলস্বরূপ নানা পরস্পর বিরোধী অভিমত এবং জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ খৃষ্টীয় অব্দের সঙ্গে উক্ত সময়কালগুলির সঠিক সম্পর্ক অনেক সংগীত শিক্ষার্থীর কাছেই অস্পষ্ট। উক্ত সময়কালগুলির সম্পর্ক নিম্নরূপ—

বিক্রম : খৃষ্টপূর্ব ৫৮, ∴ খৃষ্টাব্দ + ৫৮ = বিক্রমাব্দ।
শক : ৭৮ খৃষ্টাব্দ, ∴ খৃষ্টাব্দ − ৭৮ = শকাব্দ।
গুপ্ত : ৩২০ খৃষ্টাব্দ, ∴ খৃষ্টাব্দ − ৩২০ = গুপ্তাব্দ।
বঙ্গাব্দ : ৫৯৩ খৃষ্টাব্দ, ∴ খৃষ্টাব্দ − ৫৯৩ = বঙ্গাব্দ।
হর্ষ : ৬০৬ খৃষ্টাব্দ, ∴ খৃষ্টাব্দ − ৬০৬ = হর্ষাব্দ।

বর্তমানে ঐতিহাসিকগণ পরীক্ষা নিরীক্ষা তথা বিচার বিবেচনা করে প্রাচীনকাল থেকে যাবতীয় নৃপতিগণের রাজত্বকাল মোটামুটি ভাবে স্থির করেছেন। সাধারণ শিক্ষার্থীর সুবিধার্থে, প্রাচীনকাল থেকে যে সকল নৃপতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করেছেন, তাঁদের সময়কাল, খৃষ্টীয় অব্দ সহযোগে সংকলন করা হোল।

প্রসঙ্গত এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা কর্তব্য যে, প্রাচীন রাজত্বগুলির আঞ্চলিক নামসমূহের অধিকাংশই বর্তমানে অপ্রচলিত অথবা লুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে প্রাচীন নামোল্লিখিত রাজ্যসমূহের অবস্থান নির্ণয় করা সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে কঠিন মনে হতে পারে। তাই বৌদ্ধ সাহিত্যে

উল্লিখিত ষোলটি মহাজনপদ, যেগুলি সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত ছিল, তাদের প্রাচীন নাম এবং বর্তমান অবস্থানগুলি দেওয়া হোল।

১। অঙ্গ : পূর্ব বিহার ; ২। মগধ : দক্ষিণ বিহার ; ৩। কাশী : বেনারস ; ৪। কোশল : অযোধ্যা ; ৫। বজ্জি : উত্তর বিহার ; ৬। মল্ল : গোরখপুর ; ৭। ছেদি : যমুনা ও নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ; ৮। বৎসা : এলাহাবাদ ; ৯। কুরু : থানেশ্বর (দিল্লী ও মিরাটের মধ্যবর্তী অঞ্চল) ; ১০। পঞ্চালা : বাদাউন ও ফরাক্কাবাদ জেলা ; ১১। মকচা : জয়পুর ; ১২। সৌরসেনা : মথুরা ; ১৩। অসাকা : গোদাবরী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ; ১৪। অবন্তি : মালওয়ার চরমনাবতী উপত্যকা, চম্বল হোল যমুনার শাখা নদী , ১৫। গান্ধার : পেশোয়ার ও রাওয়ালপিণ্ডি জেলা ; ১৬। কাম্বোজ : দক্ষিণ পশ্চিম কাশ্মীর ও কাফ্রীস্থানের অংশসমূহ।

এছাড়াও যে সকল প্রাচীন নামের উল্লেখ বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় তাদের অবস্থানগুলি এইরূপ :—

১। পাটলিপুত্র : পাটনা , ২। বৈশালী : পাটনার উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ; ৩। কপিলাবস্তু : গণ্ডক নদীর তীরে যুক্তপ্রদেশ ও নেপাল সীমান্তীয় অঞ্চল ; ৪। শ্রাবস্তি : অযোধ্যার উত্তর সীমান্তবর্তী অঞ্চল ; ৫। উজ্জয়িনী : চম্বল নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল ; ৬। পুলিন্দ : নর্মদা ও তাপ্তী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ; ৭। কলিঙ্গ : গোদাবরী ও মহানদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ; ৮। অন্ধ্র : কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ; ৯। চোলা : মহীশূর ; ১০। পাণ্ড্য : কাবেরী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল।

খৃষ্টপূর্বাব্দকাল।

৫৬৩-৪৮৩ : গৌতম বুদ্ধ, সিদ্ধার্থ (বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তক) ; কপিলাবস্তু।

৫৪৩-৪৯১ : বিম্বিসার ; মগধের রাজা।

৪৯১-৪৫৮ : অজাতশত্রু ; মগধের রাজা।

৪২২-৩২২ : নন্দ বংশ ; প্রথম নন্দ 'মহাপদ্ম' নাকি নাপিতের পুত্র ছিলেন। পুরাণে এঁকে দ্বিতীয় পরশুরাম বলা হয়েছে। এই বংশের নয়জন 'নন্দ' বিশাল রাজত্ব ভোগ করেছেন।

৩২৭-৩২৫ : আলেকজাণ্ডার, (গ্রীক, ম্যাসিডন) মহাযোদ্ধা ও বীর। ইনি সমগ্র পশ্চিম ভারত অধিকার করেছিলেন।

৩২২-১৮৪ : মৌর্যবংশ ; চন্দ্রগুপ্ত—৩২২-২৯৮ সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য
বিন্দুসার—২৯৮-২৭৪ গান্ধার থেকে বঙ্গ তথা দক্ষিণে
অশোক—২৭৪-২৩৭ অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

?—১৮৪ : অশোক বংশীয় বৃহদ্রথ ;
গ্রীকেরা ১৯০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে কিছুকাল উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজত্ব করেন।

১৮৪-৭২ : শুঙ্গ বংশ ;
শকেরা ৯০ খৃষ্টপূর্বাব্দে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হানা দেয়। খৃষ্টপূর্ব ৭৫ থেকে ৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শক ও পহ্লবেরা উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজত্ব করে।

খৃষ্টাব্দকাল।

৪০-২৩০ : কুশান বংশ ; প্রকৃতপক্ষে এই বংশ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করে।

কডকিসিস (১ম) ৪০-৬৪ কুশান রাজত্ব ব্যাকটেরিয়া থেকে
কডকিসিস (২য়) ৬৪-৭৮ মালওয়া পর্যন্ত সমগ্র উত্তর-পশ্চিম
কনিষ্ক (১ম) ৭৮-১০১ ভারতে বিস্তৃত ছিল।
ঐ (২য়) ১০১-১১৯
ঐ (৩য়) ১৭৬-২৩০

১৩০-৩৮৮ : শকবংশ ; উজ্জয়িনী।

৩০০-৮৮৮ : পহ্লববংশ ; দক্ষিণ ভারত।

৩১৯-৫৫০ : গুপ্তবংশ ; চন্দ্রগুপ্ত (১ম) ৩১৯-৩৩৫ গুপ্তবংশের রাজত্ব সিন্ধু
সমুদ্রগুপ্ত ৩৩৫-৩৭৫ থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত
চন্দ্রগুপ্ত (২য়) ৩৭৬-৪১৪ সমগ্র মধ্য ভারতে
কুমারগুপ্ত (১ম) ৪১৪-৪৫৪ বিস্তৃত ছিল।
স্কন্দগুপ্ত ৪৫৫-৪৬৭
কুমারগুপ্ত (২য়) ৪৭৩-৫৫০

হূনেরা ৪৫০ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারত আক্রমণ করেছিল।

৫৫০-৭৫৭ : পশ্চিম চালুক্য রাজত্ব ; বাতাপি (বাদামী)

৫৫০-৯৭০ : পূর্ব চালুক্য রাজত্ব ; ভেনগী ; (ভীমাভরম)

খৃষ্টাব্দকাল।

৯৭৩-১১৮৯ : উত্তর চালুক্য রাজত্ব ; কল্যাণী ; গোদাবরীর দক্ষিণে।
রাজা ভোজ : ১০১৮-১০৬০ ; ধারা ; মালওয়া।
রাজা সোমেশ্বর : ১০৪২-১০৬৮ ; উড়িষ্যা।

৫৮০-৬৪৭ : পুষ্যভূতি বংশ :
প্রভাকর বর্ধন : ৫৮০-৬০৫ ;
রাজ্যবর্ধন : ৬০৫-৬০৬ ;
হর্ষবর্ধন : ৬০৬-৬৪৭, এঁর রাজত্ব থানেশ্বর থেকে উজ্জয়িনী এবং সৌরাষ্ট্র থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৭১০-১৩২৭ : পাণ্ড্য বংশ ; মাদুরাই।

৭৩০-৭৪০ : যশো বর্মা ; কান্যকুব্জ, বঙ্গদেশ ;

৭৫০-১১৪২ : পাল বংশ :
ধর্মপাল : ৭৭০-৮১০
দেবপাল : ৮১০-৮৫০
মহীপাল : ৯৭০-১০৩০
এই বংশের প্রথম রাজা ছিলেন গোপাল, আর শেষের দিকে নয়াপাল, ইন্দ্রদ্যুম্নপাল প্রমুখ রাজত্ব করেছেন। এই রাজত্ব দিল্লী থেকে বঙ্গোপসাগর এবং জলন্ধর থেকে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৮০০-১০১৮ : গুর্জর প্রতিহর্ষ : কান্যকুব্জ ;

৮৫০-১২৬৭ : চোলা রাজত্ব : তাঞ্জোর ;

৯১৬-১২০৩ : চন্দেলা বংশ : বুন্দেলখণ্ড ;

৯৫০-১১৯৫ : কলাকুরিস বংশ : ত্রিপুরী, মধ্যভারত।

৯৭৩-১১৯২ : কাহমানস বংশ : আজমীর, রাজস্থান।

১০৯০-১১৯৩ : গাহদভালস বংশ : বেনারস, কান্যকুব্জ।

১০৯৫-১২০৫ : সেন বংশ : উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ।
বল্লাল সেন : ১১০৮-১১১৯ ;
লক্ষণ সেন : ১১১৯- ? ; বিশ্ববিখ্যাত কবি জয়দেব এঁর সভায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১১৯০-১৯২৪ : যাদব বংশ ; দেবগিরি, দক্ষিণ ভারত।

১৩৩৬-১৬৭৫ : বিজয়নগর রাজত্ব (বিদ্যানগর) ; তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এই নগরে, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিদ্যারণ্যের প্রভাবে শ্রেষ্ঠ হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

খৃষ্টাব্দকাল।

৬৩৬ : ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আরবদের অভিযান।

৭১১-১২ : মহম্মদ বিন কাশিমের নেতৃত্বে আরবদের ভারত আক্রমণ এবং সিন্ধু জয়।

৯৭৮-৯৯৭ : তুর্কি আমীর সাবুক্তিগিন ; গান্ধার, সিন্ধু ও গুর্জর। ইনি আফ্‌গানিস্থান থেকে ভারত আক্রমণ করেন এবং উক্ত অঞ্চলগুলি জয় করেছিলেন।

৯৯৪-১০৩০ : মহমুদ ; (ঐ পুত্র)।

১০১৮ : গজনীর মহম্মদ মথুরা ও কনৌজ জয় করেন।

১১৭৫-১২০৪ : সাহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোড়ী ; সিন্ধু, মূলতান, পাঞ্জাব।

১২০৬-১২৯০ : ক্রীতদাস রাজত্ব : দিল্লী।
কুতুবুদ্দীন আইবক : ১২০৬-১২১০ ; (কুতুবমিনার নির্মাতা ?)
সমশুদ্দীন ইলতুতমিশ : ১২১০-১২৩৬ ; (দিল্লী সলতনতের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা)
ঐ কন্যা রিজিয়া : ১২৩৬-১২৪০ ;
নসিরুদ্দীন (ঐ ভ্রাতা) : ১২৪৬-১২৬৬ ;
ঐ শ্বশুর : গিয়াগুদ্দীন বলবন : ১২৬৬-১২৮৬ ;
কাইকোবাদ (ঐ পৌত্র) : ১২৮৭-১২৯০ ;

১২৯০-১৩২০ : খিলজি রাজত্ব ; দিল্লী।
জালালুদ্দীন : ১২৯০-১২৯৬ ;
আলাউদ্দীন : ১২৯৬-১৩১৬ ; প্রসিদ্ধ আমীর খসরু এবং মালিক কাফুর (হিন্দু ক্রীতদাস) এঁরই রাজত্বে অতিউচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১৩২০-১৪১২ : তুঘলক রাজত্ব : দিল্লী।
মহম্মদ গিয়াগুদ্দীন : ১৩২০-১৩২৫ ;
মহম্মদ বিন : ১৩২৫-১৩৫১ ;
ফিরোজ শা : ১৩৫১-১৩৮৮ ;

১৩৯৮ : তৈমুরের ভারত আক্রমণ ;

১৪১১-১৪৫১ : সৈয়দ রাজত্ব ; দিল্লী।
খিজির খাঁ : ১৪১৪-১৪২১ ;
মুবারক শা : ১৪২১-১৪৩৪ ;

১৪৫১-১৫২৬ : লোদী রাজত্ব ; দিল্লী।
সুলতান ভুলুল (আফগান) : ১৪৫১-১৪৮৮ ;
সুলতান সিকন্দর গাজী (আফগান) : ১৪৮৮-১৫১৭ ;
সুলতান ইব্রাহিম (আফগান) : ১৫১৭-১৫২৫ ;

১৫১০ : পর্তুগীজদের গোয়া অধিকার।

১৪৮৬-১৫১৮ : রাজা মানসিংহ তোমর ;

খৃষ্টাব্দকাল।

১৩৪৭-১৫২৬ : বাহমনী রাজত্ব ;
আলাউদ্দীন শা : ১৩৪৭-১৩৫৮ ;
মহম্মদ (১ম) : ১৩৫৮-১৩৭৭ ;
মহম্মদ (২য়) : ১৩৭৮-১৩৯৭ ;
ফিরোজ শা : ১৩৯৭-১৪২২ ;
আহম্মদ : ১৪২২-১৪৩৫ ;
আলাউদ্দীন : ১৪৩৬-১৪৫৮ ;
হুমায়ুন জলীম : ১৪৫৮-১৪৬১
নিজাম শা : ১৪৬১-১৪৬৩ ;
মহম্মদ (৩য়) : ১৪৬৩-১৪৮২ ;
মহমুদ : ১৪৮২-১৫১৮ ;
আহমদ : ১৫১৮-১৫২১ ;
বলিউল্লা : ১৫২১-১৫২৪ ;
কলিমুদ্দীন : ১৫২৪-১৫২৭ ;

বাহমনী রাজত্ব উত্তরে গঙ্গা ও দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী আর পূর্বে ভঙ্গীর ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১৫২৬-১৮৫৮ : মোঘল রাজত্ব ; দিল্লী।
বাবর : ১৫২৬-১৫৩৭ ;
হুমায়ুন : ১৫৩০-১৫৪০
১৫৫৫-১৫৫৫
আকবর : ১৫৫৬-১৬০৬ ;

জাহাঙ্গীর : ১৬০৫-১৬২৭ ;
শাহজাহান : ১৬২৭-১৬৫৮ ;
ঔরঙ্গজেব : ১৬৫৭-১৭০৭ ;
বাহাদুর শা : ১৭০৭-১৭১২ ;
ফরুখ সৈয়র (ঐ পৌত্র) : ১৭১২-১৭১৯ ;
মহম্মদ শা (বাহাদুর শা'র পৌত্র) : ১৭১৯-১৭৪৮ ;
বাহাদুর শা (২য়) : ১৮৩৭-১৮৫৮ ;

১৫৪০-১৫৪৫ : শের শা (সুর) ; দিল্লী।
সেলীম শা (সুর) : ১৫৪৫-১৫৫৪ ;

১৭৩৯-১৭৪৭ : নাদির শা (তুর্কী) ; দিল্লী।

॥ কাশ্মীর ॥

খৃষ্টাব্দকাল।

১৩১৬—১৩৫৯ : শাহ মির্জা ;
১৩৫৯—১৩৭৬ : ঐ (৩য়) পুত্র ;
১৩৭৬—১৩৯৩ : বংশধরেরা ;
১৩৯৩—১৪১৬ : সিকন্দর ;
১৪২০—১৪৬৭ : জিয়াবুল আবেদিন ; ইনি অত্যন্ত দক্ষ এবং মহৎ বাদশাহ ছিলেন। নানাবিধ বিষয়ে এঁর অসাধারণ যোগ্যতা নাকি বাদশাহ আকবরের থেকেও উন্নত ছিল।

॥ জৌনপুর ॥

১৩৫৯—১৩৬০ : ফিরোজ শা তুঘলক ; জৌনপুর নগর নির্মাতা।
১৪০০—১৪৭৯ : শর্কী রাজত্ব ;
মুবারক শা : ? -১৪০০ ;
সমশুদ্দীন ইব্রাহিম শা : ১৪০০—১৪৩৬ ; ইনি মুবারক শা'র ভ্রাতা এবং বংশের যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ বাদশাহ ছিলেন।
মহমুদ শা : ঐ পুত্র ; ১৪৩৬—১৪৫৭ ;

সুলতান হোসেন : ঐ ভ্রাতা ; ১৪৫৭-১৪৭৯ ; ইনি অতি গুণী সংগীতজ্ঞ ও বংশের শেষ বাদশাহ ছিলেন।

খৃষ্টাব্দকাল।

॥ গুজরাট ॥

১৪০১-১৪০৭ : জাফর খাঁ ; (রাজপুত ছিলেন)।

১৪০৭-১৪১১ : মুজফ্‌ফর খাঁ ; ঐ পুত্র ;

১৪১১-১৪৪১ : আহমদ শা ; ঐ পুত্র ; আহমদাবাদ নগর নির্মাতা।

১৪৫৯-১৫১১ : মহম্মদ বেগড় ; ঐ পুত্র ;

১৫২৬-১৫৩৭ : বাহাদুর শা ; (ঐ পুত্র)

॥ উড়িষ্যা ॥

১২৩৮-১২৬৪ : নরসিংহ (১ম) ; ইনি অত্যন্ত মহান ও প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত সূর্যমন্দির (কোনারক) ও জগন্নাথ মন্দির (পুরী) এঁরই অমর কীর্তি। তবে এঁর বংশধরেরা তেমন যোগ্য ছিলেন না।

? -১৩৩৪ : ভানুদেব (৪র্থ) ; বংশের অন্তিম রাজা ছিলেন।

১৩৩৪-১৩৪১/৪২ : গজপতি ;

১৩৩৪ - ? : কপিলেন্দ্র ; ইনি ছিলেন রাজা ভানুদেবের মন্ত্রী। অযোগ্য রাজার কাছ থেকে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। বিচক্ষণ এই রাজার বিশাল রাজত্ব দক্ষিণে কাঞ্চিপুরম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

?? পুরুষোত্তম ; ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

১৪৯৭-১৫৪০ : প্রতাপরুদ্র ; ঐ পুত্র।

১৫৫০ ১৫৬৮ : মুকুন্দ হরিচন্দন ; এঁর পরে উড়িষ্যা বাদশাহ আকবরের অধিকারভুক্ত হয়।

॥ বাংলা ॥

১২৮২-১৩৩৯ : বুগরা খাঁ ; বলবন পুত্র।

১৩৩৮-১৩৪০ : ফকীরুদ্দীন ;

১৩৪০-১৫২৬ : বঙ্গদেশ সমগ্র ভারত থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ছিল।

১৪১৪-১৪৩১ : জালালুদ্দীন মহম্মদ (জয়মল); বাংলার রাজা গণেশের পুত্র জয়মল রাজা হওয়ার পরে জামালুদ্দীন নাম এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইনি বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন।

১৪৩১-১৪৪২ : সামশুদ্দীন মহম্মদ; ঐ পুত্র।

১৪৫৯-১৪৯৩ : রুকনুদ্দীন মহম্মদ;

১৪৯০-১৫১৮ : হোসেন শা (সৈয়দ) ইনি বাংলার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ হিসাবে স্বীকৃত।

১৫১৮-১৫৩৩ : হোসেন নসরৎ শা (ঐ পুত্র); ইনি মুসলমান বাদশাহদের মধ্যে পরম ভ্রাতৃবৎসল হিসাবে উল্লেখযোগ্য। হোসেনশাহী রাজত্ব প্রায় ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

১৫৩৯-১৫৫৬ : শের শা (সুর); এঁর পরে বাংলা, বাদশাহ আকবরের অধিকারভুক্ত হয়।

১৭০৫-১৭২৭ : মুর্শিদকুলি খাঁ;

১৭২৭-১৭৩৯ : সুজাউদ্দীন খাঁ;

১৭৩৯-১৭৪০ : সরফরাজ খাঁ;

১৭৪০-১৭৫৬ : আলবর্দী খাঁ;

১৭৫৬-১৭৫৭ : সিরাজুদ্দৌলা;

১৭৫৭-১৭৬০ :
১৭৬৪-১৭৬৫ : } মীরজাফর;

১৭৬০-১৭৬৪ : মীরকাশিম;

॥ মহারাষ্ট্র ॥

১৬৭৪-১৬৮০ : ছত্রপতি শিবাজী, জন্ম : ১৬২৭; মৃত্যু : ২-৪-১৬৮০।
ঐ পিতা : শাহজী ভোঁসলে : (জায়গীরদার)
ঐ গুরু : রামদাস : ১৬০৮-১৬৮১;

১৬৮০-১৬৮৯ : শম্ভুজী (১ম); (শিবাজীর পুত্র)।

১৬৯০-১৭০০ : রাজারাম : ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

১৭০০-১৭০৮ : শিবাজী (২য়) ঐ পুত্র।

১৭০০ - ? : তারাবাঈ; রাজারামের স্ত্রী।

১৭০৮-১৭৪৯ : শাহজী; (শম্ভুজী'র পুত্র এবং শিবাজী'র পৌত্র)

১৭১৪ - ? : শম্ভুজী (২য়) কোলহাপুর।
১৭৬৩-১৭৭৭ : রামরাজা ; ঐ পুত্র।
১৭৬৫-১৭৮৬ . তুলজাজী : তুলাজীরাও ভোঁসলে।

॥ পেশোয়া বংশ ॥

খৃষ্টাব্দকাল।
১৭১৩-১৭২০ : বালাজী বিশ্বনাথ ; শাহুজী'র সেনাপতি।
১৭২০-১৭৪০ : বাজিরাও (১ম), ঐ পুত্র।
১৭৩০-১৭৫৫ : রঘুজী ভোঁসলে ;
১৭৪০-১৭৬১ : বালাজী রাও, (বাজিরাও'র পুত্র)।
১৭৬১-১৭৭২ : মাধবরাও নারায়ণ, (মৃত্যু: ১৭৯৫ খৃঃ)
১৭৬৩-১৭৮৩ : রঘুনাথ রাও (ঐ খুল্লতাত)।
১৭৯৬-১৮১৮ : বাজিরাও (২য়)

॥ দেশীয় রাজত্ব ॥

১৭৫৪-১৭৭৫ : সুজাউদ্দৌলা ; অযোধ্যা।
১৭৭৫-১৭৯৫ : আসফউদ্দৌলা ; অযোধ্যা।
? - ১৭৮০ : হৈদর আলী ; মহীশূর।
১৭৮০-১৭৯৯ : টিপু সুলতান ; মহীশূর।
১৭৮৯-১৮১৪ : সাদত আলী ;
১৮১৪-১৮২৭ : গাজিউদ্দীন হৈদর ;
১৮২৭-১৮৩৭ : নসীরুদ্দীন হৈদর ;
১৮৪৭-১৮৫৬ : ওয়াজেদ আলী শা ; লক্ষ্ণৌ।
১৭৫৮-১৯৪৭ : ইংরাজ রাজত্ব ;
লর্ড ক্লাইভ : ১৭৫৮-১৭৭২ ; বাংলার গভর্ণর।
লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংস : ১৭৭২-১৭৮৬ ; ,,
লর্ড কর্ণওয়ালিস : ১৭৮৬-১৭৯৩ ; গভর্ণর জেনারেল
স্যার জন শোর : ১৭৯৩-১৭৯৮ ; ,,
মারকুইস ওয়েলেসলি : ১৭৯৮-১৮০৫ ; ,,
জর্জ বারলো : ১৮০৫-১৮০৭ ; ,,

আর্ল মিণ্টো (১ম) : ১৮০৭-১৮১৫ ; ,,
মারকুইস হেস্টিংস : ১৮১৩-১৮২৩ ; ,,
লর্ড আমহার্ষ্ট : ১৮২৩-১৮২৮ ; ,,
উইলিয়ম বেন্টিক : ১৮২৮-১৮৩৩ ; ,,
লর্ড অকল্যাণ্ড : ১৮৩৬-১৮৪২ ; ,,
লর্ড এ্যালেনবুরগ : ১৮৪২-১৮৪৪ ,,
লর্ড হার্ডিঞ্জ : ১৮৪৪-১৮৪৮ ; ,,
লর্ড ডালহাউসি : ১৮৪৮-১৮৫৬ ; ,,

১৮৫৭-৫৮ : সিপাহী বিদ্রোহ।

লর্ড ক্যানিং : ১৮৫৮-১৮৬২ ; গভর্ণর জেনারেল।

১৮৭৭ : ইংলণ্ডের রাণী ভারতের রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

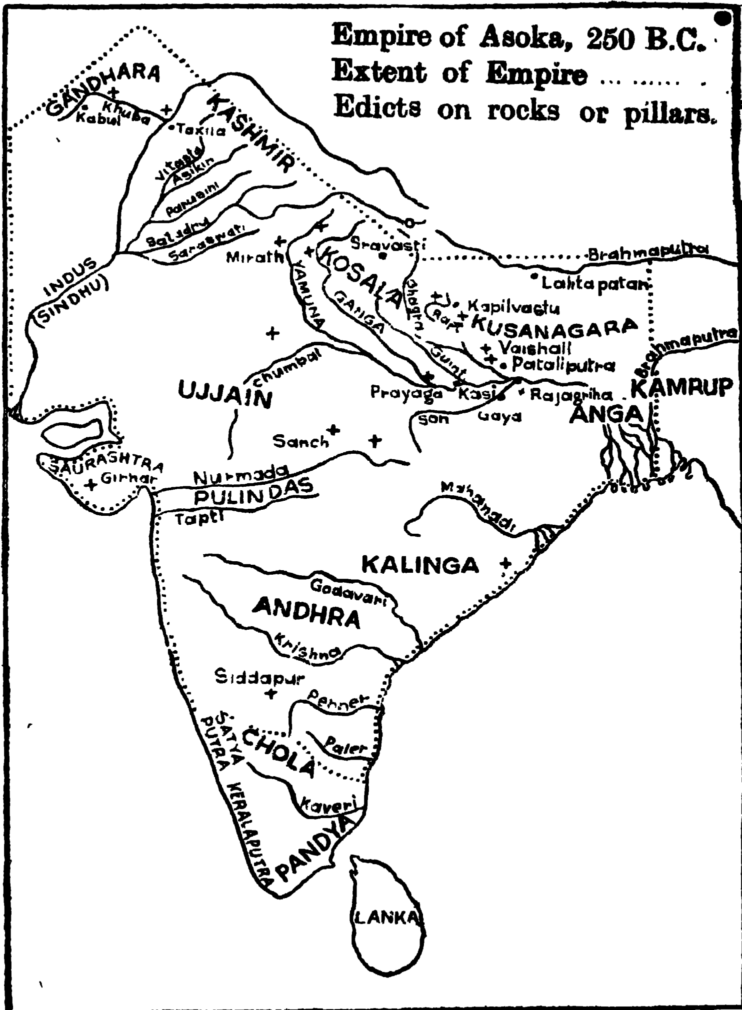
॥ স্বাধীন ভারতের প্রেসিডেণ্ট ॥

১৯৪৭-১৯৪৮ : লর্ড লুইস মাউণ্টব্যাটেন ;
১৯৪৮-১৯৫০ : রাজাগোপালাচারী ;
১৯৫০-১৯৬২ : ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ;
১৯৬২-১৯৬৭ : ডঃ রাধাকৃষ্ণন ;
১৯৬৭-১৯৬৯ : ডঃ জাকির হোসেন ;
১৯৬৯-১৯৭৪ : ডঃ ভি. ভি. গিরি ;
১৯৭৪-১৯৭৭ : ফকরুদ্দীন আলী আহম্মদ ;
১৯৭৭- : নীলম সঞ্জীব রেড্ডী।

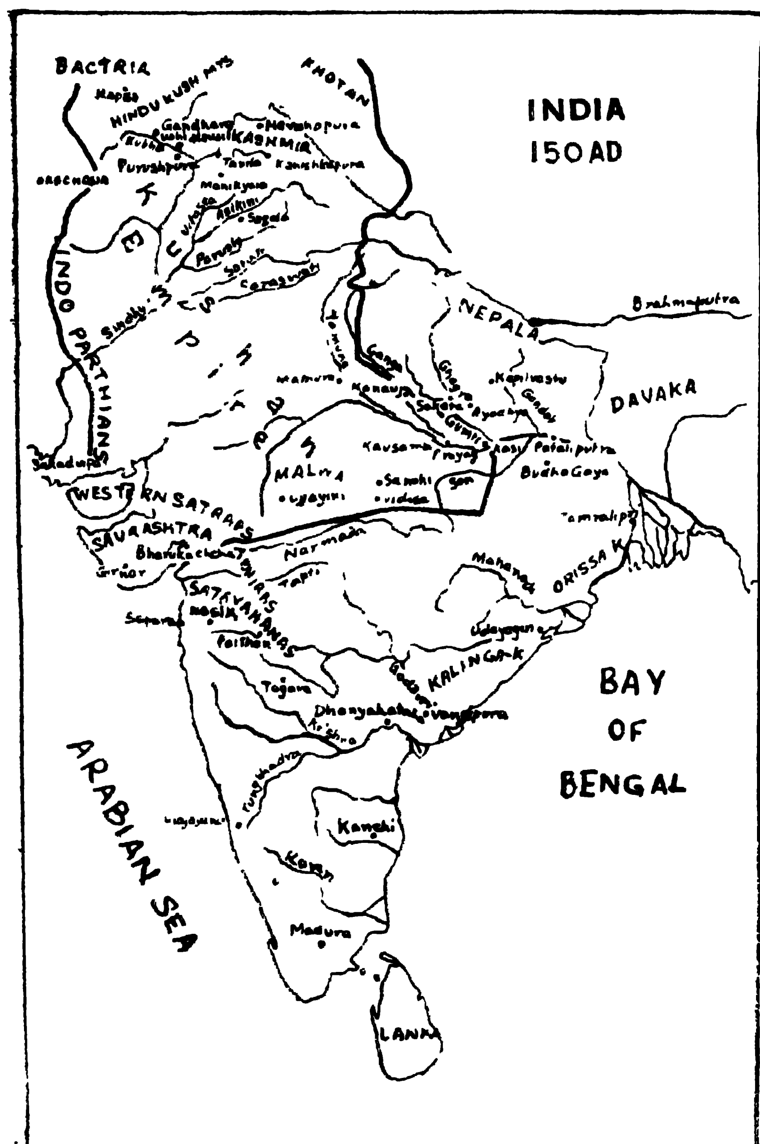
॥ স্বাধীন ভারত ॥

প্রধানমন্ত্রী।

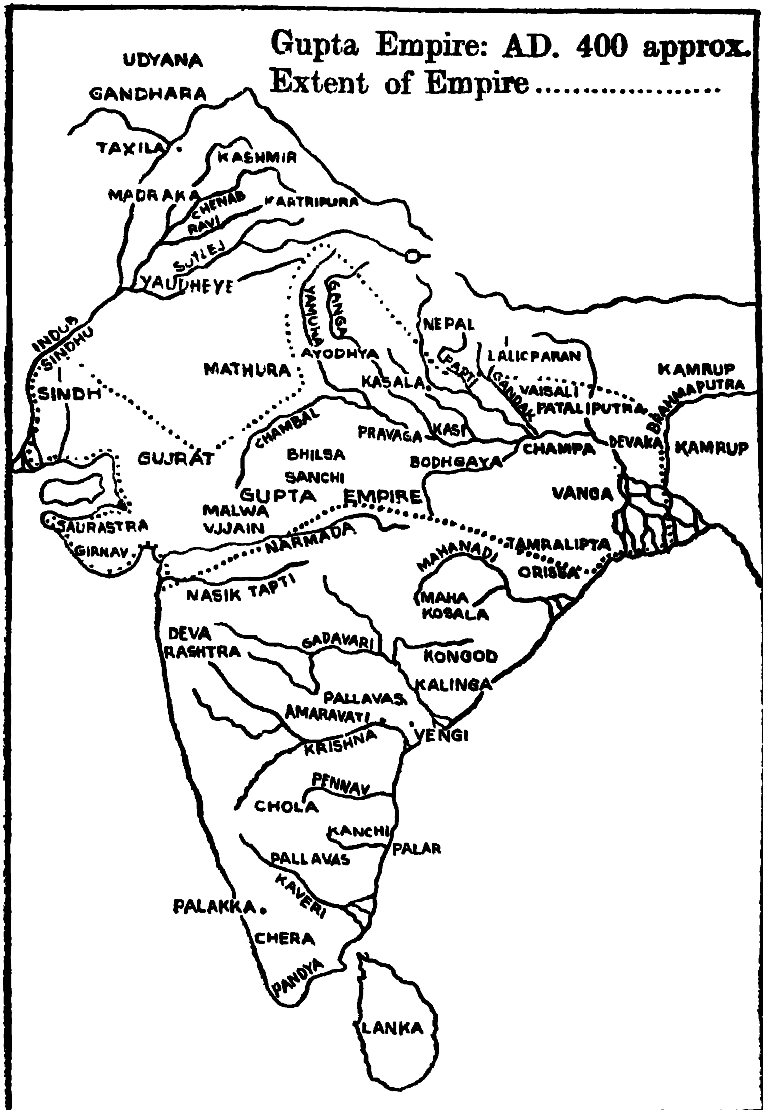
জহরলাল নেহেরু : $\frac{১৫}{৮}$১৯৪৭—$\frac{২৭}{৫}$১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ।
গুলজারিলাল নন্দা : $\frac{২৭}{৫}$১৯৬৪—$\frac{৯}{৬}$১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ। (তত্ত্বাবধায়ক)।
লালবাহাদুর শাস্ত্রী : $\frac{৯}{৬}$১৯৬৪—$\frac{১১}{১}$১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ।
গুলজারিলাল নন্দা : $\frac{১১}{১}$১৯৬৬—$\frac{২৪}{১}$১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ।
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী : $\frac{২৪}{১}$১৯৬৬—$\frac{২৩}{৩}$১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ।
মুরারজী রণছোড়জী দেশাই $\frac{২৪}{৩}$১৯৭৭—$\frac{২৮}{৭}$১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ।
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী : $\frac{১৪}{১}$১৯৮০—



Advance History of India : P-104



Advance History of India : P-160



Advance History of India : P-184

সংগীত বিষয়ক গ্রন্থসূচী

প্রাচীনকাল থেকে রচিত যে সকল সংগীত গ্রন্থাদির নাম বর্তমান কালের সংগীত পুস্তকাদি রচনায় উল্লিখিত হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত সূচী এখানে সংকলন করা হোল।

সংখ্যা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
১	অভিনব গুপ্ত	অভিনব ভারতী। লোচন।
২	অহোবল	সংগীতপারিজাত।
৩	অপ্পাতুলসী	অভিনব তালমঞ্জরী। রাগকল্পদ্রুমাংকুর। রাগচন্দ্রিকা। রাগচন্দ্রিকা সার। সংগীত সুধাকর।
৪	ওঁকারনাথ ঠাকুর	প্রণবভারতী। সংগীতাঞ্জলি।
৫	কল্লিনাথ	সংগীতরত্নাকর টীকা।
৬	কোহল	অভিনয়শাস্ত্র। কোহলরহস্যম্। তাললক্ষণম। সংগীত মেরু।
৭	কুম্ভকর্ণ (মহারাণা কুম্ভ	রসিকপ্রিয়া। সংগীতমীমাংসা। সংগীতরাজ। সংগীতরূপ।
৮	গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়	গীতপ্রবেশিকা। গীতিমালা। তানমালা। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস। সংগীতচন্দ্রিকা।
৯	গোবিন্দাচার্য	সংগীতচূড়ামণি।
১০	জয়দেব	গীতগোবিন্দম।
১১	তুলজাজী (তুলাজীরাও ভোঁসলে)	সংগীত সময়সারামৃত।
১২	দত্তিল	দত্তিলম।
১৩	দামোদর	সংগীতদর্পণ।
১৪	নন্দী (নন্দি)	নন্দিভরতম।

সংখ্যা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
১৫	নন্দিকেশর	তাললক্ষণম্। তালাভিনয়লক্ষণম্। ভরতার্থ চন্দ্রিকা।
১৬	নরহরি চক্রবর্তী	গীতচন্দ্রোদয়। ভক্তিরত্নাকর।
১৭	নারদ	নারদীশিক্ষা। পঞ্চমসারসংহিতা। সংগীতমকরন্দ। সারসংহিতা।
১৮	নারায়ণ (?)	সংগীতরাগকল্পদ্রুম্।
১৯	নান্যদেব	ভরত ভাষ্যম্।
২০	পাণিনি	পাণিনিশিক্ষা।
২১	পার্শ্বদেব	সংগীত সময়সার।
২২	পি. সাম্বমুর্তি	Dictionary of South Indian Music & Musicians. Great Composers. Great Musicians. History of Indian Music. Etc.
২৩	পুণ্ডরীক বিটঠল	নর্তন নির্ণয়। রাগদর্পণ। রাগমঞ্জরী। সদ্রাগচন্দ্রোদয়।
২৪	ফকীরুল্লা	রাগদর্পণ।
২৫	বাল্মীকি	রামায়ণ।
২৬	বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর	ভজনামৃতলহরী। মহিলা সংগীত। রাগ প্রবেশ। রাষ্ট্রীয় সংগীত। সংগীত তত্ত্বদর্শক। স্বল্পালাপ গায়ন।
২৭	বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে	অভিনব রাগমঞ্জরী। ক্রমিক পুস্তক মালিকা। ভাতখণ্ডে সংগীতশাস্ত্র। শ্রীমলক্ষ্যসংগীতম্। ইত্যাদি।
২৮	বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী	ভারতীয় সংগীতকোষ।
২৯	ব্যাসদেব	মহাভারত।
৩০	ব্যংকটমুখী	চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা।
৩১	ভরত	নাট্যশাস্ত্র।
৩২	ভাবভট্ট	অনুপসংগীতাংকুশ। অনুপসংগীত বিলাস।

সংখ্যা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
		অনুপসংগীতরত্নাকর। ধ্রুপদের টীকা। নষ্টাদিষ্ট প্রবোধ। মুরলীপ্রকাশ। সংগীতবিনোদ।
৩৩	মতঙ্গদেব	বৃহদ্দেশী।
৩৪	মহম্মদ রজা	নগমাতে আসফি।
৩৫	মহাকবি কালিদাস	ঋতুসংহার। কুমার সম্ভব। বিক্রমোর্বশী। মালবিকাগ্নিমিত্র। মেঘদূত। রঘুবংশ। শকুন্তলা।
৩৬	মাধব বিদ্যারণ্য	দৃগদৃশ্যবিবেক। পঞ্চদশীসর্বদর্শন। পরাসর মাধব। সংগীতসার।
৩৭	যাজ্ঞবল্ক্য	যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা।
৩৮	রঘুনাথ	ভরতশাস্ত্রম। সংগীতসুধা।
৩৯	রাজা প্রতাপ	সংগীত চুড়ামণি।
৪০	রাজা নবাব আলী	মারিফুন্নগামাত।
৪১	রাজা ভোজ	শৃঙ্গার প্রকাশ। সরস্বতীকণ্ঠাভরণম্।
৪২	রাজা মানসিংহ তোমর	মানকুতুহল।
৪৩	রাজা সোমেশ্বর	অভিলাসচিন্তামণি। মানসোল্লাস।
৪৪	রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর	কণ্ঠকৌমুদী। মৃদঙ্গমঞ্জরী। যন্ত্রকোষ। Hindu Music. Six Principal Ragas. Etc.
৪৫	রাজা হরিপাল দেব	সংগীত সুধাকর।
৪৬	রামামাত্য	স্বরমেলকলানিধি।
৪৭	লোচন	রাগতরঙ্গিণী। রাগসর্বসংগ্রহ।
৪৮	শার্ঙ্গদেব	সংগীতরত্নাকর।
৪৯	সবাই প্রতাপ সিংহ	সংগীতসার।
৫০	সোমদেব পরামর্দী	সংগীতরত্নাবলী।
৫১	সোমনাথ	রাগবিবোধ।

সংখ্যা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
৫২	সিংহভূপাল	কবলয়াবলী বা রত্নপঞ্চালিকা। কন্দর্প-সম্ভব। রসার্বর্ণ সুধাকর। সংগীত-সুধাকর। সংগীতরত্নাকর-টীকা।
৫৩	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস। রাগ ও রূপ। সংগীত সারসংগ্রহ। সংগীতে রবীন্দ্রনাথ। A Short History of Indian Music. Etc.
৫৪	হৃদয় নারায়ণ দেব	হৃদয়কৌতুক। হৃদয়প্রকাশ।
৫৫	ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী	কণ্ঠকৌমুদী। সংগীতসার।

গ্রন্থপঞ্জী ('Bibliography')

1. A History of Arabian Music. 1929. London.
Dr. H. G. Farmer.

2. A Survey of Russian Music. 1944. M. D. Calvocoressi.

3. Arabic Thought & its place in History.
D. Lacy O' Leary.

4. A Handbook of Musical knowledge. 1968. London.
James Murray, D. Mus

5. Encyclopaedia Britannica. 1971. London. Vol. XXIV.

6. India & Her People. 1905-6. Swami Abhedananda.

7. Introduction to the study of Musical Scale. 1943.
Allan Danielou.

8. Landmarks of the World's Art. 1967, London.
(Vol. X). Paul Hamlyn.

9. The Art of Indian Asia. 1968. New York. USA
(II Vol) Heinrich Zimmer.

10. The Rise of Music in the Ancient World. 1944.
London. Curt Sachs.

11. The Story of Music. 1902. London. F. J. Crowest.

12. The World of Music. 1957. London. (Vol. II).
K. B. Sandved.

13. A Handbook of Musical Knowledge. (Part I) 1968.
London. James Murray Brown. D. Mus. FTCL. Lram.

14. 100 Question on Theory, Answered for Candidates
preparing of Exam. of Music, 1946. London.
Tames Lyon. D. Mus. (Oxon).

15. Advance History of India. 1956. London.
A. L. Bashm.

16. Dwarkin & Sons. Catalague 'H' 1971.

17. History of Indian Music. 1960. P. Sambomorthy.

18. Great Musicians. 1959. —do—

19. Great Composers. 1962, 1970. (2 Vol.) —do—

20. Dictionary of South Indian Music & Musician (2 Vol.)
1952 1959. P. Sambomorthy.

21. South Indian Music. 1960. (১ Vol.) —do—

22. The Wonder That was India. 1956. London.
A. L. Bashm.

23. Sources of Indian Tradition. 3rd Print 1960.
New York. Columbia University Press.

গীতবিতান। ফাল্গুন ১৩৫৭। (৩ খণ্ড) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাতীয় সংগীত। বৈশাখ ১৩৫৮। প্রবোধ সেন।

প্রসাদ (পত্রিকা/সংগীত সংখ্যা) আষাঢ় ১৩৭৭ ; শ্রাবণ ১৩৭৯।

বৃহত্তর ভারত (প্রবাসী পত্রিকা) ১ম সংখ্যা ১৩৩২।

ক্রমিক পুস্তক-মালিকা। (৬ খণ্ড) ১৯৫৭। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে।

জীবনী অভিধান। ১৩৭৩ কলিকাতা। সুধীরচন্দ্র সরকার।

জীবনস্মৃতি। ১৩৬৩ বিশ্বভারতী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভাতখণ্ডে সংগীতশাস্ত্র। (৪ খণ্ড) ১৯৬৮-১৯৬৯। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে।

ভারতের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ / মধ্যযুগ) ১৯৬৪ কলিকাতা।
Dr. Atul Ch. Roy. M. A. Ph. D. (London.)

ভারতীয় সংগীতকোষ। বৈশাখ ১৩৭২। বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী।

ভারতীয় সংগীত প্রসঙ্গ। ডঃ বিমল রায়।
ভারতীয় সংগীতে ছন্দ ও তাল। আষাঢ় ১৩৬৯। সুবোধ নন্দী।
রবীন্দ্রসংগীত। ১৩৫৮। শান্তিদেব ঘোষ।
রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ। (২ খণ্ড) ১৩৬৭-১৩৬৯। প্রফুল্লকুমার দাস।
রবীন্দ্র জীবনকথা। ১৩৬৬। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
রবীন্দ্রসংগীতে ত্রিবেণীসঙ্গম। ১৩৬১। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী।
রাগ ও রূপ। (২ খণ্ড) ১৯৬১-১৯৬৫। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।
রাগ নির্ণয়। (২ খণ্ড) ১৩৫৭। রবীন্দ্রলাল রায়।
রাগ কোষ। ১৯৬২। লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ।
রাগ বিজ্ঞান। (৬ খণ্ড) ১৯৪৭-১৯৪৮। বিনায়ক রাও পটবর্ধন।
লিপিচিত্রে সংগীত সাধক। ১৯৬৭। অমরেন্দ্র কুমার দত্ত।
সংগীত দর্শিকা। (২ খণ্ড) ১৩৬৫-১৩৬৮। ননীগোপাল বন্দোপাধ্যায়।
সংগীত চিন্তা। ১৩৭৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সংগীত চন্দ্রিকা। ১৩৭৪। গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়।
সংগীত ও সংস্কৃতি। (২ খণ্ড) ১৯৬১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।
সংগীত সমীক্ষা। রাজ্যেশ্বর মিত্র।
সংগীতের আসর। দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়।
সংগীতাঞ্জলি। (৬ খণ্ড) ১৯৫৬-১৯৬২। পণ্ডিত ওঁকারনাথ ঠাকুর।
সংগীত সার। ১২৮৬। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী।
সংগীতজ্ঞোকে সম্মরণ। ১৯৫৯। বিলায়েত হোসেন খাঁ।
সংগীত বিশারদ। ১৯৬১। বসন্ত।
সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা। ১৩৬৩। ১৩৬৪। ১৩৬৫। ১৩৬৬। কলিকাতা।
আর. বি. দাস এণ্ড সন্স ৮ সি লালবাজার ষ্ট্রীট।
হমারে প্রিয় সংগীতজ্ঞ। ১৯৬৮। প্রঃ হরিশ্চন্দ্র শ্রীবাস্তব।
হমারে সংগীতরত্ন। ১৯৬৯। লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ।
হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের স্থান। ১৩৬৪। বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

শব্দসূচী

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২১	আনদ্ধ	অবনদ্ধ
১০	৯	স্বরেও	স্বরের
১২	২১	অণরসনাত্মক	অনুরসনাত্মক
১৩	১	সর্বোচ্চ	সর্বাশ্চ
৪১	১৭	খণ্ডমেরু মীডখণ্ড	খণ্ডমেরু/মীড়খণ্ড
৫০	২৫	দৃষ্টিনামাগ্রে	দৃষ্টিনাসাগ্রে
৫৮	১৮	মধ্যমগ্রামে	মধ্যমগ্রামের
১৩৩	৮	নি	নি̣
১৪২	১০	মাতঙ্গদেব	মতঙ্গদেব
১৪২	১৪	তাছাড়া	এছাড়া
১৫২	১৯	মহাভারত	মহাভারত
১৫৫	৪	বিক্ষো	বিক্ষেপ
১৫৭	১৪	পদ্ধতি	পদ্ধতিতে
১৫৭	২৪	তা	তো
১৬৫	২৬	উন্নতি	উন্নত
১৭৯	১২	যতিষেখর	যতিশেখর
১৮০	১৩	লক্ষীতাল	লক্ষ্মীতাল
১৮১	৫	লক্ষী	লক্ষ্মী
২৩৩	১	Serol	Scrol
২৫০	২৬	গোলপন্থ, কেদারপন্থ	গোলপন্থ, কেদারপন্থ
২৫০	২৬	কম্বয়ম	কম্বরম
২৫১	১	যার	যায়
২৫১	৫	অট	অঠ
২৬৬	৯	কল্লড়	কন্নড়
২৬৭	৪	খরহরপ্রিয়	খরহরপ্রিয়
২৭৩	১৫	এইরূশ	এইরূপ

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭৬	১৯	স্বরান্তরালাদি	স্বরান্তরালাদি
২৮৩	১২	Seale	Scale
৩০৯	১৩	লক্ষান্তরে	পক্ষান্তরে
৩১৩	২৫	মন্ত্র	মন্দ্র
৩১৮	১৫	Lines Spaces	Lines/Spaces
৩২০	৯	Tone Semitone	Tone/Semitone
৩২০	১১	Tonic Tonality	Tonic/Tonality
৩২১	৩	The Colleen Bown	The Colleen Brown
৩২২	৩	Domniant	Dominant
৩২৪	৫	Double Sharp Double Flat	Double Sharp / Double Flat
৩২৬	২১	Comon	Common
৩২৭	৮	Denominator Numerator	Denomitor/Numeratos
৩৪১	৬	জালাপ্রসাদ	জ্বালাপ্রসাদ
৩৬৫	৯	খস্তার	খণ্ডার
৩৭৫	১৭	আলশ্যক	আবশ্যক